# মালদহ জেলার ইতিহাস

প্রথম পর্ব

ড. প্রদ্যোত ঘোষ

পরিবেশক

পুস্তক বিপণি

২৭, বেনিয়াটোলা লেন

কলিকাতা - ৭০০০০৯

**প্রয়াত উদার-হৃদয় শ্রুতকীর্তি অধ্যক্ষ দুর্গাকিঙ্কর ভট্টাচার্য**

যাঁর স্নেহডোর মালদা জেলাকে আমার 'তৃতীয় স্বদেশ' করেছে
যাঁর সান্নিধ্যে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা পরম গৌরবের হয়েছিল
যিনি জীবদ্দশায় প্রবাদ-প্রতিম অধ্যাপক-অধ্যক্ষে পরিণত হয়েছিলেন
মৎ-সামর্থ্যে জীবনের শেষ পর্যন্ত সুগভীর বিশ্বাস,
প্রত্যয় ও স্নেহ যাঁর জাগরূক ছিল

এবং

**প্রয়াত যশস্বী পণ্ডিত মনীন্দ্রমোহন চৌধুরী**

বরেন্দ্র বিসার্চ-এর খ্যাতিমান গবেষক, এশিয়াটিক সোসাইটির প্রকাশনায়
যাঁর গ্রন্থ সম্মানিত

যাঁর মধ্যে দেবত্বকে অনুভব করে আমি ধন্য।

**— তাঁদের পূত আত্মা শ্রদ্ধায় স্মরণ করে**

**ও**

**দেশখ্যাত হোমিও চিকিৎসক ডাঃ এম. হাসান (বালি-উত্তরপাড়া)**

যাঁর মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে জ্যোতির্ময় মানবাত্মাকে প্রত্যক্ষ করে আমি অভিভূত

**তাঁকে ভক্তিভরে গ্রন্থটি নিবেদিত হল।**

## মুখবন্ধ

সুদূর অতীত-ইতিহাসের গ্লানিমাময় ধূসর স্মৃতি বক্ষে ধারণ করে আজও গৌড় দাঁড়িয়ে আছে জেলা মালদহে (সামান্য অংশ অবশ্য বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত)। গৌড় ও মালদহ তাই অঙ্গাঙ্গীভাবে এখন বিজড়িত হয়ে আছে, যদিও প্রাচীন ও মধ্যযুগের গৌড়ের চৌহদ্দী বারবার পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত ও সংকুচিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন যুগে।

আজ ভগ্ন গৌড় ইতিহাসের স্মৃতিমাত্র। কিন্তু সেই স্মৃতির খণ্ডিত, ধূল্যবলুণ্ঠিত ভগ্নাবশেষ মধ্যযুগের কতিপয় ভগ্ন সৌধ, মসজিদ, ভবন ও দীর্ঘিকা ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই অভিজ্ঞানগুলি তারও অতীতের খণ্ড ক্ষুদ্র চিহ্নের আভাস জাগায়। এ গুলির দিকে দৃষ্টিপাত করে ভাবুক মনে তার ইট-কাঠ-পাথরের মধ্যে অনেক অনেক যুগের যুদ্ধ-বিগ্রহ, জয়-পরাজয়, গৌরব-অগৌরব, কামনা-বাসনা, জিগীষা-জিঘাংসা বিজড়িত রাজকীয় যুগের ইতিহাসের অসংখ্য অকথিত বাণীই বুঝি 'চুপি সারে কথা কয়'। এগুলি ঐতিহাসিক ব্যঞ্জনাঋদ্ধও বটে।

প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে ইতিহাস শুধুমাত্র কিম্বদন্তী বা লোকশ্রুতি নয়। যদিও লোকশ্রুতির উৎসে আংশিক সত্য বা তথ্য থাকে, কিন্তু তা তথ্য বা যুক্তিভিত্তিকতাকে বিশেষ আমল দেয় না বলেই ভ্রমাত্মক হলেও জনরুচিতে পল্লবিত হয়ে লোকমুখে স্থায়ী রূপ নিতে সাহায্য করে। প্রসঙ্গ ক্রমে গৌড়ের সোনা মসজিদ, লুকোচুরি গেট, চামচিকা মসজিদ, কদমরসুল মসজিদ, লোটন মসজিদ, পাণ্ডুয়ার একলাখি মসজিদ এই ভ্রমাত্মক বিষয়কেই যুগ যুগ ধরে সমর্থন জানিয়েছে। যথার্থই শিক্ষা সেই ভ্রমকে অপনোদন করে। প্রকৃত ইতিহাস নানাবিধ প্রমাণে সত্যকে প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়। মালদহ তথা গৌড়-পাণ্ডুয়াকেন্দ্রিক বহু বিষয়ে তাই সত্য প্রতিষ্ঠায় ঐকান্তিক এ গ্রন্থ।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে আঞ্চলিক ইতিহাসে অধিকাংশ সময়ে গালগল্প ও কিম্বদন্তীকে জনরুচির রসপ্রাশনে নিবেদন করার প্রবণতা থাকে অধিক। পদ্ধতিগত দৃষ্টি সেখানে গৌণ হয়ে পড়ে বলেই তা খণ্ডিত, কর্তৃত এবং আংশিক সম্ভাব্য সূত্র-তথ্য ক্রম-পল্লবিত হয়ে সত্যকে প্রচ্ছন্ন করে।

'মৎ-প্রণীত' মালদহ জেলার ইতিহাস সে দিক থেকে তথ্য, যুক্তি ও সম্ভাবনা — সব বিষয়কে উপস্থাপন করেও সত্য-আবিষ্কারে যে সচেষ্ট তা সাবধানী পাঠক মাত্রেরই অনুধাবনযোগ্য। স্থান মালদা, মালদহ, ফজলী আম, লোটন মসজিদ, পারাদীঘি, জহুরা কালী প্রভৃতি নামসমূহ নানা সুদূর, স্বকপোলকল্পিত ধারণা-ভাবনা প্রকৃত সহজ সত্যকে আস্তৃত করেছে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে সে সব বিষয়ে ভ্রান্তি নিরসনের প্রচেষ্টা আছে।

'ইতিহাস' — ইতিহাস, তা কাব্য নয়, কাহিনী নয়, রূপকথা-উপকথা বা উপন্যাস নয়, রম্যরচনাও নয়।

দুখণ্ডে প্রকাশিতব্য 'মালদহ জেলার ইতিহাস'—এর প্রথম খণ্ড প্রকাশ পেল। দ্বিতীয় খণ্ডে তার প্রাচীন জনপদ, কৃষি, ভূমিব্যবস্থা, লোকউৎসব, অর্থনীতি ইত্যাদির প্রবহমান ধারার সঙ্গে তার শিল্প, ভাস্কর্য, সামাজিক উৎসব ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্বও অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে গ্রন্থ মধ্যে মালদহ, মালদা; কালিন্দী, কালিন্দ্রী উভয়ই গ্রাহ্য বলে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

দীর্ঘকালের পরিশ্রমের ফসল প্রকৃত ইতিহাস অনুসন্ধানী ও তন্নিষ্ঠ পাঠকদের তৃপ্ত করলে খুশী হব। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে আজ বিদ্যানুরাগ ও তথ্যনিষ্ঠ রচনা ক্রম-হ্রাসমান। সে দিক থেকে মালদহ জেলা কালেক্টরেটের প্রাক্তন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীঅজয়কুমার ঘোষ এক বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাঁর ইতিহাস চর্চা ও তথ্যনিষ্ঠা তথা তাঁর অধ্যয়ন-অনুসন্ধিৎসা ঈর্ষণীয়। গ্রন্থটি রচনায় আর যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে আশিস্ মিশ্র, সুভাষ চৌধুরী, গোপাল লাহা, নিতাই ঘোষ, শুভঙ্কর দাস, ড. রতন দাশগুপ্ত, ড. সুমন্ত চট্টরাজ ও ড. তুষারকান্তি ঘোষ উল্লেখযোগ্য।

ছাত্র-ছাত্রীদের অকুণ্ঠ সাহায্য ব্যতিরেকে এমন একটি পরিকল্পনার কাজ সম্ভব নয়, বিশেষতঃ ক্ষেত্রানুসন্ধানে। সে দিক থেকে মোহিত রায়, খাইজামান আলি, গোপাল পাঠক, সমিত সরকার, বীরেন মণ্ডল, সুধীরচন্দ্র দাস, রেজিনা মুর্মু, নীলোৎপল মণ্ডল, শিবনাথ মার্ডি, নেশাদ আহমেদ, দেবশ্রী মজুমদার ও তৃণা শিকদার প্রমুখেরা উল্লেখ্য। এদের আশীর্বাদ জানাই।

গ্রন্থটি প্রকাশে আমার ছাত্রত্রয় জ্যোতির্ময় চৌধুরী, ফাল্গুনী চৌধুরী ও সব্যসাচী চৌধুরী ও পুস্তক বিপণি শ্রীমান অনুপকুমার মাহিন্দারকে আশিস্ জানাই।

গ্রন্থটি মুদ্রণে শ্রীমান কৌশিক মুখার্জী, আদিত্য মুখার্জী, কৌশিক মণ্ডল ও শঙ্কর সাহার ঐকান্তিকতার জন্য তাদের স্নেহাশিস্ জানাই।

সূচীপত্র

ফিরোজ মিনার : গৌড়

পালরাজা মহেন্দ্রপালদেবের জগজ্জীবনপুরের তাম্রশাসন (সম্মুখভাগ)
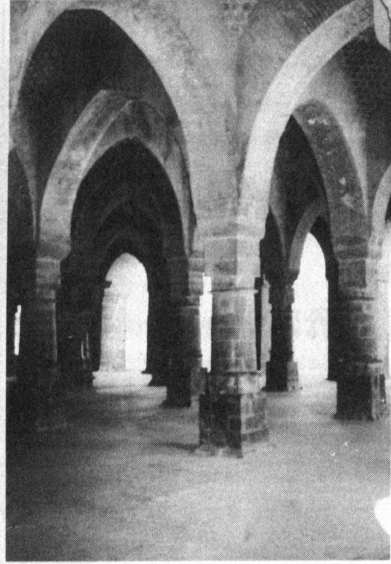
আদিনা মসদিজের মহিলাদের বসার কক্ষ
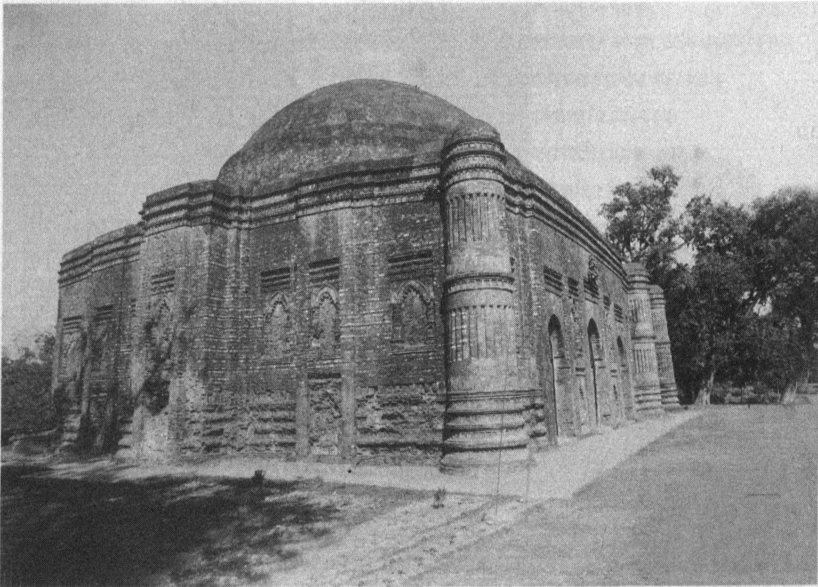
লোটন মসজিদ: গৌড়
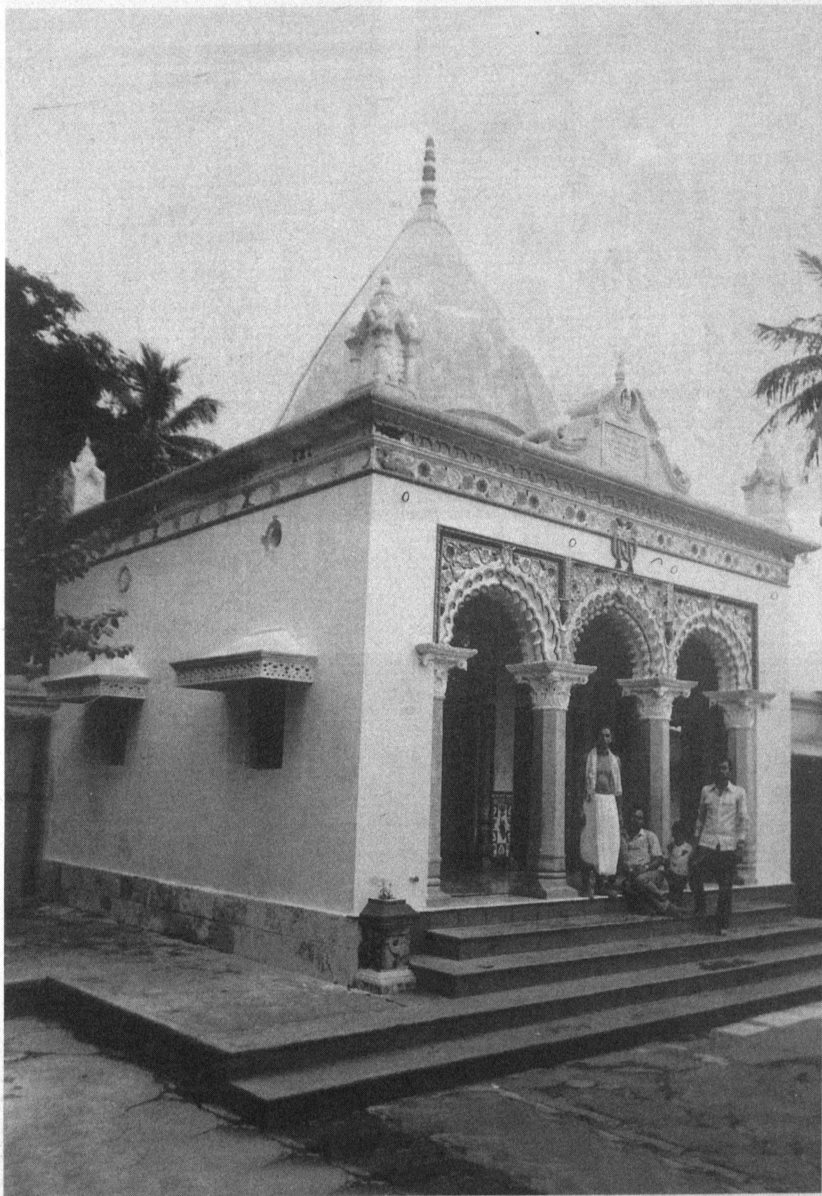
রামকেলি/মদনমোহন জীউর মন্দির (সনাতন গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ) : গৌড়
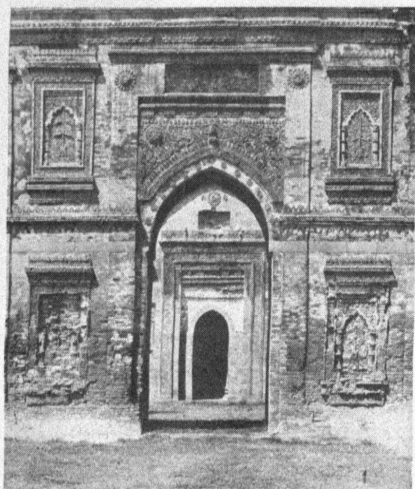
তাঁতীপাড়া মসজিদ : গৌড়
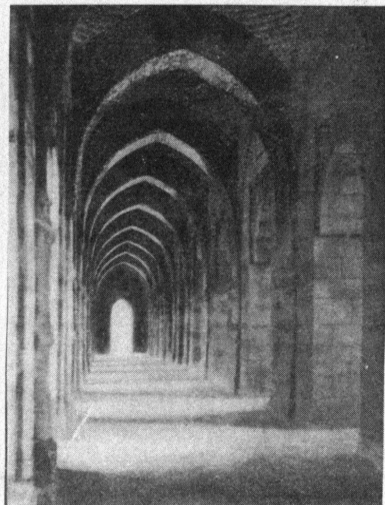
বারদুয়ারী : গৌড়

শাহী দরওয়াজা বা লুকোচুরি গেট : গৌড়

ফতে খাঁর সমাধিভবন : গৌড়
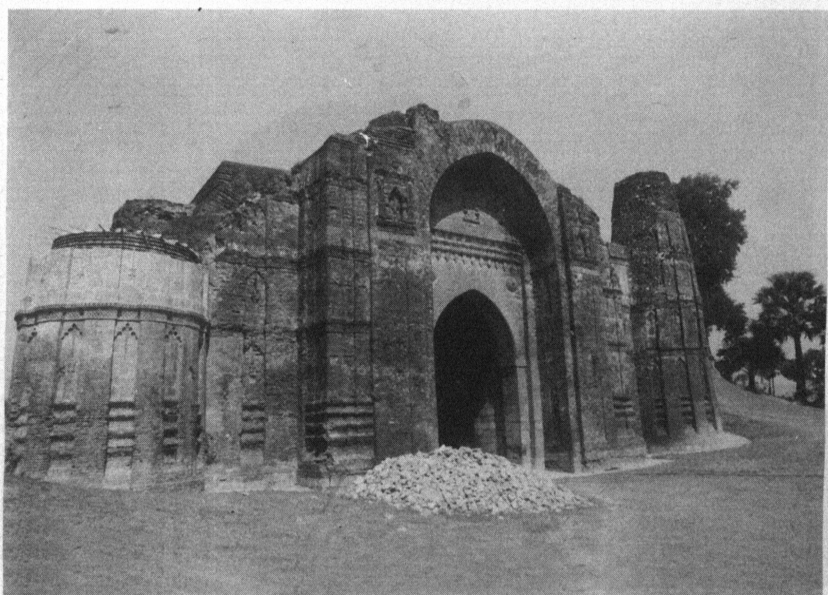
দাখিল দরওয়াজা : গৌড়
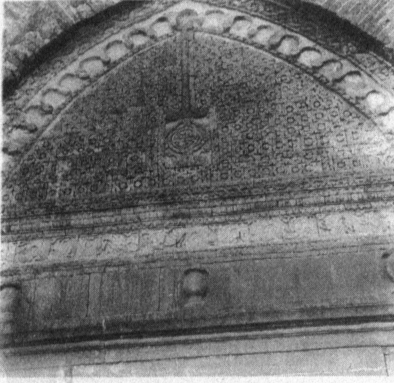
আদিনা মসজিদের টিম্পানাম
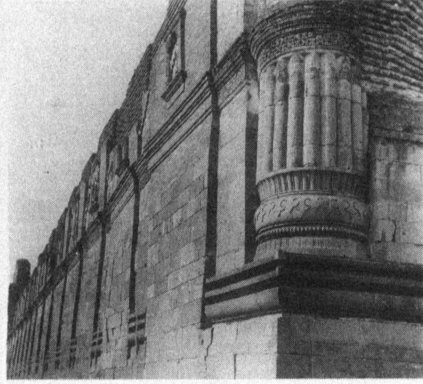
আদিনা মসজিদের পশ্চিমদিকের পার্শ্বচিত্র
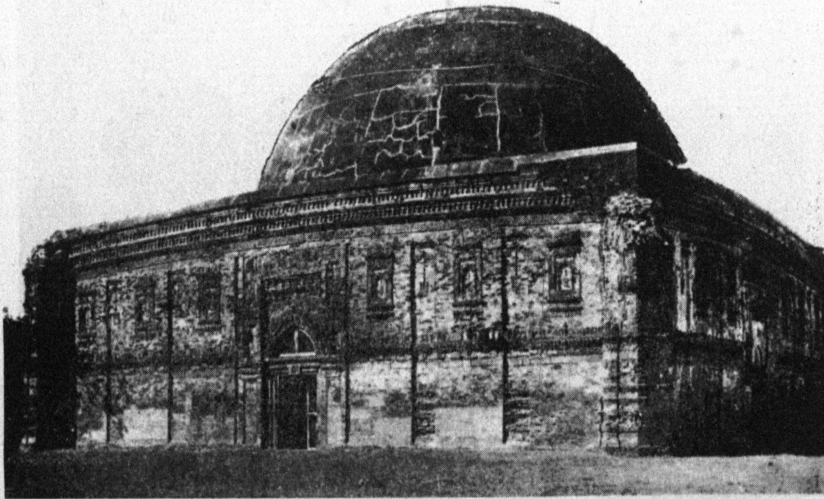
একলাখি ভবন : পাণ্ডুয়া

আদিনা মসজিদের মিমবার সহ সম্মুখভাগ
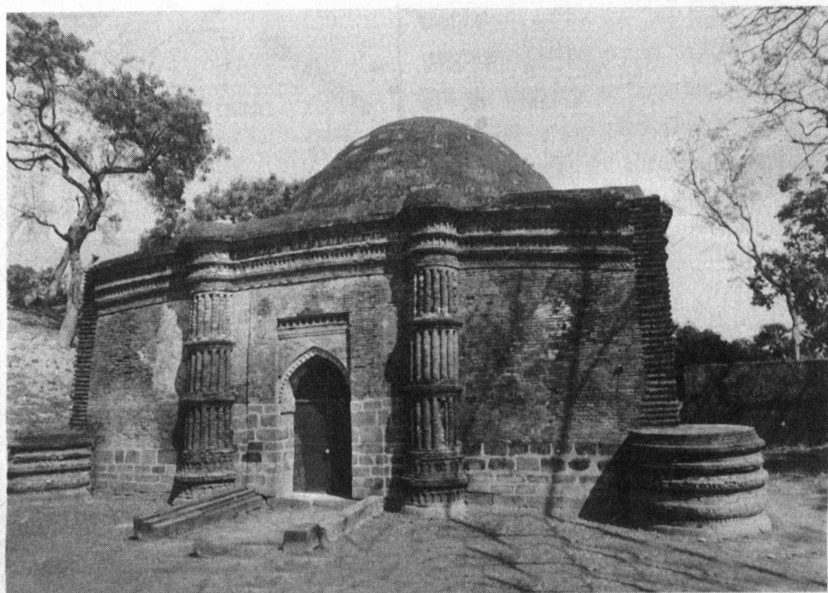
গুমটি দরওয়াজা: গৌড়
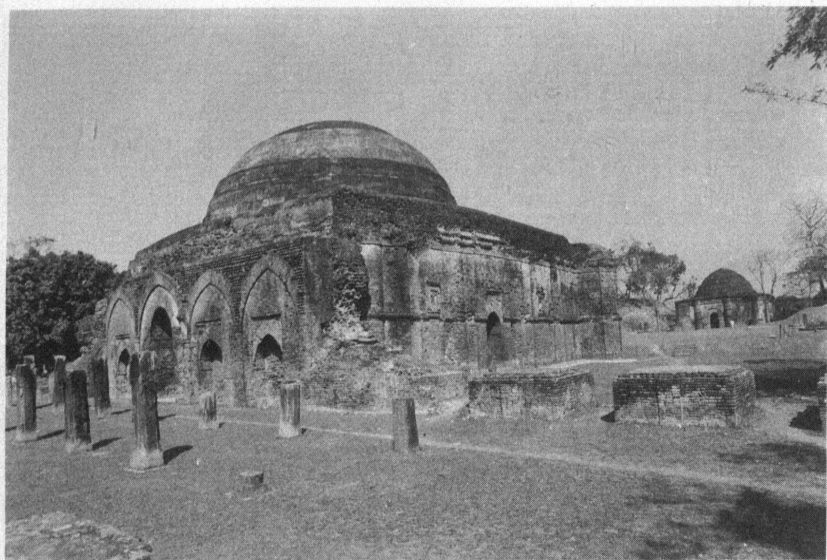
চিকাভবনের পশ্চাদভাগ : গৌড়

কদম রসুল : গৌড়

# মালদহ / মালদা ঃ নাম-প্রসঙ্গ

মালদহ জেলা তথা মালদহ (মালদা) নামটি নিয়ে অজস্র মতামত প্রচলিত আছে। বঙ্গের এ অংশে পূর্বে 'মাল' জাতি কর্তৃক উপনিবিষ্ট হয়েছিল বলে অনেকের অভিমত। এই জাতি পূর্বাঞ্চলে বিস্তীর্ণ হয়ে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে পরিগণিত হয়েছে। "মালা ভিল্লা কিরাতাশ্চ সর্বেহপি ম্লেচ্ছজাতয়ঃ" (ভা/৬/৯/৩৯)। অপরাপর আদিম অধিবাসীদের মত এই 'মাল'গণ ৪৫ প্রকার চণ্ডাল জাতির অন্তর্গত।[১] প্লিনির প্রাচীন ভারতের ভূগোলে 'মাল্লি' জাতির কথা উল্লিখিত আছে বলে ক্যানিংহামের ধারণা — যারা কলিঙ্গ ও গঙ্গা নদীব মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাস করতো। তা ছাড়া বিখ্যাত মন্দর পর্বতের সঙ্গে যুক্ত এই সব অধিবাসীরা — যা ভাগলপুরের দক্ষিণে অবস্থিত। Mandei জাতি ক্যানিংহাম কর্তৃক মহানদীর তীরবর্তী অধিবাসী বলে নির্দিষ্ট — যা টলেমির Mandalae জাতি হিসেবে কথিত।[২]

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে তামিল ভাষায় 'মলয়' শব্দের অর্থ পাহাড়, অতএব 'মাল' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ — পাহাড়িয়া জাতি বা পার্বত্যজাতি। প্রায় দু হাজার বছর আগে এই দ্রাবিড়ীয় জাতি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। পরে অবশ্য অন্যান্য জাতির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। বর্তমানে মালদায় 'মাল' বা 'মাল পাহাড়িয়া'দের সংখ্যা ব্যাপক না হলেও তারা তাদের অস্তিত্ব আজও বজায় রেখেছে।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে সম্ভবতঃ মেগস্থিনিসের Molindai-কে 'মালদা' বলে উল্লেখও করা হয়ে থাকে। টলেমি যে Kelynda বা কালী নদী বা কালিন্দীর (কালী নদী > কালিন্দী) যে অক্ষাংশ অর্থাৎ ২৫°৩০ বলে উল্লেখ করেছেন, তার সঙ্গে মালদা (বর্তমানে পুরাতন মালদা) প্রায় মিলে যায়। কারণ এ জেলার অক্ষাংশ ২৫°২ ও দ্রাঘিমাংশ ৮৮°১১।[৩]

অন্যদিকে ম্যাকক্রিণ্ডেল টলেমির Molindaeকে Maroundai বলে যে উল্লেখ করেছেন সে সম্পর্কে জৈনের মত এই যে, মলদ, মালদ অথবা মানদ মহাকাব্য ও পুরাণাদিতে প্রোক্ত।[৪] এরা প্রথমে শাহাবাদ জেলার অধিবাসী ছিল। প্লিনির Monedes মানদ-এর সঙ্গে অভিন্ন। মেগাস্থিনিসের Maladas ও Molindae এক হওয়া স্বাভাবিক।[৫] মেগাস্থিনিসের Molandae এবং টলেমির Maroundai মলদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। কারণ প্রাকৃত ভাষার শেষ অক্ষরের অনুনাসিকতার প্রবণতা 'বক্রাদিত্বাৎ নুম্'-- দ্বিতীয় অক্ষরে 'ল'-এর স্থলে সংস্কৃত 'র', সংস্কৃত শব্দ ঋকবেদ ও মৈথিলীর Rhotacism অনুযায়ী সংঘটিত।[৬] জৈনের মতে Maroundaiর সঙ্গে মহাকাব্য ও পুরাণের মলদ, মালদ কিম্বা মানদ সমপংক্তিভুক্ত এবং এই আদিবাসীরাই পূর্বদিকে বাংলার মালদহ জেলায় স্থায়ী বসবাস সুরু করে।[৭] হান্টারের অনুমানের উপর নির্ভর করে *Mons Mallus* এবং মালদের দ্বারা প্রায় দু হাজার বছর আগে অধ্যুষিত হওয়ায় বেভারলি 'মালদা' নামের সমর্থন পান।[৭ক]

অনেকে 'মাল্' ফারসী শব্দজাত হিসেবে গ্রহণ করে (যার অর্থ ঐশ্বর্য) এ অঞ্চলের সুখ-সমৃদ্ধির রূপ কল্পনা করে একটি জনশ্রুতি খাড়া করে জনৈকা মহিলার লক্ষ টাকার পারদ কেনার গল্পে এ অঞ্চলের নামের সমর্থন করেছেন।[৮] কিন্তু প্রথম এই 'মালদহ' শব্দটি আবুল ফজল আল্লামির আইন-ই-আকবরীতে দৃষ্ট হয়।[৯] সুতরাং প্রাক্ -মুঘল যুগেই তার প্রচলন স্বাভাবিক। এমন কি তার পূর্বেও থাকার সম্ভাবনাই প্রবল। এ পর্বের একটি সম্ভাবনার কথা আমি পূর্বেই জানিয়েছি।[১০] তা হল এই যে সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ মাল (মল্+ঘঞ) শব্দের অর্থ উন্নত ক্ষেত্র বা উচ্চ জমি বোঝায়, তার সঙ্গে আঞ্চলিক 'দহ' যুক্ত হয়েই মালদহ হয়েছে। অবশ্য সে সম্ভাবনার কথা পূর্ণ সমর্থন করবে বর্তমানের ওল্ড মালদহ বা পুরাতন মালদহ সম্পর্ক, যেহেতু সেটিই প্রাচীনতম মালদহ নামের জনপদ। বর্তমানে ইংরেজবাজার শহরটিকে মালদহ বা মালদা বলে প্রচার করে প্রাচীন মালদহকে অতীত যুগের গহ্বরে নিক্ষেপ করা হয়েছে। এই পুরাতন মালদহ মহানন্দা ও কালিন্দীর সংযোগ-স্থলে হওয়ায় এখানকার জলের ঘূর্ণি বা দহ থাকাই স্বাভাবিক। ভাষাতত্ত্বের দিকে থেকে যেমন এমন অনেক নাম বাংলায় আছে — চাকদহ, চাকদা (< চক্রদহ), খড়দহ, খড়দা (<খর দহ), শিয়ালদহ,শিয়ালদা (> শৈবালদহ) ইত্যাদি মতেরই সমর্থন জানায়।[১১] শুধু তাই নয় এই দুই নদীর সম্মিলিত জলোচ্ছ্বাসে উনিশ শতকের প্রথম পাদেও এলাকাটি জলমগ্ন হওয়ার খবর মেলে।[১২]

- **পাদটীকা**

১ নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত -- বাংলা বিশ্বকোষ, চতুর্দশ ভাগ, পৃ-৬৫১

২ Beverley H – Report on the Census of Bengal, 1872, p-184-85

৩ Edward Thornton – A Gazetteer of the Territories under the Government of the East India Company and the native States on the continent of India, 1858, p-596

৪. বায়ুপুরাণ ৪৪/১২২, মহাভারতম্, সভাপর্ব — ততো মৎস্যান মহাতেজা মলদাংশ্চ মহাবলম্।.. ২৯/৮, দ্রোণ পর্ব ৭/১৪৩

৫. Megasthenes & Arrian, p-137, Benoychandra Sen – Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal, p-120

৬. Ramchandra Jain (Ed.) - J. W McCrindle's Ancient India as described by Ptolemy, 1884, p-390-91

৭. ibid, p-390

৭ক. Beverley H – Report on the Census of Bengal, 1872, p--185

৮. Jatindra Chandra Sengupta - West Bengal District Gazetteer, Malda,1969, p-1

৯. Abu-L-Fazl Allami – The A-In-I-Akbari, Tr Jarrett, corrected and further annotated by Sir Jadunath Sarkar, vol.-2, p- 144

১০. প্রদ্যোত ঘোষ - মালদহ্ জেলার পুরাকীর্তি, পৃ-৩

১১. সুকুমার সেন - বাংলা স্থান নাম, পৃ-২৩

১২. Edward Thornton – Op Cit p-596

# গৌড়ঃ মালদা

'মালদহ' / 'মালদা' নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে গৌড় নামটি এসে যায়। তার সঙ্গে মালদা জেলার গৌড় অঞ্চল থাকায় স্বাভাবিকভাবেই গৌড়ের ভিন্ন ভিন্ন সীমা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন যুগে বিভিন্ন তথ্য বর্তমান। এই নামটির সর্ব-জন-মান্য ব্যাখ্যা নেই। গুড়ের দেশ বলে গৌড় নাম, এমন একটি মত আছে। পুণ্ড্রবর্ধন (আধুনিক পাণ্ডুয়া — পেঁড়ো) বরেন্দ্রভূমির একটি বিশিষ্ট স্থানের নাম, পুঁড় — আখের জায়গা। তবে সমগ্র উত্তরাপথের এক ব্যাপক নাম গৌড়।[১] এ নামটি খ্রীষ্টপূর্ব যুগের বলে পণ্ডিতদের অভিমত।[২] জৈন গ্রন্থ আচারাঙ্গ সূত্রে (২/৩৬১ক) গৌড় দেশ দূকুলের (রেশম বস্ত্র) জন্য বিখ্যাত বলে কথিত। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে প্রাচ্য দেশের নগর রূপে গৌড়পুর মেলে — পুরে প্রাচাম্। অরিষ্ট-গৌড় পূর্বে চ (৬/২/৯৯-১০০)।[৩] আবার কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গৌড়িক স্বর্ণের উল্লেখ আছে এবং তাতে গৌড় নগর অথবা গৌড় দেশের প্রাচীনত্বই প্রমাণ করে।[৪] মৌখরীরাজ যশোবর্মণের একটি ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগের শিলালিপিতে লিখিত আছে যে সমুদ্রের তীরবর্তীতে আশ্রয়লাভে গৌড়ীয়রা বাধ্য হয়েছিল।[৫] বিখ্যাত আলংকারিক দণ্ডী ষষ্ঠ শতাব্দীতে পূর্ব দেশে গৌড় বা গৌড়ীয় রীতির কথা উল্লেখ করেছেন।[৬] আবার বোধায়ন ধর্মসূত্রে আরট্ট (পাঞ্জাব), পুণ্ড্র, সৌবীর (দক্ষিণ পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ), বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চলকে আর্য সীমার বহির্ভূত অনার্য দেশ বলে গ্রহণ করে পুণ্ড্র ও বঙ্গ অঞ্চলে স্বল্পকাল বাসে প্রায়শ্চিত্তের নির্দেশ আছে।[৭]

খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদ পরাশর খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে 'গৌড়' রাজ্যের উল্লেখ করেছেন। সপ্তম শতকে বরাহমিহিরের 'বৃহৎ সংহিতায়' দেখা যায় —

উদয়গিরি-ভদ্র-গৌড়ক-পৌণ্ড্রোৎকল-কাশি-সমকলাম্বষ্ঠাঃ।
একপদ-তাম্রলিপ্তিক-কোশলকাবর্দ্ধমানশ্চঃ।।
আগ্নেয়্যাং দিশি কোশল-কলিঙ্গবঙ্গোপবঙ্গ-জঠরাঙ্গাঃ।[৮]

এখানে গৌড়, পৌণ্ড্র ও বর্ধমান স্বতন্ত্র জনপদরূপে উল্লিখিত। আবার 'শক্তিসঙ্গম তন্ত্র' অনুসারে বঙ্গদেশ থেকে সুরু করে ভুবনেশ্বরের সীমা পর্যন্ত 'গৌড়দেশ' নামে বিখ্যাত —

বঙ্গদেশং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে।

গৌড়দেশং সমাখ্যাতঃ সর্বশাস্ত্র বিশারদঃ।।[৯]

পদ্মাপুরাণে গৌড়দেশের রাজা নরসিংহের উল্লেখ বর্তমান। (১৮৯/২)

আবার স্কন্দপুরাণে লক্ষণীয় —

সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা উৎকলা মৈথিলাশ্চ যে।
গৌড়াশ্চ পঞ্চধা চৈব .... পঞ্চগৌড়াঃ প্রকীর্তিতা।।[১০]

অর্থাৎ সরস্বতী তীরস্থ কনৌজ, উৎকল, মিথিলা ও গৌড় — এই পঞ্চস্থানের অধিবাসীদের পঞ্চগৌড় বলে। এতে গৌড় শুধুমাত্র একটি নয়, পাঁচটি। এই পঞ্চগৌড়ের মধ্যে মিথিলা ও বঙ্গের মধ্যবর্তী গৌড়রাজ্যই সকলের নিকট পরিচিত ছিল। অন্য গৌড়ের উল্লেখ নেই। এই পঞ্চগৌড়ের ব্রাহ্মণেরাই অবশ্য পরবর্তীকালে সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মৈথিল ও উৎকল নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।[১১] উত্তর ভারতের বৃহত্তর অংশের এই পঞ্চগৌড় যেমন মধ্যযুগের সাহিত্যে উল্লিখিত, তেমনই তার সামগ্রিক একটি সীমাও কেউ কেউ নির্দেশ করেছেন। তা হল — ১. সারস্বত (পাঞ্জাব) ২. কান্যকুব্জ (কনৌজ), ৩ বঙ্গ (বাংলা), ৪. মিথিলা (দ্বারভাঙ্গা), ৫. উৎকল (উড়িষ্যা)।[১২]

সারস্বতঃ কান্যকুব্জঃ গৌড়ঃ মৈথিলক-উৎকলাঃ।
পঞ্চগৌড়াঃ ইতিখ্যাতঃ বিন্ধ্যস্য উত্তরা-বাসিনঃ।।[১৩]

পঞ্চগৌড় নামের প্রাচীনতম উল্লেখ মেলে রাষ্ট্রকূট অধিপতি তৃতীয় ইন্দ্রের চিঞ্চান তাম্রশাসনে (৯২৬ খ্রীঃ)। পরবর্তীকালে মিথিলার রাজা শিবসিংহ 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' উপাধি ধারণ করেন।[১৪]

একাদশ / দ্বাদশ শতকে কৃষ্ণমিত্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয' নাটকে বর্ধমান প্রভৃতি স্থানও গৌড়রাজ্যান্তর্গত।[১৫] বর্ধমান ও তার দক্ষিণ অঞ্চল 'রাঢ়' বা 'রাঢ়া' নামে পরিচিত। অবশ্য লেখক গৌড় অপেক্ষা রাঢ়দেশকেই অধিকতর উত্তম বলে নির্দেশ করেছেন —

গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরূপমা তত্রাপি রাঢ়াপুরী।[১৬]

আবার বর্তমান অযোধ্যা প্রদেশের শ্রাবস্তী নগরী ও গোণ্ডা জেলাও কূর্মপুরাণ ও লিঙ্গপুরাণে গৌড়দেশ বলে কথিত। এখানে সূর্যবংশীয় শ্রাবস্তীপুত্র বংশের গৌড়দেশে শ্রাবস্তী নগর নির্মাণের কথা আছে —

তস্য পুত্র ভবৎ-বীর শ্রাবস্তী-ইতি বিশ্রুতঃ।
নির্মিতা যেন শ্রাবস্তী গৌড়দেশে মহাপুরী।।[১৭]

এবং

শ্রাবস্তিচ মহাতেজা বংশকস্তু ততোহভবৎ।
নির্মিতা যেন শ্রাবস্তী গৌড়দেশে দ্বিজোত্তমা।।[১৮]

কলহনের রাজতরঙ্গিণী ও হিউ এনৎ সাং-এর ভ্রমণ বৃত্তান্তে মনে হয় যে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এই গৌড় রাজ্য নানা অংশে বিভক্ত ছিল। কাশ্মীরী সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধে গৌড়ীয় সেনার সাহসিকতার সঙ্গে প্রাণদানে রামস্বামী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ গৌড়বাসীর বিপুল যশোরাশি প্রকাশক বলেও সেখানে ঘোষিত হয়েছে —

অদ্যাপি দৃশ্যতে শূন্যং রামস্বামিপুরাস্পদম্।
ব্রহ্মাণ্ডং গৌড়বীরাণাং সনাথ যশসা পুনঃ।।[১৯]

ষষ্ঠ শতাব্দীতে লিখিত বরাহমিহিরের 'বৃহৎ সংহিতা'য় গৌড় অঞ্চল পৌণ্ড্র (উত্তরবঙ্গ), তাম্রলিপ্ত (মেদিনীপুর জেলা), বঙ্গ এবং সমতট (দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গ) পৃথকভাবে চিহ্নিত। গৌড় ও বঙ্গ আবার কখনো কখনো পাশাপাশি ব্যবহৃত হত।[২০]

তবে অভিলেখে প্রথম প্রাপ্ত ৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দের হরাহা (Haraha) শিলালিপিতে মৌখরী বংশের ঈশান বর্মনের গৌড়দেশ বিজয়ের কথায় প্রথম এ নামের প্রমাণ মেলে।[২১] আদিত্য সেনের (আনুমানিক ৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দ) অফসদ শিলালিপিতে সূক্ষ্মশিব নামক লিপি খোদাইকরের পরিচয়ে তাঁকে গৌড়দেশের অধিবাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।[২২] বাদল স্তম্ভলিপিতে দেবপালকে গৌড়েশ্বর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।[২৩] রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণের গৌড়বাসীদের নম্রতা শিক্ষাদানের গৌরবের কথা লিপিবদ্ধ।[২৪] বৈদ্যদেবের কামরূপ তাম্রশাসনে গৌড়েশ্বরের কথার উল্লেখ[২৫] এবং লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর তাম্রলিপিতে গৌড়রাজ্য অকস্মাৎ অধিকারের কথা আছে।[২৬] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে কেশবসেনের তাম্রশাসনে সেন রাজগণের প্রত্যেকের 'শঙ্কর গৌড়েশ্বর' উপাধি দৃষ্ট হয়।[২৭] ষোড়শ শতকের (১৫৭৯) সপ্তম দশকে দ্বিজ মাধবের মঙ্গলচণ্ডীর গীতে আকবর বাদশাহের প্রশস্তি প্রসঙ্গেও পঞ্চগৌড়ের উল্লেখ আছে —

পঞ্চগৌড় নামে দেশ পৃথিবীর সার।
একাব্বর নামে রাজা অর্জুন অবতার।।[২৮]

আবার ষোড়শ দশকের শেষভাগে মুকুন্দরাম তাঁর চণ্ডীমঙ্গলে উল্লেখ করেছেন —

ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদাম্বুজভৃঙ্গ
গৌড়-বঙ্গ-উৎকল অধিপ।[২৯]

ষোড়শ শতকের বিভিন্ন সময়ে বিদেশী পর্যটক-লেখকেরা গৌড়ের উল্লেখ করেছেন। যদিও তাঁদের উচ্চারণে, যেমন কোরিয়া Gouro,[৩০] ফিচ্ Gouren,[৩১] আবার হেজ Gowre. বলেছেন।[৩২]

কলহনের রাজতরঙ্গিনীতে জানা যায় যে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে গৌড় নামক ভূখণ্ডের রাজধানীর নাম ছিল পৌণ্ড্রবর্ধন। 'ভবিষ্যপুরাণ'-এর ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডে ভারতবর্ষের পূর্ব দিকের পুণ্ড্রদেশকে সাতটি খণ্ডে বিভক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলি গৌড়, বরেন্দ্র, নিবৃত্তি, সুহ্মের নিকট বন সমাচ্ছন্ন রারিখণ্ড,,বরাহভূমি, বর্দ্ধমান এবং বিন্ধ্যপাদস্থিত বিন্ধ্যপার্শ্ব।[৩৩]

এই পুণ্ড্রবর্ধন বা পাণ্ডুয়া বা পুঁড়োবা বা পাঁড়ুয়া বা পুঁড়োর অবস্থান সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও অনেকেই এটিকে মালদার পাণ্ডুয়া অঞ্চল বলে নির্দেশ করেছেন।[৩৪] সুতরাং 'গৌড়' বা গৌড়দেশের অবস্থান যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে,তবে বর্তমান মালদা জেলায় অবস্থিত প্রাচীন গৌড় মহানগরীর ধ্বংসাবশেষ (পুরাতত্ত্ব, পুরাকাহিনী) ইত্যাদি আজও তার স্মৃতি ও নিদর্শন বহন করে। তাই মোটামুটি এই জেলা এবং তার পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের কিয়দংশ নিয়েই প্রাচীন গৌড়রাজ্য প্রথমে গঠিত হয়েছিল বলে মনে করা যায়। কালক্রমে 'গৌড়দেশ' কথাটির নানা অর্থে ব্যবহার হয়েছে।[৩৫]

## ● পাদটীকা

১ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালীব সংস্কৃতি, পৃ-৩৯
২ তদেব, পৃ-৩৮
৩ প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৮
৪ রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ-৯
৫ R.C. Majumder – History of Ancient Bengal, p-7
৬ কাব্যাদর্শ, ১,৪০,৪২,৪৩ ইত্যাদি
৭ বোধায়ন ধর্মসূত্র - ১/২/১৪

অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমাগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি।।

৮ বৃহৎসংহিতা, ১৪/৭-৮
৯ নগেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদিত) বাংলা বিশ্বকোষ, পঞ্চম ভাগ, পৃ-৬০৯
১০ স্কন্দপুবাণ, সহ্যাদ্রিখণ্ড, উত্তরার্ধ ১ অঃ
১১ প্রাগুক্ত, বাংলা বিশ্বকোষ, পৃ-৬১০
১২. Benoychandra Sen–Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal, p-120
১৩. Ananda Bhatta – Ballal Charitam, Bibliotheca Indica, p-85
১৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা -- ধর্মপাল সম্পর্কে নূতন তথ্য, ৯ বর্ষ, তৃতীয সংখ্যা, ১৩১০, পৃ- ১
১৫. ভাবতবর্ষ, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, শ্রাবণ, পৃ-২৩৯
১৬. বাংলা বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ-৬০৯
১৭. Bibliotheca Indica, Ed. p-221.
১৮ লিঙ্গপুরাণম্, ৬৫/৩৫
১৯ কহ্লন - রাজতরঙ্গিনী, ৪/৩৩৫
২০ R C Majumdar, ibid, p-7
২১ Epigraphica Indica, XIV, pp-110 ff
২২. Bimalachurn Law, Historical Geography of Ancient India, p-259
২৩ Epigraphica Indica, XIV, pp-160 ff
২৪. Op Cit , V, p-190
২৫. Op Cit , II, p-348
২৬ Bimalachurn Law, Historical Geography of Ancient India, p-259
২৭. বজনীকান্ত চক্রবর্তী - গৌড়ের ইতিহাস (দে'জ সংস্কবণ), পৃ-১৩০
২৮ দ্বিজমাধব - মঙ্গলচণ্ডীর গীত ঃ আত্মকথা (সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত), পৃ-৭
২৯. ড. প্রদ্যোত ঘোষ সম্পাদিত - কবিকঙ্কণ চণ্ডী, পৃ-২৬
৩০ Correa Gasper, Lendas da India, vol. III, p-720, Barros Joao de-Decadas de Asia. IV, IX, chap I
৩১ R Fitch in Hakluyt, II, 389
৩২ Hedges Diary, May 16, 1683 (Hakluyt Soc i,88)
৩৩. Indian Antiquary, vol. XX, p-419
৩৪. প্রাগুক্ত, বাংলা বিশ্বকোষ, একাদশ ভাগ, পৃ-৫১০
৩৫. তমোনাশ দাশগুপ্ত - প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ-১২

# বঙ্গ ঃ বাঙ্গালা ঃ বাঙলা ঃ বাংলা

'বঙ্গ' শব্দ থেকেই 'বাঙ্গালা', 'বাঙলা', বাংলা এসেছে। সুপ্রাচীন গ্রন্থসমূহে এর উল্লেখ আছে। মহাভারতের আদিপর্বে বলিরাজার পত্নী সুদেষ্ণার পঞ্চপুত্রের অন্যতম এই বঙ্গ —

অঙ্গো বঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মশ্চ তে সুতাঃ।

তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামপ্রথিতা ভুবি।। ৫১।।

(অনুবাদ — তাহাদের নাম হইবে — অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র এবং সুহ্ম; আর তাহাদের অধিকৃত দেশগুলিও তাহাদের নামেই জগতে প্রসিদ্ধ হইবে)।[১]

আবার 'জ্যোতিস্তত্ত্বধৃত কূর্মচক্রে' পূর্ব দিকের জনপদগুলির তালিকায় তার উল্লেখ আছে —

আগ্নেয্যামঙ্গবঙ্গোপবঙ্গত্রিপুর কোশলাঃ।

কলিঙ্গৌড্রান্ধ্র কিষ্কিন্ধ্যাবিদর্ভ শরভাদয়ঃ।।[২]

বৈদিক সাহিত্যে এই কৌম নামটির প্রচলন ছিল।[২ক] কেউ কেউ আবার 'বঙ্গ' শব্দটিকে এক কৌম গোষ্ঠীর নাম বলে মনে করে বলেছেন যে এটি পরবর্তী পর্বে ভৌগোলিক নাম হিসেবে পরিচিত হয়।[৩] ঐতরেয় আরণ্যক ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পূর্বাঞ্চলের উল্লেখ মেলে। অবশ্য সেখানে পূর্বাঞ্চলেব এই দেশবাসীদের প্রতি নিন্দার কথা আছে। ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ, মগধ ও চেরপাদ জাতিদের পক্ষীকল্প বা যাযাবর জাতি বলে অভিহিত করা হয়েছে —

ইমাঃ প্রজাস্তিস্রঃ অত্যায়মায়ংস্তানীমানী বয়াংসি

বঙ্গা বগধাশ্চেরপাদাঃ।[৪]

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় বা প্রথম শতাব্দীতে আবির্ভূত মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি পাণিনির (খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী) ভাষ্য রচনাকালে রাজাবাচক অস্-প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন 'আঙ্গঃ', 'বাঙ্গ' এই দুটি শব্দের উদাহবণ দিয়েছেন। আঙ্গ -বাঙ্গ — অর্থাৎ অঙ্গরাজ, বঙ্গরাজ। পতঞ্জলি অঙ্গ ও বঙ্গেব রাজার কথাও উল্লেখ করেছেন।[৫]

প্রাচীন বঙ্গের ভৌগোলিক সীমা সুস্পষ্টরূপে কোথাও মেলে না, তবে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী পর্বে বঙ্গের একটি সীমারেখা মেলে 'শক্তিসঙ্গম তন্ত্রে' —

রত্নাকর সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগং শিবে।
বঙ্গদেশে ময়া প্রোক্তঃ সর্বসিদ্ধি প্রদর্শকঃ।[৬]

কিন্তু সমগ্র দেশ বোঝাতে "বাঙ্গালা" নামটি মোগলদের অধিকারকালেই প্রথম ব্যবহৃত হয়েছে (বঙ্গ-া-লাহ) দেখা যায়[৭]। তবে বঙ্গাল শব্দটি আরও প্রাচীন। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের ৭২৭ শকাব্দের (৮০৫-০৬ খ্রীঃ) একটি শিলালিপিতেও শব্দটি (সমগ্র বাংলাদেশ অর্থে) পাওয়া যায়।[৮] আবুল ফজল বলেছেন যে এ দেশের প্রাচীন নাম বঙ্গ। প্রাচীন কালের রাজারা তাঁদের অঞ্চলে ১০ গজ উচ্চ ও ২০ গজ বিস্তৃত বিরাট 'আল' নির্মাণ করতেন এবং কালে 'আল' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'বাঙ্গাল' এবং 'বাঙ্গালা' নামের উৎপত্তি।[৯] কিন্তু ডঃ সুকুমার সেন শব্দটিকে সমাস নিষ্পন্ন পদ না বলে তদ্ধিতান্ত শব্দ বলে মনে করে তার অর্থ করেছেন — 'যে দেশে ভাল কার্পাস উৎপন্ন হয়' (উদ্ভিদ বিজ্ঞানে বলে কার্পাস এখানকার স্বাভাবিক উদ্ভিদ)'।[১০]

কিন্তু এ কথা স্মরণীয় যে প্রাচীন বাংলার ভূগোল-ইতিহাসে 'বঙ্গ' ও 'বঙ্গাল' দুটি পৃথক জনপদবিভাগ রূপেই নির্দিষ্ট হয়েছিল এবং এই বঙ্গাল, বাঙ্গাল, শব্দ থেকেই বাঙ্গালা, বাঙগ্লা, বাঙলা (বাংলা)।[১১] একাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তামিলেরা 'বাঙ্গালা' দেশের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। 'বঙ্গ' শব্দটি মুসলমান লেখকদের দ্বারাও গৃহীত হয়েছিল। মীনহাজ-ই-সিরাজের 'তবকাত-ই-নাসিরী'তে 'বঙ্গ'-এর যেমন উল্লেখ আছে[১২], তেমনই জিয়াউদ্দিন বারানীর 'তারিখ-ই-ফিরুজশাহী'তে 'বাঙালী' শব্দও মেলে।[১৩] মীনহাজ অবশ্য লক্ষ্মণসেনের বংশধরদের শাসনকর্তা বলে উল্লেখ করেছেন, তেমনই বারানী 'বঙ্গালহ' শব্দে দক্ষিণবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গকে বুঝিয়েছেন এবং সিরাৎ-ই-ফিরোজশাহীতে এ শব্দে সমগ্র বাংলা দেশ বুঝিয়েছে।

বিভিন্ন সময়ে বিদেশী-পর্যটকেরা এই বিশাল ভূখণ্ডের বিভিন্ন অংশকে বাংঘেলা (Banghella), বেঙ্গালা (Bengala) ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছেন। যেমন ত্রয়োদশ শতকে ভেনিসীয় পর্যটক মার্কো পোলো Bangala-র উল্লেখ করেছেন।[১৩খ] চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে পারস্যের কবি হাফিজ লিখেছেন — Sukhr shikan shawnd hama tutıan-i Hınd Zin khand-i-parsi kıh ba Bangala mi rawad [১৩গ]

ষোড়শ শতকের গোড়ায় ইতালীয় পর্যটক ভারথেমা বাংলার এক বন্দর-শহরের নাম করেছেন, সেটি Banghella (বাংঘেলা)। অন্যদিকে প্রায় সমকালে পর্তুগীজ দুয়ার্তে বারবোসার বাংলাদেশ সম্পর্কিত বিবরণীতে Bengala (বেঙ্গালা) নামে একটি বন্দর-শহরেরও নাম উল্লেখ করেছেন — যেটি চট্টগ্রামের অতি নিকটে ছিল বলে অনেকের ধারণা।[১৪] তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথ 'ভঙ্গল' বা বঙ্গল' দেশ চন্দ্রবংশীয় রাজাদের আগে পাল বংশের অধিকারে ছিল বলে লিখেছেন। [১৪ক] সাধারণভাবে সেটি দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গকেই নির্দেশ করে।

সুতরাং সামগ্রিক আলোচনায় এটি বোঝা যায় যে, প্রাচীনকালে এ ভূখণ্ডের বিশেষ কোন নাম বা সংজ্ঞা ছিল না। এর ভিন্ন ভিন্ন অংশ নানা সময়ে নানা নামে অভিহিত হতো। যথা — গৌড়, বঙ্গ,বরেন্দ্র, পুণ্ড্র, সুহ্ম, রাঢ়, বাংলা, সমতট ইত্যাদি। পাল আমলে বঙ্গ বা বাঙ্গালা নামে

বাংলাদেশের একাংশই নির্দেশিত হত।[১৫] আবার সম্রাট আকবরের আমলে সুবা বাঙ্গালা সুরমা তীরবর্তী শ্রীহট্ট থেকে কৌশিকী-ধৌত পূর্ণিয়া ও গঙ্গার দক্ষিণ দিকের কজঙ্গল (Kankjol) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মেদিনীপুর, হিজলী, চট্টগ্রাম ও কোচবিহার তখন পর্যন্ত এ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয় নি। মেদিনীপুর ও হিজলী উড়িষ্যার এবং চট্টগ্রাম আরাকান রাজ্যের অধীনে ছিল এবং কোচবিহার ছিল স্বাধীন রাজ্য। সাজাহান ও ঔরঙ্গজেবের আমলেই এ সকল অঞ্চল ক্রমে ক্রমে বাংলার চৌহদ্দীভুক্ত হয়।[১৬] তাই 'বঙ্গ' ও বঙ্গাল বা বাঙ্গাল এই দুটি নামেই দুটি পৃথক অঞ্চল বা দেশের নাম মেলে। মুসলমান বিজয়ে সমস্ত বিজিত প্রদেশটি 'বাঙ্গাল' নামে অভিহিত হয়।[১৭] সে সময় থেকে বিদেশী পর্যটকদের উচ্চারণে তার নাম সামান্য পরিবর্তিত হয়ে পর্তুগীজ কর্তৃক Bengala ও ইংরেজ কর্তৃক Bengal নাম ধারণ করে।

তবে 'বাঙ্গালা' নামটি ব্যাপকতর ভৌগোলিক অর্থজ্ঞাপক হয়ে ওঠে সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহের রাজত্বকালে। এ সময়ে লক্ষ্মণাবতী (মুসলমান যুগে 'লখনৌতি') ও 'বাঙ্গালা' যুক্ত হয়ে তার সীমা-আয়তন ব্যাপকতর হয়ে ওঠে। দিল্লীর ঐতিহাসিক শামস-ই-সিরাজ আফিক ইলিয়াস শাহকে 'শাহ্-ই-বাঙ্গালা' (বাঙ্গালার অধীশ্বর) এবং 'শাহ্-ই-বাঙ্গালীয়ান' (বাঙ্গালীদের অধীশ্বর) রূপে উল্লেখ করেছেন।[১৮]

পরবর্তী পর্বে ইংরেজ শাসনের প্রথম দিকে Bengal বা বাংলার চৌহদ্দী আরও বিস্তৃত হয়ে উড়িষ্যা, বিহার, আসাম, ছোটনাগপুর প্রভৃতি বর্তমান প্রদেশগুলিরও বিভিন্ন অংশ সমন্বয়ে বিস্তৃততম হয়ে খ্যাত হয়।[১৯] এবং দক্ষিণের সাগরটিও Bay of Bengal নাম পেয়ে স্মরণীয় হয়ে ওঠে।

● পাদটীকা

১ মহাভারতম্, আদিপর্ব (অষ্টনবতিতমোহধ্যায়ঃ)- হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য কৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ, পৃ-১১৬৫

২. নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত বাংলা বিশ্বকোষ, সপ্তদশ ভাগ, পৃ-৩৮৭ (জ্যোতিস্তত্ত্বধৃত কূর্মচক্রবচন)

২খ. Benoychandra Sen – Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal, p-1

৩. অতুল সুর - বাংলার সামাজিক ইতিহাস, পৃ-১

৪. ঐতরেয় আরণ্যক, ২/১/১/৫

৫. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড, পৃ-৮

৬. প্রাগুক্ত, বাংলা বিশ্বকোষ, পৃ-৩৮৭

৭. সুকুমার সেন - প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, পৃ-৭

৮. সুখময় মুখোপাধ্যায় - বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর, পৃ-৩৪২

৯. Abul-Fazl-Allami – Ain-I-Akbari, (Jarrett & Sarkar), vol.p-120

১০. সুকুমার সেন- বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃ-৪

১১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়- বাঙ্গালার সংস্কৃতি, পৃ-৪১, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - প্রাগুক্ত, পৃ-১২-১৩

১১খ Epigraphia Indica, IX, p-78, p- 232

১২. মীনহাজ-ই-সিরাজ- তবকাত-ই-নাসিরী (অনুবাদ ও সম্পাদনা - আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া), পৃ-২২

১৩. জিয়াউদ্দিন বারানী - তারিখ-ই-ফিরুজশাহী (অনু- গোলাম সামদানী কোরায়শী) পৃ-৭৫২ - ৭৫৮

১৩খ Marco Polo – The Book of Ser Marco. Tr. & Ed by Colonel Henry Yule, vol. II, p-98

১৩গ. Henry Yule and A.C.Burnell-Hobson-Jobson, p-85

১৪. সুখময় মুখোপাধ্যায় - তদেব, পৃ-৩৪১

১৪খ. R C.Majumdar– History of Ancient Bengal, p-166

১৫. Ahmed Hasan Dani – Sir Jadunath Sarkar Commemoration Volume, p-57

১৬. Hemchandra RoyChowdhury – Studies in Indian Antiquities, p-269-20

১৭. রমেশচন্দ্র মজুমদার - বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ-১১

১৮. আফিক - তারিখ-ই-ফীরুজশাহী, পৃ-১১৪-১১৮

১৯. Beverley, H. – Census of Bengal, 1872, p-6-17

# মালদহ্ জেলার রূপরেখা

প্রাচীন বরেন্দ্রভূমির বিশিষ্ট জেলা মালদহ বা মালদা। প্রাচীন কাল থেকে বিশিষ্ট এক অঞ্চল মালদহ বা মালদা নামে পরিচিত থাকলেও তার অতীত গৌরবের নাম নিয়ে নূতন জেলা নামে এর আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে। সমকালে এই জেলা ২৪°৩০′ এবং ২৫°৩২′ ৩১″ উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৭°৪৮′ এবং ৮৮°৩৩′৩০″ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত ছিল।[১] কিন্তু ১৯৪৭ সালে দেশ ভারত-পাকিস্তানে বিভক্ত হওয়ার ফলে জেলাটি কর্তৃত হয় এবং বর্তমানে উত্তর গোলার্ধের ২৫°৩২′ ০৮′ (উত্তর) এবং ২৪°৪০′ ২০″ (দক্ষিণ) অক্ষাংশের মধ্যে এবং ৮৮″২৮′ ১০′ পূর্ব এবং ৮৭°৪৫′১০″ পশ্চিম দ্রাঘিমাংশের কর্কটক্রান্তির উত্তরে অবস্থিত।[২] ক্রমান্বয়ে পাশাপাশি অন্য জেলাগুলির দ্বারা এ জেলার আত্মপ্রকাশ। প্রশাসনিক স্বাধীনতা পাওয়ারও যথার্থ সময় নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নয়। তবে ১৭৭০ সালে ইংরেজবাজারে বাণিজ্যিক প্রধানের (Commercial Resident) ভবন তৈরী হয়, যা পরবর্তী পর্বে জেলা শাসক ও সমাহর্তার অফিস হিসেবে পরিচিত হয়েছে। উনিশ শতকের প্রথম দিকে মালদা জেলার বৃহত্তর অংশ দিনাজপুর ও পূর্ণিয়া জেলা সমাহর্তার অধীন ছিল। মহানন্দা নদীই এই দুই জেলার সীমানা বলে নিদিষ্ট ছিল।[৩] ১৮১৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সরকারের নিকট Lower Province -এর আরক্ষাধ্যক্ষ (Superintendent of Police) সমকালে পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত শিবগঞ্জ, কালিয়াচক, ভোলাহাট এবং গরগরিবা (পরে রতুয়া), দিনাজপুরের অন্তর্গত মালদহ ও বামনগোলা এবং রাজসাহীর অন্তর্গত রোহনপুর এবং চাঁপাই-এ
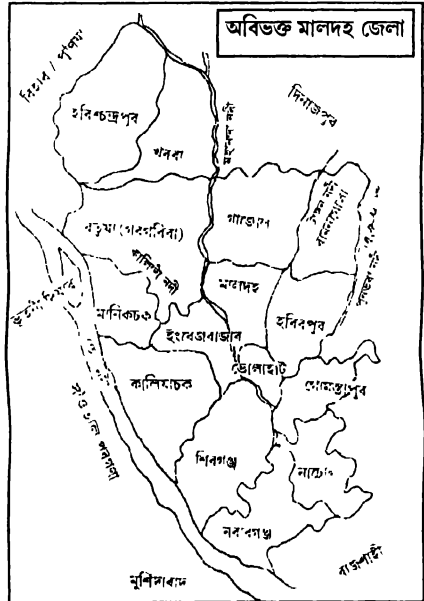
চুরি ডাকাতির ব্যাপকতা সম্পর্কে অবহিত করান। জেলা শাসকদের অবস্থানের দূরত্ব এর কারণ হিসেবে চিহ্নিত করায় ১৮১৩ সালের মার্চ মাসে বর্তমান মালদা জেলায় একজন যুক্ত-জেলাশাসক ও উপ- সমাহর্তা (Joint Magistrate and Deputy Collector) নিযুক্ত হন এবং একজন রেজিস্ট্রারও নিযুক্ত হন। কিন্তু এই Joint Magistrate ও Deputy Collector -এর প্রশাসনিক ক্ষমতারতে হওয়ায় ফৌজদারী, রাজস্ব এবং দেওয়ানী বিষয়ের এক্তিয়ার সুস্পষ্ট না থাকায় নিষ্পত্তিও হয় না। কারণ এই Joint Magistrate ও Deputy Collector পূর্ণিয়া ও দিনাজপুরের অধীনস্থ মনে হয় এবং রাজস্ব বোর্ড (Board of Revenue)-এর সব নির্দেশেই তাঁদের যে কোন Treasuryর মাধ্যমেই জানানো হতো। Joint Magistrate অবশ্য নিজের দায়িত্বে স্বাধীন ছিলেন। পূর্ণিয়া ও দিনাজপুর জেলার কতিপয় থানা তাঁর অধীনস্থ হয় এবং ঐ দুই জেলা শাসকের নির্দেশে তাঁকে চলতে হতো না। ১৮৩২ সালে মালদায় প্রথম Treasury স্থাপিত হয় এবং সে বছর থেকেই স্বাধীন জেলার স্বীকৃতি ধরা হয়। তবে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত Joint Magistrate and Deputy Collector পদটি চলে বটে, কিন্তু ১৮৫৯ সালে প্রথম Magistrate and Collector হিসেবে পদটি পরিবর্তিত হলে অন্য জেলাগুলির সমমর্যাদা পায়। ১৮৭৫/৭৬ সাল পর্যন্ত এ জেলার জজ-ও নিযুক্ত হন নি। দিনাজপুরের জজ-ই তিন মাস অন্তর মালদায় এ ব্যাপারে আসতেন এবং সব ফৌজদারী মামলা তাঁর বিচারাধীনে থাকতো। ১৮৭০ সালে জেলা সমাহর্তা দেওয়ানী, ফৌজদারী ও রাজস্ব বিষয়ক এক্তিয়ার সম্পর্কিত মতদ্বৈধতা ও সংশয়ের কথা জানান। মালদা জেলার কিছু অংশ দিনাজপুর, পূর্ণিয়া বা মুর্শিদাবাদের দেওয়ানী এক্তিয়ারের (Civil Jurisdiction)অন্তর্গত, কিন্তু ফৌজদারী ও রাজস্ব বিষয়ক এক্তিয়ার মালদার ছিল। এ জেলার অন্য অংশের ফৌজদারী এক্তিয়ার মালদার ছিল, কিন্তু রাজস্ব ও দেওয়ানী এক্তিয়ার পূর্বোক্ত জেলা তিনটির যে কোন একটির অধীন ছিল। এই অসুবিধা ও ত্রুটি-মুক্তির জন্য জেলার চৌহদ্দী অধিকতর সহজ করা হয়। তখন পশ্চিমে গঙ্গাকেই মূল সীমানা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। মহানন্দা নদী উত্তর-পূর্বের সীমানা হিসেবেও চিহ্নিত হয়।[৪] ১৮৭৫ সালে জেলার চৌহদ্দীর বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার ৬৫টি গ্রাম ও দিনাজপুর জেলার ২৩৭টি গ্রামও এ জেলার মধ্যে আসে। ১৮৯৬ সালে খরবা ও হরিশ্চন্দ্রপুর এর সঙ্গে যুক্ত হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেযোগ্য সংযুক্তিকরণের ঘটনা গঙ্গার চর ভূতনী দিয়ারার (দ্বীপ+রক>দ্বীপরক>দীঅরক>দিঅর, দিআর>দিয়ারা) ৪০১ বর্গমাইল এলাকা। মালদা জেলা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগের (Division) অন্তর্গতও হয়েছে। যেমন ১৮৭২ সালে বেভারলির রিপোর্ট-এ এটি যেমন রাজশাহী বিভাগের অন্তর্গত ছিল ১৮৭৬ সালের
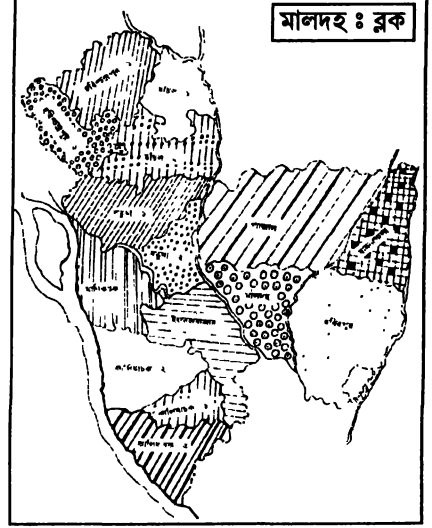
কোন এক সময় পর্যন্ত আবার ১৮৭৬ সালেই এটি আসে ভাগলপুর বিভাগে। বোরডিলনের আদমসুমারীতে (১৮৮১) Vol.I-এ এটি ভাগলপুর বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। এই বিভাগের অন্তর্গত ছিল জেলা-পঞ্চক — মুঙ্গের, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, মালদহ এবং সাঁওতাল পরগণা।[৫] ১৯০৫ সাল পর্যন্ত মালদা জেলা ভাগলপুর বিভাগে থেকে ১৯০৫ সালে আবার রাজশাহী বিভাগের অধীনে আসে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে ১৯৪৭ সালের ১২ই আগষ্ট থেকে ১৭ই আগষ্ট মালদহের জনগণ জানতে পারে নি যে জেলাটির ভাগ্য কি! শেষ পর্যন্ত ১৭ই আগষ্ট বেতারে র‍্যাডক্লিফ্ কমিশনের (Radcliffe Award) ঘোষণা প্রচারিত হয়। এবং ঐ দিনই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে (Notification 67 GA dated 17. 8. 47) পূর্বের মালদহ জেলার ১৫টি থানার মধ্যে দশটি থানা অর্থাৎ ১. ইংরেজবাজার, ২. মালদা, ৩. রতুয়া, ৪. হরিশ্চন্দ্রপুর, ৫. খরবা, ৬. গাজোল, ৭. হবিবপুর, ৮. বামনগোলা, ৯. মানিকচক, ১০. কালিয়াচক ভারতের এবং পাঁচটি থানা — শিবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, ভোলাহাট, নাচোল ও গোমস্তাপুর পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়।[৬] অর্থাৎ ১৭ তারিখ পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তানের এক ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনেই এই জেলা ছিল। এবং ১৮ই মালদা জেলার শাসনভার ভূতপূর্ব পাবনার এ.ডি.এম মঙ্গলকুমার আচার্যের হস্তে সমর্পিত হয়। তিনি ১৮ই আগষ্ট মালদা কালেক্টরেটের মাস্তুলে ভারতের জাতীয় পতাকা তোলেন।[৭]

মঙ্গলকুমার ২৮ই আগষ্ট, ১৯৪৭ থেকে ১৫ই জানুয়ারী ১৯৪৮ পর্যন্ত জেলার শাসনভার গ্রহণ করেন এবং তাঁর পরবর্তী পর্বে বিশিষ্ট আই. সি. এস অশোককুমার মিত্র ১৬ই জানুয়ারী ১৯৪৮ থেকে ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪৮ পর্যন্ত এবং তারপর রঞ্জিত ঘোষ, আই. এ. এস ৭.১০.৫০ পর্যন্ত জেল' শাসক ছিলেন। দেশ বিভাগের আগে এ জেলার আয়তন ছিল ২০০৪ বর্গ মাইল এবং পরে হয়েছে ১৩৯২ বর্গ মাইল।[৮] এ জেলার বর্তমান চিত্রটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে (সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭) যা প্রকাশ পেয়েছে, তা সামান্য পরিবর্তিত হয়েছে র‍্যাড্‌ক্লিফ রোয়েদাদের নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে ১৯৫০ সালের বাগ্গে ট্রাইবুনাল (Bagge Tribunal)-এর সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে।[৯] দেশ বিভাগের পর মালদা জেলা প্রেসিডেন্সী ডিভিশনের অন্তর্গত ছিল এবং পরবর্তী পর্বে এটি জলপাইগুড়ি ডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে।

প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে অবিভক্ত ও বিভক্ত মালদা জেলার আয়তন গঙ্গার ভাঙনে (সিকস্তি ও পয়স্তি অর্থাৎ ভাঙা-গড়ায়) জমির আয়তনও বিভিন্ন সময়ে এক থাকে নি। তা ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নানান খণ্ডিত অংশও যুক্ত হয়েছে। যেমন ১৯১৮ সালের বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে এ জেলার (অবিভক্ত) আয়তন দেখানো হয়েছে ১৮৯৯ বর্গ মাইল।[১০] অন্য দিকে ১৯১৬-১৮ সালে রাজশাহী সেটেল্‌মেণ্ট অপারেশনে দিয়ারার অংশ যোগ করে তার পরিমাণ ছিল ১৯৮৭ বর্গ মাইল (দশমিকাংশ বাদে) —

| থানা | জমির পরিমাণ (বর্গমাইল) | থানা | জমির পরিমাণ (বর্গমাইল) |
|---|---|---|---|
| ১. হরিশ্চন্দ্রপুর | ১৫০ | ৮. রতুয়া | ১৫৬ |
| ২. খরবা | ১৪২ | ৯. মাণিকচক | ১১৩ |
| ৩. গাজোল | ১৯৮ | ১০. কালিয়াচক | ২০৯ |
| ৪. বামনগোলা | ৬৮ | ১১. শিবগঞ্জ | ১৮২ |

| ৫. হবিবপুর | ১৫৩ | ১২. ভোলাহাট | ৪৮ |
|---|---|---|---|
| ৬. ওল্ড মালদা | ৮৭ | ১৩. গোমস্তাপুর | ১২৩ |
| (পুরাতন মালদা) | | ১৪. নাচোল | ১১০ |
| ৭. ইংরেজবাজার | ৯৮ | ১৫. নবাবগঞ্জ | ১৪৯ |
| | | মোট | ১৯৮৭ বর্গমাইল [১১] |

আবার বিভিন্ন সরকারী নথিপত্রে এ জেলার আয়তনের পার্থক্যও ধরা পড়ে। যেমন —
১. ১৯৬৯ সালের ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে মালদা জেলার আয়তন ১৪৩৬ বর্গমাইল।
২. সার্ভেয়ার জেনারেল অব্ ইণ্ডিয়ার হিসাব অনুযায়ী - ৩৭১৩ বর্গ কিলোমিটার।
৩. ডিরেক্টর অব্ ল্যাণ্ড রেকর্ডস- এর হিসাব অনুযায়ী - ৩৬০৫ বর্গ কিলোমিটার। আবার
৪. সেন্সাস অনুযায়ী (১৯৯১) - ৩৭৩৩ বর্গ কিলোমিটার। [১২]

স্বাধীনোত্তর যুগে দেখা যায় কিঞ্চিৎ প্রশাসনিক পরিবর্তন। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে ১৯১৯ সালের বঙ্গীয় ৫নং আইন পাশ করে কোন কোন এলাকায় ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হয়েছিল। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে সার্কেল অফিসারের উপর তদানীন্তন পঞ্চায়ত ব্যবস্থাসহ উন্নয়ন কার্যের দায়িত্ব ছিল। কিন্তু ১৯৫০ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সংবিধানের ৪০নং অনুচ্ছেদে পঞ্চায়তী রাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। বলবন্ত রাও মেহতার নেতৃত্বাধীনে সুপারিশক্রমে ১৯৫২ সালে পঞ্চায়ত প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতা স্বীকৃত হলে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৭ সালে পঞ্চায়ত আইন এবং ১৯৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়ত রাজশাসন প্রবর্তিত হয়। ১৯৬৫ সালের জিলা পরিষদ আইন অনুযায়ী সৃষ্টি হয় চারটি স্তরের পঞ্চায়ত — ১. জিলা পরিষদ; ২. আঞ্চলিক পরিষদ; ৩. অঞ্চল পঞ্চায়ত; ৪. গ্রাম পঞ্চায়ত।
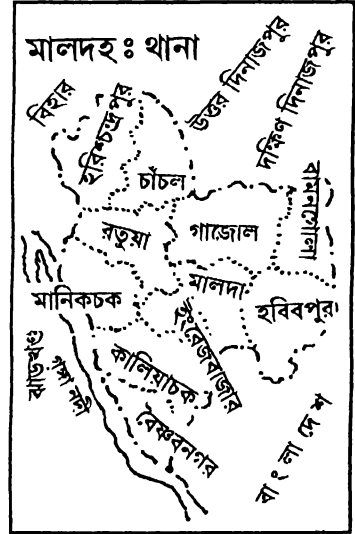
মালদহ জেলার থানাগুলিতে পূর্বে ইউনিয়ন ছিল। তার সভ্যরা ছিলেন তখন সরকার মনোনীত এবং তার প্রধান ছিলেন পঞ্চায়ত-প্রেসিডেন্ট। পরবর্তী পর্বে তা ভেঙ্গে হয় অঞ্চল পঞ্চায়ত ও গ্রাম পঞ্চায়ত। ক্রমে ক্রমে প্রশাসনিক কার্যে সুবিধার্থে এ জেলাতেও ডেভোলাপমেন্ট ব্লক (Block) গুলি হয় সৃষ্ট। ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত এ জেলায় ছিল ৫টি ব্লক, ১৩৬টি অঞ্চল পঞ্চায়েত এবং গ্রাম পঞ্চায়েত ৮২৭টি। পুনরায় তা পরে পরিবর্তিত হতে হতে এখন এ জেলায় আছে ব্লক / পঞ্চায়ত সমিতি - ১৫টি; গ্রাম পঞ্চায়ত ১৪৭টি; গ্রাম সংসদ ২০২১টি।[১৩] এখন ত্রিস্তর পঞ্চায়ত ব্যবস্থা প্রচলিত — ১. জেলা পরিষদ; ২. পঞ্চায়ত সমিতি; ৩. গ্রাম পঞ্চায়ত। এ জেলার বর্তমানে মৌজা সংখ্যা এবং গ্রামের সংখ্যা ৩৭০১।

মালদহ জেলায় পূর্বে একটি মহকুমা (ইংরেজবাজার সদর) ছিল। দ্বিতীয় মহকুমা 'চাঁচল'

সৃষ্ট হয়েছে ২০০১ সালের ১লা এপ্রিলে। 'খরবা' থানার পরিবর্তে হয়েছে চাঁচল থানা (৮ই মে, ১৯৭২) এবং পূর্ববর্তী ১০টি থানার সঙ্গে কালিয়াচক থানার একটি অংশ নিয়ে নূতন একটি থানা হয়েছে বৈষ্ণবনগর (১৩ই মার্চ, ১৯৮৮)।[১৪]

## ● পাদটীকা

১. Thornton Edward – A Gazetteer of Territories under the Government of the East India Company and of native states on the continent of India, p-596

২. West Bengal District Gazetteer Malda, 1969, p-I

৩. W. W. Hunter - A Statistical Account of Bengal, District Maldah, p-18

৪. ibid, p-18-19

৫. J A. Bourdillon - Report on the Census of Bengal, 1881, Vol -I, p-38

৬. District Gazetteer, Malda, 1969, p-3, মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ সরকাব (১৯৫৪), পৃ-৩

৭. অশোক মিত্র -- তিন কুড়ি দশ, তৃতীয় খণ্ড (১৯৩৮-১৯৫৪), পৃ-

৮. মালদহ ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ (১৯৫৪) পৃ-৩

৯. Op Cit., Gazetteer : Malda, 1969, p-3

১০. G. E. Lambourn (Ed.) Bengal District Gazetteers : Malda, 1918, p-I

১১. M. O. Carter, Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Malda 1928-35 (1938) p-I

১২. District Profiles I MALDA, 1992-93, District Statistical Hand Book 1999 & 2000 (combined), Malda, Bureau of Applied Economics.

১৩. District Flood Contingency Plan & Programme of Malda District, D.M , Malda

১৪. পঞ্চায়ত রজত জয়ন্তী, মালদা, ১৯৭৬

## ভূতত্ত্ব / ভূপ্রকৃতি

ভূপ্রকৃতি অনুসারে সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গ তিন ভাগে বিভক্ত ঃ -

১. হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল।

২. পশ্চিমের উচ্চভূমি ও ক্ষয়িত মালভূমি অঞ্চল।

৩. সমভূমি অঞ্চল।[১]

আবার মৃত্তিকা-ভিত্তিক প্রাকৃতিক অঞ্চলে এটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা ঃ-

১. পাহাড়ী অঞ্চল।

২. ডুয়ার্স তরাই অঞ্চল।

৩. পলিমাটি অঞ্চল।

৪. রাঙ্গামাটি অঞ্চল।

৫. সমুদ্র তটভূমি অঞ্চল।[১ক]

মালদা জেলা উপরি উক্ত সমভূমি অঞ্চল ও পলিমাটি অঞ্চলের অন্তর্গত। জেলাটিকে আবার উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত মহানন্দা নদী দুটি ভাগে বিভক্ত করেছে। এর উত্তরের পলি গঠিত সমভূমি হিমালয়ের পাদদেশ থেকে নির্গত নদ-নদী, বায়ু ও জলের ক্ষয় ও সঞ্চয় কার্যের ফলে উন্মুক্ত শিলাস্তর ও পলিস্তরে ঢাকা একটি ঢালু পলি সঞ্চিত পাখা ও শঙ্কু বিশিষ্ট (Alluvial Fans and cones) পাদদেশীয় পলল সমভূমিতে পরিণত হয়ে ক্রম-প্রসারিত হয়েছে।

এ জেলার পশ্চিম প্রান্তে রাজমহল পাহাড় এবং পূর্ব দিকে গারো পাহাড়ের মধ্যবর্তী পাললিক মৃত্তিকাপূর্ণ অঞ্চল। মহানন্দার পূর্ব দিকে প্লাইস্টোসিন (Pleistocene) উপযুগের প্রাচীন পাললিক মৃত্তিকায় গঠিত অংশ বরিন্দ অর্থাৎ বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত।[১খ] ভূবর্ণনবিদ্যায় এর আনুমানিক বয়স ৫০ লক্ষ বৎসর। অন্য দিকে মহানন্দার পশ্চিম ও দক্ষিণের নিম্নভূমি অঞ্চল নবীনতর। এটি নবীন পলল মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। পলল মৃত্তিকার গভীরতার বিস্তারিত তথ্য আজও মেলে না।

তবে পুরাতন মালদা থানার মন্দিলপুরে জল-অনুসন্ধানে দেখা যায় যে অন্ততঃপক্ষে এক অংশে রাজমহল গ্যাপের সৃষ্টি করেছে আর্কিয়ান গ্রানাইট যৌগিক।[২] প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে প্লাইস্টোসিন সঞ্চয় মধ্য পললভূমি থেকে স্পষ্ট চিহ্নিত করা যায়। বন্যাপ্রবণ অঞ্চলের অবস্থান থেকে এটি উচ্চে এবং জলনিকাশী ব্যবস্থায় দাঁড়া, খাদ বা নদীখাদের সর্পিল বক্রপথ স্রষ্টা।[৩] তা ছাড়া স্থানিক উচ্চাবচ রূপও এখানে অধিক।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে নানা ধরণের মাটিতে নানা রকমের শিলার সঙ্গে নানা উপাদান যুক্ত থাকে। যেমন — চুনাপাথর (Lime Stone) — এই শিলা ব্যাপক জারিত কাদা ও মাটি — অপেক্ষাকৃত কঠিন জাতের রুক্ষ আর্জিলিটিস শেল (Shale), যার মধ্যে মৎস্যডিম্বসম পাথরের কণা বিদ্যমান। এগুলি $Caco_3$ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অধঃক্ষিপ্ত হয়ে জমাট বেঁধে তৈরী হয়। আবার প্রালিক শিলা (Sedimentary Rock) — সাধারণভাবে মৃন্ময় নাম (Argillaceous); এর মধ্যে কর্দম, কাদা পাথর ও শেল থাকে। তা ছাড়া চুণ ব্যতীত অন্য কণাকে(বালি প্রভৃতি) কেন্দ্র করে চক্রাকারে চুণের সঞ্চয় ঘটে এবং গোল বা ডিম্বাকৃতি পদার্থের সৃষ্টি হয়। তা উওলাইট(Oolite)বলে চিহ্নিত।[৪] এর রঙ রক্তাভ পিঙ্গল বা বাদামী। রক্তাভ বলে এর নাম রক্তমৃত্তিকা। আবহবিকারের (Weathering) ফলে কখনো রঙ-বেরঙের, কখনো হরিদ্রা রঙের। একে পিসোলাইট (Pisolite) ও বলে। শব্দটি গ্রীক Pison, Pease ও Lithos (Stone) থেকে উৎপন্ন। মৃত্তিকার চরিত্রে এটি ল্যাটেরাইট (Laterite) — যা মুখ্যতঃ লৌহকণার পিণ্ডের সঙ্গে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইডের মিশ্রণে গ্রীষ্মমণ্ডলের আবহবিকারে সংঘটিত। প্রকৃতপক্ষে ক্রান্তীয় অঞ্চলে অধিক উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতের জন্য মৃত্তিকায় ধৌত প্রক্রিয়া দেখা যায়। গ্রীক শব্দ Later এর অর্থ ইট (Brick)। এর রঙ ইটের ন্যায়; এই জাতীয় মৃত্তিকায় লোহিত (Red) মৃত্তিকা অপেক্ষা অধিক ধৌত-প্রক্রিয়া থাকে এবং মৃত্তিকায় অ্যালুমিনিয়াম ( সেসক্যুই অক্সাইড) ও লৌহ উভয়ই বিদ্যমান।
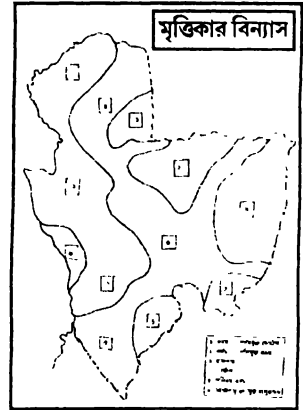
প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে পলল মৃত্তিকা পলি, নুড়ি ও কাদার সমবায়ে সৃষ্ট। এগুলির রূপ সম্পর্কে ওয়েন্টওয়ার্থ (Wentworth) যে দানাক্রমিক স্কেলানুসারে হিসেব দিয়েছেন, তা দেখানো যায় এইভাবে — ১. দানার গড় ব্যাস ২ মি.মি. এর অধিক হলে তাকে Gravel বলে। কাঁকর - (২ মি.মি - ৪ মি.মি ব্যাসযুক্ত পলিকণা), নুড়ি (৪-৬৪ মি. মি), ক্রবল (Cobble) ৬৪-২৫৬ মি.মি. ব্যাসযুক্ত এবং গণ্ডশিলা ২৫৬ মি. মি.-এর বেশী ব্যাসযুক্ত। আবার ১ / ১৩ মি.মি. — ২ মি.মি হলে তাকে বালি, ১/২৫৬ - ১/১৬ মি.মি হলে সিল্ট বা পলি এবং ১/২৫৬ মি.মি এর কম হলে কর্দম বা কাদা ( বোদ্) বলে।[৫]

মালদা জেলার মহানন্দা নদীর পশ্চিমে আছে দোআঁশ মাটি (Light Loam), এটি পরবর্তী পলল মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্ট — যা মাটি ও বালির মিশ্রণ। পূর্ব দিকে মাটির অনুপাত অধিক, কিন্তু গঙ্গার দিকে বালির অনুপাত অধিক। গঙ্গার পার্শ্ববর্তী চর ও যে সব অঞ্চলে জলমগ্ন হওয়ার

প্রবণতা আছে, সেখানে পলির যে পাতলা স্তর বালিকে আবৃত করে, তা স্থানীয় ভাষায় 'চামা' বলে পরিচিত। তবে 'দোআঁশ' মাটিই সর্বাপেক্ষা উর্বর বলে পাট, আউশ সহ নানাবিধ রবিশস্য এবং আম চাষের বিশেষ উপযোগী।

তৃতীয় আর এক শ্রেণীর মাটি বিল ও একেবারে নিম্নভূমি অঞ্চলে দেখা যায় যা কালো মাটি বা স্থানীয় ভাষায় 'মাটিয়াল' নামে পরিচিত। টাঙ্গন ও পুনর্ভবার নিম্নভূমি অঞ্চলেও এটি দেখা যায় — যা উচ্চতানুযায়ী আমন ও বোরো ধান এবং রবিশস্যের পক্ষে বিশেষ উর্বর জমি।*

## মৃত্তিকার গ্রথন বা বুনন

মৃত্তিকার গ্রথন বা বুনন মৃত্তিকা কণার আকৃতির উপর নির্ভর করে। মৃত্তিকায় কর্কর (Gravel) থেকে সুরু করে বালুকা, কর্দম ও পলির ন্যায় অতি সূক্ষ্ম মৃত্তিকাকণার তারতম্যের উপর নির্ভর করে। মৃত্তিকা বেলে মাটি (Sandy Soil), কাদা মাটি (Clayey Soil) ও দোআঁশ মাটি (Loam) — এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। এদের একের অপরের সঙ্গে মিশ্রণে মালদা জেলার মৃত্তিকার গ্রথনে মিশ্ররূপ দেখা যায়। কর্দম ও বালুকণার আকৃতি অনুসারে বিভিন্ন ধরনের দোআঁশ (Loam) মাটির নাম — ১. বালুকাযুক্ত (Sandy Loam), ২. কর্দমযুক্ত (Clayey Loam), ৩. কাঁকরযুক্ত (Gravelly Loam), ৪. প্রস্তরময় (Stony Loam), ৫. পলিযুক্ত (Silt Loam)। সেভাবে এ জেলার মৃত্তিকাকে ৬টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন — ১. কর্দম দোআঁশ (Clay-Clay Loam), ২. কর্দম পলিমিশ্রিত (Clay-Silt Clay), ৩. বালুকাময় দোআঁশ (Sandy Loam), বালুকাময় দোআঁশ কর্দম (Sandy Loam Clay), ৪. দোআঁশ (Loam), ৫. পলিযুক্ত কর্দম (Silty Clay), ৬. দোআঁশ মৃত্তিকাযুক্ত বালুকা (Loamy Sand)। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে দোআঁশ (Loam)-এ ৩০% -৪০% বালি, ৩০% - ৪০% পলি ও ১০% - ২০% কাদা থাকে। অন্যদিকে কাদা বা কর্দমে (Clay) থাকে দু মাইক্রোন ব্যাস যুক্ত প্রধানত অ্যালুমিনিয়াম, অক্সিজেন ও সিলিকনযুক্ত মাটি।

সাধারণতঃ তিনভাগে ভাগ করা হলেও প্রকৃতপক্ষে মালদা জেলার ভূ-অঞ্চল চতুর্বিধ ভাগে বিভক্ত ঃ ১. বরিন্দ বা বরেন্দ্রভূমি অঞ্চল, ২. টাল, ৩. মধ্যভূমি, ৪. দিয়াড়া (দিয়ারা)। কারণ — ওল্ড মালদা, গাজল, বামনগোলা, হবিবপুর ব্লককে 'বরিন্দ' এলাকায়, হরিশ্চন্দ্রপুর, চাঁচল (খরবা) ও রতুয়াকে 'টাল'*এবং কালিয়াচক, ইংরেজবাজার ও মানিকচককে 'দিয়াড়া'র অন্তর্ভুক্ত করলেও পুরাতন মালদা-ইংরেজবাজারের একটি অংশকে 'মধ্যভূমি' বলে চিহ্নিত করা সংগত। আবার টাল, বরিন্দ ও মধ্য অঞ্চলের এক অংশ 'কাঁটাল' নামে চিহ্নিত।

## বরিন্দ অঞ্চল

উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রায় সমস্ত জেলায় প্রবাহিত মহানন্দা নদী এ জেলাকে দ্বিধা বিভক্ত করেছে। নদীর উভয় তীরেই লোকালয় এবং ছোট বড় বৃক্ষের সমাহার — কোথাও আম বাগান, এর পূর্ব দিকে তরঙ্গায়িত ভূমিখণ্ড, টিলা সদৃশ বরিন্দ (বরেন্দ্র) এলাকা। সংস্কৃত বরেন্দ্র (বর+ইন্দ্র) শব্দটির অর্থ শ্রেষ্ঠের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ এ ভূমি এক সময়ে প্রাচুর্যের দেশ ছিল। রাজসাহী অঞ্চলের বিভাষায় এটির অর্থ 'টাকা রাখার তহবিল'। আবার প্রাচীন অনার্য বাংলায় বরিন্দ শব্দের অর্থ —

কৃষিযোগ্য জমি।[৬] এটি দক্ষিণ দিনাজপুর এবং রাজসাহী (বর্তমান বাংলাদেশ) পর্যন্ত বিস্তৃত। এর সর্বাপেক্ষা উচ্চভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩৭ মিটার উচ্চ। এখানকার জমির সর্বাপেক্ষা উচ্চ অবস্থানকে ডাঙ্গা, মধ্যবর্তী স্থানকে আর-কাঁদর, নিম্নভূমিকে কাঁদর বলে। এ জমির উৎপাদন-ক্ষমতা নিম্নমানের। জমি প্রায়শই অম্ল, এর P.H ৫.১-৭.১। ভূগর্ভের জলস্তর ৬০ ফুট নীচে, কোথাও আরও নীচে। প্রাচীন ব-দ্বীপের অংশ বলে এই ভূমি প্রাচীন বালি মাটি দ্বারা গঠিত। কথিত আছে যে প্রাচীনকালে এই মহানন্দাই রাঢ়ী ও বরেন্দ্র ব্রাহ্মণদের ভৌগোলিক সীমারেখা বলে বিবেচিত হয়েছে।[৭] গ্রীষ্মে এ অঞ্চলে যেমন প্রচণ্ড গরম, তেমনই মাটিও শক্ত। আবার হেমন্তে হৈমন্তিক ফসলে মাঠ ভর্তি।

অথচ এই বরিন্দ অঞ্চল যে এক সময়ে ঘন বসতিপূর্ণ ছিল, তার চিহ্ন আজও বর্তমান। সুলতানী ও মোগল যুগে একদিনেই পাণ্ডুয়া-গৌড়ে চলাচল করা যেত। এখানকার অতিকায় অসংখ্য দীঘি সমূহ,ইটের ভগ্নস্তূপ, নানা মূর্তির আবিষ্কার ইত্যাদিতে এককালের শ্রী ও সমৃদ্ধির পরিচয় বহন করে। সেচ প্রণালীও এক সময়ে ভাল ছিল। জমির উচ্চ তলে বড় দীঘি এবং তার নিম্ন তলে অনেকগুলি ছোট পুকুর থাকায় জল সঞ্চয় এবং জমিতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। মাঝে মাঝে ছোট বিল ও খাঁড়ি আছে। এখনও এ অঞ্চলে আছে প্রায় ২০,০০০ পুকুর।

বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হওয়ায় এবং গৌড়ের শ্রী অন্তর্হিত হলে বরিন্দ এলাকায় জনবসতি হ্রাস পেতে সুরু করে এবং স্বাভাবিকভাবেই জঙ্গলাকীর্ণ হতে থাকে। রাজস্ব জরিপে হবিবপুর থানা সহ বামনগোলা থানার অধিকাংশ অর্থাৎ বরিন্দের উত্তরের এক বৃহদাংশ বন-জঙ্গলে আকীর্ণ দেখা যায়। কিন্তু দক্ষিণাংশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চাষ-বাস হতে থাকে।[৮]

১৮৭০ সালে জেলা সমাহর্তার বিবরণ অনুযায়ী হাণ্টার কালিন্দী নদীতীর থেকে জঙ্গল পর্যন্ত অংশে রবি ও শীতকালীন ধান রোপনের কথা এবং জঙ্গলের সীমান্ত ভূমিতে চাষের উদ্যোগের কথা লিখেছিলেন। কিন্তু বন্য প্রাণীর অত্যাচারে তা নষ্ট হতো। অবশিষ্ট নদী-বরাবর অপেক্ষাকৃত নীচু অঞ্চলের সীমান্ত পর্যন্ত সম্পূর্ণ সাত দশক আগেও কাঁটা জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল বলে এলাকাটি 'কাঁটাল' নামে (কাঁটা + ল (যুক্তার্থে) আজও পরিচিত। শব্দটি ভাষাতত্ত্বের বিচারে এসেছে এমনভাবে — কণ্টকি ফল > কণ্টঅল>কাঁটাল (নাসিক্যীভবন, স্বর দৈর্ঘ ও সম্প্রকর্ষের মাধ্যমে) অথবা কণ্টকার > কণ্টআল > কাঁটাল (নাসিক্যীভবন, স্বরদৈর্ঘ ও সম্প্রকর্ষ বা স্বরসন্ধিতে)।

এই অঞ্চলটি পুরাতন মালদা স্টেশন থেকে উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্বে সাবেক দিনাজপুর সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে এ অঞ্চলে বিহার থেকে আগত সাঁওতালদের আগমনে ও তাদের শ্রমে চাষের উপযোগী জমি তৈরী হয়েছে। বরিন্দ অঞ্চলে পুনর্ভবা ও টাঙ্গন নদী-উপত্যকা — যা স্থানীয় ভাষায় 'ডোবা' বা 'ডুবা' নামে পরিচিত (দু'তিন মাইল চওড়া)। তা ব্যতিরেকে চাষ হয়। কারণ এ অঞ্চল নভেম্বর-ডিসেম্বর পর্যন্ত জলমগ্ন থাকে। জল অপসৃত হলে বোরো ও রবিশস্য হয়। সাম্প্রতিক কালে কৃষিকাজ এ অঞ্চলে বৃদ্ধি পেলেও অনেক অঞ্চলে ঘাস,

হিজল, বুনো গোলাপ ঝোপে পূর্ণ।[৯]

**টাল অঞ্চল**

মহানন্দা নদীর পশ্চিমদিকের প্রকৃতি ভিন্নতর। উত্তর দিকে খরবা (চাঁচল) থানার জমির উচ্চতা মধ্যম। বরিন্দ অপেক্ষা এখানে লোকসংখ্যা অধিক এবং গ্রামগুলিও সাধারণত বড়। এ অঞ্চলের পশ্চিম দিকের জমি ক্রমান্বয়ে ঢালু হয়ে নীচে নেমেছে বলে শব্দটি 'টাল'। ৩৩ নং চর্যাপদে ঢেণঢণপাদের লেখায় 'টিলা' বোঝায়, আবার টল্=চঞ্চল অর্থাৎ 'টাল' অর্থে তির্যক বা ঢালু। এর আক্ষরিক অর্থ'জলাভূমি' — অর্থাৎ জলা, বিলে পরিপূর্ণ। এ অঞ্চল হরিশ্চন্দ্রপুর এবং রতুয়া থানার মধ্যবর্তী — উত্তরে মহানন্দা ও দক্ষিণে কালিন্দী অঞ্চল। নিম্নভূমি হওয়ায় নদীর জলস্ফীতিতে অনেকাংশই জলমগ্ন হয়। এ অঞ্চলে দক্ষিণ দিক থেকে গঙ্গার জল কালিন্দীর মাধ্যমে এবং উত্তর দিক থেকে আসে মহানন্দার জল। মহানন্দার জল আকস্মিকভাবে বৃদ্ধি পেলে এবং পলিপড়া নদীবক্ষ বহির্গমনের পথ না পেয়ে দক্ষিণাংশ প্লাবিত হয়। এ অঞ্চলে কৃষিকাজই মুখ্য। চাঁচল (খরবা) থানা এবং উত্তরাংশের 'টাল' এলাকায় প্রধান উৎপন্নজাত পাট ও ধান। হরিশ্চন্দ্রপুর ও রতুয়া অঞ্চলে আম বাগানের আধিক্য। আবার রতুয়া থানার দক্ষিণে ধান ও রবিশস্যই প্রধান। কালিন্দী নদীর তীরবর্তী গ্রাম সমূহ জনবসতিবহুল এবং এ অঞ্চলেও ব্যাপক আম বাগান দেখা যায়। সম্পূর্ণ অংশেই খাল থাকায় বন্যার অতিরিক্ত জল কালিন্দী ও নানা বিলে গিয়ে পড়ে। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার উত্তর-পশ্চিমে কালিন্দী নদীর উত্তরেই গুল্মাবৃত জঙ্গল ও তৃণঘাসে বেশী পরিপূর্ণ। ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত রাজস্ব জরীপের সময়েও এই অঞ্চল সম্পূর্ণ খর্বাকার জঙ্গল ও ঘাসে পূর্ণ ছিল।[১০]

**মধ্য-অঞ্চল**

কালিন্দী নদীর দক্ষিণাঞ্চল জনবসতিবহুল মহানন্দা নদীর পশ্চিম দিক পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরাংশে এক সময়ে এখানে ব্যাপক তুঁত চাষ হত। পরবর্তী পর্বে সেগুলি আম বাগান ও জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়ে। গৌড়ের সোজা রাস্তা থেকে মহানন্দার পাড় পর্যন্ত জলা ও নিম্নভূমি। এ অঞ্চলের মৃত্তিকার রঙ কালো। আমন ধান এবং বিলের ধারে বোরো ধানের চাষ হয়। গৌড় অঞ্চলে আট দশক আগেও জঙ্গলাকীর্ণ ও বন্য প্রাণীর বসতি ছিল, কিন্তু তার পর থেকেই ধীরে ধীরে জঙ্গল কেটে আবাদযোগ্য অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। তবে এ অঞ্চলের জমির উন্নতি কোথাও সুউচ্চ হয়ে জলাভূমি বা পলিসঞ্চিত ডোবাগুলিতে এসে ঢালু হয়ে নেমেছে। নানা কারণে সমুন্নত অঞ্চলের বাসস্থানগুলি পরিত্যক্ত হওয়ায় এবং তার উপরিস্থিত গৃহাদির ইষ্টকাদি সরিয়ে নেওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবেই মাটি আলগা হয়ে পার্শ্বক্ষয়ের (Lateral Erosion) ঢালে খাদ, ডোবা বা খাল তথা পলিপূর্ণ ভাগীরথীর গতিপথে নেমে যায়। আউশ, রবিশস্য ও সরিষা এই সব এলাকার প্রধান উৎপন্ন শস্য। আরও দক্ষিণে এবং পশ্চিমে আদি-সৃষ্ট দিয়ারার সুরু। জেলার এই মধ্য-অঞ্চলে আছে বহু আমবাগান, তুঁত ক্ষেত এবং পুকুর। এ জেলার অন্যত্রও আমবাগানের প্রাচুর্যে বিশিষ্ট হলেও কালিন্দী ও মহানন্দা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের গ্রামগুলিতেই তা অধিক।

জেলার ইংরেজবাজার, কালিয়াচক থানায় রেশমের জন্য তুঁতগাছের ব্যাপকতা লক্ষণীয়।

তবে পুরাতন মালদা বা মালদা থানার সামান্য অংশে এবং ভূতনীর উত্তর চণ্ডীপুর অঞ্চলেও ইদানীং কালে তুঁত চাষ হচ্ছে। এই সব জমির একটা বৈশিষ্ট্য এই যে জলপ্লাবনের হাত থেকে রক্ষার জন্য জমির চতুর্দিকে খাদ কেটে কৃত্রিমভাবে জমিকে উঁচু করা হয়। প্রতিবছর এমনভাবে কাটা হলে পলিমাটির সারও গাছের পক্ষে হিতকারী হয়। এর ফলে কোন কোন তুঁতের জমি পার্শ্ববর্তী অন্য জমি অপেক্ষা বেশ উঁচু হয়ে থাকে এবং উচ্চস্থান থেকে দেখলে চকলেটের ঘনকাকৃতি বলে প্রতীয়মান হয়। এ এলাকায় শুধু জলাশয়গুলির বহুলতাতেই নয়, গৌড় অঞ্চলের দীঘিগুলি আয়তনেও সুবৃহৎ। কিছু এখনও ব্যবহার্য, কিছু জলাজমিতে পরিণত হয়েছে। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বড় সাগরদীঘি। এগুলির সবগুলিই উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত — যা প্রাক্-মুঘল যুগে তথা হিন্দু আমলেই খনিত বলে স্বীকার্য।[১১]

## দিয়াড়া / দিয়ারা

এ জেলার দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রান্তের প্রায় মাইল আষ্টেক বিস্তৃত ভূমিখণ্ডই 'দিয়াড়া' নামে অভিহিত। নিম্ন প্রবাহে গঙ্গার অবক্ষেপণের ফলে বহু শতাব্দী-সঞ্চিত গঙ্গার বালি, পলি ও কাদায় এই অঞ্চল সৃষ্ট। এর পুরাতন খাত খুঁজে পাওয়া যায়। গৌড়ের পাশ দিয়ে বর্তমান ভাগীরথীর অবস্থান থেকে পশ্চিমদিকে তা ক্রমান্বয়ে বর্তমান গঙ্গানদীর প্রবাহে গিয়ে মিশেছে। অন্যদিকে এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপস্বরূপ পশ্চিম দিকে আরও উত্তরে যে দিয়াড়া — তা ভূতনী দিয়াড়া নামে পরিচিত। 'দিয়াড়া' শব্দটি সংস্কৃত দ্বীপরক থেকে উৎপন্ন।[১২] এটি দ্বীপ > দিয়া + ড়া (সাদৃশ্যার্থে), যার অর্থ চর বা চড়া[১৩]। গঙ্গার গতিপথ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জমি বা চরের অনুক্রমিক উৎপত্তি। এখানে একটি বিচ্ছিন্ন চরও আছে, নাম গদাই চর। গঙ্গার আদি প্রবাহপথ 'ভাগীরথী' গৌড়ের পাশে ক্ষীণভাবে আজ প্রবাহিত। এটি সার্দ্ধ শত বৎসর পূর্বে 'ছোট ভাগীরথী' হিসেবে পরিচিত ছিল।[১৪] দিয়াড়ার পূর্বদিক অর্থাৎ প্রাচীন পলল মৃত্তিকাঞ্চলের অপ্রশস্ত এলাকা জনবহুল। আমবাগান এবং কোথাও তুঁত ক্ষেত, হালকা বেলে মাটির চেহারা। কিন্তু পশ্চিমে গঙ্গার দিকে অগ্রসর হলে এই মাটি অধিকতর বেলে, গাছ-গাছালিও ক্ষীণতর। সাত দশক আগেও লাক্ষা চাষের জন্য কুল গাছের বাহুল্য ছিল এখানে।[১৫] দিয়াড়ার প্রধান উৎপন্ন শস্য আউস ধান, গম, যব, জই (Oats) এবং সরষে। বেশ কিছু অঞ্চলে আখ চাষও হয়। তা ছাড়া কোদো (culmiferous crop, species paspalum), চিনা (panicum meliacum), সামা বা খেরী, কাউনি, শস্য ছাড়া মুগ, মটর, অড়হর, খেসারী, কুর্তি (কুলত্থ কলাই), তিসি, ইত্যাদি প্রধান উৎপন্নজাত শস্য।

গঙ্গার বুকে ভূতনী দিয়াড়ার চর বহু শতাব্দী-সঞ্চিত পলি মৃত্তিকায় সৃষ্ট। রাজমহলের ঠিক নীচেই এর দক্ষিণতম অংশ — যা উত্তরের দিকে প্রায় আট মাইল চওড়া এবং ৩২ বর্গমাইল আয়তনের এই চর। আগে গঙ্গার মূল প্রবাহ এর পূর্ব দিকে প্রবাহিত হত। কিন্তু বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে পশ্চিম দিকে এর গতি।[১৬] ১৮১০ সালে ড. বুকানন হ্যামিল্টন মনে করেছিলেন যে রাজমহল পাহাড়ের বিপরীত দিকে অর্থাৎ মালদার দিকে নদীর গতি ছিল। উনিশ শতকের তৃতীয়পাদে (১৮৭৫/৭৬)রাজমহল পরিত্যাগ করে মালদা জেলার মধ্যবর্তী দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার আশঙ্কাও দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ১৮৭০ সালে গঙ্গা হায়াৎপুরের অনতিদূর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে — যা দু তিন বছর আগেও বেশ কয়েক মাইল দূরে ছিল বলে জেলা সমাহর্তা জানিয়েছিলেন। শুধু

তাই নয়, তিনি কালিন্দীর পথে সংঘর্ষের ফলে জেলায় ব্যাপক বন্যা হবে বলে আশঙ্কা করেছিলেন।[১৭] অর্থাৎ উনিশ শতকের তৃতীয় পাদের শেষের দিকে গঙ্গার এই দ্রুত পথ পরিবর্তন। বর্তমানে রাজমহলের নীচে দিয়ে গঙ্গার মূল প্রবাহ প্রবাহিত এবং ভূতনী দিয়াড়ার পাশে দুয়ানীর চরে দুটি খাদিরে বয়ে চলেছে। গঙ্গার পুরাতন খাদ এখন গরমকালে হেঁটে পার হওয়া যায়। গরমকালে এই চর বিস্তীর্ণ এবং তট থেকে মূল দ্বীপের ভূমিপৃষ্ঠ ১২ থেকে ১৫ ফুট উচ্চ। চরের মধ্যাঞ্চলে প্রাচীন খাদে এবং নীচু খাদে (Depression) শীতকালীন শস্য এবং উচ্চ ভূমিতে আউশ ধান ও ডাল প্রধান উৎপন্ন শস্য। বেলে মাটি হওয়ায় উচ্চভূমি উর্বর নয় বটে, কিন্তু চরের নিম্নাংশে পলি পড়ায় রবিশস্য, বিশেষতঃ কলাই এবং সরষে উৎপন্ন হয়। গঙ্গার গতিপথ পরিবর্তনে 'পয়স্তি' (alluvion) ও 'শিকস্তি' (dilluvion) দেখা যায়। 'পয়স্তি' অর্থে নদীর ভাঙ্গনে নূতন চর জাগা এবং 'শিকস্তি' অর্থে জলপ্লাবিত জনিত ভাঙ্গা অংশ।[১৮] মালদা জেলার দিকে গঙ্গার ভাঙ্গনের ফলে ঠিক বিপরীত দিকে অর্থাৎ বর্তমানে ঝাড়খণ্ডের দিকে নূতন চর জেগে উঠেছে কয়েক দশক ধরে এবং প্রতিবছর তা অব্যাহত আছে গঙ্গা প্রবাহে ভাঙ্গার তারতম্যে।

## বিল ও জলাভূমি

বিল সৃষ্টির ব্যাপারে নানা মতবাদ প্রচলিত আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে জল নিষ্কাষণের পথ-বরাবর দেখা যায় সারি সারি বিল। এতে অনুমান যে — ১. কয়েক শতাব্দী পূর্বে ঐ পথে কোন বড় নদী প্রবাহিত হত। কিন্তু পরে সে নদী তার খাদ পরিত্যাগ করে অন্য কোন খাদে প্রবাহিত হলে পরিত্যক্ত মরাখাতে এই সব বিল সৃষ্ট হয়েছে। ২. শতাব্দীর পর শতাব্দী-বাহিত পলির অবক্ষেপণের জন্য নদীর খাদ ও তীর পার্শ্ববর্তী ভূমি থেকে উচ্চতর হয়ে যায়। ফলে মধ্যবর্তী অঞ্চলের জল নিষ্কাষিত না হওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবে বিলের সৃষ্টি হয়। ৩. ভূমিকম্পনজাত ভূ-চ্যুতি বা ভূমি বসে গিয়ে এমন বিলের উদ্ভব হয়।[১৯] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে বিল ও জলাভূমি প্রায় একই হলেও বিল ও জলাভূমির আকৃতি সমান নয়। বিলের চেয়ে জলাভূমি অগভীর হয় এবং তা নলখাগড়া ও ঘাসে আবৃত থাকে। বিলে প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়। কোন কোন বিলের উর্বরতাশক্তি অধিক বলে ধান চাষের পক্ষে তা উপযোগী।

প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে মালদা জেলায় নদীর গতিপথের পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু তা পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশের রংপুর ও অন্যান্য জেলার মত মৃত্তিকার অবনমনে সংঘটিত হয় নি। নদীকার্যের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি হিসেবে দিনাজপুর জেলার (বর্তমানে দক্ষিণ দিনাজপুর) উত্তরমুখী প্রান্তে মালার ন্যায় বিল দেখা যায়। এইসব নদী উপত্যকা দেখে অনুমান করা যায় যে আদিতে সেগুলি বর্তমানের নদী খাদ অপেক্ষা বৃহত্তর নদী খাদেরই অংগীভূত। কিন্তু প্রাচীন নদীগর্ভ সারি সারি টোল বা গর্ত ফেলে যায় — যা শীতে জলশূন্য হয়ে পড়ে। অগভীর বিলের ধারে বোরো ধানের চাষ হয়। কিন্তু বড় বিলের ক্ষেত্রে তা ঘটে না। টাঙ্গন নদী উপত্যকায় আহোড়া বিল প্রায় দুই বর্গমাইল অংশ নিয়ে বিস্তৃত।

আবার নদীর প্রত্যক্ষ কার্যের ফল দেখা যায় দিয়াড়া অঞ্চলে, যা পশ্চিমে ফেলে আসা গঙ্গার পুনঃ পুনঃ গতিপথে অবনমনে (Depression) সংঘটিত।

ইংরেজবাজার থেকে গৌড়ের পথ এবং মহানন্দা নদীর মধ্যবর্তী নিম্নভূমিতে জলা অঞ্চলে

মালার ন্যায় বিল (Chain of Beels) দেখা যায়, যা নদীর অপ্রত্যক্ষ কার্যের ফলশ্রুতি। নদীর পলি সঞ্চয়ের প্রবণতায় কয়েক শতাব্দীর পলি অবক্ষেপনের ফলে নদীর তীর-মধ্যবর্তী অংশ থেকে উঁচু হতে থাকে। দুই নদী-মধ্যবর্তী অংশ অগভীর অববাহিকার মত তৈরী হয়, এবং নিয়মিত নদীর দ্বারা প্লাবিত হয়ে পলি সঞ্চয়ের অভাবে তার উচ্চতা অপেক্ষাকৃত কম হয়।

গৌড়ের সমৃদ্ধির যুগে নগরের পশ্চিমপ্রান্ত দিয়ে স্বাভাবিকভাবেই দক্ষিণ দিকে গঙ্গার প্রবাহ বেশ ভালই ছিল। ফলতঃ নদীর প্রাচীন তীর-বরাবর উচ্চ ছিল এবং পূর্ব দিক থেকে প্লাবন রোধের জন্য গৌড়ের পরিখা ছিল ও আরও উত্তরে ছিল পাণ্ডুয়াগামী প্রধান সড়ক। পূর্বগামী মহানন্দা নদী বর্ষার সময়ে কিছুটা পলি সঞ্চয় করে বটে, কিন্তু জলস্রোত নদীতট কদাচিৎ অতিক্রম করে। নদীতটে এই নির্মাণকার্য ক্রমাগত ক্রিয়াশীল হলেও অভ্যন্তরীণ অঞ্চলে এমন পলি সঞ্চয় ঘটে না। ফলে অগভীর নিম্ন অববাহিকায় বিলের সারি দেখা যায়। অবিভক্ত মালদা জেলার ভোলাহাট থানার (বর্তমানে বাংলাদেশ রাষ্ট্র) উত্তরে ৯ বর্গমাইল বিস্তৃত ভাতিয়ার বিলই এ অঞ্চলে সর্ববৃহৎ।[২০] তবে উনিশ শতকের শেষার্ধে (১৮৭২) অবিভক্ত মালদা জেলায় যে কটি বৃহত্তর বিলের খবর মেলে, সেগুলি — ১. গাজোল পুলিশ সার্কেলের বামনগোলা বিল, জগদল বিল, রানীগঞ্জ বিল এবং ভাইয়ার বিল। ২. খরবা পুলিশ সার্কেলে চাচর বিল, ৩. গরগরিবা পুলিশ সার্কেলে (বর্তমানে রতুয়া) শৌলমারি বিল এবং দাগন বিল ৪. কালিয়াচক সার্কেলে কওয়াখোল বিল এবং সবদলপুর বিল। ৫. শিবগঞ্জ সার্কেলে মির্জাপুর করুণখালি বিল, সুকুরবাড়ী বিল ও বারোঘারিয়া বিল। ৬. নবাবগঞ্জ সার্কেলের হরিপুর বিল, কামার বিল, নাদাহি বিল এবং সারজন মল্লিকপুর বিল। ৭. গোমস্তাপুর সার্কেলে ছানা পরশন বিল। ৮. পুরাতন মালদা সার্কেলে ধাজোরা বিল ও মাধাইপুর বিল এবং ৯. ইংরেজবাজার সার্কেলে গোঁধরাইল বিল ও ভাতিয়া বিল।[২১] এছাড়া অসংখ্য বিলের মধ্যে কতকগুলির নাম — ওল্ড মালদা বা মালদা থানার অন্তর্গত মুচিয়ার নিকট পুতুল বিল, যাত্রাডাঙ্গার নীচে বড় বিল, গাজোল থানার অন্তর্গত আহোড়া বিল, লোহার্চাড়া বিল, হবিবপুর থানার বাকলা, ভীখন, সাত সিং, আটলা, দামোস, মশাইচক, চোড়োল, হবিবপুর-গাজোলে জলকর বিথান, দাঁড়িডুবা, আতলা, ইংরেজবাজার থানার সামদহ, কৃষ্ণপল্লী-মালঞ্চপল্লীর নীচের বিল এবং কালিয়াচক থানার গোলাপগঞ্জ ঢাব ইত্যাদি।

- **পাদটীকা**

১. গ্রামীণ বনসৃজন ঃ রূপায়ণ ও পরিকল্পনা. বনবিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, দ্বিতীয় সং,১৯৮৬ পৃ ৩

১খ. বন্দ্যোপাধ্যায় তরুণকুমার - আধুনিক ভূ পবিচয, চতুর্থ সং, ১৯৯৬, পৃ-৩৪

পৃথিবীর বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক সময়ে গঠিত শিলাগুলির তালিকা ---

| যুগ (Period বা (Era) | উপযুগ (Syaums) | শিলা (Representative Rocks) | আনুমানিক বৎসর (Approx. Years) |
|---|---|---|---|
| কোয়ার্টানারী (Quarternary) | হোলোসেন (বর্তমান) (recent) Holocene প্লাইস্টোসিন (pleistocene) | বালুকা, কর্দম ও নুড়ি | ৫০ লক্ষ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| নবজীবীয় (Tertiary) বা (Kain osoic) | প্লাওসিন (pliocene)<br>মাইওসিন (Miocene)<br>অলিগোসিন (Oligocene)<br>ইওসিন (Eocene) | বালুকা, কর্দম ও নুড়ি, কিছু চুনাপাথর, এবং কোন কোন স্থানে কয়লা (লিগনাইট) ও আগ্নেয় শিলা | ১/২ কোটি<br>৩ কোটি<br>৪ কোটি<br>৭ কোটি |
| মধ্যযুগীয় (Secondary বা (Mesozoic) | ক্রেটাসিয়াস (Cretacious)<br>জুরাসিক (Jurassic)<br>ট্রিয়াসিক (Triassic)<br>পার্মিয়ান (Permian) | চক বা খড়িমাটি,<br>চুনা পাথর ও কর্দম<br>নুতন লাল বেলেপাথব | ১১ কোটি<br>১৪ কোটি<br>১৯ কোটি |
| পুরাজীবীয় (Primary বা Paleaozoic) | কার্বোনিফেবাস (Carboniferous)<br>ডেভোনিযান (Devonian)<br><br><br>সিল্যুবিযান (Silurian)<br>অর্ডোভিসিযান (Ordovician)<br>ক্যাম্ব্রিযান (Cambrian) | কযলাস্তব<br>মিল স্টোনগ্রিট<br>কার্বোনিফেরাস বা অঙ্গার জাতীয চুনাপাথব<br>বেলেপাথর ও চুনাপাথব<br><br>প্রাচীন লাল বেলে পাথর<br>প্রধানতঃ স্লেট ও শেল এবং কিছু কিছু আগ্নেয শিলা | ২২ কোটি<br>২৮ কোটি<br>৩২ কোটি<br>৩৪ কোটি<br>৩৯ কোটি<br><br><br><br>৫০ কোটি |
| অ্যাজোয়িক বা আর্কিযান (Azoic বা Archaean) | অ্যালগনকিযান বা প্রি-ক্যাম্বিযান (Algonkian বা Pre-Cambrian) | প্রধানত আগ্নেয় ও রূপান্তবিত শিলা এবং কিছু পাললিক শিলা | আনুমানিক ২০০-২৫০ কোটি |

২ Sengupta Jatindrachandra – West Bengal District Gazetteers, Malda, 1969, p-9

৩. Ibid, pp-8-9

৪. মুখোপাধ্যায সুভাষচন্দ্র ও দাস রমেশকুমার -- ভূমিকম্প উদ্ভব ও প্রকৃতি, প্রথম খণ্ড, ১৯৯৯, প— ২৮২

৫. প্রাগুক্ত, পাদটীকা, পৃ- ২৮০

৬ Carter M O – Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Malda, 1928-1935, 1938, p-5

৬ক সরকার প্রভাতরঞ্জন -- বর্ণ বিচিত্রা, প্রথম পর্ব, পৃ-১০৭

৭ Carter M O , ibid, p-2

৮ ibid, p-2

৯ ibid, p-2

১০ ibid, p-2-3

১১. ibid, p-3-4

১২. ঘোষ প্রদ্যোত -- মালদা জেলাব পুরাকীর্তি, পৃ-৩

১৩ দাস জ্ঞানেন্দ্রমোহন -- বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, ১ম, পৃ-১০৭১

১৪. Hunter W.W – A Statistical Account of Bengal, Vol VII, p-23

১৫ Carter, M O – ibid, p-4

১৬. ibid, p-4
১৭. Hunter W.W – ibid, p-23
১৮. Carter, M.0 – ibid, p-4
১৯. বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার/বৃহত্তর রাজসাহী, ১৯৯১, পৃ -৭
২০. Carter, M.0 – ibid, p-4-5
২১. Hunter W.W – A Statistical Account of Bengal, Vol VII, p-27

# বাংলা

## ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

বাঙালী রাজাদের মধ্যে শশাঙ্কই প্রথম সার্বভৌম নৃপতি। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন যে তিনি মৌখরী রাজ্যের সামন্তরাজা ছিলেন এবং প্রথমে মগধের মহাসেনগুপ্তের অধীনে ছিলেন[১]। শশাঙ্কের সময় গৌড়ের সীমা দক্ষিণ-পশ্চিমে উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলার কঙ্গোদ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। অবশ্য সে সময় তাঁর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণে (মুর্শিদাবাদ)। হর্ষবর্ধন ও কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মনের বিরোধিতা করে তিনি তাঁর রাজ্য অটুট রাখেন। শশাঙ্কের জীবনাবসানের সঠিক তারিখ জানা যায় না বটে, কিন্তু ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয় বলে অনুমান করা হয়।

শশাঙ্কের পর বাংলার রাজনৈতিক দুরবস্থা দেখা যায়। আনুমানিক ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্ধন মগধ জয় করেন এবং পর বৎসর তাঁর উৎকল ও কোঙ্গদে বিজয়াভিযান। এ পর্বে কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা গৌড় জয় করে কর্ণসুবর্ণে তাঁর জয়-স্কন্ধাবার সন্নিবেশিত করেন। আনুমানিক ৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে চীন পরিব্রাজক হিউ এনৎ সাঙ বঙ্গদেশ পরিভ্রমণ কালে তিনি এর অন্তর্গত পাঁচটি রাজ্যের কথা উল্লেখ করেন। সেগুলি যথাক্রমে কজঙ্গল (রাজমহল সন্নিকটে), কর্ণসুবর্ণ / বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, হুগলী ও নদীয়া প্রভৃতি জেলা ও সন্নিহিত স্থান), তাম্রলিপ্ত (মেদিনীপুর জেলা), পুণ্ড্রবর্ধন (উত্তরবঙ্গ) ও সমতট (পূর্ববঙ্গ)। কলহনের 'রাজতরঙ্গিণী'তে (খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী) লিখিত আছে যে ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড় গৌড়ের পাঁচ প্রধানকে পরাজিত করে পুণ্ড্রবর্ধনের রাজকন্যাকে বিবাহ করেন।

## পালবংশ

শশাঙ্কোত্তর শতবর্ষব্যাপী গৌড়রাজ্যে অনৈক্য, বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও আত্মকলহে রাজতন্ত্র প্রায় বিলুপ্ত হয়েছিল। বৌদ্ধ লামা তারনাথ তাঁর বিবরণীতে এর চিত্র 'মাৎস্যন্যায়'-এ বিধৃত

করেছেন। মালদা জেলায় প্রাপ্ত 'খালিমপুর তাম্রশাসন'-এ এই মাৎস্যন্যায়' বিদূরণের অভীপ্সা আছে—

মাৎস্যন্যায়মপোহিতুং প্রকৃতির্ভিলক্ষণ্যাঃ করং গ্রাহিতঃ।
শী গোপাল ইতি ক্ষিতীশ শিরসাং চূড়ামণিস্তৎ সুতঃ।।

[ অনুবাদ ঃ দুর্বলের প্রতি সবলের (অত্যাচারমূলক) মাৎস্যন্যায় (অরাজকতা) দূর করিবার অভিপ্রায়ে প্রকৃতিপুঞ্জ যাঁহাকে রাজলক্ষ্মীর কর গ্রহণ করাইয়া (রাজা নির্বাচিত করিয়া দিয়াছিল) ... নরপাল-কুল-চূড়ামণি গোপাল নামক সেই প্রসিদ্ধ রাজা (বপ্যট) হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। —"অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়)। ] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে তাম্রশাসনে প্রকৃতিভিঃ অর্থাৎ 'প্রকৃতিবর্গ গোপালকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন' কথাগুলি বিভিন্ন অর্থে ধরা হয়। যেহেতু 'প্রকৃতি' অর্থে প্রজা বা কতিপয় বিশিষ্ট প্রধান সচিব বা সম্ভবতঃ বিশিষ্ট নেতৃবর্গ। তবে বিবেচনা করলে শেষেরটিই গ্রহণযোগ্য।[২]

গোপালের বংশ পরিচয়ের মধ্যে সামান্য যা পাওয়া যায় তা হল তিনি বরেন্দ্র-অধিবাসী, তিনি যোদ্ধা ছিলেন, তাঁর পিতা ব্যপট ও পিতামহ দয়িতবিষ্ণু। এ বংশের সকলেই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। তিনি রাজা নির্বাচিত হন ৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এবং তাঁর মৃত্যু হয় আনুমানিক ৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে।[৩]

গোপালের পর তাঁর পুত্র ধর্মপাল (৭৭০ - ৮১০ খ্রীষ্টাব্দ) সমগ্র আর্যাবর্ত জয় করে সার্বভৌম সম্রাটের পদ লাভ করে 'পরমেশ্বর', 'পরমভট্টারক', 'মহারাজাধিরাজ' ইত্যাদি উপাধি গ্রহণ করেন। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভাষায় 'ধর্মপালের রাজ্য বাঙালীর জীবন-প্রভাত'।[৪] এ যুগের বাংলা ও বাঙালীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা, আদর্শ ইত্যাদি সমকালের রচনায় আংশিক প্রতিফলিত হয়েছে। নৈষ্ঠিক বৌদ্ধ হলেও হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও বিভিন্ন বর্ণের মানুষের ধর্মপালনে তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর সদাজাগ্রত দৃষ্টি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

ধর্মপালের পর তাঁর পুত্র দেবপালের (৮১০-৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ) রাজত্বে পাল সাম্রাজ্য গৌরবের শীর্ষসীমায় উপনীত হয়েছিল। মুঙ্গেরে প্রাপ্ত একটি তাম্রশাসনে জানা যায় যে তাঁর রাজত্ব হিমালয় থেকে রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। মালদায় প্রাপ্ত খালিমপুর তাম্রশাসন ধর্মপালের বিজয় রাজ্যের ৩২ সম্বৎসরে খোদিত। এখানে যুবরাজ ত্রিভুবনপালের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু এই ত্রিভুবনপালের মৃত্যুতে দেবপাল নামে পুত্র অথবা ত্রিভুবনপালই দেবপাল নাম ধারণ করেছিলেন কিনা নিশ্চিত করে বলা যায় না।[৫] তাছাড়া রাজপুত্র দেবটের কথাও আছে। কেউ কেউ শব্দটিকে দেবপালের অপভ্রংশ মনে করেন। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভাষায় — "বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসে ইহার অনুরূপ শক্তি বা সমৃদ্ধির পরিচয় ইহার পূর্বে বা পরে আর কখনও পাওয়া যায় নাই।"[৬] গুজরাটের কবি সোঢ্ঢল ধর্মপালকে 'উত্তরাপথস্বামীন' বলে অভিহিত করেছেন।[৭] তবে এই বিরাট রাজ্যে তাঁর প্রত্যক্ষ শাসনের অন্তর্গত ছিল বাংলা ও বিহার। এ ব্যতীত অন্য সব গুলি ছিল সামন্ত-রাজ্য।

ধর্মপালের রাজত্বকালে শিক্ষা-সংস্কৃতি তথা অর্থনৈতিক বিষয়ে প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। মগধের বিক্রমশীলা বিহারের তিনি স্থাপয়িতা এবং সম্ভবতঃ ওদন্তপুরী বিহারও তাঁর স্থাপনা।

সাহিত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলারও বিকাশ ঘটে এ পর্বে।

দেবপালের পর তাঁর পুত্র শূরপাল[৮], প্রথম এবং মহেন্দ্রপাল[৯] স্বল্পকালের জন্য রাজত্ব করেন। তবে ড. দীনেশচন্দ্র সরকার প্রথম বিগ্রহপালকে শূরপালের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন।[১০] দেবপালের পর বিগ্রহপাল (আনুঃ ৮৫০ - ৮৫৪ খ্রীঃ), নারায়ণপাল (৮৫৪ - ৯০৮ খ্রীঃ), রাজ্যপাল (আনুঃ ৯০৮ - ৯৪০ খ্রীঃ), দ্বিতীয় গোপাল (আনুঃ ৯৪০ - ৯৬০ খ্রীঃ) এবং দ্বিতীয় বিগ্রহপাল (আনুঃ ৯৬০ - ৯৮৮ খ্রীঃ) রাজত্ব করেন। দশম শতকের শেষ পাদে যখন পালবংশের দুর্দশা ও অবনতি শেষ পর্যায়ে পৌঁছে, তখন দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র মহীপাল আনুমানিক ৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে (মতান্তরে) সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহীপালের অর্ধশতবর্ষব্যাপী রাজত্বকাল নিঃসন্দেহে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। বাণগড়ের লিপিতে এবং দুটি দেবমূর্তির (বিষ্ণু ও গণেশ) পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপিতে যথাক্রমে জানা যায় যে উত্তরবঙ্গ তাঁর অধীনস্থ ছিল এবং পূর্ববঙ্গ তিনি পুনরুদ্ধার করেছিলেন। মহীপাল কেবলমাত্র সুদক্ষ রণবীরই ছিলেন না, তিনি বহু প্রাচীন বৌদ্ধকীর্তিরও সংস্কারক। যেমন সারনাথের মৃগদাবের ধর্মরাজিকা বা বৌদ্ধস্তূপ, অশোকস্তম্ভের শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত 'সঙ্ঘ ধর্মচক্র', নালন্দা মহাবিহার জীর্ণোদ্ধার প্রভৃতি। তাছাড়া বোধগয়ায় দুটি মন্দির, বারাণসীর ঈশান (শিব), চিত্রঘন্টা (দুর্গা) মন্দির ইত্যাদিও তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। মহীপালের খ্যাতি শুধুমাত্র গ্রন্থে বা লিপিতেই সীমাবদ্ধ হয়নি, যুক্ত বাংলার বহু স্থান, দীঘি ও লোকগাথায় তাঁর নাম আজও উচ্চারিত হয়। সংক্ষেপে বলা যায় যে, যে মহীপালের রাজত্বে বাংলার প্রায় সর্বক্ষেত্রেই এক নতুন জাতীয় জাগরণ দেখা দিয়েছিল।

মহীপালের পর তাঁর পুত্র নয়পাল (আনুঃ ১০৩৮ - ৫৪ খ্রীঃ, মতান্তরে ১০৪৩ - ১০৫৮ খ্রীঃ) এবং তারপর তৃতীয় বিগ্রহপাল (১০৫৮-৭৫ খ্রীষ্টাব্দ) রাজত্ব করেন। শেষের দিকে পাল সাম্রাজ্য বৈদেশিক আক্রমণে এবং অন্তর্বিপ্লবে শতধাদীর্ণ হয়ে পড়েছিল। তৃতীয় বিগ্রহপালের পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র দুর্বল ও অকর্মণ্য দ্বিতীয় মহীপাল কৈবর্তনায়ক দিব্যের (দিবোক / দিব্বোক) হাতে পরাজিত ও নিহত হন। তৃতীয় বিগ্রহপালের পর নামমাত্র রাজা হয়েছিলেন দ্বিতীয় মহীপাল (আনুঃ ১০৭৫-১০৮০ খ্রীঃ) এবং দ্বিতীয় শূরপাল (আনুঃ ১০৮০ - ৮২ খ্রীঃ)। এরপর তাঁদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামপাল (আনুঃ ১০৮২ - ১১২৪ খ্রীষ্টাব্দ) বরেন্দ্র উদ্ধারের নিমিত্ত সামন্ত রাজাদের নিকট থেকে সৈন্য ভিক্ষা করে বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে কৈবর্তনায়ক ভীমকে বন্দী ও বধ করে পিতৃভূমি বরেন্দ্র পুনরায় লাভ করেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত'-এর নটি শ্লোকে ভীমের সঙ্গে রামপালের যুদ্ধের বর্ণনা আছে। রামপাল রামাবতী নামক স্থানে এক নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। রাজ্য বিস্তারেও রামপাল সার্থক-ধন্য। বিক্রমপুরের বর্মরাজ ও কামরূপরাজও তাঁর যেমন বশ্যতা স্বীকার করেন, তেমনই অনন্তবর্মার লিপিতে জানা যায় যে, ১১৩৫ অব্দের কিছু আগে তিনি উড়িষ্যা জয়ও করেছিলেন। তিনি জীবিতকালে কর্ণাটের চালুক্যরাজবংশীয় রাজার লোলুপ দৃষ্টি থেকেও বাংলাদেশকে রক্ষা করা তাঁর কম কৃতিত্ব নয়। অঙ্গ ও মগধও যে তাঁর অধিকারে ছিল, তা শিলালিপিতে সুপ্রমাণিত। রামপাল কমপক্ষে যে ৩৩ বছর রাজত্ব করেছিলেন তা একটি পুঁথির পুষ্পিকায় জানা যায়। তাঁর জীবন তথা রাজ্যলাভ ও মৃত্যু উভয়ই উপন্যাসের মত হৃদয়স্পর্শী। তাঁর পরম সুহৃদ মাতুল মহনের মৃত্যুতে তিনি এতদূর শোকাচ্ছন্ন হন যে, তিনি গঙ্গাগর্ভে জীবন বিসর্জন করেন। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে রামপালের রাজধানী প্রাচীন রামাবতীর প্রকৃত অবস্থান

সম্পর্কে পণ্ডিত মহলে নানা মত বতমান। কেউ বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটের সন্নিকটে 'আমাতি' গ্রাম, কেউ মালদার (অমৃতি) অঞ্চলে[১০ক], আবার কেউ বা 'অমৈর'কে 'রামাবতী' বলে অনুমান করেন। 'রামচরিত'-এ এই রাজধানীর সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের বিস্তারিত বিবরণ কবির ভাষায় লিপিবদ্ধ। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পালবংশের গৌরব-রবি চিরকালের জন্য হল অস্তমিত।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, রামপালের চারপুত্র — কুমারপাল, মদনপাল, বিত্তপাল ও রাজ্যপালের মধ্যে কে বড় তা জানা যায় না, তবে ড. রাধাগোবিন্দ বসাকের মতে জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যপাল পিতার জীবদ্দশায় বিগত হন।[১১] রামপালের পর তাঁর পুত্র কুমারপাল (১১২৪-২৯) এবং তারপর তাঁর পুত্র তৃতীয় গোপাল (১১২৯ - ৪৩) রাজত্ব করেন। কুমারপালের সময় তাঁর সেনাপতি বৈদ্যদেবের দ্বারা প্রাক্‌জ্যোতিষ ও কামরূপ বাংলার অন্তর্ভুক্ত হয়। পরবর্তী পর্বে তৃতীয় গোপালের কনিষ্ঠ পিতৃব্য অর্থাৎ রামপালের কনিষ্ঠপুত্র মদনপাল (১১৪৩-৬২) রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বের অষ্টম বর্ষে উৎকীর্ণ একটি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে। মালদা জেলার কালিন্দী নদী তীরে মদনপালের রাজধানী ছিল বলে অনেকের অনুমান।

মদনপালের পর ঠিক কোন রাজা রাজত্ব করেন, সে সম্পর্কে কোন শিলালিপি বা তাম্রশাসন মেলে নি। তবে গুণরিয়া ও রামগয়া থেকে মহেন্দ্রপালদেবের (যথাক্রমে) নবম ও অষ্টমবর্ষে উৎকীর্ণ শিলালিপির আকার থেকে অনুমিত হয় যে তিনি মদনপালের সময়ে বা অব্যবহিত পরে রাজ্যলাভ করেন।[১২]

নানান প্রাচীন হস্তলিপি ও শিলালিপিতে গোবিন্দপালকে পালবংশের শেষ রাজা বলে নির্দেশ করা হয়েছে। গয়ার একটি মূর্তির পাদদেশে যে লিপি খোদিত, তা থেকে অনেকে অনুমান করেন যে ১২২৮ সংবতে অর্থাৎ ১১৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর রাজ্য শেষ হয়েছিল।[১৩] তাছাড়া বেণ্ডল মুসলিমগণ কর্তৃক মগধ অধিকারের দ্বারা গোবিন্দপালের পরাজয়ের ঘটনা বৌদ্ধ হস্তলিপি সমূহে লিখিত 'গোবিন্দপালদেবানাং বিনষ্টরাজ্যে' শব্দ দুটির উল্লেখ করেছেন।[১৪] তবে সম্ভবতঃ মদনপালই পালরাজ্যের শেষ রাজা। যদিও মদনপালের পর বিহার প্রদেশের পাটনা-গয়া অঞ্চলে গোবিন্দপাল (১১৬১-৬৫) এবং মুঙ্গের-ভাগলপুর অঞ্চলে পলপাল (১১৬৫-১১৯৯) রাজত্ব করেছিলেন বলে জানা যায়।[১৫] তবে মদনপালের পর গোবিন্দপাল ও পলপালের সম্পর্ক কি তা আজও নির্ণয় করা যায় নি।

প্রসঙ্গক্রমে পালবংশের পারম্পর্য সম্পর্কে একটি লতিকা উপস্থিত করা যেতে পারে।

ধর্মপাল (আনুঃ ৭৮১ - ৮২১ খ্রীঃ)
[ স্ত্রী রন্নাদেবী / নীতি ] *
বকপাল
জয়পাল
* ১. ত্রিভুবনপাল (?)
* ২. দেবপাল (আনু ৮২১-৮৬১ খ্রীঃ)
[ স্ত্রী মাহটা ] (মুঙ্গেরলিপি)
স্ত্রী ভবদেবী (মির্জাপুর তাম্রশাসন)
জয়পাল (?)
বিগ্রহপাল প্রথম (আনুঃ৮৬১-৮৬৬)
(রাণী লজ্জাদেবী)
নারায়ণপাল (আনুঃ ৮৬৬-৯২০খ্রীঃ)
গরুড়স্তম্ভ লিপি
(বাদাল প্রস্তরলিপি)
মহেন্দ্রপাল প্রথম
(জগজ্জীবনপুর তাম্রশাসন)
শূরপাল প্রথম (মির্জাপুর তাম্রশাসন)
বা
সুরপাল (আনুঃ ৮৬১-৮৬৬ খ্রীঃ)
(পত্নী বব্বা)
(পত্নী মহেষোভট্টারিকা দেবী)
রাজ্যপাল (আনুঃ ৯২০-৯৫২খ্রীঃ)
[ স্ত্রী ভাগ্যদেবী ]
গোপাল দ্বিতীয় (আনুঃ ৯৫২-৯৬৯খ্রীঃ)
বিগ্রহপাল দ্বিতীয় (আনুঃ ৯৬৯-৯৯৫খ্রীঃ)
মহীপাল প্রথম (আনুঃ ৯৯৫-১০৪৩খ্রীঃ)
নয়পাল (আনুঃ ১০৪৩-১০৫৮খ্রীঃ)
বিগ্রহপাল তৃতীয় (আনুঃ ১০৫৮-৭৫খ্রীঃ)
* ১. দেবপালের মুঙ্গের লিপিতে দেবপালের
মায়ের নাম রন্নাদেবী
* ২. মহেন্দ্রপালের জগজ্জীবনপুর তাম্রলিপিতে
দেবপালের মায়ের নাম নীতি
মহীপাল দ্বিতীয়
(১০৭৫-৮০ খ্রীঃ)
দ্বিতীয় শূরপাল/সুরপাল
(১০৮০-৮১ খ্রীঃ)
রামপাল
(আনুঃ ১০৮২-১১২৪ খ্রীঃ)
কুমারপাল (আনুঃ ১১২৪-২৯খ্রীঃ)
মদনপাল (আনুঃ ১১৪৩-১১৬২খ্রীঃ)
(স্ত্রী চিত্রমতিকা)

তবে বিভিন্ন লেখকের এই রাজত্বকালের হিসাবের পার্থক্য আছে।[১৬ক]

এ পর্যন্ত মালদা জেলার পালরাজাদের তিনটি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে। সেগুলি ঃ—

১. **ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসন ঃ** মালদা জেলার ইংরেজবাজার থানার গৌড়ের সন্নিকটে খালিমপুরে (জে. এল. নং ৩২) চাষ করার সময় জনৈক চাষী এটি পায়। তার জীবদ্দশায় সেটি হস্তগত করা যায় নি। চাষীর মৃত্যুর পর তার বিধবা পত্নী মোরি বেওয়ার নিকট থেকে জেলাশাসক উমেশচন্দ্র বটব্যাল ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে এটি ক্রয় করেন। প্রথমে এটি বটব্যাল কর্তৃক এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশ পায়। পরবর্তী পর্যায়ে 'এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকায়' (IV 243) প্রফেসর কিলহর্ণ অধিকতর গ্রহণযোগ্য পাঠ প্রকাশ করেন। এই তাম্রশাসনটি দৈর্ঘ্যে ৪২ সে.মি. ও প্রস্থে ২৮ সে.মি.

বিভিন্ন সংস্কৃত ছন্দে এটি রচিত ঃ—

যেমন ঃ প্রথম শ্লোক বসন্ত তিলক, দ্বিতীয় শ্লোক মালিনী, তৃতীয়, নবম, চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ ও ঊনবিংশ শ্লোক অনুষ্টুপ; চতুর্থ, পঞ্চম, দশম ও ত্রয়োদশ শ্লোক শার্দূলবিক্রীড়িত; ষষ্ঠ, একাদশ ও দ্বাদশ স্রগ্ধরা, অষ্টম শ্লোক মন্দাক্রান্তা, সপ্তদশ শ্লোক পুষ্পিতাগ্রা এবং অষ্টাদশ শ্লোক শিখরিণী ছন্দে গ্রথিত।[১৭]

ধর্মপালদেব শুভস্থলীতে প্রতিষ্ঠিত নুন্ন নারায়ণ সেবার জন্য পাটলীপুত্র জয়স্কন্ধাবার (Victory Camp, বিজয় শিবির) থেকে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির ব্যাঘ্রতটি মণ্ডলের মহান্ত প্রকাশ নামক বিষয়ের অন্তর্গত ক্রৌঞ্চশ্বভ্র গ্রাম এবং মাড়াশাল্মলী পালিতক ও আম্রষণ্ডিকা মণ্ডলের অধীনে স্থালীকট্ট বিষয়ের অন্তর্গত গোপিপল্লী গ্রামটি দান করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ যে ব্যাঘ্রতটী বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার গঙ্গা-ভাগীরথীর অববাহিকায় এবং 'ক্রৌঞ্চশ্বভ্র' মালদা জেলার মাধাইপুরের উত্তর পশ্চিমে 'কাঁওচ' বলে অনেকের অভিমত।

২. **দ্বিতীয় গোপালদেব-এর জাজিলপাড়া তাম্রশাসন** — দ্বিতীয় গোপালদেবের শাসনকালে বেশ কিছু লিপি বিহার ও বাংলায় মিলেছে। তার মধ্যে মালদার গাজোল থানার জাজিলপাড়া (জে.এল. নং ১৮৯) তাম্রশাসন উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৯ সালে তদানীন্তন মালদার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ক্ষিতীশচন্দ্র বর্মন এটি ক্রয় করে মালদা মিউজিয়ামকে উপহার দেন। দ্বিতীয় গোপালদেবের রাজত্বের ষষ্ঠ বৎসরে উৎকীর্ণ এই লিপিতে বর্তমান বিহারের ভাগলপুরের কহলগাঁর সন্নিকটে বটপর্বতিকায় অবস্থিত জয়স্কন্ধাবার থেকে ভট্টপুত্র নাগের পৌত্র ও ভট্টপুত্র শ্রীগর্ভের পুত্র শ্রীধর শর্মণকে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির কুদ্দালখাতক বিষয়ের দুটি পল্লীদানের কথা খোদিত।

৩. **মহেন্দ্রপালের জগজ্জীবনপুর তাম্রশাসন** — মালদা জেলার হবিবপুর থানার জগজ্জীবনপুর (জে. এল. ৭৩) তুলাভিটার উত্তর-পূর্ব দিকে ১৯৮৭ সালের ১৩ই মার্চ এই গুরুত্বপূর্ণ তাম্রশাসনটি আবিষ্কৃত হয় এবং বর্ত্তমানে তা মালদা মিউজিয়ামে সংরক্ষিত। এতে দেবপালের পরলোকগমনের পর তাঁর পুত্র মহেন্দ্রপালের উত্তরাধিকার প্রাপ্তির কথা আছে। তা ছাড়া দেবপাল অপুত্রক ছিলেন — এই পূর্ব ধারণাও পরিত্যক্ত হল, যেহেতু অভিলেখে উল্লেখ আছে যে —

সা চাহমানান্বয়বারিধীন্দোঃ
সাধ্বীং সুতাং দুর্লভরাজনাম্নঃ।
শ্রীমাহটাং ধর্মপরাং নরেন্দ্র —
স্ত্রিয়ং কিলোবাহ সুলক্ষণাঙ্গীম্।।১১

সা দেবকীব নরদেব সহস্রবন্দ্যং
সৌকর্মতো বসুমতীভরমুদ্বহন্তং।
লক্ষ্ম্যাঃ স্বয়ংবরপতিং পুরুষোত্তমঞ্চ
দেবং সুতোত্তমমসূত মহেন্দ্রপালম্।।১২

[ অনুবাদ - ১১. তিনি চাহমান বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি দুর্লভরাজের সাধ্বী, ধর্মপরায়ণা ও সুলক্ষণা কন্যা শ্রীমাহটা দেবীকে বিবাহ করেন।

অনুবাদ - ১২. মাহটা দেবী দেবকীর মত সহস্র নরপতি দ্বারা বন্দিত, অনায়াসে পৃথিবীর ভারবহনক্ষম ও লক্ষ্মীর স্বয়ম্বরলব্ধ পতি পুরুষোত্তম নারায়ণের মত উত্তম পুত্র মহেন্দ্রপালকে প্রসব করলেন। ]

মহেন্দ্রপাল দেব নামাঙ্কিত নিষ্কর ভূমিদানের এই দলিল 'অর্যানন্দ সংঘ' নামক বৌদ্ধসংঘকে শ্রীবজ্রনির্মিত বৌদ্ধবিহার পরিচালনার জন্য পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত কুদ্দালখাতক বিষয়াধীন ও কুদ্দালখাতক জয়স্কন্ধাবার (Victory Camp) থেকে প্রদান করা হয়।

বৌদ্ধধর্মালম্বী হলেও পালরাজারা ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিও ছিলেন বিশেষ শ্রদ্ধাশীল। খ্যাতনামা ব্রাহ্মণদের তাঁরা ভূমিদানও করতেন। তাঁদের শাসনব্যবস্থা বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করে। শান্তি প্রতিষ্ঠায় তাঁদের ঐকান্তিকতার জন্য শিক্ষা, সাহিত্য, শিক্ষা ও স্থাপত্য-ভাস্কর্যেরও উন্নতি দেখা যায়। শুধুমাত্র তাঁরা বিদ্যোৎসাহীই ছিলেন না, বেদ, বেদান্ত, ব্যাকরণ, মীমাংসা ও তর্কশাস্ত্র প্রভৃতিতে অনুশীলনরত ব্রাহ্মণদেরও যে ভূমিদান করতেন তার প্রমাণ আছে। বরেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের এ পর্বে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, কাব্য ও ব্যাকরণে বিশেষ পারদর্শিতা উল্লেখযোগ্য। সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিত এযুগের বিশেষ স্মরণীয় গ্রন্থ। মদনপালের রাজত্বকালে রচিত এই গ্রন্থে রামপালের ইতিহাস দ্ব্যর্থবোধক শ্লোকে বর্ণিত। স্বাভাবিকভাবে ঐতিহাসিক আখ্যান বর্ণনায় এখানে কাব্যগুণের আশা সঙ্গত নয় বটে, কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে বরেন্দ্রভূমি এবং রামাবতী নগরী বর্ণনা এবং রামপালের সঙ্গে কৈবর্তরাজ ভীমের যুদ্ধবিবরণ ইত্যাদি অংশ নিঃসন্দেহে কাব্যাস্বাদী। এযুগে বৈদ্যক শাস্ত্রেও কতিপয় বঙ্গ সন্তান উল্লেখ্য। চরক ও শুশ্রুত-এর টীকাকার চক্রপাণি দত্তের 'চিকিৎসা সংগ্রহ', 'আয়ুর্বেদ দীপিকা', 'শব্দ চন্দ্রিকা', 'দ্রব্যগুণ সংগ্রহ' প্রভৃতি বিশিষ্ট রচনা। তা ছাড়া এযুগে বৈদ্যক গ্রন্থের টীকাকার অরুণ দত্ত, বিজয় রক্ষিত, বৃন্দকুন্ড, শ্রীকণ্ঠদত্ত, বঙ্গসেন এবং শুশ্রুতের খ্যাতনামা টীকাকার গয়াদাসও বাঙালী বলে অনেকের ধারণা। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে নির্দেশিত

রাজ্যের শাসনবিভাগ তাঁদের বৈশিষ্ট্য। প্রধান্য অমাত্য 'মহাসান্ধিবিগ্রহিক', রাজস্ব বিভাগে 'ষষ্ঠাধিকৃত', দস্যু ও তস্করের ভয় থেকে রক্ষার জন্য চৌরোদ্ধরণিক, বাণিজ্য দ্রব্যের শুল্ক, শুল্কের জন্য 'শৌল্কিক, খেয়াঘাটের মাশুল আদায়কারী 'তরিক' জমিজরিপের অধ্যক্ষ ক্ষেত্রপ ও প্রমাতৃ, বিচারের কর্তা মহাদন্ডনায়ক, অথবা ধর্মাধিকার এবং আরক্ষা বিভাগে মহাপ্রতিহার, দান্ডিক, দান্ডপাশিক, দন্ডশক্তি, দুর্গরক্ষক কোট্টপাল, সীমান্তরক্ষক 'প্রান্তপাল'প্রভৃতি নামে কর্মচারী ছিলেন।[১৮] অন্যদিকে রাঢ়দেশীয় ব্রাহ্মণ জীমূতবাহন প্রণীত 'দায়ভাগ' অনুসারে কিছুদিন আগে পর্যন্ত বাঙালীর উত্তরাধিকার, স্ত্রীধন ইত্যাদি হিন্দু আইনে (Hindu Law) কার্যকর ছিল। তাঁর বিচার-পদ্ধতি বিষয়ক গ্রন্থ 'ব্যবহার-মাতৃকা' এবং হিন্দুদের আচরিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কাল-নির্দ্ধারক গ্রন্থ 'কালবিবেক' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১৯]

দর্শন শাস্ত্রের উল্লেখ্য ব্যক্তিত্ব অস্তিক্যবাদের প্রবর্তক শ্রীধরভট্ট ন্যায়কন্দলী, অদ্বয়সিদ্ধি, তত্ত্বসংবাদিনী, তত্ত্বপ্রবোধ এবং সংগ্রহ টীকা ইত্যাদি বেদান্ত ও মীমাংসার কতিপয় গ্রন্থও রচনা করেন। আবার জীনেন্দ্রবুদ্ধি, বিমলমতি ও মৈত্রেয়রক্ষিত প্রমুখ এ পর্বের কতিপয় খ্যাতনামা বৈয়াকরণ এবং অমরকোষের টীকাকার সুভূতিচন্দ্র বাঙালী ছিলেন বলে অনেকের ধারণা।[২০] এযুগে 'জেতারি' নামধারী দু-জন বাঙালী বৌদ্ধ সাহিত্যিকের নামও মেলে। তিনটি ন্যায়গ্রন্থের রচয়িতা প্রবীন জেতারি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের গুরু ছিলেন এবং নবীন জেতারির একাদশটি বজ্রযান গ্রন্থের তিব্বতীয় গ্রন্থের অনুবাদ মিলেছে। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানও যে বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ ও জগদ্বিখ্যাত পন্ডিত তাও অধিকাংশের মত। মোট ১৬৮ টি গ্রন্থের রচনাকার দীপঙ্করের বজ্রযান সাধন সম্পর্কিত রচনাই বেশী। তিব্বতীয় কিম্বদন্তী অনুসারে দিবাকরচন্দ্র, কুমারচন্দ, কুমারবজ্র, দানশীল, পুতলি, নাগবোধি, প্রজ্ঞাবর্মণ এবং জগদ্দল মহাবিহারের (গৌড়) মোক্ষাকরগুপ্ত, বিভূতিচন্দ্র ও শুভাকরও ছিলেন বাঙালী। তবে শেষোক্ত ব্যক্তিত্বত্রয় সন্দেহাতীত ভাবে বাঙালী হিসাবে প্রমাণিত হন নি।

বাংলা লিপির ক্ষেত্রেও এ যুগ উল্লেখযোগ্য। দশম শতকের শেষপাদে প্রথম মহীপালের রাজত্বেই বাংলা বর্ণমালার স্বতন্ত্ররূপ স্পষ্ট হতে দেখা গেল। বাণগড় লিপিতে বাংলা অক্ষরমালার বেশ কয়েকটি অক্ষরই পাওয়া যায়। পূর্বে বাংলায় যে মাগধী ও মগধী অপভ্রংশ ভাষা ছিল, পালযুগে বাংলা ভাষা তার নির্দিষ্ট রূপ পেতে থাকে। বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যদের 'চর্যাপদ' এই ভাষার প্রথম মুখরিত রূপ। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাচর্য্য বিনিশ্চয়' বা 'চর্যাপদ' এ যুগেরই রচনা।

পালযুগে উচ্চতর বিদ্যার প্রসারও ঘটেছিল। বহু বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্মপাল তাঁর নাম 'বিক্রমশীলদেব' অনুসারে বিক্রমশীলা বিহার বা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। এটি ভাগীরথী তীরের এক গিরিশীর্ষে ছিল বলে অনেকের ধারণা। শুধুমাত্র সংস্কৃত নয়, তিব্বতী ভাষা ও ধর্ম সম্পর্কে পঠন-পাঠনও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ধর্মপাল অধুনা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের রাজশাহী জেলার সোমপুরা (পাহাড়পুর) বিহারেরও প্রতিষ্ঠাতা। রাঢ় অঞ্চলে ত্রৈকূটক বিহারের হরিভদ্র 'অভিসময়ালঙ্কার'-এর বিখ্যাত টীকা রচনা করেন। বরেন্দ্রের দেবীকোট ও জগদ্দল, চট্টগ্রামের পন্ডিতবিহার, ফুল্লহটির, বিক্রমপুরী এবং কুমিল্লার সন্নিকটে পট্টিকেরা ছাড়া দেবীকোট, সন্নগরা বৌদ্ধবিহার উল্লেখযোগ্য।[২১] পাল রাজারা পৃথিবী বিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়েরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বুদ্ধজ্ঞানপাদ, সমতটের রাজবংশজাত বাঙালী শীলভদ্র, জেতারি, শান্তিরক্ষিত, চন্দ্রগোমিন

ও অতীশ প্রভৃতি এর আচার্য ছিলেন। শীলভদ্র ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাধ্যক্ষ পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন।

পালযুগের স্থাপত্য ও শিল্পকলা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যায় যে এযুগের স্থাপত্যের বিশেষ নিদের্শন পাওয়া না গেলেও রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরের সোমপুরা বিহার ও মালদার জগজ্জীবনপুরের বিহারের ভগ্নাবশেষ থেকে সমকালের বৌদ্ধ স্থাপত্যের নিদর্শন মেলে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিশেষত ব্রহ্মদেশ ও জাভার বহু বিহার এই সোমপুরা বিহারের আদর্শেই নির্মিত হয়েছিল। সপ্তম শতকের মধ্যভাগ থেকে অষ্টম শতকের তৃতীয় পাদ পর্যন্ত যে ভাস্কর্যের ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় তা পাহাড়পুরের প্রাপ্ত মূর্তিগুলিতে স্পষ্ট। তবে পাল যুগের স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাহাড়পুরের সোমপুরা বিহার। এটি একক বৃহত্তম বিহার - যা উত্তর-দক্ষিণে বহিরঙ্গে ৯২২ ফুট ও পূর্ব-পশ্চিমে ৯১২ ফুট এবং চতুর্দিকে ১৭৭ টি ভিক্ষুদের আবাসস্থল, প্রবেশদ্বার, নিবেদনের স্তূপ ইত্যাদি ছিল।[২২] এই বৌদ্ধবিহারটিরও মূল ভিত্তি ও রূপ সম্ভবতঃ একটি জৈন চতুর্মুখ-মন্দিরকে কেন্দ্র করেই পরিবর্তন-পরিবর্ধনের মাধ্যম তৈরী হয় । চতুষ্পার্শের বেষ্টনী ১৬ ফুট চওড়া এবং ১২ ফুট থেকে ১৫ ফুট উচ্চ, শ্রেণীবদ্ধ কক্ষ ১৪ ফুট x ১৩-৬ ফুট এবং বারান্দা আনুমানিক ৮ ফুট x ৯ ফুট।[২৩] উত্তরবিহারে লৌরিয়া নন্দনগড়ের আবিষ্কৃত বিহারটি পাহাড়পুরের আদলেই তৈরী। ভূমি-নক্সা ও স্থাপত্য কৌশলই নয়, প্রস্তর ও পোড়ামাটির ফলকের রূপে সর্বপ্রথম বাংলার নিজস্ব ভাস্কর্য-শিল্পের বৈশিষ্ট্য এখানে ধরা পড়েছে। প্রকৃতপক্ষে পাহাড়পুরের ভাস্কর্য তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ— ১. অভিজাত তথা ধ্রুপদী শিল্প ২. লোকশিল্প ৩. মিশ্র শিল্প (যা উপরিউক্ত দুটির মধ্যবর্তী)। রামায়ণ-মহাভারতের কিছু কাহিনী যেমন খোদিত হয়েছে এখানে, তেমনি লোকায়ত জীবনের সুখ-দুঃখ শ্রমজীবনের চিত্র তথা প্রেমজীবনের খন্ড ক্ষুদ্র মুহূর্তগুলিও চিরকালীন রূপ পেয়েছে। নিসর্গ প্রকৃতি ও প্রাণীচিত্রও এখানে রূপবন্ধনে বিধৃত। পোড়ামাটির ফলক অপেক্ষা পাথরের মূর্তির সংখ্যা অনেক কম হলেও তারা উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া বেলেপাথরের মূর্তিও পাওয়া যায়।

পাথরের মধ্যে হিন্দুমূর্তির অন্তর্গত রাধা-কৃষ্ণ, হেবজ্রের শক্তির সঙ্গে আলিঙ্গন, বলরাম, যমুনা, কাম-রতি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, গণেশ, দেবকীর নিকট থেকে বসুদেবের শিশু-কৃষ্ণ গ্রহণ, রাক্ষস-বানর যুদ্ধ, শিবকে হলাহল প্রদান, মনসা, মঞ্জুশ্রী, তারা প্রভৃতি যেমন আছে, তেমনই ব্রোঞ্জের হর-গৌরী, গণেশ, অভয় মুদ্রায় বুদ্ধ এবং উপবিষ্ট কুবের (জম্ভল) ইত্যাদি এবং টেরাকোটার মূর্তির মধ্যে লাঙ্গল কাঁধে কৃষকের মাঠে যাত্রা, বাজিকরের খেলা, শিশুকে কোলে নিয়ে মায়ের কূপ থেকে জল তোলা, পূজার্চনায় ব্রাহ্মণ, অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত পুরুষ ও নারী, শবর নারী-পুরুষের প্রেমালাপ, ধনু হস্তে শবর, কিন্নর, পশু-পাখি, প্রভৃতির রিলিফ মূর্তি উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কুমিল্লা জেলার ময়নামতী ও লালমাই পাহাড়েও এ পর্বের পোড়ামাটি ও পাথরের মূর্তি ছাড়া মহাস্থানের কাছে অষ্টধাতু নির্মিত যে বৌদ্ধ মঞ্জুশ্রী মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে, তা ভাস্কর্য শিল্পের অনুপম নিদর্শন। মহীপালদেবের রাজত্বকালের বাঘাউরার বিষ্ণুমূর্তি ও তৃতীয় গোপালের আমলে সদাশিব মূর্তি পালযুগের ভাস্কর্যের অনবদ্য নিদর্শন। এখানে উল্লেখ্য যে পালযুগের প্রথম পর্যায়ের মূর্তির মুখমন্ডলে যে এক প্রশান্ত গাম্ভীর্য দেখা যায়, পরবর্তী পর্বে সেখানে ঔদার্যপূর্ণ স্মিতহাস্য ও প্রশান্ত লাবণ্য দেখা গেল।[২৪] শিল্পবেত্তার মতে "প্রাচীন বাংলার প্রস্তর-ভাস্কর্যে বাঙালী মনের যে পরিচয় পাওয়া যায়

তাহা তাহার সংস্কৃতপূত চিত্তের সমষ্টিগত গভীরতর ধ্যান-কল্পনার এবং সূক্ষ্মতর দৃষ্টির, যে দৃষ্টি ও ধ্যান-কল্পনার যোগ সর্বভারতীয় দৃষ্টি ও ধ্যান কল্পনার সঙ্গে।'' [২৫]

পালযুগের চিত্রকলার নিদর্শন সমকালীন চিত্র-সংযুক্ত পুঁথিতে দশম শতকের অন্ত্য থেকে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের পাটা ও পুঁথি চিত্রে (বৌদ্ধধর্মের অনুলিপি) ভগবান বুদ্ধের জীবন চিত্র থেকে বৌদ্ধদেবদেবী যথা মহাসাহস্রপ্রমর্দিণী, মহাপ্রতিসরা, দেবী, নৈরাত্মা-যোগিনী, মহামায়ূরী, মৃত্যুবঞ্চন তারা, রক্ষা মহাদেবী, মহাশ্রী তারা, বজ্রসত্ত্ব, কুরুকুল্লা, অমোঘসিদ্ধি, বজ্রপাণি, লোকনাথ, মৈত্রেয়, মঞ্জু ঘোষ, ভৃকুটী তারা, মহাশ্রী তারা, প্রজ্ঞাপারমিতা, বসুধারা প্রভৃতি বর্তমান।[২৬] এগুলি প্রধানত গোপালদেব প্রথম ও দ্বিতীয় মহীপালদেব, নয়পালদেব, রামপালদেব, গোমীন্দ্রপালদেব গোবিন্দপালদেব ও হরিধর্মদেবের রাজত্বকালে চিত্রিত। তন্মধ্যে রামপালের রাজত্বের ৩৯শ বর্ষে লিখিত অষ্টসহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার চিত্রগুলিই শ্রেষ্ঠ।[২৬]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে পালযুগের ভাস্কর্যে ধ্রুপদীরীতির দৃঢ়ভিত্তি যেমন মুদ্রিত, তেমনই পালচিত্রকলার উদ্ভব ঐ রীতি থেকে উদ্ভূত হলেও মধ্যযুগের রেখা সর্বস্ব রীতির স্পষ্ট রীতির চিহ্ন আছে। এই সব পুঁথিচিত্র কোনটি রেখা-চিত্র, কোনটি রেখা-মুখ্য, কোথাও রেখাবিন্যাসে প্রাসাদগুণ, লালিত্য, সাবলীলতা বা বর্তনাসৃষ্টিতে চূড়ান্ত দক্ষতা, কোথাও রেখা ও রঙের সুসমঞ্জস ব্যবহার, কোথাও বা সুললিত, সাবলীল, ছেদহীন ও তরঙ্গায়িত রেখাবিন্যাসে দেহভঙ্গি এবং তার নতোন্নত অংশ একসূত্রে গ্রথিত বলে প্রতীত হয়। পুঁথিগুলিতে লিপিকারদের অক্ষরগুলি সূক্ষ্ম, সুন্দর ও সুসমঞ্জস।[২৭] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে এর মধ্যে একটি পারমাররাজ ভোজদেবের শিল্পগ্রন্থ 'সমরাঙ্গন সূত্রধর'। একাদশ শতকের এ গ্রন্থে চিত্রকর্ম সম্পর্কেও কিছু তথ্য নির্দেশিত। তাতে চিত্রের আঙ্গিক-কেন্দ্রিক প্রক্রিয়া সেই অষ্ট-অঙ্গ — ১. বর্তিকা ২. ভূমিবন্ধন ৩. লেখ্য ৪. রেখাকর্ম ৫. বর্ণকর্ম ৬. বর্ত্তনাক্রম ৭. লেখন বা লেখকরণ ৮. দ্বিককর্ম (?)[২৮]

বাংলায় প্রাচীন মন্দির বিশেষ নেই বটে, কিন্তু ঐসব মন্দিরের অংশ বিশেষ অর্থাৎ স্তম্ভ, চৌকাঠ, বাজু ইত্যাদি মালদা, দিনাজপুর, হুগলী, বীরভূম, রাজসাহী ইত্যাদি জেলায় পাওয়া যায় — যার কারুকার্য আজও দেখা যায়। দারু ও তক্ষণ শিল্পেরও উন্নতি দেখা যায় এই যুগে। ঢাকায় বাংলাদেশ মিউজিয়মে কতিপয় স্তম্ভ, ব্রাকেট আজও বিচিত্র কারুকার্যের নিদর্শন বহন করে।

লামা তারনাথ বাংলার দুই বিখ্যাত শিল্পী (প্রস্তর, ধাতব ও চিত্র) ধীমান ও তাঁর পুত্র বীতপালের নাম উল্লেখ করেছেন। সমকালে যে শিক্ষাসংঘ (Artists' Guild) ছিল তার খবর বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তিতে বিদ্যমান। বাংলার শিলালিপি ও তাম্রশাসনে যে সব শিল্পীর নাম পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে শূলপাণি, সোমেশ্বর, তাতট, মঙ্খদাস ও তাঁর পুত্র বিমলদাস, বিষ্ণুভদ্র, মহীধর ও তাঁর পুত্র শশিদেব, কর্ণভদ্র ও তথাগতসার উল্লেখযোগ্য।

পোড়ামাটি বা টেরাকোটা শিল্পে সমকালের লোকায়ত মানসের পরিচয়ও সুস্পষ্ট। তার মধ্যে কিছু কালাতীত আবার কিছু কালধর্মী মৃৎশিল্প খ্রীষ্টীয় শতকের প্রারম্ভ থেকে খ্রীষ্টীয় অষ্টম-নবম শতক পর্যন্ত পাওয়া যায় ইতঃস্তত বাংলার বিভিন্ন স্থানে, বিশেষতঃ পাহাড়পুর, ময়নামতী ও জগজ্জীবনপুরে। সাধারণ মানুষের জীবনচর্যার নানা বৈচিত্র্যময় রূপায়ণেরই পূর্ণ প্রতিফলন পাল ও পরবর্তী সেন যুগে — যে যুগ বাংলার ইতিহাস ও সমাজজীবনে — এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অতুলনীয় যুগ।[২৯]

## ● পাদটীকা

১. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃঃ-৪০
২. প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৫৬
৩. তদেব, পৃঃ-৬০
৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ-৬১
৫. তদেব, পৃঃ-৬৭-৬৮
৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ-৭৩
৭. Gaekward Oriental Series, P - 4-6
৮. Monthly Bulletin of the Asiatic Society, Vol VI, No. 10, November, 1971, PP- 4-5
৯. অশোক চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রী — মহেন্দ্রপাল / পাল অভিলেখ সংগ্রহ, পৃঃ-১৭
১০. দীনেশচন্দ্র সরকার — ভূমিকা, গৌড়রাজমালা, পৃঃ- ০.০৭
১০ক. Prodyot Ghosh — The exact location of Ramavati, Jagaddal Mahavihara and Nadiah - Paper read in a Seminar organised by the N.B U., 1977
১১ রাধাগোবিন্দ বসাক — রামচরিত, ১৯৫৩। অতরণিকা, পৃঃ-২.২
১২. নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত — বাংলা বিশ্বকোষ — একাদশভাগ, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৮৮, পৃঃ-৩১৭
১৩. Archaeological Survey Reports – Cunningham, Vol. XV, P-155
১৪. Bendall's Catalogue of Buddhist Sanskrit MSS of Cambridge, P-iii
১৫. Epigraphia Indica, Vol XXXV, PP-235ff, Journal of the Bihar Research Society, Vol. XLI, PP-Iff
১৫খ. R. C Majumder, Op cit, p- 161- 162
১৬. Abdul Momin Chowdhury – Dynastic History of Bengal, P-277-78 এবং বাংলা বিশ্বকোষ, একাদশ ভাগ. পুনর্মুদ্রণ, পৃঃ- ৩১৭-৩১৮
১৭. S K. Maity and R.R Mukherjee – Corpus of Bengal Inscriptions, P-95
১৮. রমেশচন্দ্র মজুমদার — বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), পৃঃ- ১৭৭-৭৮
১৯ তদেব, পৃঃ- ১৮৮
২০. তদেব, পৃঃ- ১৮৬
২১. History of Ancient Bengal, P-525, বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), পৃঃ- ২১১
২২. M A A Qader – A Guide to Paharpur, P-7
২৩. ibid - P-13
২৪. কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় — বাংলার ভাস্কর্য, পৃঃ- ১৫৭
২৫. নীহাররঞ্জন রায় — বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃঃ- ৭৬১
২৬. সরসী সরস্বতী — পালযুগের চিত্রকলা, পৃ- ১১ - ২৩, Sanskrit Buddhist Literature of Bengal – Rajendralal Mitra.
২৭ পালযুগের চিত্রকলা — প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৯৬
২৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৯৯
২৯ বাংলার ভাস্কর্য — প্রাগুক্ত, পৃঃ- ১৫৯

# সেনবংশ

পালযুগের পর বাংলায় সেনযুগের সূত্রপাত হয়। সেনরা দাক্ষিণাত্যের কর্নাট দেশের অধিবাসী ছিলেন অর্থাৎ বর্তমান মহীশূর এবং অন্ধ্রপ্রদেশে কানাড়ী ভাষা অধ্যুষিত অঞ্চলে। তবে তাঁদের বাংলায় বসতি স্থাপনের সময় আজও অনাবিষ্কৃত। বল্লালসেনের নৈহাটি তাম্রশাসনে সামন্তসেনের পূর্ব-পুরুষগণ রাঢ়দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন বলে জানা যায়। বল্লালসেনের সময়ে দেওপাড়া প্রশস্তিতে জানা যায় যে চন্দ্রবংশীয় বীরসেন (দাক্ষিণাত্য ক্ষোণিন্দ্র) থেকে সামন্তসেনের বংশধরেরা রাজত্ব করেন।[১] ষোড়শ শতকের প্রথমে লিখিত আনন্দভট্টের বল্লাল চরিতে লিখিত আছে যে সামন্তসেন পুরাণের মহাবীর কর্ণের প্র-পৌত্র বীরসেনের বংশজাত।[২] তিনি বিন্ধ্য থেকে সেতুবন্ধ পর্যন্ত রাজত্বের অধিকারী ছিলেন। সেন বংশ-লতিকা বল্লাল চরিত ব্যাস পুরাণের বিশিষ্ট অংশে বিধৃত। তাছাড়া বীরসেনের এই পৌরাণিক বংশের কথা লক্ষ্মণসেনের মাধাইনগর এবং ভাওয়াল তাম্রশাসনেও উল্লিখিত বলে তা খ্যাতিমান।[৩] কোথাও তাঁদের কর্ণাট-ক্ষত্রিয়, কোথাও বা ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় বলা হয়েছে। আসলে ব্রাহ্মণ বংশের লোক ক্ষত্রিয় পেশা গ্রহণ করলে তাঁদের এমন পরিচিতি দেখা যায়। যেমন মেবারের শিশোদিয়া, প্রতিহার, সাতবাহন, কাদম্ব, চাহমন ইত্যাদি রাজ-বংশ।[৪] পালগণের উচ্চপদস্থ সেনাধ্যক্ষ হয়ে সেনেরা কাজ করেছেন এবং তাঁরা দুর্বল হওয়ায় অন্যায়ভাবে রাজ্য অধিগ্রহণ করেন বলে অনেকের বিশ্বাস।[৪ক] সামন্তসেনের পুত্র বিজয়সেন (আনুমানিক ১০৯৭-১১৬০ খ্রীষ্টাব্দ) গৌড়রাজ মদনপালকে পরাজিত করেন এবং বর্মরাজকে পরাজিত করে পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গও অধিকার করেন। এঁর রাজত্বকাল বাংলার ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। কারণ দীর্ঘদিন পর বাংলায় এক সুদৃঢ় রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রজাকুলের সুখ-শান্তি আসে। হেমন্তসেন বড় যোদ্ধা ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি গৌড়রাজ্যের কোন অংশ অধিকার করেছিলেন তার সঠিক খবর মেলে না।[৫] প্রসঙ্গক্রমে সেন বংশের একটি বংশতালিকা এখানে দেওয়া গেল ঃ—
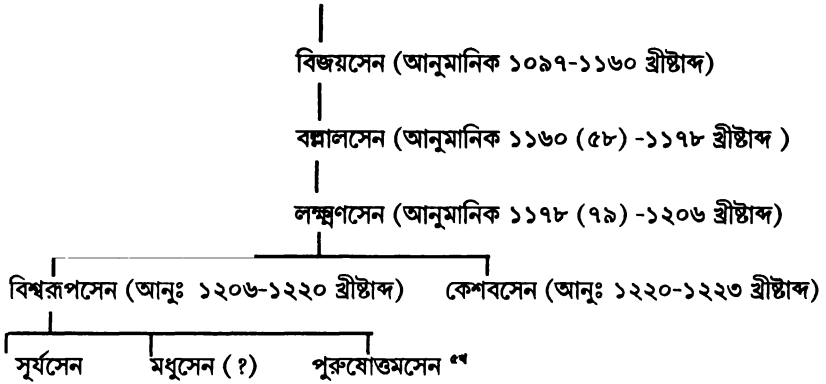
বিজয়সেনের পর তাঁর পুত্র বল্লালসেন আনুমানিক ১১৫৮ (৬০) খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। যশস্বী শাস্ত্রবিদ পন্ডিত বল্লালসেনের রচিত 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' গ্রন্থদ্বয় এবং বল্লাল চরিত গ্রন্থ-কাহিনী থেকেও তাঁর সম্পর্কে বহু তথ্য মেলে। বাংলার কৌলিন্য প্রথার উৎপত্তির সঙ্গে তাঁর নামটি আজও বাংলায় পরিচিত। শাস্ত্রচর্চা, যাগ-যজ্ঞ, সমাজসংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর গভীর সংযুক্তি সত্বেও যুদ্ধ নৈপুণ্যেও তিনি ন্যূন নন। সম্ভবতঃ বল্লালসেনই গৌড়েশ্বর গোবিন্দপালকে পরাজিত করেন।[৬] বল্লাল চরিতে তাঁর মগধজয়ের কথা লিপিবদ্ধ। মগধের কিয়দংশ এবং সম্ভবতঃ মিথিলা তাঁর রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। পরিণত বয়সে তিনি তাঁর পুত্র লক্ষ্মণসেনের হস্তে রাজ্যসমর্পণ করে ত্রিবেণীর নিকটে সস্ত্রীক বানপ্রস্থে গমন করেন।

লক্ষ্মণসেন ১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্বকালে সাতটি তাম্রশাসন যথা গোবিন্দপুর তাম্রশাসন, আনুলিয়া তাম্রশাসন, তর্পণদীঘি তাম্রশাসন, শক্তিপুর তাম্রশাসন, সুন্দরবন তাম্রশাসন, মাধাইনগর তাম্রশাসন, ভাওয়াল তাম্রশাসন এবং একটি চন্ডীমূর্তির পাদদেশে উৎকীর্ণ লিপি (ঢাকা)[৭], সভাকবিগণ রচিত কিছু স্তুতিবাচক শ্লোক, পুত্রদ্বয় বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেনের মদনপাড়া তাম্রশাসন, ঢাকার সন্নিকটে প্রাপ্ত কলকাতা সাহিত্য পরিষদ তাম্রশাসন এবং ইদিলপুর তাম্রশাসন ছাড়া মীনহাজ-উদ্দিন সিরাজ রচিত তবকাত-ই-নাসিরীতেও তাঁর রাজত্বের বহু খবর মেলে। লক্ষ্মণসেন ৫৪ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন বলে কেশবসেনের ইদিলপুর তাম্রশাসন, বিশ্বরূপসেনের মদনপাড়া তাম্রশাসন এবং সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনে উল্লিখিত।[৮] এগুলির মধ্যে লক্ষ্মণসেনের কৈশোরে উদ্ধত গৌড়েশ্বরের শ্রীহরণ এবং যৌবনে কলিঙ্গদেশ অভিযানের খবর মেলে। তাছাড়া কাশ্মীররাজ তাঁর কাছে পরাজিত হন এবং প্রাক্-জ্যোতিষের (কামরূপ-অসম) রাজা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন।

লক্ষ্মণসেনের নামানুসারে রাজধানী লক্ষ্মণাবতী (মুসলিম লেখকদের উচ্চারণে লখনৌতি) নামটি সৃষ্ট এবং তাঁর আমল থেকেই সেনারাজদের 'গৌড়েশ্বর' উপাধির প্রচলন। লক্ষ্মণসেন সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ গৌড়দেশ জয় করেছিলেন। তিনি উত্তরে গৌড়, পূর্বে কামরূপ ও দক্ষিণে কলিঙ্গ দেশ জয় করে তাঁর রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলেন। লক্ষ্মণসেনের দুই সভাকবি উমাপতি ধর ও শরণ-রচিত শ্লোকে তাঁর বিজয় কাহিনীর কথা স্বাভাবিকভাবেই অনুমেয়। তাতে কামরূপ, গৌড়, কলিঙ্গ কাশী, মগধ ইত্যাদি জয় এবং চেদি (কলচুরি) ও জনৈক ম্লেচ্ছরাজের পরাজয়ের কথা আছে।[৯]

অবশ্য কেবলমাত্র রণনৈপুণ্যেই তাঁর পরিচয় নয়, শাস্ত্রচর্চা ও ধর্মচর্চাতেও তিনি সমউৎসাহী ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তী পালবংশের ধর্মপাল ও দেবপালের পর আর কোন নরাধিপ সীমান্তপারে তাঁর ন্যায় এমন সাফল্যলাভের দাবীদার নন। তাই এমন রণনিপুণ মহাযোদ্ধার বখতিয়ারের নিকট পরাজয়ের কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাছাড়া ঘটনাবলীর প্রায় পাঁচ দশক পরে মীনহাজ-সিরাজ তাঁর 'তবকাত-ই-নাসিরী' গ্রন্থে যা লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তা কেবল জনশ্রুতির সহায়তায়। এ সম্পর্কে তবকাত-এর সম্পাদক ও অনুবাদক আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়ার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। তিনি বলেছেন — "মোহাম্মদ বখতিয়ার কর্তৃক মহারাজা লক্ষ্মণসেনের প্রাসাদ অধিকার ও তাঁর পালিয়ে যাওয়ার মধ্যে যথেষ্ট নাটকীয়তা থাকলেও এতে যে কিছু সত্য আছে তাতে সন্দেহ নেই। তবে মীনহাজ যত সহজে ও সংক্ষেপে এ ঘটনা করেছেন এত সংক্ষেপে ও সহজে যে তা ঘটে নি তা মীনহাজের বর্ণনা থেকেই ধরা পড়ে। মোহাম্মদ শিরান খলজীর বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি যা বলেছেন তাতে দেখা যায় যে মোহাম্মদ বখতিয়ারের সৈন্যরা লক্ষ্মণসেনের সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল। তা-ই যদি হয়, তবে সেখানে দুই পক্ষের মধ্যে একটি যুদ্ধ হয়েছিল বলে ধরা যেতে পারে।"[১০] এই প্রতিবন্ধকতায় যে ক্রোধ ও ক্ষোভ তা থেকেই 'নওদীহ' তিনি ধ্বংস করেছিলেন বলে মনে করাও সংগত। তাই ধ্বংসপ্রাপ্ত এ রাজধানী পুনর্বাসের জন্য যথেষ্ট সময়-সাপেক্ষ বলে গৌড়-লক্ষ্মণাবতীতে (লখনৌতি) রাজধানী স্থাপন করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে অনেক ঐতিহাসিক বখতিয়ারের নবদ্বীপ জয়ের কথা বলেছেন, কিন্তু রেভার্টির অনুবাদ নোদিয় বা নুদীয়হ ( Nudiah) হাবিবী কর্তৃক পাঠ 'নওদীহ'। পরবর্তী পর্বে এটি নবদ্বীপ বা নদীয়া বলে পরিচিত। কিন্তু বখতিয়ারের আগমন পথ দেখলে এটি উত্তরবঙ্গের গৌড়ের সন্নিকটে রাজশাহী জেলার নওদীহ বা নওদা বা নদে বলে প্রথম ধারণা বর্তমান লেখকেরই বক্তব্যে দেখা যায়।[১১] তা ছাড়া বখতিয়ারের নওদীহ আক্রমণের সন নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা মতও আছে। চার্লস স্টুয়ার্ট ১২০৩-১২০৪ খ্রীষ্টাব্দ বলে ধার্য করেছেন। এবং ১১৯২-৯৩, ১১৯৮-৯৯, ১২০২-০৩ ইত্যাদি সালও অনেকে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কুতবুদ্দীন আইবকের ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে কালীঞ্জর দুর্গ জয়ের পর বদায়ুনে আগমন ও বখতিয়ারের তাঁকে উপঢৌকন দেওয়ার পর অর্থাৎ ১২০৪ সালে 'নোদীয়াহ' জয়কেই আহ্‌মদ হাসান দানী, এবং পরে ডঃ সুখময় মুখোপাধ্যায় এবং ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সাব্যস্ত করেছেন।[১২]

তবে বখতিয়ারের নিকট পরাজিত হয়েও লক্ষ্মণসেন পূর্ববঙ্গে তাঁর অধিকার অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। বিতর্কিত মাধবসেনকে বাদ দিলে তাঁর পুত্রদ্বয় বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন ন্যূনপক্ষে ১২২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে রাজত্ব করেছিলেন তার প্রমাণ বিভিন্ন তাম্রশাসনে মেলে। প্রকৃতপক্ষে অসংখ্য নদ-নদী পরিবেষ্টিত দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা তুর্কী অশ্বারোহী সৈন্যদের নিকট সহজগম্য না হওয়ায় ত্রয়োদশ শতকের শেষ পর্যন্ত তা মুসলিম শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয় নি।

সেন রাজারা নৈষ্ঠিক হিন্দু ছিলেন এবং তাঁরা ছিলেন শৈব ও বৈষ্ণবধর্মের উপাসক। বিজয়সেন অর্ধনারীশ্বর পূজানিমিত্ত এক অপরূপ মন্দির নির্মাণ করেন বলে জানা যায়, অন্যদিকে লক্ষ্মণসেন বিষ্ণুরূপের নরসিংহ অবতারের পূজক ছিলেন। তাঁরা সকলেই শাস্ত্রানুশীলনের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করেছিলেন। বল্লালসেন শাস্ত্রবিৎ ছিলেন এবং গ্রন্থপঞ্চক — ব্রতসাগর, আচারসাগর, প্রতিষ্ঠাসাগর, দানসাগর এবং অদ্ভুতসাগর-এর রচয়িতা ছিলেন লক্ষ্মণসেন।

তবে এ পর্যন্ত শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয়ই পাওয়া যায়। দুটি গ্রন্থেই তাঁর বিপুল অধ্যয়ন ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় লভ্য।

হলায়ুধ এ যুগের এক খ্যাতনামা লেখক। যৌবনে তিনি লক্ষ্মণসেনের মহামাত্য ও প্রৌঢ় বয়সে ধর্মাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে ব্রাহ্মণসর্বস্ব, মীমাংসাসর্বস্ব, বৈষ্ণবসর্বস্ব, শৈবসর্বস্ব ও পণ্ডিতসর্বস্ব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ধোয়ী, উমাপতিধর, শরণ, গোবর্ধন আচার্য এবং জয়দেব লক্ষ্মণসেনের রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন। মহাকবি কালিদাসের অনুসরণে ধোয়ীর 'পবনদূত', গোবর্ধন আচার্যের 'আর্যা সপ্তশতী' কাব্যগুণসম্পন্ন ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা। লক্ষ্মণসেনের সভাসদ ও সুহৃদ বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃত'ও এ যুগের উল্লেখযোগ্য সংকলন। এ সংকলনে ৪৮৫ জন কবির ২৩৭০টি মনোজ্ঞ কবিতা স্থান পেয়েছে। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে এখানে বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন ও কেশবসেনের কবিতাও স্থান পেয়েছে। দেওপাড়া লিপির রচনাকার উমাপতিধরের কাব্যরচনার মুন্সীয়ানা বিজয়সেনের প্রশস্তিতে সুমুদ্রিত।[১৩] 'গীতগোবিন্দ'-এর অমর স্রষ্টা জয়দেব গোস্বামীর জন্মস্থান সম্পর্কে যদিও উড়িষ্যা ও মিথিলার দাবী আছে, তবুও বীরভূমের কেন্দুবিল্ব বা কেঁদুলির মেলা বঙ্গবাসীর পক্ষে সুদৃঢ় দাবী।

ভাষাতত্ত্বের উপরেও এ যুগের রচনা স্মরণীয়। এ পর্বের রচনাকারের মধ্যে আর্তিহার-পুত্র বন্দ্যঘটী ও সর্বানন্দ সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য। ১১৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত সর্বানন্দের 'অমরকোষ'-এর 'টীকা-সর্বস্ব' শুধু বাংলাদেশেই নয়, ভারতের সর্বত্র বিশেষ প্রশংসাধন্য। এই গ্রন্থে শুধুমাত্র তাঁর পাণ্ডিত্যই প্রকাশ পায় নি, অসংখ্য দেশী শব্দকেও তিনি স্থান দিয়েছেন, যার অধিকাংশই বর্তমান বাংলা শব্দভাণ্ডারে স্থানলাভ করেছে। তাছাড়া ভাষাবৃত্তি, ত্রিকাণ্ডশেষ, দ্বিরূপকোষ ইত্যাদির বৈয়াকরণ ও কোষগ্রন্থ-রচয়িতা পুরুষোত্তমকেও অনেক বাঙালী বলে মনে করেন।[১৪]

দেশের শাসনব্যবস্থা সেন রাজাদের সময় পাল রাজাদের ন্যায়ই সুদৃঢ় ছিল। তবে প্রশাসন অধিকতর সংহত ছিল। রাজ্য ক্রমান্বয়ে ভুক্তি, বিষয়, মণ্ডল, বীথি, চতুরক ও পটিতে বিভক্ত ছিল।

বাংলা সাহিত্যের আজও পর্যন্ত আদি উৎস সিদ্ধাচার্যদের লিখিত 'চর্যাপদ' সম্ভবত দশম-একাদশ শতাব্দীরই রচনা। বাংলা লিপিও দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে প্রায় আধুনিক বাংলা অক্ষরে পরিণত হয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, সেনযুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মের জাগরণের প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। পূর্ববর্তী পালযুগে সহজিয়া ও তন্ত্রধর্মের প্রভাবে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মে যে কদাচার ও কু-প্রথা অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল, এ পর্বে তা বিদূরিত করে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে প্রাচীন মহিমায় বর্ণোজ্জ্বল করার প্রচেষ্টা ছিল। সে জন্যই বৈদিক শাস্ত্রের রূপরেখার উপরে ভিত্তি করে বিশুদ্ধ আচার প্রবর্তনের যে চেষ্টা তা প্রগতিশীল চরিত্র অপেক্ষা রক্ষণশীলতারই পরিচায়ক। তাছাড়া পালযুগের সর্বধর্মের প্রতি যে শ্রদ্ধা তথা সমন্বয় পন্থাও এপর্বে পরিত্যক্ত হয়। জাতি বিভাগ এ পর্বের স্মরণীয় কাজ। হিন্দু সমাজকে কঠোর শৃঙ্খলায় বন্ধন করার ঐকান্তিকতা তাতে দেখা যায়। তবে এখানে দক্ষিণ ভারতের orthodox মানসিকতা ক্রিয়াশীল — যা পরিণামে সমাজ সংহতি বিনষ্ট করে।

সেনযুগে সমাজে নৈতিক শিথিলতাও বিশেষভাবে দেখা যায়। যেমন 'আর্যাসপ্তশতী'তে

রিরংসার চিত্রও দুর্লভ নয়, তেমনই বিখ্যাত 'গীতগোবিন্দ'-এ কাব্যোৎকর্ষ দেখা গেলেও অনেকস্থানেই আদিরসাত্মক চিত্র Puritan মনকে সংকুচিত করে। তা ছাড়া নানা উৎসব যথা হোলক (বসন্তোৎসব) চৈত্রে কাম-মহোৎসব ও দুর্গাপূজায় দশমী তিথিতে শাবরোৎসব প্রভৃতিতে রুচির শৈথিল্য দেখা যায়।[১৫]

সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, সেনবংশের রাজত্বকাল সুদীর্ঘকাল স্থায়ী না হলেও বাংলার ইতিহাসে এটি একটি গৌরবময় যুগ হিসেবে কীর্তিত। কারণ পালবংশের পতনের পর বাংলা যে রাজনৈতিক অনৈক্য ও অরাজকতার সম্মুখীন হয়, সেনবংশের প্রথম তিনজন রাজার দূরদর্শিতা ও কর্মনৈপুণ্যের ফলে দেশ সে সংকট থেকে পরিত্রাণ পায় ও বাংলা এক ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং হিন্দুধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও উচ্চবর্ণ ও গোষ্ঠীর বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদের আধিপত্যে সমাজের সংহতি ধীরে ধীরে বিনষ্ট হয়, তবুও সেনবংশের সময়েই দ্বাদশ শতাব্দীর শেষপাদ বাংলাদেশে সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ যুগ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। কারণ একদিকে ধর্মশাস্ত্র, অন্যদিকে উচ্চাঙ্গের কাব্যসৃষ্টিও[১৬] এ যুগের বিশেষত্ব। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে অনিরুদ্ধ ভট্ট, হলায়ুধ, বল্লালসেন, সর্বানন্দ, জয়দেব, উমাপতিধর, ধোয়ী, শরণ ও গোবর্ধন — এতগুলি পণ্ডিত ও কবির সৃষ্টি যে কোন যুগের পক্ষেই শ্লাঘা ও গৌরবের কথা।[১৭]

● **পাদটীকা**

১. Dr. Ramaranjan Mukherjee & Dr. S.K. Maity – Corpus of Bengal Inscription – Deopara Inscription of Vijayasena, Verse 4 - 5, P-250 - 251.

২. H.P. Sastri (Ed. & trans.) – Vallalacharita, P- 66-61

৩. Inscriptions of Bengal - III, P-110 & 113, Epigraphia Indica Vol. XXVI, P-5 & 10

৪. V.A. Smith – The Oxford History of India, 3rd Edition, P-191-192

৪ক. Corpus of Bengal Inscription, P-33

৫. রমাপ্রসাদ চন্দ্র — গৌড়রাজমালা, নবভারত সং ১৯৭৫, পৃঃ-৭৩

৫ক. Op. Cit – Dynastic History of Bengal, P-279

৬. রমেশচন্দ্র মজুমদার — বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড, প্রাচীন যুগ), সপ্তম সং ১৯৮১, পৃঃ- ১৪১

৭. A.M. Chowdhury – Dynastic History of Bengal, P-238

৮. N. G. Majumdar – Inscriptions of Bengal - III, P-122-123 & 135, 140-148, 177-180

৯. বাংলাদেশের ইতিহাস — প্রাগুক্ত, পৃঃ- ১৪৪-১৪৫

১০. মীনহাজ-ই-সিরাজ — তবকাত-ই-নাসিরী, অনুবাদ ও সম্পাদনা - আবুল কালাম যাকারিয়া, পৃঃ- ২৭৭

১১. Dr. Prodyot Ghosh – The Exact Location of Ramavati and Jagaddal mahavihara and Nadiah, paper read under the auspices of North Bengal University, 1977, আবুল কালাম যাকারিয়া, প্রাগুক্ত ১৯৮৩

১২. Ahmad Hasan Dani – Indian Historical Quarterly XXX, P- 133 - 146, ড. সুখময় মুখোপাধ্যায় — বাংলাদেশের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড, মধ্যযুগ), পৃঃ-১-২

১৩. R. C. Majumdar – History of Ancient Bengal, 1971, P-228

১৪. বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড) — প্রাগুক্ত, পৃঃ- ১৯২
১৫. নীহাররঞ্জন রায় — বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) — পৃঃ- ৫২৬
১৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ- ৫২৭
১৭. বাংলাদেশের ইতিহাস — প্রাগুক্ত, পৃঃ- ১৯৫

# বাংলার ইতিহাসের মধ্যযুগ

অতর্কিত আক্রমণে ইখতিয়ার-উদ্-দীন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী নওদীহ জয় করে লখনৌতিতে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। প্রায় দু বছর তিনি অন্য কোন অভিযানে না গিয়ে তাঁর অধিকৃত অঞ্চলে শাসন মনোনিবেশ করেন। প্রত্যেক অঞ্চলে তিনি খুৎবা ও মুদ্রা প্রচলন করেন এবং অসংখ্য মসজিদ, মাদ্রাসা যেমন প্রতিষ্ঠা করেন, তেমনই লুণ্ঠিত দ্রব্য ও সম্পদ থেকে বহু দ্রব্য সুলতান কুত্‌ব-উদ-দীনের খেদমতে পাঠান। তিনি রাজ্যের অসংখ্য হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেন এবং অসংখ্য হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করেন।[১] বখতিয়ার তাঁর রাজ্যকে কতিপয় জায়গীরে বিভক্ত করে আলি মর্দান, মুহাম্মদ শিরাণ, হসামুদ্দীন ইউয়জ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। প্রায় দু বছর পর বখতিয়ারের তিব্বত অভিযান ব্যর্থ হলে সামান্য কতিপয় অশ্বারোহী সহ তিনি অতিকষ্টে দেবকোটে পৌঁছান এবং অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে অল্পদিনের মধ্যেই পরলোক গমন করেন (১২০৫-০৬খ্রীঃ)। অবশ্য কেউ কেউ বলেন যে নারাণ-কোইর শাসনকর্তা আলি মর্দান কর্তৃক তিনি নিহত হন। কিন্তু বখতিয়ারের অনুচর মুহম্মদ শিরাণ মালিক আলি মর্দানকে পরাস্ত ও বন্দী করে ইজজুদ্দীন মুহম্মদ শিরান খিলজী উপাধি ধারণ করে বখতিয়ারের উত্তরাধিকারী হিসেবে (আনু ১২০৬-০৭খ্রীঃ) ঘোষণা করেন। শিরাণ ছিলেন সুচতুর, দয়ালু ও বিচক্ষণ। এ দিকে কারাগার থেকে আলি মর্দান পলায়ন করে দিল্লীর সুলতান কুত্‌ব-উদ-দীন আইবকের শরণাপন্ন হন। কুত্‌ব-উদ-দীন শিরাণের কার্যকলাপ সম্পর্কে ক্ষুব্ধ হয়ে অযোধ্যার শাসনকর্তা কায়েমাজ রুমীকে লখনৌতিতে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। বখতিয়ারের অপর অনুচর গাঙ্গুরীর জায়গীরদার মালিক হুসামুদ্দীন ইউয়জ হোসেন খিলজী কায়েমাজকে স্বাগত জানিয়ে দেবকোটে নিয়ে যান। এই পরিস্থিতিতে ভীত শিরাণ যুদ্ধ না করে দেবকোট থেকে পলায়ন করলে কায়েমাজ ইউয়জকে দেবকোটের কর্তৃত্ব দান করে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেন। ইতিমধ্যে শিরাণ দলের অন্যান্য আমীরদের সহায়তায় দেবকোট আক্রমণের উদ্যোগ করলে কায়েমাজ পুনরায় অগ্রসর হয়ে শিরাণকে পরাজিত করেন। তবে পলায়ন-পর্বে নিজেদের মধ্যে বিবাদের ফলে শিরাণ পরিণামে নিহত হন।

এই পর্বে ১২০৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইউয়জ খিলজীর রাজত্ব-কাল। তিনি তাঁর রাজধানী ঐতিহাসিক নগরী লখনৌতিতে পরিবর্তন করেন। কুত্‌ব-উদ-দীন তাঁর প্রিয়পাত্র আলি মর্দানকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিজে পদত্যাগ করেন। কিন্তু আলি মর্দান কুত্‌ব-উদ-দীনের মৃত্যুর

পরেই স্বাধীনতা ঘোষণা করে সুলতান আলা-উদ-দীন আলী মর্দান খলজী নাম গ্রহণ করেন। নির্ভীক ও সুনিপুণ যোদ্ধা হলেও আলি মর্দান ছিলেন নৃশংস, অত্যাচারী ও অদূরদর্শী। স্বাভাবিকভাবেই বিরক্ত ও অতিষ্ঠ খলজী আমীররা ষড়যন্ত্র করে তাঁকে হত্যা করেন। এরপর পুনরায় গিয়াস-উদ-দীন ইউয়জ খলজী (১২১৩-২৭খ্রীঃ) সিংহাসনে আরোহণ করেন। মোট চোদ্দ বছর তিনি রাজত্ব করেছিলেন। লখনৌতির খলজী মালিকদের মধ্যে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ।[২] বাঙালী নাবিকদের দ্বারা তিনি নদীমাতৃক পূর্ব বাংলা জয়ের জন্য নৌবহর গঠন করেন। ইউয়জ ছিলেন সুদর্শন, দয়ালু ও ধর্মপ্রাণ। তিনি দেবকোট থেকে বীরভূমের রাজনগর (লাখনোর বা বর্তমানে নগৌর) পর্যন্ত যে একটি সুদীর্ঘ ও সুউচ্চ রাজপথ নির্মাণ করেছিলেন, তার কিছু কিছু অংশ আজও বর্তমান। মুসলমান শাসকদের মধ্যে ইউয়জই প্রথম যাঁর বহুল মুদ্রা পাওয়া যায়। তাঁর কোন কোন মুদ্রায় আব্বাসী খলিফার নাম অঙ্কিত হওয়ায় তিনি খলিফার নিকট থেকে 'সনদ' (investiture) লাভ করেছিলেন বলে অনেকের অনুমান।[৩] বন্যার কবল থেকে কৃষকদের রক্ষার নিমিত্ত রাজপথের মধ্যে তাঁর নির্মিত বাঁধগুলি বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল এবং তার সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও সুবিধা হয়। ইউয়জ স্বাধীন বলে নিজেকে ঘোষণা করায় ক্রুদ্ধ ইলতুতমিস তাঁর পুত্র যুবরাজ নাসির-উদ-দীনকে লখনৌতি আক্রমণ করার নির্দেশ দেন।[৪] এ সময়ে পূর্ব বাংলা আক্রমণকালে ব্যস্ত থাকায় ইউয়জ নাসির-উদ-দীনের আক্রমণের সংবাদ পেয়ে ক্ষিপ্রগতিতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই লখনৌতি নাসির-উদ-দীনের অধিকারে আসে। তা ছাড়া যথেষ্ট সৈন্য সংগ্রহ না করে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ায় তিনি শুধু বন্দীই হন নি, তাঁর আমীরগণ সহ সপরিবারে তাঁকে হত্যা করা হয়।[৫] গিয়াসুদ্দীন ইউয়জের পর লখনৌতি পূর্ণরূপে দিল্লীর সুলতানী শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইলতুতমিস বহু গুণান্বিত পুত্র যুবরাজ নাসির-উদ-দীনকে লখনৌতির শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করেন বটে, কিন্তু মাত্র দেড় বছরের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয় (হিজরী ৬২৬, ১২২৮ খ্রীঃ)।[৬] অবশ্য এই মৃত্যু স্বাভাবিক কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে। আব্বাসী খলিফার যে সনদ ও খেলাত ইলতুতমিস লাভ করেছিলেন, তার মধ্যে পোষাক (Robe of honour) ও রাজছত্র তিনি নাসির-উদ-দীনকে প্রেরণ করেন। এই পুত্রের প্রতি সুলতানের স্নেহাতিরেকের জন্য তিনি পুত্রের মৃতদেহ দিল্লীতে নিয়ে গিয়ে এক মনোরম সমাধিভবন নির্মাণ করেন। তা ছাড়া জ্যেষ্ঠপুত্রের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি কনিষ্ঠ পুত্রের নামও রাখেন নাসির-উদ-দীন মাহমুদ,[৭] যিনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করে বাইশ বছর রাজত্ব করেন।

নাসির-উদ-দীনের মৃত্যুর পর হোসাম-উদ-দীন ই-ইউয়জ খলজীর পুত্র আমীর ইখতিয়ার-উদ-দীন দৌলতশাহ-ই-বলকা বিদ্রোহী হয়ে লখনৌতি অধিকার করেন বটে, কিন্তু ইলতুতমিস বলকাকে পরাজিত করে আলা-উদ-দীন জানীকে লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। অথচ অল্পদিন শাসনের পর জানী পদচ্যুত হন এবং সৈফুদ্দীন আইবক য়াগানতৎকে সুলতান শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করেন। দুই / তিন বছর পরে প্রায় একই সময়ে ইলতুতমিস ও সৈফুদ্দীনের মৃত্যু হলে জনৈক তুর্কী আওর খান লখনৌতি ও লাখনোর অধিকার করেন বটে, কিন্তু বিহারের শাসনকর্তা তুগরল তুগান খাঁর হাতে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। ১২৩৬ - ১২৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় নয় বছর তুঘরল রাঢ় ও বরেন্দ্র ভূমিতে রাজত্ব করেন। দিল্লীর সুলতানা রাজিয়ার নিকট বহুমূল্য উপহার পাঠিয়ে তাঁর ক্ষমতা আইনানুগ করান। রাজিয়া তাঁকে লখনৌতির গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত করা ব্যতিরেকে তাঁকে ছত্র ও ঝান্ডা উপহার দেন।[৮] মীনহাজ তাঁর বদান্যতা, মনুষ্যত্ব, দয়া, বীরত্ব

ও মানুষের মন জয় করার শক্তির প্রশংসা করেছেন।[৯] তবে বেতনভুক ও স্তাবক মীনহাজের এমন স্তুতি সত্য কিনা তা নির্দ্ধারণ করা কঠিন। তুঘরল সাম্রাজ্যবাদী হওয়ায় উত্তর ভারতের কারা সীমান্তে পৌঁছান এবং সেখান থেকে চুণার, বারাণসী এবং এলাহাবাদে পৌঁছে দিল্লীর দুর্বল সুলতান আলা-উদ-দীন মাসুদ শাহকে বহুমূল্য উপহার প্রেরণ করেন। সুলতানও মুগ্ধ হয়ে দূত মারফৎ খিলাত দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেন। এ সময়েই মীনহাজের সঙ্গে তাঁর পরিচয় এবং তাঁকে নিয়ে লখনৌতিতে প্রত্যাবর্তন। তুঘরলের শাসনকালে জাজনগরের (উড়িষ্যা) গঙ্গবংশীয় রাজা প্রথম নরসিংহদেব লখনৌতি আক্রমণ করেন। তুঘরল পাল্টা আক্রমণ করে জাজনগরের সীমান্তে অবস্থিত কটাসিন দুর্গ অধিকার করেন বটে, কিন্তু জাজনগরের সৈন্যবাহিনীর আকস্মিকআক্রমণে পরাজিত হয়ে লখনৌতি প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হন।[১০] জাজনগর-রাজ পুনরায় লখনৌতি অবরোধ করলে দিল্লীর সুলতান আলা-উদ-দীন মাসুদ শাহের নির্দেশে অযোধ্যার শাসনকর্তা কমরুদ্দীন তমুর খান-ই-কিরান তাঁর সাহায্যার্থে এলে প্রথম নরসিংহদেব স্বদেশে ফিরে যান। এ দিকে লখনৌতির অধিকার নিয়ে তুঘরল ও তমুরের মধ্যে অনিবার্য সংঘর্ষ ও যুদ্ধ হয় এবং তুঘরল পরাজিত হন। তবে ঐতিহাসিক মীনহাজ উভয়ের মধ্যে মধ্যস্থতা করে বিবাদ মীমাংসা করেন। সন্ধির শর্ত অনুসারে তুঘরল তাঁর অনুচরবর্গ, অর্থভাণ্ডার, হাতি-ঘোড়াসহ দিল্লীতে যাত্রা করেন এবং তমুর খান লখনৌতির অধিকার পান। দিল্লীর সুলতান তুঘরলকে অযোধ্যার শাসন ভার প্রদান করেন। তমুর খান দিল্লীর সুলতানের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে দু বছর লখনৌতি শাসন করেন এবং অদৃষ্টের অমোঘ নির্দেশে তুঘরল ও তমুর একই রাত্রিতে (৯ই মার্চ, ১২৪৭ খ্রীষ্টাব্দে) পরলোক গমন করেন। এর পর আলা-উদ-দীন জানীর পুত্র জালাল-উদ-দীন মসুদ জানীর প্রায় চার বছর বিহার ও লখনৌতি শাসন। পরবর্তী শাসনকর্তা ইখতিয়ার-উদ-দীন যুজবক তুঘরল খান প্রথমে অযোধ্যার ও পরে লখনৌতির। দুবার জাজনগরের সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হলেও তৃতীয়বারে যুজবক পরাজিত হন।[১০ক] তিনি উমর্দন রাজ্যও দখল করেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও অহংকারী যুজবক এর পর দিল্লীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে সুলতান মুগীস-উদ-দীন নাম ধারণ করে নিজের নামে খোতবা পাঠ ও মুদ্রারও প্রচলন করেন, কিন্তু অযোধ্যা অধিকারের পর দিল্লীর সম্রাটের আগমন-সংবাদে লখনৌতিতে পলায়ন করেন। তারপর কামরূপ রাজ্যের রাজধানী দখল করে প্রচুর ধনরত্ন অধিকার করলেও কামরূপরাজের কৌশলে শেষ পর্যন্ত পরাজিত ও বন্দী হন এবং বন্দী অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। লখনৌতি দিল্লীর সম্রাটের অধীনে আসে পুনরায়। পরবর্তী শাসনকর্তা জালাল-উদ-দীন মাসুদ জানী (দু বার), ইজ্জ-উদ-দীন বলবন-ই ইউজবকী, তাজ-উদ-দীন আরস্‌লান খান, তাতার খান এবং শের খান।

এর পর বলবনী বংশের শাসন। আনুমানিক ১২৭১ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বলবন লখনৌতির শাসনকর্তা ও সহকারী শাসনকর্তারূপে যথাক্রমে আয়তগীন বা আমিন খান ও তুঘরল খানকে নিয়োগ করেন। আমিন খান শাসনকর্তা হলেও বকলমে মুগীস-উদ-দীন তুঘরলই সর্বেসর্বা ছিলেন। তাঁর চাতুর্য, বীরত্ব, দানশীলতা, সুশাসন, রাজনীতিক অভিজ্ঞতা ও ঔদার্যের জন্য তিনি প্রজাদের প্রিয় ছিলেন। সোনারগাঁও-এ তাঁর এক দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল 'কিলা-ই-তুঘরল'। বলবনের বশ্যতা অস্বীকার করে রাজছত্র গ্রহণ করে, খোতবা পাঠ ও মুদ্রার প্রচলনে বলবন এতদূর চিন্তান্বিত হন যে দিবারাত্র তুঘরল-সংবাদের জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকতেন।[১১] তুঘরলের একমাত্র ত্রুটি এই যে তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা। ক্রুদ্ধ বলবন এরপর তাঁর স্ত্রী-পুত্র পরিজন সকলকে

বন্দী করেন এবং লখনৌতিতে এক বিভীষিকার রাজত্ব সৃষ্টি করেন। ইতোমধ্যে তুঘরলের পশ্চাদধাবনকারী যে সৈন্যদ্বয়ের মধ্যে প্রথম আঘাতকারীকে 'তুঘরলকুশ' উপাধি দেন এবং তুঘরলের শিরচ্ছেদকারী মালিক মুকাদ্দরকে যথোচিত পুরস্কার দেন। লখনৌতিতে তুঘরলের সৈন্য, সঙ্গী, পারিষদ, পাইক, বরকন্দাজ এবং তাঁর পরিবার পরিজনকে ক্রোশাধিক দীর্ঘ এক বাজারের দোকানসমূহের সম্মুখে দু সারিতে দাঁড় করিয়ে হত্যা করেন এবং মৃতদেহগুলিতে ঝোলাতে আদেশ দেন। এমন কি সম্মানীয় দরবেশদেরও তিনি হত্যা করেন।[১২] বলবনের এই কর্মকাণ্ডে তাঁর সমর্থকেরাও অসন্তুষ্ট হন।

কিছুদিন পরে বলবন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র পরম স্নেহের বুঘরা খানকে (প্রকৃত নাম নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহ) লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। বুঘরা অত্যন্ত বিলাসী হওয়ায় অধস্তন কর্মচারীরাই রাজ্য শাসন করতেন। পিতার মৃত্যুর পর লখনৌতিতে তিনি স্বাধীন হন এবং স্বীয় নামে মুদ্রা প্রচার ও খুত্‌বা পাঠ সুরু করেন। কিন্তু বলবনের পর তাঁর নির্দেশ উপেক্ষা করে উজীর ও কোতোয়াল বুঘরা খানের পুত্র মুইয-উদ-দীন কায়কোবাদকে সিংহাসনে বসান। কায়কোবাদ পিতা অপেক্ষাও উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন। তিনি যমুনা তীরে এক অতুলনীয় প্রাসাদ নির্মাণ করে সঙ্গী সাথী সহ আমোদ-প্রমোদ ও তদ-অনুসঙ্গ বিলাস-ব্যসনে মত্ত ছিলেন। তারিখ-ই-ফিরুজশাহীতে এই বিলাস-ব্যসনের চিত্র আছে,[১২ক] আছে তবকাত-ই-আকবরীতে।[১২খ] বারানী এ সময়ের আমোদ-প্রমোদ ও বিলাসিতার একটি চিত্র তাঁর রচনা 'কুব্বাতুৎ-তারিখে' লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর 'দাদ বেগ' মালিক নিযাম-উদ-দীন প্রকৃত অর্থেই ছিলেন 'নায়েবে সুলতান' এবং তাঁরই উচ্চাকাঙ্ক্ষায় ও প্ররোচনায় কায়কোবাদ পিতা সুলতান নাসির-উদ-দীনকে দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর অধীনতা স্বীকার ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য নির্দেশ দিলে শেষ পর্যন্ত পুত্রের চৈতন্যোদয় হওয়ায় পিতা-পুত্রের এক মর্মস্পর্শী মিলন চিত্র দেখা যায়।[১৩] বিখ্যাত কবি আমীর খসরু 'কিরান-উস্‌-সদাইন' কাব্যে তার মর্মদ্রাবী বর্ণনা দিয়েছেন।[১৪] কায়কোবাদের উজীর নিজাম-উদ-দীনের ষড়যন্ত্রেই বুঘরা খানকে কিছু অপমান সহ্য করতে হয় বলে সামনে উজীরদের প্রশংসা করে বিদায় নেওয়ার সময় পুত্রের কানে কানে দুই উজীর নিজাম-উদ-দীন ও কিয়াম-উদ-দীনকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। পিতা-পুত্রের মিলনের পর দিল্লীর দ্বারা লখনৌতির সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৫] নাসির-উদ-দীন মাহমুদ বুঘরা অসমসাহসী যোদ্ধা না হলেও কবি-স্বভাবের ছিলেন এবং ভাব উপদেশ দানে দক্ষ ছিলেন। যদিও তিনি নিজে সে সব উপদেশ মানতেন না। নিজাম-উদ-দীনের মৃত্যুর পর রাজ্যের বিশৃঙ্খলা রোধের জন্য কায়কোবাদ জালাল-উদ-দীন ফিরোজ খলজীকে 'আরিজ-ই-মালিক' নিযুক্ত করেন। কিন্তু দিল্লীর ইলবরী তুর্কী ও খলজীদের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব সুরু হয়। ফলে কিলুখড়িতে অসুস্থ মুমূর্ষু মুইয-উদ-দীনকে হত্যা করান জালাল।[১৫ক] দিল্লীর সংবাদে লখনৌতিতে মর্মাহত বুখরা খান তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র কাইকাউসকে সিংহাসনে বসিয়ে চলে আসেন। কাইকাউস সুলতান রুকন্‌-উদ-দীন কাইকাউস উপাধি ধারণ করেন। কাইকাউসের আমলের উৎকীর্ণ মোট পাঁচটি শিলালিপি ও বহু মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। তিনি ১২৯১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২৯৯-১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এ সময় তাঁর বয়স আনুমানিক ২৯/৩০ ছিল।[১৬] সম্ভবতঃ তিনি অপুত্রক থাকায় বা তাঁকে অপসারিত করে বা হত্যা করে শামস-উদ-দীন ফিরুজ শাহ সিংহাসনে বসেন। কাইকাউসের এই পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে লখনৌতির বলবনী বংশ শেষ হয়।[১৭]

পরবর্তী পর্বে তুঘলক বংশের শামস-উদ-দীন ফিরুজ শাহ লখনৌতির সুলতান হন। তিনি দীর্ঘ একুশ বছর (১৩০৯-১৩২২ খ্রীঃ) অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে শাসন করেন। তাঁর সময়েই সাতগাঁও, সোনারগাঁও, চট্টগ্রাম, সিলেট পর্যন্ত তাঁর রাজত্বের সীমা প্রসারিত হয়। ফিরুজ শাহ বেশী বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করা কালে তাঁর ছয়টি বয়স্ক পুত্রও ছিলেন।[১৮] তাঁরা হলেন — শিহাব-উদ-দীন বুঘরা শাহ, জলাল-উদ-দীন মাহমুদ শাহ, গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুর শাহ, নাসির-উদ-দীন ইব্রাহিম শাহ, হাতেম খান ও কতলু খান। এঁদের মধ্যে শিলালিপি থেকে বিহারের শাসনকর্তা হাতেম খান এবং প্রথমোক্ত চারপুত্র পিতার জীবদ্দশায় বিভিন্ন টাঁকশাল থেকে নিজেদের নামে মুদ্রা প্রকাশ করেছিলেন।[১৯] কেউ কেউ এ প্রসঙ্গে পুত্রদের বিদ্রোহের কথা বলেছেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুলতান তাঁদের রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে শাসনকর্তা নিযুক্ত করে তাঁদের স্ব স্ব নামে মুদ্রা প্রকাশে অনুমতি দিয়েছিলেন।[২০]

শামস-উদ-দীন ফিরুজ শাহের পর তাঁর পুত্র শিহাব-উদ-দীন বুঘরা শাহ সিংহাসনে বসলে তাঁর ভ্রাতা গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুর শাহ তাঁকে পরাজিত ও বিতাড়িত করে লখনৌতি অধিকার করেন। তিনি শিহাব-উদ-দীন ও নাসির-উদ-দীন ব্যতীত অন্য সকল ভ্রাতাদেরই হত্যা করেন। শিহাব ও নাসির দিল্লীর সাহায্য চান। তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে লখনৌতির কতিপয় সম্ভ্রান্ত নাগরিকও দিল্লীর সুলতান গিয়াস-উদ-দীন তুঘলকের সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি তাঁর পালিতপুত্র তাতার খানের অধীনে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নাসির-উদ-দীন ইব্রাহিম শাহকে দেন। এই বিরাট বাহিনী লখনৌতি অধিকার করে। গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুর শাহ বন্দী হন। তুঘলক নাসির-উদ-দীন ইব্রাহিম শাহকে লখনৌতির শাসনভার অর্পণ করেন. পরে বন্দীত্বমুক্ত গিয়াস-উদ্-দীনকে সোনারগাঁওয়ে তাতার খানের (বা বহরাম খান) সহযোগী শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ করলেও সুযোগ বুঝে গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুর বিদ্রোহী হলে বহরামের হস্তে বন্দী হন এবং তাঁর গাত্রচর্ম বিচ্ছিন্ন করে দিল্লীর সুলতান মুহম্মদ তুঘলকের নিকটে প্রেরিত হয়।[২১]

এর পর এক দশকের কিছু বেশী কাল তাতার খান বা বহরাম খান, কদর খান ও ইজ্জ-উদ-দীন ইয়াহিয়া মহম্মদ তুঘলকের অধীনস্থ শাসক হয়ে সোনারগাঁও, লখনৌতি ও সাতগাঁও শাসন করেন। বহরাম খানের মৃত্যুর পর তাঁর সিলাহদার বা বর্মরক্ষক ফকরা ফকর-উদ-দীন মুবারক শাহ উপাধি নিয়ে সোনারগাঁও-এর সিংহাসনে বসেন।[২২] লখনৌতির কদর খানের সোনারগাঁও আক্রমণে ফখর-উদ-দীন পরাজিত হলেও পরে সোনারগাঁও-এ অবস্থানরত কদর খানকে সুযোগ বুঝে আক্রমণ করেন এবং কদর খানের লোভী সৈন্যরা তাঁকে হত্যা করে।[২৩] ফকর-উদ-দীন সোনারগাঁও-এ চলে যাওয়ায় লখনৌতিতে তাঁর দাস মুখলিশ শাসনভার পান। কিন্তু কদর খানের সৈন্য পরিদর্শক (Inspector of Troops) আলি মুবারক তাঁকে হত্যা করে[২৩ক] দিল্লীর সুলতান মুহম্মদ তুঘলককে শাসনকর্তা প্রেরণে প্রার্থনা জানান। দিল্লীর গর্ভনর ইউসুফকে সুলতান মনোনীত করে লখনৌতিতে প্রেরণ করেন। কিন্তু পথিমধ্যে তাঁর মৃত্যু হলে আলি মুবারক সুলতান আলা-উদ-দীন আলি শাহ নাম গ্রহণ করে লখনৌতির রাজা হন।[২৪] তবে তিনি লখনৌতি থেকে ফিরুজাবাদ বা পাণ্ডুয়ায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। মাত্র ২ বছরের কম তিনি রাজত্ব করেন। কিছুকাল পরে তাঁর অধীনস্থ মালিক ইলিয়াস হাজী আমীর মালিক ও লখনৌতির প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের সাহায্যপুষ্ট হয়ে আলা-উদ-দীন আলি শাহকে হত্যা করেন এবং সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ নাম

ধারণ করে লখনৌতির অধীশ্বর হন। কোন গ্রন্থে ইলিয়াসকে আলি শাহের ধাত্রীমাতার পুত্র, কোথাও তাঁকে ভৃত্য বলা হয়েছে। শামস্-উদ-দীন ইলিয়াস শাহের আগ্রাসী রাজ্যবিস্তার, লুণ্ঠন ও অর্থসংগ্রহের পরিচয় নেপাল আক্রমণ, বহু মন্দির ধ্বংস, পশুপতিনাথের মূর্তি ধ্বংস, উড়িষ্যা আক্রমণ, চম্পারণ, গোরক্ষপুর, কাশী প্রভৃতি অঞ্চল এবং পূর্বদিকে সোনারগাঁও এবং কামরূপের কতকাংশ জয়ে বর্তমান। স্বাভাবিকভাবেই দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুঘলক ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযানে পাণ্ডুয়া জয় করলেও ইলিয়াসের একডালা দুর্গ অধিকার করায় তিনি সমর্থ হন নি। যদিও শামস্-ই-সিরাজ আফিক-এর তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী এবং সিরাৎ-ই- ফিরোজ শাহীতে বা বারাণীর তারিখ-ই-ফিরুজশাহীতে ফিরোজ শাহের পক্ষে যে সব তথ্য উপস্থিত করেছেন তাও বিশ্বাস্য নয়।[২৫] তেমনই খাজা নিজাম-উদ-দীন আহমদের তবকাত-ই-আকবরীর তথ্য।[২৬] শেষ পর্যন্ত দুই সুলতানের সন্ধি হওয়ায় ফিরোজ শাহ ইলিয়াস শাহের স্বাধীনতা কার্যত স্বীকার করে নেন। ইলিয়াস ছিলেন নির্ভীক, দৃঢ়চেতা ও অসামান্য ব্যক্তিত্বশালী। মুসলিম সাধু-সন্তদের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর আমলে বাংলায় যে তিনজন পীর ছিলেন, তাঁরা হলেন অখী-সিরাজ-উদ-দীন, আলাউল হক এবং রাজা বিয়াবানি।

দিল্লীর ঐতিহাসিকেরা ইলিয়াসের দিল্লীর সুলতানের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ায় বিদ্বিষ্ট হয়ে তাঁকে ভাঙ বা সিদ্ধিখোর ও কুষ্ঠরোগী বলে অভিহিত করলেও ইলিয়াস যে বাংলার সকল প্রজাকুলের সুলতান ছিলেন তার প্রমাণ তাঁর উপাধি 'শাহ্-ই-বাঙ্গালা', 'সুলতান-ই-বাঙ্গালা' ও শাহ্-ই-বাঙ্গালীয়ান।[২৭]

ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র শিকান্দর অপ্রতিহত ভাবে দীর্ঘ তেত্রিশ বছর রাজত্ব করেন। সে নজীর বাংলার আর কোন সুলতানের নেই। দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহের সঙ্গে সংঘর্ষেও তাঁর ক্ষতি হয় নি, পরন্তু দিল্লী শিকান্দার শাহের সার্বভৌমত্বে স্বীকৃতি দেয় এবং সমকক্ষ রাজার ন্যায় দূত ও উপঢৌকন বিনিময় করে। মালদহের বিখ্যাত আদিনা মসজিদ (১৩৬৪-১৩৭৪ খ্রীঃ) তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি — যা আজও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। তাঁর আমলের তিনটি শিলালিপি ও বেশ কিছু মুদ্রা 'আবুল মুজাহিদ শিকান্দর শাহ' নামে আবিষ্কৃত হয়েছে। সুফীদের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। দেবীকোটের মোল্লা আতার দরগাহে তিনি একটি মসজিদও নির্মাণ করেন।[২৮] বাংলার সুলতানদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম 'ইমাম' বা 'খলিফা' (ইমাম-উল-আজম) উপাধি গ্রহণ করেন।[২৯]

শিকান্দরের শেষ জীবনে সিংহাসনের দাবী নিয়ে পুত্র গিয়াস-উদ-দীনের সঙ্গে মর্মান্তিক বিরোধ ঘটে। শিকান্দরের প্রথমা পত্নীর গর্ভে সতেরটি পুত্র এবং দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত একমাত্র পুত্র গিয়াস-উদ-দীন জন্মগ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে সর্ববিষয়েই গুণসম্পন্ন ছিলেন গিয়াস-উদ-দীন। বিমাতার ক্রোধ ও ঈর্ষাই শিকান্দরকে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্বিষ্ট করায়। ফলশ্রুতিতে গিয়াসের সঙ্গে সংঘর্ষ এবং তাঁর জনৈক সৈন্যের ভ্রান্তিবশতঃ শিকান্দরের বক্ষে বর্শাঘাত ও তাতেই তাঁর মৃত্যু। তবে নিষ্কণ্টক হওয়ার জন্য গিয়াস বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের চক্ষু উৎপাটন করেছিলেন। মৃত্যুকালে পিতা-পুত্রের বিদায় দৃশ্য বড়ই করুণ।[৩০]

গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ তাঁর পিতার ন্যায় দক্ষ শাসক হলেও তিনি সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন না। তিনি ছিলেন বিদ্বান, ধার্মিক, কবিদের পৃষ্ঠপোষক, সুফী সাধকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। মক্কা ও

মদীনায় তিনি মাদ্রাসা, সরাইখানা ও খাল খনন ইত্যাদি করান। কিন্তু বাংলায় এমন জনহিতকর কর্ম তিনি করেছিলেন কিনা তা জানা যায় না। চীন সম্রাট য়ু-শোর নিকট তিনি দূত প্রেরণ করেন। রিয়াজ-এ তাঁর সুশাসন ও নিরপেক্ষতার ঘটনা-উল্লেখে এক বিধবার পুত্রের তীরবিদ্ধ হওয়ায় কাজীর তলব-প্রাপ্ত হয়েও কাজীর বিচারে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন ও কাজীকে পুরস্কৃত করেন।[৩১] তবে শেষ জীবনে বলখির উপদেশে হিন্দুদের প্রতি ভ্রান্ত নীতিতেই তাঁর সর্বনাশ হয়। রিয়াজের মতে ভাতুড়িয়ার প্রসিদ্ধ রাজা কংশ বা গণেশের চক্রান্তে গিয়াস-উদ-দীন (১৪১০-১১) নিহত হন।[৩২]

গিয়াস-উদ-দীনের পর তাঁর পুত্র সয়ফ-উদ-দীন হামজা শাহ 'সুলতান-উস-সলাতিন' (রাজাধিরাজ) উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে বসেন। তিনি চীন সম্রাট য়ুং-লোর নিকট দূত প্রেরণ করে সুলতান গিয়াস-উদ-দীনের মৃত্যু ও তাঁর সিংহাসনে আরোহণের সংবাদ পাঠান। চীন সম্রাট তার প্রত্যুত্তরে মৃত সুলতানের শোকানুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য এবং সয়ফ-উদ-দীনের রাজ্যাভিষেকে তাঁর প্রতিনিধিগণকে প্রেরণ করেন।[৩৩]

দু বছর রাজত্বের পর সয়ফ-উদ-দীন হামজা শাহ তাঁর ক্রীতদাস শিহাব-উদ-দীন বায়েজীদ শাহ কর্তৃক নিহত হন। এই হত্যাকাণ্ড রাজা গণেশের চক্রান্তে সংঘটিত হয়েছিল। চীন সম্রাটের নিকট তিনি যে সব উপহার প্রেরণ করেন তন্মধ্যে জিরাফ, ঘোড়া ও অন্যান্য দ্রব্যাদি ছিল। জিরাফ চীনে বেশ কৌতূহল সৃষ্টি করে। দু বছর রাজত্বের পর শিহাব-উদ-দীন নিহত হন গণেশের চক্রান্তে।[৩৪] বায়েজীদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর শিশুপুত্র আলা-উদ-দীন ফিরোজ শাহকে নামমাত্র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়ে গণেশ নিজেই রাজ্যশাসন করেছিলেন। সম্ভবতঃ কয়েক মাস রাজত্বের পর গণেশই তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করেন।

বাংলার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় চরিত্র এই গণেশের। কারণ পাঁচ শতাধিক বছর মুসলমান শাসনে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি অতি স্বল্প সময়ের জন্য হলেও (মাত্র দেড় বছর) হিন্দু রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের তীব্র বিরোধিতার জন্যই তাঁর রাজত্ব এত দ্রুত শেষ হয়। এই বিরুদ্ধ শক্তির নেতৃত্বে ছিলেন দরবেশ নূর কুত্‌ব-উল-আলম। তিনি উত্তর ও পূর্ব ভারতের সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত নৃপতি জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কীকে উত্তেজক ভাষায় লিখিত এক পত্রে গণেশের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করায় ইব্রাহিম শর্কীর বিপুল শক্তিতে গণেশ ভীত হয়ে দরবেশের নিকট আত্মসমর্পণ করায় তিনি তাঁকে ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষিত হতে নির্দেশ দেন। গণেশ কৌশলে তাঁর দ্বাদশ বর্ষীয় পুত্র যদুকে (নামান্তর জিৎমল বা যদুসেন) ইসলাম ধর্মে দীক্ষার বিষয়টি পেশ করলে কুত্‌ব-উল-আলম যদুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন এবং তাঁর নাম হয় জালাল-উদ-দীন মুহম্মদ শাহ। ইব্রাহিমের মৃত্যুর পর পুত্র জালাল-উদ-দীনকে সিংহাসনচ্যুত করে গণেশ পুনর্বার রাজা হন এবং প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে পুত্রকে পুনরায় হিন্দু ধর্মে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করেন। এ প্রসঙ্গে রিয়াজ-এ চমকপ্রদ ঘটনার উল্লেখ আছে। তা হল এই যে গণেশ স্বর্ণনির্মিত গাভীর মুখ দ্বারা জালালকে প্রবেশ করিয়ে অধোদ্বার দিয়ে নির্গত করান এবং স্বর্ণ-গাভীর সমুদয় স্বর্ণ ব্রাহ্মণদের দান করেন।[৩৫]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে ৮১৯ হিজরাতে গণেশ পুত্রের নিকট থেকে সমস্ত ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং 'দনুজমর্দন দেব' উপাধি ধারণ করেছিলেন। ৮২০ হিজরাতে তিনি এই উপাধি নিয়ে মুদ্রাও প্রকাশ করেন বলে অনেকের ধারণা।[৩৬] পাণ্ডু নগর (মালদা জেলার

পাণ্ডুয়া) টাঁকশাল থেকে তৈরী এই মুদ্রাগুলির অন্য পিঠে 'শ্রীচণ্ডীচরণপরায়ণস্য' শব্দটি উৎকীর্ণ আছে। তবে দ্বিতীয়বার সিংহাসনে আরোহণ করে গণেশ প্রায় দু বছর রাজত্ব করেছিলেন। অর্থাৎ ১৪১০ খ্রীষ্টাব্দের অল্প কিছু পরেই গণেশ কার্যত বাংলার অধিপতি হন এবং ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী পর্ব পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং বলা চলে যে পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয় দশকের অধিকাংশ সময়েই তিনি বাংলায় শাসন করেছিলেন।[৩৭]

তবে সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে স্বল্প সময়ের জন্য হলেও গণেশের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, কুশাগ্রবুদ্ধি, দূরদর্শিতা, কূটনীতি ও সাধারণ মানুষের উপর তাঁর গভীর প্রভাবকে স্বীকৃতি দিয়েছেন ঐতিহাসিকেরা। ফিরিশতা তাঁকে দক্ষ সুশাসক বলেছেন। তাঁর কথায় গণেশ " মাথায় রাজমুকুট পরিধান করে এবং ছত্র প্রভৃতি রাজকীয় প্রতীক চিহ্নে ভূষিত হয়ে পরিপূর্ণ প্রাধান্যের সঙ্গে অত্যন্ত চমৎকারভাবে সাত বছর রাজত্ব করেছিলেন।"[৩৮] অবিচ্ছিন্ন দু-শতাব্দীর মধ্যে স্বল্প কয়েক বছরের জন্য হলেও তাঁর হিন্দু রাজ্য স্থাপন নিঃসন্দেহে তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও কূটনীতিরই পরিচায়ক।

গণেশ সাহিত্য ও বিদ্যার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলেও অনেকে মনে করেন। গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় কতিপয় স্থাপত্যকর্মেরও তিনি স্রষ্টা বলে অনুমান। তন্মধ্যে গৌড়ের 'ফতে খানের সমাধিভবন' নামে একটি দোচালা গৃহ এবং পাণ্ডুয়ার 'একলাখি ভবন' উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া আদিনা মসজিদ সংস্কার সাধন করে সেটিকে 'কাছারীগৃহ' হিসেবে পরিণত করাও তাঁর স্বল্পদৈর্ঘ্যের রাজত্বকালের চিহ্ন বলে প্রবাদ।

গণেশের সমকালেই ১৩৪০ শকাব্দেই মহেন্দ্রদেব নামে একজন রাজার মুদ্রারও সন্ধান পাওয়া যায়। কেউ কেউ জালাল-উদ-দীন (যদু)কে মহেন্দ্রদেব বলে স্বীকার করতে আগ্রহী। কিন্তু স্টেপলটন ও আচার্য যদুনাথ সরকার মনে করেন যে গণেশেরই দ্বিতীয় পুত্র মহেন্দ্রদেব।[৩৯] তবে গণেশের অন্তিম পরিণতি সম্পর্কে গোলাম হোসেন বলেছেন — "কোন কোন ইতিহাসবেত্তার মতে জালাল-উদ-দীন (যিনি বন্দী ছিলেন) খেদমতকারগণের সাহায্যে পিতাকে বধ করিয়াছিলেন।"[৪০] সমসাময়িক আরবী ঐতিহাসিক ইব্‌ন্-ই-হজর রচিত ইনবাউ'ল-গুমর গ্রন্থে জানা যায় যে গণেশের পুত্র জালাল-উদ-দীন গণেশকে আক্রমণ করে বধ করেন।[৪১] কিন্তু আচার্য যদুনাথ সরকারের মতে গণেশ বৃদ্ধ বয়সে শান্তিতে প্রাণত্যাগ করেন, জালাল-উদ-দীনের দ্বারা নিহত হন নি।[৪১ক] জালাল-উদ-দীন দ্বিতীয় দফায় ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৪৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তবে রাজত্বের লিপ্সায় তিনি হিন্দুধর্ম থেকে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তা মিরাৎ-উল্‌-আসরারে স্পষ্টভাবে লিখিত আছে।[৪২]

তবুও ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর তাঁর ধর্মনিষ্ঠা পূর্ববর্তী জাত-মুসলমানকেও অতিক্রম করেছিল। রিয়াজ-এ আছে যে তিনি বহু হিন্দুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন এবং যে সব ব্রাহ্মণ স্বর্ণনির্মিত গাভী গ্রহণ করেছিলেন, তিনি তাঁদের গোমাংস ভক্ষণের দ্বারা জাতিচ্যুত করেন।[৪৩] তিনি তাঁর মুদ্রায় কল্‌মা খোদাই করেন। তা ছাড়া পূর্ববর্তী সুলতানরা যেমন সকলেই খলীফার আনুগত্য স্বীকার করতেন, তিনিও প্রথমে তা করলেও রাজত্বের শেষ পর্বে মুদ্রা ও শিলালিপিতে তাঁর 'খলীফৎ-আল্লাহ' উপাধি ধারণের কথা জানা যায়। অর্থাৎ নিজেই খলীফা বা ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে দাবী করেছেন। তিনি তাঁর পিতা গণেশ কর্তৃক ধ্বংস মসজিদগুলির সংস্কার করেন এবং মক্কায় কতিপয় ভবন এবং একটি সুন্দর মাদ্রাসা নির্মাণ করান। তা ছাড়া মক্কাবাসীদের জন্য বহু

*অর্থ প্রেরণ করেন।*[৪৪] *চীন সম্রাট ও মিশরের খলিফা প্রমুখের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতাও ছিল।*

জালাল-উদ-দীনের সময় পাণ্ডুয়া নগর বর্ণনাতীত জনপূর্ণ হয়েছিল। বহু জলাশয়, পুষ্করিণী, মসজিদ ও সমাধিগৃহও (mausoleum) তিনি নির্মাণ করেন। গৌড় নগরীতে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৪৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র শামস্-উদ-দীন আহমদ শাহ সিংহাসনে বসেন।

ফিরিশতার মতে তিনি ন্যায়পরায়ণ ও উদার ছিলেন, কিন্তু রিয়াজ-এর মতে তিনি বিশেষতঃ অন্তঃসত্ত্বা নারীদের প্রতি পৈশাচিক অত্যাচারে উল্লাস বোধ করতেন।[৪৫] দুটি বিরুদ্ধ মত বিশ্লেষণ করে ও সমকালের রাজনৈতিক চক্রান্তের কথা উল্লেখ করে কেউ কেউ মনে করেন যে শামস্-উদ দীন সেই রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার হয়ে স্বীয় ক্রীতদাস সাদী খাঁ ও নাসের খাঁর হস্তে নিহত হন।[৪৬] একলাখী ভবনে সম্ভবত শামস-উদ-দীন, তাঁর পত্নী ও পুত্রের সমাধি আছে। আইন-ই-আকবরী, তবকাত-ই-আকবরী, তারিখ-ই-ফিরিশতা ও রিয়াজ-উস-সলাতীন প্রভৃতি গ্রন্থানুসারে শামস্-উদ-দীন আহমদ শাহ ১৬ অথবা ১৮ বছর রাজত্ব করেছিলেন, কিন্তু মুদ্রার সাক্ষ্যে তা প্রমাণিত হয় নি। সে দিক থেকে বুকাননের বিবরণে তিনি যে তিন বছর রাজত্ব করেন -- তাইই গ্রাহ্য বলে মনে হয়।[৪৭] প্রকৃতপক্ষে শামস-উদ-দীনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই গণেশের বংশের রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে।

শামস-উদ-দীন আহমদ শাহের অমাত্যেরা এরপর ইলিয়াস শাহী বংশের সন্তান নাসির-উদ-দীন মাহমুদ শাহকে সিংহাসনে বসান। কেউ কেউ এই বংশকে 'মাহমুদ শাহী বংশ' নামে অভিহিত করেছেন।[৪৮] নাসির-উদ-দীন ন্যায়পরায়ণ ও উদার ছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল গৌড়। তাঁর যোগ্যতার পরিচয় দীর্ঘ ২৪/২৫ বছর রাজত্ব ভোগ। গোলাম হোসেন তাঁর রাজনীতি ও সুশাসনের প্রশংসা করেছেন।[৪৯]

নাসির-উদ-দীনের মৃত্যুর পর (৮৬৪ হিজরী বা ১৪৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁর পুত্র রুকন-উদ-দীন বারবক শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। যুদ্ধ ও শান্তি দ্বিবিধ ক্ষেত্রেই তাঁর নৈপুণ্যের পরিচয় মেলে। কামরূপ এবং ত্রিহুতও তিনি জয় করেন, বাংলার দক্ষিণ অঞ্চলেও তাঁর রাজ্য প্রসারিত হয়। তাঁর শিলালিপিতে তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক 'অল্-ফাজিল' এবং 'অল্-কামিল' উপাধিদ্বয় লক্ষণীয়। তিনি নিজে শুধু পণ্ডিতই ছিলেন না, বিদ্যা ও সাহিত্যেরও তিনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কবি-পণ্ডিতদেরই তিনি ছিলেন পরম পৃষ্ঠপোষক। তাঁর পৃষ্ঠপোষণা পেয়েছিলেন গীতগোবিন্দ টীকা, রঘুবংশ টীকা, শিশুপাল বধ টীকা, কুমারসম্ভব টীকা, অমরকোষ টীকা, 'পদচন্দ্রিকা' ইত্যাদি বহু গ্রন্থের লেখক সুপণ্ডিত বৃহস্পতি মিশ্র, শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের লেখক মালাধর বসু, রামায়ণ- রচয়িতা কৃত্তিবাস ওঝা, এবং ফরঙ্গ-ই-ইব্রাহিমী নামক ফার্সী ভাষার এক শব্দকোষের লেখক ইব্রাহিম কাইয়ুম ফারুকী প্রমুখেরা। বারবক মালাধর বসু ও তাঁর পুত্রকে যথাক্রমে 'গুণরাজ খান' ও 'সত্যরাজ খান' উপাধিতে ভূষিত করেন। বহু হিন্দুকে উচ্চ রাজপদে তিনি অধিষ্ঠিত করেন। তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন অনন্ত সেন, নারায়ণ দাস ও কেদার রায় ছিলেন সুলতানের ত্রিহুতের প্রতিনিধি এবং ভান্দসী রায় ছিলেন ঘোড়াঘাট দুর্গাধ্যক্ষ।[৫০]

বারবক শাহের গুণাবলীর মধ্যে তাঁর সৌন্দর্যপ্রীতিও স্মরণীয়। তাঁর মুদ্রা ও শিলালিপি তাঁর নান্দনিক গুণেরই পরিচায়ক। তাঁর প্রাসাদের যে চিত্র সমসাময়িককালে পাওয়া যায়, তা নিতান্ত মনোরম। গৌড়ের বিখ্যাত দাখিল দরওয়াজার স্রষ্টা তিনিই।[৫১] সামগ্রিক দিক থেকে তাই

বাংলার সুলতানদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার।

রুকন-উদ-দীন বারবক শাহের পর তাঁর পুত্র শামস-উদ-দীন ইউসুফ শাহ্ প্রায় ছ বছর (১৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দ) রাজত্ব করেন। পিতার ন্যায় তিনি সুপণ্ডিত, ধর্মপ্রাণ, শিল্পপ্রাণ, ন্যায়পরায়ণ ও দক্ষ রাজা ছিলেন। ফিরিশতায় দেখা যায় যে কাজীরা যে সব মামলা বিচারে ব্যর্থ হতেন, তিনি তা স্বয়ং মীমাংসা করতেন সুন্দরভাবে। তাঁর রাজ্যে প্রকাশ্যে মদ্যপান পরিপূর্ণ বন্ধ ছিল। আলিমদেরও তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে কোন পক্ষকে সমর্থন না করতে।[৫২] শামস-উদ-দীন ইউসুফ শাহ্ পুরাতন মালদার শাকমোহন মসজিদ এবং গৌড়ের তাঁতীপাড়া, লোটন মসজিদ ও চামকাটি মসজিদও তৈরী করেন বলে অনেকের অভিমত।[৫৩] তবে নিজ ধর্মে নিষ্ঠা থাকলেও তাঁর পরধর্মে বিদ্বেষও ছিল। তাঁর রাজত্বকালে হুগলী জেলার পাণ্ডুয়ার সূর্য ও নারায়ণ মন্দির মসজিদ ও মিনারে রূপান্তরিত হয় এবং ব্রহ্মশিলা নির্মিত অতিকায় সূর্যমূর্তি বিকৃত করে তার পৃষ্ঠদেশে আরবী লিপি খোদিত হয় — যা আজও 'বাইশ দরওয়াজা' নামে পরিচিত এবং এতে হিন্দু মন্দিরের বহু শিলাস্তম্ভ ও অন্যান্য ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।[৫৪]

এরপর অল্প কিছুদিনের জন্য রিয়াজের মতে ইউসুফ শাহের পুত্র[৫৫] মতান্তরে স্টুয়ার্টের মতে রাজবংশ জাত [৫৬] দ্বিতীয় শিকান্দার শাহ গৌড়ের সিংহাসনে অরোহণ করেন বটে, কিন্তু বিভিন্ন মতানুসারে অর্ধ দিবস, সার্দ্ধ দু দিন অথবা মাত্র দুমাস-কাল তিনি রাজ্য ভোগ করেন। আসলে তিনি ছিলেন উন্মাদ। সুতরাং অমাত্যবর্গ দ্বিতীয় শিকান্দার শাহের স্থলে রিয়াজের মতে ইউসুফ শাহের দ্বিতীয় পুত্র ফতেহ্ শাহকে অভিষিক্ত করেন। কিন্তু সমসাময়িক আরবী শিলালিপি অনুযায়ী তিনি মাহমুদ শাহের পুত্র।[৫৭] অর্থাৎ শামস্-উদ-দীন ইউসুফ শাহের খুল্লতাত। তিনি ৮৮৬ থেকে ৮৯২ হিজরী (১৪৮১-৮২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৪৮৭-৮৮ খ্রীষ্টাব্দ) পর্যন্ত রাজ্য ভোগ করেন। ফতেহ্ শাহ বিজ্ঞ, উদারহৃদয় ও বুদ্ধিমান নৃপতি ছিলেন। সমসাময়িককালে বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে তাঁর সপ্রশংস উল্লেখ আছে। তবে হরিদাস মুসলমান হয়েও কৃষ্ণনাম করায় এবং এক শ্রেণীর মুসলমানদের প্ররোচনায় জালাল-উদ দীন ফতেহ্ শাহ নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচার করেছিলেন।[৫৮] এই ধরণের অত্যাচার ও দণ্ড অনেক সময়ে সুকঠোর হওয়াতে যথেচ্ছচারী হাবশীরা প্রধান খোজা বারবককে দিয়ে তাঁকে হত্যা করায়। আবার এই বারবক 'সুলতান শাহজাদা' হিসেবে কয়েকমাস রাজত্ব করেন। রিয়াজ-এ হাবশী আমীর মালিক আন্দিল কর্তৃক শাহজাদার হত্যার এক দীর্ঘ নাটকীয় চিত্র আছে।[৫৯] মালিক আন্দিল এর পর সুলতান সয়ফ-উদ-দীন ফিরুজ শাহ উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বীর, দয়ালু, দানবীর ও মহৎ ছিলেন। প্রজাহিতকর কার্যও তাঁর উল্লেখযোগ্য। তিন বছরের কিছু বেশী তাঁর রাজত্বকালে (১৪৮৭-১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দ) গৌড়ে ফিরোজ মিনার ব্যতীত একটি মসজিদ ও জলাশয়েরও তিনি নির্মাতা। দীন দুঃখীদের প্রতি তাঁর দানশীলতার কথা রিয়াজে উল্লেখ আছে।[৬০] তা ছাড়া ফিরোজ মিনার নির্মাণ সম্পর্কে মুন্সী শ্যামপ্রসাদের আহওয়াল-ই-গৌড়, রজনীকান্ত চক্রবর্তীর গৌড়ের ইতিহাস ও আবিদ আলির মেময়রস অব গৌড় এ্যাণ্ড পাণ্ডুয়া গ্রন্থে একটি কৌতূহলোদ্দীপক কিম্বদন্তী বর্তমান। সেটি হল এই যে, জনৈক রাজমিস্ত্রী এই মিনারটি সম্পূর্ণ করলে সুলতান সদলবলে মিনারের উপরে আরোহণ করে প্রশংসা করেন। কিন্তু রাজমিস্ত্রী তার দক্ষতা ও গরিমা প্রকাশের জন্য সুলতানকে জানায় যে সে আরও অনেক উঁচু মিনার তৈরীতে সক্ষম। সুলতান তার সেই গুণপনা প্রকাশে দ্বিধা কেন তা জিজ্ঞাসা

করায় রাজমিস্ত্রী বলে — আমার কাছে এত মাল-মশলা ছিল না।

সুলতান ঃ ছিল না তো আমার কাছে চাও নি কেন?

রাজমিস্ত্রী এর কোন উত্তর দিতে না পারায় ক্রুদ্ধ সুলতান তাকে মিনারের চূড়া থেকে ফেলে দিতে আদেশ দিলে সে আদেশ মুহূর্তে পালিত হল এবং সে হতভাগ্য ট্র্যাজিক পরিণতির শিকার হল। সুলতান চূড়া থেকে অবতরণ করে তাঁর বিশ্বস্ত ভৃত্য হিঙ্গাকে তৎক্ষণাৎ মোরগাঁও যাওয়ার নির্দেশ দেন। হিঙ্গাও রওনা হল বটে, কিন্তু যাত্রার উদ্দেশ্য তার অজানা, তা ছাড়া ক্রুদ্ধ সুলতানকে জিজ্ঞাসা করার সাহসও সে সময় তার ছিল না।

এ দিকে মোরগাঁও পৌঁছে হিঙ্গা চিন্তা করতে থাকে যে তাকে এখানে পাঠানর কারণ কি। অনেক চিন্তার পরও কূল-কিনারা না পেয়ে সে ইতঃস্তত ঘুরতে থাকে এবং শেষে সে সনাতন নামে এক ব্রাহ্মণ যুবকের সাক্ষাৎ পায়। হিঙ্গা তখন ভাবে যে হয়ত এর সঙ্গে আলোচনা করে তার সমস্যার সমাধান হবে। সনাতন তখন মিনার থেকে তার যাত্রার অব্যবহিত পূর্বেকার ঘটনা আনুপূর্বিক শুনে বলেন যে — "সুলতান তোমাকে মোরগাঁও থেকে নিশ্চয়ই সুদক্ষ রাজমিস্ত্রী নিয়ে যেতে বলেছেন।" আসলে মোরগাঁও-এ সমকালে সুদক্ষ খ্যাতিমান রাজমিস্ত্রীদের বাসস্থান ছিল। এ দিকে সনাতনের পরামর্শ হিঙ্গার মনে ধরায় সে কতিপয় সুদক্ষ রাজমিস্ত্রী সহ সুলতান সম্মুখে হাজির হয়।

এ দিকে সুলতানও হিঙ্গার যাত্রার পর বিশেষ চিন্তিত হন, কারণ তিনি মোরগাঁও যেতে তাকে নির্দেশ দিলেও উদ্দেশ্য বা কর্তব্য সম্পর্কে কোন নির্দেশ দেন নি। কিন্তু এতগুলি রাজমিস্ত্রী সহ সে হাজির হওয়ায় তিনি বিস্মিত হলেন। হিঙ্গা তখন সনাতন নামক ব্রাহ্মণের পরামর্শেই যে এ কাজ করেছে তাঁকে জানালে, সুলতান তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন এই সনাতনকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁকে রাজ দরবারে এক উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করেন এবং মোরগাঁও-এর মিস্ত্রীদের দ্বারায় মিনারটির উচ্চতা বৃদ্ধি করেন।

কিন্তু এই কিম্বদন্তীর প্রথমভাগের রাজমিস্ত্রীর আত্মশ্লাঘার অনুরূপ তার শোকাবহ পরিণতি ও সমপর্যায়ের লোকপ্রবাদ শোনা যায় অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুর জেলার রাজবাড়ী মহকুমার মথুরাপুর গ্রামের দেউল সম্পর্কে। সেখানকার ৭০' ফুটের এই টেরাকোটার মন্দিরটি জনৈক সংগ্রাম শাহ নির্মাণ করেন। তিনি এর শীর্ষদেশ থেকে যাতে ঢাকা শহর দেখা যায়, তার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তা না দেখা যাওয়ার কারণ হিসেবে জানেন যে তার মাল-মশলার ঘাটতি ঘটেছে। তাতে সংগ্রাম তাকে হত্যা করার হুমকী দিলে রাজমিস্ত্রী নিজেই মন্দিরের উপর থেকে লাফ দিয়ে মৃত্যুবরণ করে।[৬১]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে ক্রিটন অঙ্কিত ফিরোজ মিনারের গম্বুজ দেখা গেলেও[৬২] ১৭৯৫ সালে ড্যানিয়েলের অঙ্কিত চিত্রে গম্বুজটির ভগ্নশীর্ষ লক্ষণীয়।[৬৩]

অধিকাংশ ইতিহাস গ্রন্থের মতে ফিরোজ শাহ পাইকদের হাতে নিহত হন।

এর পর নাসির-উদ-দীন মাহমুদ সুলতান হন। তাঁর পিতৃপরিচয় স্পষ্টভাবে না জানা গেলেও তবকাত-ই-আকবরী, তারিখ-ই-ফিরিশতা এবং রিয়াজ-উস-সলাতীন প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত সয়ফ-উদ-দীন ফিরোজ শাহের জ্যেষ্ঠপুত্র হিসেবে চিহ্নিত হলেও হাজী মোহাম্মদ কান্দাহারীর মতে

তিনি ছিলেন জালাল-উদ-দীন ফতেহ্ শাহ্‌র পুত্র। এ প্রসঙ্গে নানা যুক্তি ইতিহাসবেত্তাদের মধ্যে দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত ড. আবদুল করিম মুদ্রা পরীক্ষা করে ড. সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতকেই স্বীকৃতি দিয়ে তাঁর প্রকৃত নাম সম্পর্কে মন্তব্যে বলেন ঃ — "সুতরাং আমরা এখন বিনা দ্বিধায় বলিতে পারি যে তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল কুতুব-উদ-দীন মাহমুদ শাহ এবং তিনি সয়ফ-উদ-দীন ফিরুজ শাহের ছেলে ছিলেন।[৬৪] মাহমুদ শাহ সম্পর্কে বিশেষ জানা যায় না। তবে এইটুকু জানা যায় যে সমকালে দুই হাবশী অমাত্য হাবশ খান এবং সিদি বদর ক্ষমতার লড়াইয়ে মত্ত থাকেন। মাহমুদ শাহ রাজা হলেও হাবশ খানই প্রকৃত রাজ্য শাসন করতেন। স্বভাবতঃই ঈর্ষান্বিত সিদি বদর প্রথমে হাবশ খানকে হত্যা করে রাজ্যের অভিভাবক হন এবং কিছুদিন পরে পাইকদের দ্বারা মাহমুদ শাহকে হত্যা করিয়ে শামস-উদ-দীন মুজাফফর শাহ্ উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে বসেন।[৬৫] রিয়াজের মতে তিনি তিন বছর পাঁচমাস কাল রাজত্ব করেন,[৬৬] কিন্তু মুজাফফরের শিলালিপি ও মুদ্রার নিরিখে তিনি প্রায় তিন বছর (সম্ভবত ৮৯৬ হিজরী শেষ অংশ থেকে ৮৯৮ হিজরী) রাজত্ব করেছিলেন।[৬৭]

শামস-উদ-দীন মুজাফফর শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির হওয়ায় অসংখ্য ধার্মিক, পণ্ডিত ও অভিজাত মুসলমান ও হিন্দু রাজাদের হত্যা করেন। রিয়াজ ও নিজাম-উদ-দীনের মতানুসারে এই দৌরাত্ম্যই তাঁর কাল হয়েছিল। ফলে তাঁর উজীর সৈয়দ হোসেন পাইক-সর্দারকে উৎকোচ দান করে কতিপয় যোদ্ধাসহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করে তাঁকে হত্যা করেন।[৬৭ক] এবং তার পর দিন প্রভাতেই সুলতান আলা-উদ-দীন উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে বসেন।[৬৭খ] তাঁর পূর্ণ নাম আলা-উদ-দুনিয়া-ওয়াদ-দীন আবুল মুজফফর হোসেন শাহ্। রিয়াজের মতে অবশ্য হাজী মহম্মদের বর্ণনানুযায়ী মজাফফরের নিপীড়নের ফলে তাঁর বিরোধীদের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ কয়েকমাস যুদ্ধ হয় এবং তাতে এক লক্ষ বিশ হাজার হিন্দু ও মুসলমান নিহত হয়।[৬৮]

মুজাফফর তাঁর স্বল্প সময়ের রাজত্বকালের মধ্যেই গৌড়ে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন এবং সৈয়দ নূর কুতুব-উল-আলমের পাণ্ডুয়ায় একটি সমাধিভবন নির্মাণ করেন।[৬৯] মুজফফরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ছ বছরের হাবশী-কুশাসনের উপর যবনিকাপাত ঘটে। এই হাবশী-কুশাসন লুণ্ঠন, অত্যাচার, লাম্পট্য, ভ্রষ্টাচার, ষড়যন্ত্র ও অহেতুক রক্তপাতের দ্বারা লাঞ্ছিত। হাবশী রাজত্বে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু ও হত্যা রাজধানীতে ওত পেতে ছিল। এই আবিশীনীয় শাসকেরা সুদূর আফ্রিকা থেকে এসেছিল। তাদের এ দেশের প্রতি কোন দরদই ছিল না। এমনকি ভারতের বা এশিয়ার মুসলমানদের সঙ্গেও তারা সংস্কৃতিগতভাবে অনুরাগ রহিত। ইসলামের ভ্রাতৃত্ববোধও হাবশীদের মধ্যে উন্মেষিত হয় নি। তারা অধিকাংশই খোজা, তাই ভবিষ্যতের জন্যও তাদের কোন দায়ভাগ ছিল না। জীবন তাদের কেবল দৈহিক আনন্দেরই জন্য, তাই বিকৃত ইন্দ্রিয় লালসাই ছিল তাদের ঐহিক কাঙ্ক্ষিত বস্তু।[৭০]

এর পর হোসেনশাহী শাসনের সূত্রপাত। মুজাফফরকে হত্যা করেই হোসেন শাহের রাজ্য অধিকার। তাঁর সম্পর্কে প্রামাণিক তথ্য মেলে না। রিয়াজ মনে করে যে হোসেন শাহের পিতা আসরফ মক্কার শেরিফ ছিলেন। তার পর পুত্র পিতার উপাধি গ্রহণ করেন; কিন্তু তাঁর নাম সৈয়দ হোসেন।[৭১] তবে তাঁর পিতৃপরিচয় ও নিবাস সম্পর্কে নানা কিম্বদন্তী ও উপাখ্যান প্রচলিত আছে। জোঁয়া-দ্য-ব্যারোস, ফিরিস্তার তারিখ-ই-হিন্দুস্তান, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত এবং

গুরুদাস সরকার সংগৃহীত জনশ্রুতিতে নানা তথ্য আছে।[৭২] হোসেন শাহ রাজপ্রাসাদের প্রহরার কাজে নিযুক্ত সমস্ত হাবশীদের বিতাড়িত করেন এবং সৈয়দ, আফগান ও মুঘলদের উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেন [৭২ক] এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠান। তবে তিনি যে দূরদর্শী, কূটনীতিজ্ঞ, দক্ষ প্রশাসক, সুযোগসন্ধানী ও সুচতুর ছিলেন তা মুজাফফর শাহের বিরুদ্ধে সকলকে বিদ্বিষ্ট করে তাঁর ভালমানুষী (চারিত্র-রূপ) সকলকে জানাতেন এবং আপনার ভাল ব্যবহারে সকলকে তুষ্ট করার চেষ্টা করতেন।[৭৩] রিয়াজ তাঁর রাজপদ গ্রহণের জন্য অমাত্যবর্গের অনুমতি সাপেক্ষে তাঁদের সম্মুখে তাঁর যে কথা লিপিবদ্ধ কবেন তাতে তাঁকে ধুরন্ধর বলেই স্বীকার করতে হয়। মুজাফফরের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে অমাত্যরা তাঁকে রাজপদে প্রতিষ্ঠা করায় আগ্রহী হলে তাঁরা বলেন — "আমরা যদি আপনাকে অভিষিক্ত করি, তবে আপনি আমাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করবেন?" সৈয়দ হোসেন প্রত্যুত্তরে বলে — "আমি আপনাদের ইচ্ছা প্রতিপালন করব। নগরের সঞ্চিত সমস্ত ধনরাশি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করব, কিন্তু ভূগর্ভস্থ বা লুকানো ধনরাশি আমি স্বয়ং গ্রহণ করবো।" এ কথায় প্রলুব্ধ অমাত্যবর্গ তাঁকে নির্বাচিত করেন, এবং তাঁরা গৌড়নগর লুণ্ঠন সুরু করেন। কিন্তু কয়েকদিন পরেই হোসেন নগর লুণ্ঠন বন্ধ করার আদেশ দেন।, কিন্তু সে আদেশ পালিত না হওয়ায় তিনি বারো হাজার লুণ্ঠনকারীকে বধ করে এই লুণ্ঠনকার্য রহিত করেন। এর পর গুপ্তধনের অনুসন্ধান করে বহু রত্ন ও তের শত স্বর্ণপাত্র হস্তগত করেন।[৭৪] হোসেন শাহ স্বনামে খোত্‌বা এবং শিক্কাও প্রচলন করেন। এই সব ঘটনায় হোসেন শাহকে প্রকৃতপক্ষে উদার ও সৎ বলা অযৌক্তিক। নানা কিম্বদন্তীতেও হোসেন শাহের হিন্দুদের জাতিনাশ করার কথা উল্লিখিত।[৭৫] বিপ্রদাস পিপিলাই-এর মনসামঙ্গল-এ হাসান-হুসেন পালায় জুলুম এবং ধর্মান্তরিতকরণের চিত্রও লিখিত আছে।[৭৬] বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত-এ হোসেন শাহ সম্পর্কে বৈষ্ণবদের মানসিকতাও শ্রদ্ধেয় নয়। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে হোসেন শাহ বা তাঁর কর্মচারীরা বহু সুন্দর মসজিদ, ফটক (যেমন গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ ও গুমটি গেট) ইত্যাদি নির্মাণ করেছিলেন। শিলালিপিগুলিতে তাঁকে নৈষ্ঠিক মুসলমান এবং ইসলাম ধর্ম-প্রতিষ্ঠা ও মুসলিম জনগণের মঙ্গল সাধনে তাঁর প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। তাঁর রাজত্বকালে পশ্চিম সীমান্তে শর্কী-লোদী সংঘর্ষ উল্লেখযোগ্য। জৌনপুরের রাজ্যচ্যুত সুলতান হোসেন শাহ শর্কী দিল্লীর সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বাংলায় পলায়ন করে হোসেন শাহের আশ্রয়ে এলে হোসেন শাহের পুত্র দানিয়েলের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। দিল্লীর সুলতান শিকান্দর লোদীর সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের পরিস্থিতিতে শেষ পর্যন্ত সন্ধি হয় এবং দিল্লীর সুলতান প্রত্যাবর্তন করেন। ভবিষ্যতে দিল্লীর সুলতানের শত্রুদের তিনি আশ্রয় দেবেন না, এমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু এই সংঘর্ষ বাংলার সুলতানের গৌরব হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। উত্তর-বিহারের কিয়দংশ হোসেন শাহের শাসনে আসে। কামতাপুর অভিযানে তিনি তার রাজধানী হাজো অধিকার করেন, তবে আসাম ও অহোমরাজ্য অভিযান ব্যর্থ হয়। উড়িষ্যার রাজাদের সঙ্গেও তাঁর দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষ হয়। হোসেন শাহের মুদ্রা ও শিলালিপি তথা রিয়াজ এবং ত্রিপুরার রাজমালা তাঁর উড়িষ্যা জয়ের কথা বললেও জীবদেবাচার্যের ভক্তিভাগবত, জগন্নাথ মন্দিরের "মাদলাপঞ্জী" এবং "কটকরাজবংশাবলী" গ্রন্থের মতে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁকে বিতাড়িত করেন। সুতরাং হোসেন শাহ ও উড়িষ্যারাজের সংঘর্ষে দু পক্ষই বিজয়ী হিসেবে দাবী করেন।[৭৮] তা ছাড়া হোসেন শাহ বিদ্যা ও বাংলা সাহিত্যের যে পৃষ্ঠপোষক বলে বহুল প্রচলিত, সে ধারণারও প্রমাণ অনুপস্থিত।

যশোরাজ খান, দামোদর, কবিরঞ্জন প্রভৃতি বাঙালী কবি হোসেন শাহের কর্মচারী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর পৃষ্ঠপোষকতার কোন সূত্র মেলে না।[৭৭] হিন্দু কর্মচারীদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা তাঁর রাজ্যের সুশাসনের প্রয়োজনেই হয়েছিল। কারণ ইলিয়াস শাহী আমল থেকেই এই দৃষ্টিতে মুসলমান শাসকেরা হিন্দু কর্মচারী নিয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। সে সময়ে যোগ্য মুসলমান কর্মচারীর সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই কম ছিল। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে হোসেন শাহ বহু যুদ্ধ করলেও পরিপূর্ণ জয়লাভ মাত্র কয়েকটি যুদ্ধে হয়েছিল। তাই সামরিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষতা দেখালেও পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছিলেন বলে মানা যায় না, যদিও বাংলার প্রায় সম্পূর্ণ এবং বিহারের এক বিরাট অংশ তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল। তা ছাড়া কামরূপ, কামতা রাজ্য ও ত্রিপুরার কিয়দংশ সাময়িকভাবে তাঁর রাজ্যের অন্তর্গত হয়েছিল। সে দিক থেকে অন্যান্য সুলতানদের অপেক্ষা তাঁর রাজ্য বৃহত্তর ছিল সন্দেহ নেই।

প্রকৃতপক্ষে শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক হওয়ায় বহু চৈতন্যচরিত গ্রন্থে তাঁর নামোল্লেখ থাকায় বাঙালীর স্মৃতিতে আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ উজ্জ্বলভাবে বিরাজমান। কতিপয় স্মরণীয় ব্যক্তিত্বেরও আবির্ভাব ঘটে তাঁর রাজত্বকালে। পূর্বে উল্লিখিত যশোরাজ খান, দামোদর, কবিশেখর ব্যতীত পরাগল খাঁ, ছুটী খাঁ, সনাতন, রূপ, বল্লভ প্রভৃতি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সনাতন ও রূপ ভ্রাতৃদ্বয় হোসেন শাহের মন্ত্রী ও দবীর খাস(দবিরে খাস 'দেওয়ানে ইনসা' বিভাগের ভারপ্রাপ্ত) ছিলেন। সনাতনের উপাধি ছিল 'সাকর মল্লিক' (সগীর মালিক অর্থাৎ ছোট রাজা) এবং প্রধান সচিব দবীর খাস (দবীর-ই-খাস — Chief Secretary)। হোসেন শাহের প্রধান সেনাপতি বিদ্যোৎসাহী পরাগল খাঁ চট্টগ্রামের শাসনকর্তা হয়ে কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে দিয়ে মহাভারত বাংলায় অনুবাদ করান।পরাগল খাঁর পুত্র ছুটী খাঁও (প্রকৃত নাম নসরৎ খান) পিতার ন্যায় বিদ্যোৎসাহী ও কাব্যানুরাগী ছিলেন। তিনি তাঁর সভাকবি শ্রীকর নন্দীকে অনুবাদ করতে অনুরোধ করেন। শ্রীকর নন্দী জৈমিনী ঋষি রচিত মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের বাংলা-অনুবাদক।

গৌড়ের সন্নিকটে রামকেলি গ্রামে শ্রীচৈতন্যের আগমনের সময় সনাতন তাঁর সঙ্গে মিলিত হলে তাঁর বিষয় বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। এ পর্বে রাজকার্যে অবহেলা ও হোসেন শাহের উড়িষ্যা অভিযানে সুলতানের সঙ্গী না হওয়ায় ক্রুদ্ধ সুলতান তাঁকে বন্দী করে (কিম্বদন্তী অনুসারে বর্তমান চিকা ভবনে) উড়িষ্যা যান। কিন্তু কারারক্ষীদের উৎকোচ দিয়ে মুক্তি পেয়ে সনাতন বৃন্দাবন যাত্রা করেন এবং পরবর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভাষ্য রচনায় বাকী জীবন অতিবাহিত করেন। রূপও সংসার ত্যাগ করে বৃন্দাবনবাসী হন এবং অগ্রজের ন্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম ষড় গোস্বামী হিসেবে কীর্তিত হন এবং বহু গ্রন্থ রচনা করেন।

সামগ্রিক মূল্যায়নে এ কথা বলা যায়, বাংলার সিংহাসন দখলে যে রাজনৈতিক চরম অস্থিরতা ও হত্যাপর্ব কয়েক বছর ধরে চলেছিল, সে সময়ে দেশের চরম দুর্দিনে হোসেন শাহ সুলতান হয়ে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করে পরবর্তী পর্বে বিভিন্ন রাজ্য জয় করে তাঁর রাজ্যের চৌহদ্দীকে বৃহত্তর করে তুলেছিলেন এবং দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর অপ্রতিহতভাবে রাজ্য শাসন করেন। এটি তাঁর বীরত্ব ও সুশাসনেরই পরিচায়ক।

রোগগ্রস্ত হয়ে ৯২৭ হিজরীতে (১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দ) হোসেন শাহ পরলোক গমন করেন। রিয়াজে তাঁর ১৮টি পুত্রের কথা উল্লিখিত।

আলা-উদ-দীন হোসেন শাহের পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র নসরৎ শাহ সুলতান নাসির-উদ-দুনিয়া ওয়াদ-দীন আবুল মুজাফফর উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তবাকাত-ই আকবরীতে তিনি নসীর শাহ, কিন্তু পাণ্ডুলিপিদ্বয়ে নসীব খান বলে কথিত।[৭৮] তাঁর সিংহাসন আরোহণের সময় নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কারণ কিছু হোসেন শাহের মুদ্রার তারিখের আগেই নসরৎ শাহের কতিপয় মুদ্রার তারিখ আছে।[৭৯] এ সম্পর্কে অনেকে বলেছেন যে যোগ্য পুত্রদের সুলতানের জীবদ্দশায় স্বনামে মুদ্রা জারী করার অনুমতি অনেকে দিতেন।[৮০] নসরৎ ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন বলে মনে হয়।

এ পর্বে পূর্ব ভারতে ক্রমবর্ধমান মোগলশক্তির বিস্তারে নসরতের নেতৃত্বে মোগল বিরোধী শক্তি সংঘ (Anti-Mughal Confederacy) গঠন তাঁর এক বিশেষ কীর্তি বলে অনেকে মনে করেন। কূটনীতিক দূরদর্শিতার সহায়তায় তিনি প্রায় দু বছর বাবরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এড়ালেও ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ হয়। 'বাবর নামায়' এর উল্লেখ আছে। এই যুদ্ধে নসরৎ পরাজিত হলেও কেবলমাত্র মৌখিক আনুগত্য স্বীকার করেন। 'বাবর নামায়' উল্লেখ করা হয়েছে যে আফগানদের দমন করাই বাবরের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এবং বর্ষাকাল আসন্ন দেখে বাবর নসরতের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করেন এবং আফগান দমনে মনোনিবেশ করেন।[৮১]

গুজরাটের বাহাদুর শাহকে নসরৎ পূর্ব-কথিত শক্তিসংঘের সভ্য করতেও সচেষ্ট হয়েছিলেন বলে অনেকের ধারণা। কিন্তু এই সময়েই তিনি নিহত হন। বাংলাদেশে পর্তুগীজদের ঘাঁটি স্থাপনের চেষ্টা তাঁর শক্তিতেই আর একবার ব্যর্থ হয়।

নসরতের রাজ্যের আয়তন সুবৃহৎ ছিল — প্রায় সমগ্র বাংলা, ত্রিহুত, বিহারের অধিকাংশ অঞ্চল এবং উত্তরপ্রদেশের কিয়দংশ। ধর্মপ্রাণ নসরৎ গৌড়ে অনেকগুলি মসজিদও নির্মাণ করেন, তন্মধ্যে 'বড় সোনা মসজিদ' বা 'বারদুয়ারী' এবং কদম রসুলের ভবন প্রকোষ্ঠে হজরত মহম্মদের পদচিহ্ন সমন্বিত কৃষ্ণবর্ণ পীঠিকা উল্লেখযোগ্য।

গোলাম হোসেনের মতে শেষ জীবনে তিনি জনগণের উপর অকথ্য অত্যাচার সুরু করেন। জনৈক দণ্ডিত খোজা তাঁর পিতার সমাধিস্থল থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁকে হত্যা করে।[৮২] কিন্তু বুকাননের বিবরণে নিদ্রিত অবস্থায় প্রধান খোজার হস্তে তিনি নিহত হন।[৮৩]

নসরতের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা আবদুল বদরের (মামুদ) সিংহাসনের অধিকারকে অগ্রাহ্য করে রাজসভার এক প্রভাবশালী গোষ্ঠী নসরতের পুত্র আলা-উদ-দীন ফিরোজ শাহ (দ্বিতীয়)কে ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান নির্বাচিত করেন। ফিরোজ শাহ ছিলেন সুদক্ষ শাসক ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। যুবরাজ থাকাকালীন তাঁর আদেশে দ্বিজ শ্রীধর 'বিদ্যাসুন্দর' বা 'কালিকা মঙ্গল' রচনা করেন।এটিই বাংলায় প্রথম বিদ্যাসুন্দর কাব্য হিসেবে স্বীকৃত। রিয়াজের মতে তিনি তিন বছর রাজত্ব করেন,[৮৪] কিন্তু বুকাননের মতে এবং শিলালিপি ও মুদ্রার সাক্ষ্যে তিনি নয় মাস রাজত্ব করেন।[৮৫]

এরপর পিতৃব্য গিয়াস-উদ-দীন মামুদ শাহ দ্বিতীয় আলা-উদ-দীন ফিরোজ শাহকে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর পূর্ব নাম ছিল আবদুল বদর বা আব্‌দ শাহ বা বদর শাহ।[৮৬] সমরনীতিতে অজ্ঞ, অদূরদর্শী, নির্বোধ, চূড়ান্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ দুর্বল চিত্তের মামুদ শাহ শের খানের সঙ্গে সংঘর্ষে পরাজিত ও বিতাড়িত হয়ে হুমায়ুনকে বঙ্গদেশে যাওয়ার জন্য অনুনয় বিনয় করে তাঁর সেনার সহযাত্রী হন। কিন্তু গৌড় দুর্গ অধিকারকালে পাঠান সেনাপতি জালাল খাঁর হস্তে

পুত্রগণের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর কিছুদিনের মধ্যেই শোকগ্রস্ত মামুদ শাহের মৃত্যু ঘটে।[৮৭] এই ভাবেই হোসেন শাহী রাজত্বের অবসান ঘটে এবং বাংলায় পাঠান প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। তবে তাঁর রাজত্বকালে সাদুল্লাপুরে জান জাহানিয়া মসজিদ নির্মিত হয়।[৮৮] সাহাপুরে আবিষ্কৃত একটি শিলালিপি অনুসারে মামুদ শাহ একটি তোরণও নির্মাণ করেন।[৮৯] তাঁর আমলেই পর্তুগীজদের বাংলায় চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রামে বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হয়।[৮৯ক]

মামুদ শাহের মৃত্যুর পর হুমায়ুন বিনা বাধায় গৌড় নগর অধিকার করেন (জুলাই, ১৫৩৮)। নাসির-উদ-দীন মোহাম্মদ হুমায়ুন 'গৌড়' নামটি অশুভকর (আরবী-গোর?) বিবেচনা করে[৯০] তার নাম রাখেন 'জন্নতাবাদ' (আঃ.জন্নত) অর্থাৎ স্বর্গপুরী।[৯১] কিন্তু আবুল ফজলের এই উক্তি যথার্থ নয় এজন্য যে গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহের মুদ্রায় 'জন্নতাবাদ' শব্দটি পাওয়া যায়। অর্থাৎ পঞ্চদশ শতকের গোড়ায় এ নামটি দেখা যায়।[৯২] রিয়াজ তাঁর নামে খোত্‌বা ও সিক্‌কার প্রচলনের কথা বললেও[৯৩] হুমায়ুনের এই পর্বের মুদ্রা আজও অনাবিষ্কৃত।

হুমায়ুনের গৌড় বাস প্রায় ন মাস কাল। এরই মধ্যে তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে কর্মচারীদের জায়গীর প্রদান করেন। এ দিকে হুমায়ুন ভ্রাতা মীর্জা হিন্দালের বিদ্রোহের খবর পেয়ে জাহাঙ্গীর কুলী বেগকে বাংলার সুবাদার পদে ও সহকারী হিসেবে ইব্রাহিমকে নিযুক্ত করে গৌড় ত্যাগ করেন।[৯৪]

এ দিকে চৌঁসার যুদ্ধে (১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুন) শের খানের সঙ্গে হুমায়ুনের যে যুদ্ধ হয়, তাতে হুমায়ুন বিপর্যস্ত ও পরাজিত হন এবং জলে নিমজ্জিত হলে নিজাম-উদ-দীন নামক ভিস্তি তাঁকে রক্ষা করে।[৯৫] পুরস্কার স্বরূপ পরে সম্রাট হুমায়ুন ভিস্তিকে দু ঘণ্টা (মতান্তরে ৬/১২ ঘণ্টা) সিংহাসনে বসার অনুমতি দেন।[৯৬] হুমায়ুনকে পরাজিত করে আফগান বীর শের খান শূর বাংলার দিকে অগ্রসর হয়ে গৌড় পুনরাধিকার করেন। হুমায়ুন কর্তৃক নিযুক্ত জাহাঙ্গীর কুলী বেগ শের খানের পুত্র জালাল খান ও হাজী খান বটনীর দ্বারা পরাজিত ও নিহত হন (অক্টোবর, ১৫৩৯ খ্রীঃ)। চট্টগ্রাম অঞ্চল তখনও পর্যন্ত গিয়াস-উদ্-দীন মামুদ শাহের কর্মচারীদের হাতেই ছিল। শের খানের জনৈক সহকারী 'নোগাজিল' চট্টগ্রাম অধিকার করেন। ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ও বিহার জয়ের পর শের খান ফরিদ-উদ-দীন আবুল মুজাফফর শের শাহ নাম ধারণ করে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং প্রায় এক বছর এখানে শাসনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে পুনরায় হুমায়ুনের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। শেষে কনৌজের যুদ্ধে (১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ) শের শাহ হুমায়ুনকে পর্যুদস্ত করে ভারত ত্যাগে বাধ্য করেন ও দিল্লীতে রাজধানী স্থাপন করেন এবং বাংলা দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্যতম একটি প্রদেশে পরিণত হয়। কিন্তু মাত্র পাঁচ বছর রাজত্ব করার পর কালিঞ্জর দুর্গ জয়ের সময়ে ভূগর্ভস্থ বারুদখানায় অগ্ন্যুৎপাত হলে তিনি পরলোক গমন করেন।[৯৭] অল্প কয়েক বছরের মধ্যে শের শাহ বাংলায় যে নতুন শাসন ব্যবস্থার প্রচলন করেন, তা শুধুমাত্র ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণই নয়, তা শের শাহের অসামান্য প্রতিভা ও দূরদর্শিতারই পরিচায়ক। সুতরাং ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল তারিখে শের খানের গৌড় জয়ের সঙ্গেই বাংলার স্বাধীনতা লুপ্ত হয় এবং বাংলা আফগানদের অধিকারে এসে ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ মোঘল সম্রাট আকবরের বাংলা জয় পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৮ বছর বাংলায় আফগান-শাসনেরই ইতিহাস।[৯৮] অবশ্য এর মধ্যে প্রথম দিকে হুমায়ুন ন মাস গৌড়ে বাস করেন। [৯৮ক]

শের শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জলাল খান সূর ইসলাম শাহ নাম ধারণ করে 'সুলতান'

হন এবং দীর্ঘ ৮ বছর রাজত্ব করেন (১৫৪৫-৫৩ খ্রীষ্টাব্দ)। তাঁর রাজত্বকালে কালিদাস গজদানী নামে একজন বাইস বংশীয় হিন্দু রাজপুত সুলতান গিয়াস-উদ-দীন শাহের কন্যাকে বিবাহ করে সোলায়মান খান নাম গ্রহণ করে পূর্ববঙ্গের অংশবিশেষ অধিকার করে স্বাধীন রাজা হন। ইসলাম খানের দুই সেনানায়ক তাজ খান ও দরিয়া খান তাঁকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে সোলায়মান পুনরায় বিদ্রোহ করলে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাজ খান ও দরিয়া খান তাঁকে হত্যা করেন এবং তাঁর দুই পুত্রকে তুরাণী বণিকদের নিকট বিক্রয় করে দেন।[৯৯] ইসলাম শাহের রাজত্বকালে শিকান্দার সূরের ভ্রাতা কালাপাহাড় (অনেকে তাঁকে হিন্দু বলেছেন,[৯৯ক] কিন্তু আবুল ফজল আল্লামির আকবরনামা, মন্তখব-উৎ তাওয়ারিখ (বদউনী) ও নিয়ামত উল্লাহের মখজানি-ই-আফগানীতে তিনি জন্মে মুসলমান ও আফগান বলে উল্লিখিত) কামরূপ আক্রমণ করে হাজো ও কামাখ্যার মন্দিরগুলি ধ্বংস করেন।[১০০]

ইসলাম শাহর মৃত্যুর (১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর) পর তাঁর নাবালক পুত্র ফিরুজ শাহ মাত্র কয়েকদিন দিল্লীর সিংহাসনে বসার পর শের শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র মুবারিজ খান তাঁকে হত্যা করেন এবং মুহম্মদ আদিল শাহ নাম ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর অত্যাচার অমাত্যদের বিদ্রোহী করে তোলে। আদিলের দুর্বলতার সুযোগে অনেক প্রাদেশিক শাসনকর্তাও স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বাংলার শাসনকর্তা মুহম্মদ খানও স্বাধীনতা ঘোষণা করে শাম-উদ-দীন মুহম্মদ শাহ গাজী নাম ধারণ করে বাংলার সুলতান হন (১৫৫৩ খ্রীঃ)। এর পর আরাকান হানা দিয়ে জৌনপুর অধিকার করে আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হওয়া কালীন মুহম্মদ শাহের হিন্দু সেনাপতি হিমু তাঁকে ছাপরঘাটের যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন (১৫৫৫ খ্রীঃ)। এই যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে মুহম্মদ শাহ আদিল শাহবাজ খানকে বাংলার শাসনকর্তা রূপে নিযুক্ত করেন।[১০১]

শামস-উদ-দীন মুহম্মদ শাহ গাজীর মৃত্যুর পর তাঁর অমাত্যেরা তাঁর পুত্র খিজির খানকে গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুর শাহ উপাধি দিয়ে সিংহাসনে বসান। বাহাদুর শাহ শাহবাজকে পরাজিত করে গৌড় অধিকার করেন এবং পরবর্তী পর্বে পিতৃহন্তা আদিল শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। (১৫৫৭ খ্রীঃ)। এদিকে আদিল শাহের বিদ্রোহী সেনাপতিদ্বয় তাজ খান কররানী ও তাঁর ভাই বাহাদুর শাহের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় যুদ্ধে আদিল শাহ পরাজিত ও নিহত হন। তাজ খান কররানীকে তখন তিনি বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করেন। এ দিকে দিল্লীতে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে হুমায়ুনের দিল্লী পুনরাধিকার এবং তাঁর মৃত্যুর পর আকবরের সিংহাসন লাভ ও জৌনপুর পর্যন্ত মোগলদের অধিকারে আসে। এ দিকে বাহাদুর শাহের সঙ্গে মোগল সেনাপতি খান-ই জামানের যুদ্ধে মোগলেরই জয় হয়। তবে বাহাদুর শাহ এর পরবর্তী পর্বে মোগলের বিরোধিতা করেন নি। ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে বাহাদুর শাহের মৃত্যু হয়।

তারপর গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুর শাহের ভ্রাতা দ্বিতীয় গিয়াস-উদ-দীন জলাল-উদ-দীন শাহ উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দের কিছু অংশ রাজত্ব করেন বলে অনুমান।[১০২] জলাল শাহের মৃত্যুর পর তাঁর এক পুত্রের সিংহাসন প্রাপ্তির কথা জানা গেলেও, তাঁর নাম মেলে নি। রিয়াজের মতে কিঞ্চিদধিক সাত মাস সুলতান থাকার পর জনৈক ব্যক্তি তাঁকে হত্যা করে তৃতীয় গিয়াস-উদ-দীন নাম ধারণ করে সুলতান হন।[১০৩] কিন্তু দু বছরের মধ্যেই শের শাহের প্রধান কর্মচারী ও অমাত্য কররানী বংশের তাজ খান

তাঁকে হত্যা করে বাংলার সুলতান হন। (১৫৬৪ খ্রীঃ)[১০৪]

কররানী বংশের চারজন রাজত্ব করেন। এঁরা তাজ খান কররানী, সোলায়মান কররানী, বায়েজিদ কররানী ও দাউদ কররানী। তাজ কররানী মাত্র এক বছরের মধ্যেই মারা যান এবং তাঁর ভ্রাতা সোলায়মান কররানী প্রায় ৮ বছর (১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) রাজত্ব করেছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ ও শক্তিশালী শাসনকর্তা। তাঁর রাজ্যের সীমান্ত ক্রমশ দক্ষিণে পুরী, পশ্চিমে শোন নদ এবং পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। তাঁর রাজস্বও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় এবং বাংলার অধিপতি হলে তাঁর রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলাও স্থাপিত হয়। ন্যায় বিচারক হিসেবেও তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল। মুসলমান আলিম ও দরবেশদের তিনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি শরিয়তি বিধান কার্যকরী করেন এবং নিজেও তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন।[১০৫] সোলায়মান অস্বাস্থ্যকর গৌড় নগর পরিত্যাগ করে টাঁড়ায় (তান্ডা) রাজধানী স্থাপন করেন। অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে তিনি আকবরের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা পরিহার করে চলেন এবং উড়িষ্যা ও কোচবিহার লুণ্ঠন করেন। তাঁর সেনাপতি কালাপাহাড় পুরীর জগন্নাথ মন্দির লুণ্ঠন করে বহু ধন রত্ন নিয়ে আসেন। মালদা জেলার গুয়ামালতীতে কালাপাহাড়ের বাড়ী ছিল বলে জনশ্রুতি আছে। সোলায়মানের জীবদ্দশায় মোগলেরা বাংলা আক্রমণ করে নি। ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর সোলায়মানের মৃত্যু হয়। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়েজিদ কররানী এর পর সিংহাসনে বসেন। তাঁর উদ্ধত আচরণ ও কঠোর ব্যবহার স্বল্পকালের মধ্যে অমাত্যদের ক্ষুব্ধ করে তোলে। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে একদল অমাত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সোলায়মানের ভাগিনেয় এবং জামাতা হন্‌সু (বা হাঁসু) বায়েজিদকে হত্যা করেন বটে, কিন্তু তিনি নিজেই লোদী খান ও অন্যান্য বিশ্বস্ত অমাত্যদের হাতে নিহত হন। স্বল্পকাল রাজত্ব করলেও বায়েজিদ আকবরের অধীনতা অস্বীকার করে স্বীয় নামে খুৎবা পাঠ ও মুদ্রা উৎকীর্ণ করান।

কিন্তু অমাত্যরা হন্‌সুকেও বধ করে সোলায়মানের দ্বিতীয় পুত্র দাউদকে সিংহাসনে বসান। দাউদ নির্বোধ, উত্তপ্ত মস্তিষ্ক, লঘুচিত্ত, বিলাসী, মদ্যপ, দুশ্চরিত্র, কানপাতলা ও নিষ্ঠুর ছিলেন। তিনি নিজ নামে খুৎবা পাঠ করেন ও সিক্কার প্রচলন করেন।[১০৬] অনিবার্যভাবে মোগল বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে সন্ধির প্রস্তাব করে নিজে মোগল শিবিরে উপনীত হন। মুনিম খাঁ সদাশয়তা প্রদর্শন করে কোমরবন্ধ, ছোরা ও মণি-খচিত তরবারি দাউদ খাঁকে উপহার দিয়ে তাঁকে উড়িষ্যা ও কটক বানারস ছেড়ে দিয়ে অবশিষ্ট অঞ্চল মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। তারপর তিনি মহাসমারোহে তাণ্ডা নগরে আগমন করে শাসনকার্যে প্রবৃত্ত হন।[১০৭] এ দিকে বর্ষায় তাণ্ডার (টাঁড়া) নীচু জলা অংশে অসুবিধা হওয়ায় গৌড়ে রাজধানী স্থাপনের আশায় মুনিম খাঁ গৌড় জয় করেন। কিন্তু গৌড় দীর্ঘকাল পরিত্যক্ত হয়ে অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মহামারীতে হাজার হাজার লোকের মৃত্যু হয়। মোগল সৈন্যও গৌড়ে মহামারীর কবলে পড়ে। সুবাদার মুনিম খাঁ এই অবস্থায় গৌড় থেকে রাজধানী পুনরায় টাঁড়ায় নিয়ে যান। কিন্তু ফেরার মাত্র দশ দিন পরে ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর পরলোক গমন করেন।[১০৭ক]

মুনিম খানের মৃত্যুর পর আফগানেরা অত্যুৎসাহে মোগলদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। মোগলদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং শত্রুদের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে তারা ভাগলপুরে চলে আসে। এ পর্বে আকবর কর্তৃক বাংলার শাসনকর্তা হাসান কুলী বেগ ওরফে খান-ই-জাহান পুনরায় বিদ্রোহকারী দাউদ কররানীকে রাজমহলের যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। প্রথম দিকে

মোগলদের নিষ্ক্রিয়তার জন্য তাদের প্রতিকূল অবস্থার কথা আবুল ফজল উল্লেখ করেছেন। কিন্তু দাউদের নির্বুদ্ধিতাই তাঁকে নিশ্চিত জয় থেকে পরাজিত করে এবং পরিণামে তিনি নিহত হন।[১০৮] তাঁর ছিন্ন শির দিল্লীতে আকবরের নিকট প্রেরিত হল। দাউদ কররানীর মৃত্যুর (১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দ) সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় আফগান-শাসন সমাপ্ত হয়।

# মোগল যুগ

দাউদ কররানীর পর তিন বছরেরও কিছু বেশী কাল দক্ষতার সঙ্গে শাসন করার পর খান-ই-জাহানের মৃত্যু (১৯শে ডিসেম্বর, ১৫৭৮) হলে বাংলার সুবাদার হন মুজাফফর খান। কিন্তু তিনি ছিলেন এ পদের অযোগ্য। এ সময়ে আকবর প্রবর্তিত নূতন শাসনরীতি সর্বত্র প্রচারিত হওয়ায় সমগ্র দেশ কতিপয় সুবায় বিভক্ত হয়ে প্রতি সুবায় একজন সিপাহসালার বা সুবাদার ব্যতীত বিভিন্ন বিভাগের অধ্যক্ষরা দিল্লী থেকে নিযুক্ত হয়ে আসতেন। রাজস্ব আদায়েরও যে নূতন ব্যবস্থা হল, তাতে এতদিন নিযুক্ত মোগল কর্মচারীদের যথেচ্ছচার ও অর্থ উপার্জনের নানা পদ্ধতি বন্ধ হওয়াতে সুবে বাংলা ও বিহারের কর্মচারীরা বিদ্রোহ করে। আকবরের ভ্রাতা কাবুলের শাসনকর্তা মীর্জা হাকিমও দিল্লীর মসনদের জন্য ষড়যন্ত্র করায় বিদ্রোহীরা তাঁকে সহায়তা করে। এই বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধে মুজাফফর খান পরাজিত ও টাঁড়ায় নিহত হন (১৯শে এপ্রিল, ১৫৮০)।[১০৯] মীর্জা হাকিম সম্রাট বলে ঘোষিত হলেন এবং বাংলায় নবনিযুক্ত সুবাদারের আমলে মোগল সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে সাময়িক অরাজকতা দেখা দিল। কিন্তু বছর খানেকের মধ্যেই (১৫৮২ খ্রীঃ) আকবর খান-ই-আজমকে সুবাদার নিযুক্ত করেন এবং বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত থাকেন। তার পর সুবাদার শাহবাজ খান। তিনি প্রথমে বিশেষ কোন সুবিধা করতে অপারগ হওয়ায় যুদ্ধের পরিবর্তে তোষণ-নীতি ও উৎকোচ প্রদানে বহু পাঠান বিদ্রোহীদের বশীভূত করেন। ঈশা খান ও মাসুমী কাবুলীও বশ্যতা স্বীকার করেন। পাঠান নায়ক কুৎলু খান উড়িষ্যায় রাজত্ব করলেও শাহাবাজ তাঁর বিরুদ্ধাচারণ না করায় ১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দে বাংলায় মোগল আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এবং পরের বছর অর্থাৎ ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার জন্য নূতন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সে ব্যবস্থায় ওয়াজিব খান প্রথম সিপাহসালার বা সুবাদার নিযুক্ত হলেও অনতিকালেই তাঁর মৃত্যু হয় (আগষ্ট, ১৫৮৭)। তার পর আসেন সৈয়দ খান (১৫৮৭-১৫৯৪ খ্রীঃ)। তাঁর সময়ে পুনরায় পাঠান ও ভূস্বামীরা শক্তিশালী হন।[১১০]

এর পর ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার শাসনকর্তা হন রাজা মানসিংহ। রাজমহলে এক নূতন রাজধানী স্থাপন করে তিনি তার নাম দেন আকবর নগর এবং ঈশা খানকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। মানসিংহের দুই পুত্র হিম্মৎ সিংহ কলেরায় ও দুর্জন সিংহ ঈশা খান-মাসুম খানের সঙ্গে

নৌযুদ্ধে মৃত্যুমুখে পতিত হলে শোকাতুর মানসিংহ সম্রাটের অনুমতিতে আজমীরে গমন করেন এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জগৎ সিংহ উপ-শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। কিন্তু অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে আগ্রা যাওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর বালক পুত্র মহাসিংহ ঐ পদে অধিষ্ঠিত হন। এ সুযোগে আবার বিদ্রোহীরা জাগ্রত হয় ও পাঠান শক্তি উড়িষ্যার উত্তরাংশ পর্যন্ত দখল করায় বিপর্যয় রোধে পুনরায় মানসিংহ হাল ধরেন (১৬০১ খ্রীস্টাব্দ)। অকুতোভয় মানসিংহ একে একে পূর্ববঙ্গের বিদ্রোহীদের, পাঠান নায়ক কুৎলু খানের ভ্রাতুষ্পুত্র উসমানকে ও ঈশা খানের পুত্র মুসা খান ও কুৎলু খানের উজীর পুত্র দাউদ খান সহ অন্যান্য বিদ্রোহীদের পরাস্ত করে বিতাড়িত করেন। মালদহ অভিমুখে তিনি মহাসিংহকে প্রেরণ কালে কালিন্দ্রীর পরপারের বিদ্রোহীদেরও তিনি পরাজিত করেন। তা ছাড়া তিনি ঢাকা অঞ্চলে আরাকানের মগ দস্যুদের এবং বিক্রমপুরের নিকট কেদার রায়কে পরাজিত করে উসমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজনে তাঁকেও পালাতে বাধ্য করলে বাংলায় কিয়ৎ পরিমাণে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফেরে।[১১১] মানসিংহ আকবরের নির্দেশে ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং আকবরের মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন।

সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সেলিম 'জাহাঙ্গীর' নাম ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৬০৫ খ্রীঃ)। জাহাঙ্গীরও মানসিংহকে পুনরায় বাংলার শাসনকর্তা করেন। কিন্তু বর্ধমানের তুর্কী জায়গীরদার শের আফকান ইস্তলজুর অসামান্যা রূপবতী পত্নীকে সম্ভবত হস্তগত করার বাসনায় তাঁর বিশ্বস্ত ধাত্রীপুত্র কুৎবুদ্দীন খান কোকাকে বাংলার সুবাদার পদে নিয়োগ করেন। কুৎবুদ্দীন ও শের আফকান উভয়েই সংঘর্ষে নিহত (১৬০৭ খ্রীঃ) হলে তাঁর বিধবা পত্নীবে আগ্রার মোগল হারেমে আনার পর জাহাঙ্গীর তাঁকে বিবাহ করেন এবং তাঁর নাম হয় 'নূরজাহান'।[১১২]

কুৎবুদ্দীনের পর মাত্র এক বছর বাংলার সুবাদার ছিলেন জাহাঙ্গীর কুলী খান। তাঁর মৃত্যু হলে সুবাদার হন ইসলাম খান (১৬০৮ খ্রীঃ)[১১২ক] মাত্র পাঁচ বছরে তিনি অসাধারণ শৌর্য ও রাজনীতিজ্ঞানে সমগ্র বাংলায় মোগল শক্তিকে সুদৃঢ় করেন। তাঁর আমলে মালদহের এক বিদ্রোহী ক্ষুদ্র মনসবদার আলি আকবর (আনু. ১৬১১ খ্রীঃ) পর্যুদস্ত হন। প্রকৃতপক্ষে সে সময় বাংলার বিভিন্ন অংশে অনেক জমিদার মুখে মোগলের বশ্যতা স্বীকার করলেও সুযোগ-সুবিধা পেলে তাঁরা বিদ্রোহ করতেন। তাঁদের মধ্যে পূর্ববঙ্গের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঈশা খাঁ ও তাঁর পুত্র মুসা খাঁ, ভূষণার সত্রাজিৎ, সুসঙ্গের রঘুনাথ, যশোহরের প্রতাপাদিত্য, বাকলার রামচন্দ্র, ভুলুয়ার অনন্তমাণিক্য এবং পশ্চিমবঙ্গের মল্লভূম ও বাঁকুড়ার বীর হাম্বীর, পাঁচের শামস্ খান ও হিজলীর সেলিম খান।[১১৩]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে আকবরের আমলে মোগল কর্তৃক বাংলা বিজিত হলেও প্রকৃত বাংলা জয়ের গৌরব রাজা মানসিংহ ও তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী ইসলাম খানের।

ইসলাম খানের পর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাশিম খানের (১৬১৪-১৭ খ্রীঃ) সময়ে মোগল শাসন দুর্বল হয়ে পড়লেও তাঁর পরের সুবাদার ইব্রাহিম খান ফতেহ জঙ্গের দক্ষতায় পুনরায় মোগল শক্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময়ে পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে সাজাহান বিদ্রোহ করে বাংলায় এসে পুরাতন বিদ্রোহী মুসা খানের পুত্র, আরাকান রাজ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের সহায়তায় বাংলায় স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হলে ইব্রাহিম পিতা-পুত্রের দ্বন্দ্বে বিপাকে পড়ে শেষ পর্যন্ত রাজমহল-দখলে উভয় পক্ষের যুদ্ধে ইব্রাহিম পরাজিত ও নিহত হন। সাজাহান রাজধানী জাহাঙ্গীর

নগর অধিকার করে রাজত্ব করতে থাকেন। তিনি উড়িষ্যা, বিহার ও অযোধ্যা জয় করলেও শেষে বাদশাহী সৈন্যের হাতে পরাজিত হয়ে বাংলা ত্যাগ করে (অক্টোবর, ১৬২৪ খ্রীঃ) দাক্ষিণাত্যে ফেরেন। তবে তার চার বছর পরে পিতার দেহান্তের পর সম্রাট হন (১৬২৮ খ্রীঃ)।[১১৪]

সাজাহান থেকে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু (১৭০৭ খ্রীঃ) পর্যন্ত বাংলায় মোগল শাসন সামগ্রিকভাবে শান্তি ও শৃঙ্খলায় অতিবাহিত হয়। প্রায় আশী বৎসরের মধ্যে এখানকার তিনজন সুবাদার স্মরণীয়। তাঁরা হলেন — সাজাহানের পুত্র শাহ সুজা (১৬৩৯-১৬৫১খ্রীঃ), শায়েস্তা খান (১৬৬৪-১৬৮৮ খ্রীঃ) এবং ঔরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম-উস্-সান (১৬৯৮-১৭০৭ খ্রীঃ)। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে শাহ সুজা বাংলার শাসনকর্তা হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করা পর্যন্ত (১৬৩৯ খ্রীঃ) মালদহ জেলার বিশেষ খবর মেলে না। তিনি অবশ্য রাজমহলেই সাধারণতঃ বাস করতেন। ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সাজাহানের গুরুতর পীড়া হলে এবং জ্যেষ্ঠপুত্র দারা শিকোহকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করলে, ভ্রাতৃবর্গের যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তাতে সুজা খাজুয়ার যুদ্ধে (জানুয়ারী, ১৬৫৯ খ্রীঃ) পরাজিত হলে মোগল সেনাপতি মীর জুমলা ঢাকা নগরী অধিকার করেন (মে, ১৬৬০ খ্রীঃ)। সুজা আরাকানে পলায়ন করেন এবং শেষ পর্যন্ত আরাকানরাজের দ্বারায় নিহত হন। ঔরঙ্গজেব মীর জুমলাকে সাত হাজারী মনসবদার করে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। মীর জুমলার আক্রমণে কোচবিহার ও কামরূপ রাজদ্বয় পলায়ন করায় তাঁদের রাজ্য অধিকারে আসে বটে, কিন্তু বর্ষাতে অহোমরাজ্য নিমজ্জিত হলে মোগল শিবিরগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়। খাদ্যাভাবে বহু অশ্ব এবং সংক্রামক ব্যাধিতে বহু সৈন্যের মৃত্যু ঘটে। কিন্তু হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হওয়ায় অহোমরাজের সঙ্গে সন্ধি করে ঢাকায় পৌঁছানর কয়েক মাইল পূর্বেই মীর জুমলার মৃত্যু ঘটে (মার্চ, ১৬৬৩ খ্রীঃ)।

মীর জুমলার সময়ে ইংরেজ কুঠিয়ালদের (English Factors) সঙ্গে হুগলীতে Customs ও বালেশ্বরে নোঙ্গরের জন্য ট্যাক্সের ব্যাপারে তাঁর বিরোধ হয়। অথচ প্রতি বছর ইংরেজ-জাহাজে করে তিনি কোন শুল্ক না দিয়ে পারস্যে gumlac পাঠাতেন। মীর জুমলা তাঁর সামরিক ও অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ইংরেজ (ক্যাপ্টেন ভারসন) এবং পর্তুগীজ (টমাস, প্রিট)-দের জাহাজের সাহায্য নিতেন। এমন কি কতিপয় Muscovetes এবং আর্মেনিয়ানদের মোগল সৈন্যদলে গ্রহণ করেছিলেন। তবে তাঁর আসাম অভিযান গ্রীক ট্রাজেডির মত মহাশক্তি অদৃশ্য নিয়তির দ্বারা ব্যর্থ হয়।[১১৫] তাঁর মৃত্যুতে বাংলার নৈরাজ্য বা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে শায়েস্তা খান বাংলার সুবাদার হয়ে আসেন ৬৩ বছর বয়সে। তিনি উপযুক্ত কর্মচারী ও তাঁর যোগ্য পুত্র চতুষ্টয়ের[১১৬] সাহায্যে কঠোর হস্তে শৃঙ্খলার সঙ্গে রাজ্য শাসন করতেন। কোচবিহারের রাজাকে বিতাড়ন, চট্টগ্রাম বিজয় তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি। তিনি দিল্লীর দরবারকে সন্তুষ্ট করতে প্রচুর অর্থ যোগান দিতেন জনগণের উপর কর চাপিয়ে ও শোষণ করে। যেমন ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাটকে সাত লক্ষ মুদ্রা ধার দিয়ে পরের বছর তিনি 'পেশকাশ' হিসেবে দেখান। ১৬৮২ ফেব্রুয়ারিতে তিনি সম্রাটের দাক্ষিণাত্য অভিযানে বাংলার (খরচ-ই-ইসাক) বাৎসরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে পাঁচ লক্ষ মুদ্রা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা থেকে জিজিয়া কর হিসেবে এক লক্ষ মুদ্রা এবং ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সুবাদার হিসেবে তাঁর পুনঃ আগমনের সময় তিনি সম্রাটকে ৩০ লক্ষ মুদ্রা ও ৪ লক্ষ মুদ্রার মণিরত্ন খচিত অলংকার নজরানা দেন।[১১৭] সুতরাং প্রজা-

শোষণ ও সম্রাট-তোষণ করে নিজে রাজোচিত ঐশ্বর্য ও জাকজমকপূর্ণ নিরুদ্বেগ জীবন যাপন করে তিনি হারেমে সুখী ছিলেন। শায়েস্তা খানের নিজস্ব জায়গীর ছিল মালদহে। যদিও ইংরেজরা বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুমতি শাহ সুজার সময়েই পায় (১৬৫০ খ্রীঃ) এবং শীঘ্রই হুগলীতে (১৬৫১ খ্রীঃ) এবং শায়েস্তা খানের সময়ে ঢাকা (১৬৬৮ খ্রীঃ), রাজমহল ও মালদহে (১৬৮০ খ্রীঃ) তাদের কুঠি স্থাপন করে।

শায়েস্তা খানের পর ঔরঙ্গজেবের ধাত্রীপুত্র অপদার্থ খান-ই-জাহান বাহাদুর এবং মাত্র এক বছর পর খাঁটি পারসী দুর্বল বৃদ্ধ ইব্রাহিম খান বাংলার সুবাদার হয়। তাঁর রণনিপুণতা ছিল না বটে, কিন্তু তিনি ছিলেন কোমল হৃদয়, ফার্সী গ্রন্থের একনিষ্ঠ পাঠক ও ন্যায়নিষ্ঠ। তাঁর আমলে মেদিনীপুর জেলার ঘাঁটাল-চন্দ্রকোণা মহকুমার ছেটো-বর্দার জমিদার শোভা সিংহ লুণ্ঠন করে অনুচর সংখ্যা বৃদ্ধি করে রাজা উপাধি ধারণ করেন এবং উড়িষ্যার পাঠান সর্দার রহিম খানের সহায়তায় বিরাট ভূখণ্ডের মালিক হন। বর্ধমানের রাজস্ব আদায়ের ইজারা প্রাপ্ত রাজা কৃষ্ণরাম বিরোধিতা করায় তাঁকে হত্যা করেন ও কৃষ্ণরামের কন্যার উপর অত্যাচারে উদ্যত হলে সেই বীরাঙ্গনা শোভা সিংহকে ছুরিকাঘাতে বধ করে নিজেও আত্মহত্যা করেন।[১১৮]

শোভা সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা হিম্মৎ সিংহ দলনায়ক হলেও সৈন্য সামন্তেরা রহিম খানকেই তাদের নায়ক হিসেবে গ্রহণ করায় রহিম খান 'রহিম শাহ' উপাধি নিয়ে রাজা হন এবং দশ হাজার ঘোড়সওয়ার, ৬০ হাজার পদাতিক (যারা ভবঘুরে ও ভাগ্যান্বেষী পাঁচমিশালী ভাড়াতে সৈন্য) মখ্‌সুদাবাদ (মুর্শিদাবাদ) লুণ্ঠন করে রাজমহল ও মালদহ (১৬৯৭ খ্রীঃ) অধিকার করেন। তাঁর ছোট ছোট দলও বিভিন্ন দিকে লুঠ-তরাজ, অগ্নি সংযোগ ইত্যাদিতে জনগণকে তাদের দলে যোগ দিতে জোর জবরদস্তি করে।[১১৯]

এই সংবাদে ঔরঙ্গজেব ইব্রাহিম খানকে সুবাদার পদ থেকে বরখাস্ত করে তাঁব পৌত্র মোহম্মদ আজিম-উদ-দীন পরবর্তী পর্বে আজিম-উস-সানকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন (১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে)। এ দিকে রাজপুত্রের আগমনের পূর্বে রহিম খানের পুত্র জবরদস্ত খান ফিরিঙ্গী গোলন্দাজদের সহায়তায় রহিম খানকে পরাজিত করে রাজমহল, মালদহ, মখ্‌সুদাবাদ ও বর্ধমান অধিকার করেন এবং রহিম খান ও হিম্মৎ খান শেষ পর্যন্ত চন্দ্রকোণার জঙ্গলে আত্মগোপন করেন।

রাজপুত্র আজিম-উস্‌-সান বর্ধমানে পৌঁছে জবরদস্ত খানের কৃতিত্বের কথা পরিপূর্ণ উপেক্ষা করায় মনোকষ্টে জবরদস্ত তাঁর পিতার সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে রাজকীয় শিবিরে গমন করেন (জানুয়ারী, ১৬৯৮)। এই সুযোগে রহিম খান পুনরায় জঙ্গল থেকে বহির্গত হয়ে লুঠতরাজ সুরু করলে রাজপুত্র এক বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। চন্দ্রকোণার সন্নিকটে রহিম খান পরাজিত হন। মোগল নায়ক হামিদ খান কোরেশী তাঁর মস্তক দ্বিখণ্ডিত করেন (আগষ্ট ১৬৯৮)। হামিদের এই সাফল্যে তাঁকে সামসের খান বাহাদুর নামে সিলেটের ফৌজদার করা হয়।[১২০]

আজিম-উস-সান ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার সুবাদার থাকাকালীন দেওয়ান মুর্শিদকুলী খান তাঁর অবৈধ অর্থ সংগ্রহের পথ রুদ্ধ করায় আজিম-উস-সান তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেও ব্যর্থ হন। মুর্শিদকুলী খান সব ব্যাপার সম্রাটের গোচরে এনে দেওয়ানী

বিভাগ মখ্‌সুদাবাদে স্থানান্তরিত করেন — যা সম্রাটের অনুমতিক্রমে পরবর্তী পর্বে মুর্শিদাবাদ নামে পরিচিতি লাভ করে।

ঔরঙ্গজেবের পর দিল্লীর সম্রাট হন বাহাদুর শাহ (১৭০৭ খ্রীঃ)। তিনি পুত্র আজিম-উস-সানের প্ররোচনায় মুর্শিদকুলী খানকে দাক্ষিণাত্যের দেওয়ান হিসেবে প্রেরণ করেন বটে, কিন্তু বাংলার দেওয়ান জিয়াউল্লাহ খান বিদ্রোহী নাকদীদের দ্বারা নিহত হওয়ায় (২০ জানুয়ারী, ১৭১০) , মুর্শিদকুলী খানকে বাংলার দেওয়ান পদে (২০শে ফেব্রুয়ারী) অভিষিক্ত করে উচ্চতম তিন হাজারী জাঠ এবং দামামা দ্বারা সম্মানিত করা হয় (এপ্রিল, ১৭১০ খ্রীঃ)। দাক্ষিণাত্যের এক ব্রাহ্মণ সন্তান মুর্শিদকুলী খান বাল্যবয়সে হাজী সফী ইসপাহানীর নিকট বিক্রীত হন এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে মুহম্মদ হাদি নামে পারস্যে তাঁর সঙ্গী হয়ে শিক্ষাদীক্ষায়, আচার-আচরণে, বুদ্ধি ও পরিশ্রমে উন্নত পারসিক সংস্কৃতিতে (Persian culture) ব্যুৎপত্তি লাভ করে অল্প দিনের মধ্যে প্রদেশের দ্বিতীয় উচ্চতম স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন। তাঁর দক্ষতা ও সততা সম্পর্কে ঔরঙ্গজেবের উচ্চ প্রশস্তি এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য।[১২১] মুর্শিদকুলী খান ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সুবাদার বা নবাব নিযুক্ত হন। এই পর্বে দিল্লীর অকর্মণ্য সম্রাটদের দুর্বলতা ও আত্মকলহে মোগল সাম্রাজ্য চরম অবনতির পথে অগ্রসর হয়। সে জন্য এই পর্ব থেকে বাংলার সুবাদাররা প্রায় স্বাধীনভাবেই রাজ্য শাসন করতে সুরু করেন।

অপুত্রক মুর্শিদকুলী খানের মৃত্যুর পর তাঁর মনোনীত দৌহিত্র সরফরাজ খানের দাবী অগ্রাহ্য করে তাঁর জামাতা সুজা-উদ-দীন মহম্মদ খান বাংলা ও উড়িষ্যার সুবাদারের পদে অধিষ্ঠিত হন (জুন, ১৭২৭ খ্রীঃ)। তিনি গুণবান হলেও বিলাসী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ হওয়ায় শাসন কার্য দুই ভ্রাতা হাজী আহমদ, আলিবর্দী খান এবং আলমচাঁদ ও জগৎ শেঠ ফতেচাঁদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। বাংলাকে দু ভাগে ভাগ করে কিছুটা স্বীয় হাতে রেখে অন্য অংশ ছাড়া বিহার ও উড়িষ্যার জন্য দুজন নায়েব-নাজিম নিযুক্ত করেন। বিহারের প্রথম নায়েব-নাজিম হন আলিবর্দী খান। এই পদে যোগ্যতা বিচার করে সুজা-উদ-দীনের (শুজাহ খাঁ) স্ত্রী জিনাতুন্নেসাই তাঁকে মনোনীত করে খেলাত ও অন্যান্য উপহারের নির্দেশ দেন।[১২২]

সুজা-উদ-দীনের মৃত্যুর পর (১৭৩৯ খ্রীঃ) তাঁর পুত্র সরফরাজ খান নবাব হন। তিনি অতি অযোগ্য ছিলেন এবং অধিকাংশ সময়ে হারেমে থাকায় শাসন ব্যবস্থা যেমন শিথিল হয়, তেমনই নানা ষড়যন্ত্র দেখা দেয়। তারই ফলে বাংলার প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য আলিবর্দীর সঙ্গে গিরিয়ার যুদ্ধে সফররাজ পরাজিত ও নিহত হলে আলিবর্দী মুর্শিদাবাদ অধিকার করেন। আলিবর্দী অতি বৃদ্ধ হয়েও জীবনে নানা যুদ্ধে বিশেষত মারাঠা বর্গীদের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর অপূর্ব সাহস, অধ্যবসায় ও রণকৌশল প্রশংসনীয়। তা ছাড়া তিনি ছিলেন অভিজ্ঞ প্রশাসক। উড়িষ্যার আধিপত্য নিয়ে রুস্তম জঙ্গের নায়েব মীর হবীর ও মারাঠাদের সঙ্গে দীর্ঘকাল যুদ্ধে উভয় পক্ষ শ্রান্ত হলে ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে মারাঠাদের সঙ্গে তাঁর তিনটি সন্ধি হয় —

১. মীর হবীর আলিবর্দীর অধীনে উড়িষ্যার নায়েব হবেন এবং উড়িষ্যার উদ্বৃত্ত রাজস্ব সৈন্যদের ব্যয় হিসেবে পাবেন রঘুজী ভোঁসলে।

২. রঘুজী ভোঁসলেকে প্রতি বছর ১২ লক্ষ টাকা দিতে হবে 'চৌথ' হিসেবে।

৩. মারাঠা সৈন্য সুবর্ণরেখা পার হয়ে বাংলায় প্রবেশ করবে না।

কিন্তু এক বছরের মধ্যে জনোজী ভোঁসলের মারাঠা সৈন্যরা মীর হবীরকে বধ করে রঘুজীর এক অমাত্যকে উড়িষ্যার নায়েব নাজিম পদে অধিষ্ঠিত করে। স্বাভাবিকভাবেই উড়িষ্যা মারাঠা রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়।

এমন পরিস্থিতিতে বাংলায় শান্তি এলেও এত দিনের যুদ্ধ ও অন্তর্দ্বন্দ্বে বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়েছিল। আলিবর্দীর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তাঁর ভ্রাতা হাজীর তিন পুত্রের সঙ্গে (যথাক্রমে ঢাকা, পূর্ণিয়া ও পাটনার নবাব) তিন কন্যার বিবাহ দেন। জ্যেষ্ঠা মেহের-উন-নিসা (ঘসেটি বেগম) নিঃসন্তান, দ্বিতীয়ার পুত্র সৌকত জঙ্গ ও মীর্জা রমজানী এবং কনিষ্ঠার দুই পুত্র সিরাজ-উদ্-দৌলা এবং মীর্জা মেহেদী।[১২৩] আলিবর্দী শাসন সংক্রান্ত বহু ব্যবস্থা করেও বিশেষ ফল পান নি। ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর এক দৌহিত্র এবং পরের বছর তাঁর দুই জামাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যুতে আশী বৎসরের বৃদ্ধ নবাব শোকে জর্জরিত হয়ে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল পরলোক গমন করেন।

আঁলিবর্দীর পর তাঁর প্রিয়তম দৌহিত্র সিরাজ-উদ্-দৌলা নবাব হন। তাঁর জন্মের অব্যবহিত পরেই আলিবর্দী বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত হওয়ায়, শিশুপুত্র সিরাজকেই তিনি তাঁর সৌভাগ্যের নিদান বলে মনে করায় আলিবর্দীর অতিরিক্ত স্নেহে সিরাজ শিক্ষা-দীক্ষা বিহীন উদ্ধত, দুর্বিনীত, কামাসক্ত, নিষ্ঠুর ও স্বেচ্ছাচারীতে পরিণত হলেন। তবে মাতামহের মৃত্যুর পর সিরাজ কৌশলে তাঁর সিংহাসনের তিন প্রতিবন্ধক ঘসেটি বেগম, ইংরেজ ও সওকত জঙ্গকে বিধ্বস্ত করে তাঁর যোগ্যতার পরিচয় রাখলেও পরবর্তী পর্বে তাঁর অস্থিরচিত্ততা, অদূরদর্শিতা ও লোকচরিত্র সম্পর্কে অনভিজ্ঞতাই তাঁর সর্বনাশের কারণ হয়ে ওঠে। নবাব হয়ে সেনাপতি মীরজাফর ও দেওয়ান রায় দুর্লভকে পদচ্যুত এবং জগৎ শেঠকে অপমানিত করায় তাঁরা ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেন। যার ফলশ্রুতি ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুনের যুদ্ধ-সম্ভবে [১২৪] ক্লাইবের নেতৃত্বে ইংরেজদের যুদ্ধ জয়। এরপর ২৬শে জুন মুর্শিদাবাদে মীরজাফরের অভিষেক, ৩০শে জুন রাজমহলের পথে মালদহে সিরাজের বন্দীত্ব এবং ২রা জুলাই রাত্রে গোপনে তাঁকে মুর্শিদাবাদে আনয়ন, মীরজাফরের পুত্র মীরণের হেফাজতে রাখা এবং সে রাত্রেই সিরাজ-হত্যা পর্ব সম্পূর্ণ হয়।

এর পর ২৯শে জুন সন্ধ্যায় মীরজাফরকে মসনদে বসিয়ে ক্লাইব বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদার বলে অভিবাদন করেন এবং দিল্লীর বাদশাহও তা অনুমোদন করেন। কিন্তু নামে মাত্রই মীরজাফর নবাব। তাঁকে দোহন করা এবং ক্রীড়নক হিসেবে পরিণত করার যে অভিসন্ধি ইংরেজদের ছিল, তা অচিরেই ফলে। ইংরেজ কোম্পানী তথা ক্লাইবের উপর রাজনীতি ও অর্থনীতি উভয় দিকেই মীরজাফর হন নির্ভরশীল । ইংরেজদের প্রচুর অর্থ-পুরস্কার ও জমিজমা দান করেও তাদের সন্তুষ্টি বিধানে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। তা ছাড়া ইংরেজদের ঔদ্ধত্য, প্রতিনিয়তঅসম্মানিত হওয়া ও শাসনকার্যে তাদের প্রতি মুহূর্তে হস্তক্ষেপ এবং পুত্র মীরণের বজ্রাঘাতে মৃত্যু ইত্যাদিতে বৃদ্ধ মীরজাফর শেষ অবস্থায় যেমন পৌঁছেছিলেন, তেমনই বাংলার প্রশাসনও তখন প্রায় বিধ্বস্ত। ক্লাইব দেশে ফিরলে অর্থলিপ্সু ভ্যান্সিটার্ট কলকাতার গভর্নর হয়ে সত্য-মিথ্যা বহু অভিযোগে অভিযুক্ত করে মীরজাফরকে অপসারিত করে তাঁর জামাতা মীর কাশিমের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ ও সুযোগ-

সুবিধার বিনিময়ে তাঁকে মসনদে বসান (১৭৬০)।

অথচ স্বাধীনচেতা মীর কাশিম ইংরেজদের ক্রীড়নক হয়ে কাজ না করে ইংরেজের প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে তিনি যে ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করেন তা প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের পথে তাঁকে চালিত করে। কিন্তু কাটোয়া, গিরিয়া এবং উদয়নালার যুদ্ধে পরাজিত (১৭৬৩ খ্রীঃ) নবাব অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ-দৌলা এবং দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের সাহায্য নিয়ে অগ্রসর হয়ে বক্সারের যুদ্ধে (১৭৬৪খ্রীঃ) ইংরেজ বাহিনীর নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে পলাতক জীবন যাপনের পর ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। প্রকৃতপক্ষে মীর কাশিম চার বছর নবাবীর মধ্যে প্রায় তিন বছর স্বাধীনভাবে কিছু করতে পারেন নি। তবে স্বাধীনতালাভের চেষ্টা করেছিলেন বলে 'বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব' বলে তাঁকে আংশিকভাবে অভিহিত করা যায়।[২৫]

মীর কাশিমের সঙ্গে যুদ্ধের সময় ইংরেজ কোম্পানী পুনরায় মীরজাফরকেই নবাবের পদে অধিষ্ঠিত করে (১৭৬৩ খ্রীঃ) যে সন্ধিপত্র তৈরী করে তাতে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের বাবদ ৬৫ লক্ষ টাকা ও বাণিজ্যিক সহ অন্যান্য বহুবিধ সুবিধা আদায় করে। বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অরাজকতা নামে, শান্তি-শৃঙ্খলা ব্যাহত হয় এবং কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও ব্যাপক অব্যবস্থা ও দুর্নীতি দেখা দিলে কোম্পানীর প্রশাসন প্রায় অচলাবস্থায় পৌঁছে।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মীরজাফরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নাজিম-উদ-দৌলাকে সিংহাসনে স্থাপন করে ইংরেজ কাউন্সিল প্রচুর অর্থ আদায় করে। কিন্তু সুশাসনের দায়িত্ব না নিলে সর্বত্র বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে তা দূরীকরণের জন্য কোম্পানীর ডিরেক্টর-সভা লর্ড ক্লাইবকে দ্বিতীয়বার ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্নর করে পাঠায় (১৭৬৫ খ্রীঃ)। ক্লাইব বাংলা ও অযোধ্যার দুই নবাব এবং মোগল সম্রাটের সঙ্গে কোম্পানীর সম্পর্ক নির্ধারণ করেন। অযোধ্যার নবাব যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫০ লক্ষ টাকা এবং আরা ও এলাহাবাদ কোম্পানীকে ছেড়ে দিতে রাজী হন। তবে শত্রুর আক্রমণে কোম্পানীর সামরিক সাহায্যে ব্যয় বহনের শর্ত মানেন এবং কোম্পানী বিনা শুল্কে অযোধ্যা রাজ্যে বাণিজ্যের অধিকার পেল।

শাহ আলমের সঙ্গে সন্ধিতে তাঁকে এলাহাবাদ ও তার চতুষ্পার্শের ভূখণ্ড দিতে রাজী হল ইংরেজ। তার পরিবর্তে বাদশাহ ইংরেজ কোম্পানীকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ান নিযুক্ত করে এক ফরমান অর্পণ করেন। নবাবের সঙ্গে সন্ধি হয়। বাংলার সৈন্যবল ও শাসন ব্যবস্থা আগেই ইংরেজদের হাতে আসে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে দেওয়ানী পাওয়ার পর রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা ইংরেজদের হাতে আসে। প্রথমে স্থির হয় যে আদায়ী রাজস্ব থেকে মুর্শিদাবাদের নবাব বার্ষিক ৫৩ লক্ষ টাকা ও দিল্লীর বাদশাহ ২৬ লক্ষ টাকা পাবেন এবং বাকী অর্থ ইংরেজরাই ব্যয় করবে। ১৭৬৬ সালে নবাবের এই বার্ষিক বৃত্তি হ্রাস করে ৪১ লক্ষ ও ১৭৬৯ সালে আরও হ্রাস করে ৩২ লক্ষ টাকা করা হয়। আসলে বাংলার নবাবী শাসন শেষ হয় ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দেই।

সুতরাং মালদহ অঞ্চলেও বাংলার দেওয়ানী আসায় প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বে আসে এ সময়েই। যদিও ব্রিটিশদের সঙ্গে এ জেলার সম্পর্ক গড়ে ওঠে ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে বাণিজ্যিক কুঠি স্থাপনের মাধ্যমে। এই কুঠিটি হুগলীর কুঠিরই অধীনে ছিল। অবশ্য তাদের আগেই ওলন্দাজরা কুঠি স্থাপন

করেছিল। ফিচ নীডহ্যাম এই ইংরেজ কুঠির প্রধান হয়েছিলেন। এখানে বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র যথা চাঁন্দেয়ী, ইলাচী, চারকোণী, নেহালেওয়ার, মন্দিল, মলমল, তানজীব ইত্যাদি ছিল। ১৬৮০ সালের ১লা ডিসেম্বরে (ওল্ড) মালদা শহর থেকে প্রায় দু মাইল দূরে বর্তমান ইংরেজবাজারের মকদুমপুরে জমিদার রাজারায় চৌধুরীর নিকট থেকে ১৫ বিঘা জমি ৩০০ টাকায় ক্রয় করে তিনি নূতন কুঠি স্থাপন করেন — যা বর্তমানে পুরাতন কালেক্টরেট বলে পরিচিত (আগষ্ট, ১৬৮১)। অন্যদিকে (পুরাতন) মালদহের ভাড়া বাড়ীতে অবস্থিত কুঠিও তিনি তত্ত্বাবধান করতেন। তবে নদীর এপার ও ওপারের দুই কুঠির বাণিজ্যের ব্যাপারে মালদার ক্রোরির (অর্থাৎ ভূমি-রাজস্ব বিভাগের কর্মচারী সঙ্গে) মতবিরোধ ঘটতো যার নদীর এপার পর্যন্ত এক্তিয়ার ছিল।

১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে নবাব শায়েস্তা খানের আদেশে বাংলার সব কুঠি বাজেয়াপ্ত হয়। এই নূতন এলাকা ব্রিটিশদের দ্বারা ইংলেজাবাদ বলে কথিত হয়, যা পরবর্তী পর্বে ইংরেজবাজার নামে পরিচিত হয়েছে।[১২৬] ফারসী 'আবদ্দ' শব্দের অর্থ বসতিপূর্ণ। তাই রংরেজ + আবাদ = রংরেজাবাদ, পরে ইংলিশ + আবাদ ইংলিজাবাদ ও তারও পরে ইংলিশবাজার হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ইংলেজাবাদ > আংরেজাবাদ > ইংলিশবাজার নাম হওয়ার আগে যেহেতু বস্ত্রে রঙ করার লোকেরাই এখানে অধিক ছিল বলে তাদের বলা হত রঙ্গরেজ — যারা মুখ্যতঃ মুসলমান। এ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল'-এর 'আখেটী খণ্ডে' কালকেতুর নগর পত্তনে মুসলমানদের শ্রেণী বিভাগ দেখাতে গিয়ে কবির বর্ণনা —

বসন রাঙায়্যা কেহ ধরে রঙ্গরেজ।
লোহিত বসন শিরে ধরে মতাতেজ।।

বা

রঙ্গরেজ নাম ধরে রঙ্গণ করিয়া।
ধরিয়া হালাম নাম কুন্দুর ধরিয়া।।[১২৭]

এই রঙ্গরেজদের বাজার = রঙ্গরেজ বাজার থেকে ভাষাতাত্ত্বিক পরিবর্তনে ইংরেজরা তখন প্রধান (রাজা) ছিল বলে বাংলায় ইংরাজবাজার বা ইংরেজবাজার বলে কথিত।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে সরকারী নথিতে জানা যায় যে মালদার কোম্পানীর গোমস্তারা নবাবের কর্মচারীদের দ্বারা নিগৃহীত হয়। ১৭৭০ সালে এই ইংরেজবাজার কোম্পানীর বাণিজ্যিক প্রতিনিধির আবাস (Commercial Residency) হিসেবে নির্দিষ্ট হয় এবং তার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় কোম্পানীর নিজস্ব বাণিজ্যের বিরতি পর্যন্ত। হেঞ্চম্যানের কুঠিই বর্তমানে পুরাতন জেলা আরক্ষাধ্যক্ষের (Superintendent of Police) সদর দপ্তর। এটি উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত সুরক্ষিত এবং এখানে প্রতিরক্ষার নিমিত্ত চার দিকে কামান দাগবার জন্য দুর্গ প্রাচীরের ফাঁকও দেখা যায়।[১২৮]

## ● পাদটীকা

১. তবকাত-ই-নাসিরী — আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া অনূদিত ও সম্পাদিত - পৃ-২৯ (মীনহাজ-ই-সিরাজ জোযজানী) — মীনহাজের প্রকৃত নাম ও পদবী ঃ কাজী-উল-কুজ্জাত সদর-ই জাহান আবু ওমর ওয়া মীনহাজ-উদ-দ্বীন ওসমান বিন সিরাজ-উদ-দ্বীন মোহাম্মদ আফ্‌সা-উল-আজম আজুবাত-উজ-

জামান ইবনে মীনহাজ-উদ-দ্বীন ওসমান আল-জোযজানী মারুফ বহ্‌কাজী মীনহাজ-ই সিরাজ (প্রাগুক্ত পৃ-১)
২. বাংলার ইতিহাস - সুলতানী আমল — আবদুল করিম পৃ-৭১
৩. প্রাগুক্ত - পৃ-৭১
৪. তবকাত-ই-নাসিরী — প্রাগুক্ত পৃ-৬৫
৫. প্রাগুক্ত - পৃ- ৮৩
৬. তবকাত-ই-নাসিরী — প্রাগুক্ত, অনুবাদের টীকা, পৃ-৮৩
৭. নাসিরী — প্রাগুক্ত পৃ- ১০৩
৮. নাসিরী — প্রাগুক্ত পৃ-১৪৩
৯. নাসিরী — প্রাগুক্ত পৃ-১৪১
১০. বাংলাদেশের ইতিহাস -দ্বিতীয় খণ্ড (মধ্যযুগ), সম্পাদক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃ-৯-১০
১০ক. তবকাত-ই-নাসিরী, প্রাগুক্ত, পাদটীকা, পৃঃ-৩১৯
১১. তারিখ-ই ফিরুজশাহী — জিয়া-উদ-দীন বারানী অনুঃ গোলাম সামদানী কোরায়শী, ১৩৮৯, পৃ-৬৭
১২. প্রাগুক্ত - পৃ-৭৪
১২ক. প্রাগুক্ত - পৃ- ১০৬-১০৯ ও ১৩০-১৩৮
১২খ. Tabaquat-I-Akbari, Tr. B.N De, P-128-130
১৩. ঐ - পৃ-১১৮-১৯
১৪. কিরান-উস্-সাদাইন — সম্পাদনা মৌলভী মোহাম্মদ ইসমাইল, ১৯১৬
১৫. History of Bengal .Vol. II Ed. Sir J. N.Sarkar. P-73
১৫ক. তবকাত-ই-আকবরী — প্রাগুক্ত, পৃ-১৩১
১৬. বাংলার ইতিহাস — আবদুল করিম, পাদটীকা-পৃ-১১৬
১৭. প্রাগুক্ত - পৃ-১১৫
১৮. History of Bengal. Vol. II P. 80-81
১৯. বাংলাদেশের ইতিহাস — প্রাগুক্ত, পৃ-২৪ .
২০. বাঙ্গালার ইতিহাস - দ্বিতীয় ভাগ — রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩২৪, দে'জ তৃতীয় সং, পৃ- ৪৯
২১. History of Bengal. Vol.II Ibid P.89
২২. তারিখ-ই-মুবারকশাহী — কে. কে. বসু অনুদিত, পৃ- ৯৯-১০০
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ-১০৬ - ১০৭
২৩.ক. রিয়াজ-উস-সালাতিন — গোলাম হোসাইন - অনুঃ রামপ্রাণ গুপ্ত, সম্পাদিত গ্রন্থ ১৩৯৭, পৃঃ ৮০, অন্যদিকে তারিখ-ই-ফিরুজশাহীতে সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস কর্তৃক তাঁর মৃত্যুর কথা আছে (পৃ-১০৭), তবে আব্দুল করিম মুদ্রা- সাক্ষ্যে বলেছেন যে ফকর-উদ-দীনের স্বাভাবিক মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা অধিক, প্রাগুক্ত- পৃ-১৫১
২৪. Tarikh-I-Mubarakshahi-Yahiya Bin Ahmed Bin Abdullah Sirhindi-Tr.H.Beveridge, reprint.1990. p-107
২৫. বাংলা দেশের ইতিহাস — প্রাগুক্ত, পৃ-৩৪ - ৩৫
২৬. Tabaquat-I - Akbari. Vol. I ibid. p-247
২৭. তারিখ-ই-ফিরুজশাহী — প্রাগুক্ত, পৃ- ১৪৯
২৮. Inscriptions of Bengal, Vol. 4 - Samsuddin Ahmed, p-34-35
২৯. বাংলার ইতিহাস — প্রাগুক্ত, পৃ- ১৭৫
৩০. রিয়াজ-উস-সলাতিন — প্রাগুক্ত, পৃ- ৯১ - ৯২
৩১. প্রাগুক্ত — পৃ- ৯৪ - ৯৫
৩২. প্রাগুক্ত — পৃ- ৯৫
৩৩. Visva Bharati Annals, Vol. I, (1945), p-133

৩৪ Islamic Culture, 1958 p-201
৩৫ বিয়াজ — প্রাগুক্ত, পৃ- ১০১ - ১০২
৩৬ বাংলাব ইতিহাসেব দুশো বছব — সুখময় মুখোপাধ্যায়, পৃ- ১৩৪
৩৭ প্রাগুক্ত, পৃ- ১৪১
৩৮ প্রাগুক্ত, পৃ - ১৪৪
৩৯ Journal of the Asiatic Society of Bengal Stapleton, Vol XXVI - 1930, N S pp 12-13 এবং History of Bengal Vol II-J,N,Sarkar, p-122
৪০ বিযাজ-উস সালাতিন — গোলাম হোসেন (বামপ্রাণ গুপ্ত কৃত অনুবাদ, সম্পাদিত )পৃ ১০৩
৪১ বাংলাব ইতিহাসেব দুশো বছব, প্রাগুক্ত, পৃ-১৩৮
৪১ক History of Bengal Vol II (Ed ) J N Sarkar, p-128
৪২ Mirat-ul-Asrar - Tr Dr A H Dani, J A S, 1952, p-138
৪৩ বিযাজ, প্রাগুক্ত পৃ-১০৩
৪৪ বাংলাব ইতিহাসেব দুশো বছব, প্রাগুক্ত, পৃ-১৬০
৪৫ বিযাজ-উস সালাতিন — প্রাগুক্ত, পৃ-১০৪
৪৬ বাংলাব ইতিহাস — প্রফেসব আব্দুল কবিম, পৃ-২৩৮
৪৭ বাংলাদেশেব ইতিহাস — দ্বিতীয খণ্ড (মধ্যযুগ) প্রাগুক্ত, পৃ ৫৩
৪৮ প্রাগুক্ত, পৃ-৫৪
৪৯ বিযাজ-উস-সালাতিন,প্রাগুক্ত, পৃ-১০৫
৫০ বাংলাব ইতিহাস , প্রাগুক্ত, পৃ ২৫২
৫১ বাংলাদেশেব ইতিহাস — দ্বিতীয খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ ৬০
৫২ প্রাগুক্ত, পৃ-৬১
৫৩ Journal of the Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Old Series Vol XLIII 1874, pt I, p-298, Vol XLIV, 1895 pt I p-199
৫৪ Journal of the Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Old Series Vol XLII 1873, pt I, p-275
৫৫ বিযাজ-উস সালাতিন প্রাগুক্ত, পৃ-১০৬
৫৬ History of Bengal, Stewart, London, 1813, p-101
৫৭ বাঙ্গালাব ইতিহাস — বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায, তৃতীয সং, পৃ-১২০
৫৮ বাংলাদেশেব ইতিহাস — দ্বিতীয খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ-৬৩ ৬৫
৫৯ বিযাজ, প্রাগুক্ত, পৃ ১০৭-১১
৬০ প্রাগুক্ত, পৃ-১১১-১১২
৬১ Memoirs of the Asiati : Society of Bengal, Major Rennell's Journal Vol III No 8 Footnote and Folk Arts and Crafts of Bengal - Gurusaday Dutt, p-124
৬২ Ruins of Gour pt I, Creighton
৬৩ Oriental Scenery Vol V Daniell, p-23
৬৪ বাংলাব ইতিহাস — প্রফেসব আব্দুল কবিম, পৃ ২৭৭
৬৫ Tarikh-i-Firista, Vol 2, p-300-01 বিযাজ উস সালাতিন, পৃ-১০২-১১৩
৬৬ বিযাজ-উস-সালাতিন, প্রাগুক্ত, পৃ-১১৫
৬৭ বাংলাব ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ ২৭৮
৬৭ক তবকাত-ই-আকববী - খাজা নিজাম-উদ-দীন আহমেদ, ইংবেজী অনুবাদ B De, pt III p- 442
৬৭খ প্রাগুক্ত, পৃ-৪৪২
৬৮ বিযাজ, প্রাগুক্ত, পৃ ১১৪

৬৯. Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. XIII, pt. I, p- 290
৭০. History of Bengal-pt.-I Sushila Mondal, p.206-207
৭১. রিয়াজ-উস-সালাতিন, প্রাগুক্ত, পৃ-১১৬
৭২. History of Bengal-pt.-I Sushila Mondal, ibid, p-209
৭২ক. Tabaquat-I Akbari, Vol. III, ibid, Footnote, p-443
৭৩. Tarikh-i-Firista, Vol. II, p.302 এবং রিয়াজ-উস-সালাতিন, প্রাগুক্ত, পৃ-১১৫
৭৪. রিয়াজ-উস-সালাতিন, প্রাগুক্ত, পৃ-১১৫-১১৭ এবং Tabaquat-I-Akbari - Khwajah Nizamuddin Ahmed, Tr. B.N.De, Vol.III Footnote P. 443
৭৫. বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ-৭১-৭২
৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ-৮৯
৭৭. বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ড. সুখময় মুখোপাধ্যায়, পৃ-৮৫-৯১
৭৮. বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ-৭৬-৭৮
৭৮ক. Tabaquat-I Akbari, ibid, pt. III,p-444
৭৯. Corpus of Muslim Coins of Bengal, 1960, Op Cit. p-118
৮০. Journals of the Numismatic Society of India, Vol 17 1st part. p-76-84
৮১. বাংলার ইতিহাস-আব্দুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ-৯৬
৮২. রিয়াজ-উস-সালাতিন, প্রাগুক্ত, পৃ-১২৪
৮৩. বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ-৯৬
৮৪. রিয়াজ-উস-সালাতিন, প্রাগুক্ত, পৃ-১২৫
৮৫. বাংলার ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৩৪
৮৬. বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-৯৭
৮৭. রিয়াজ-উস-সালাতিন, প্রাগুক্ত, পৃ-১২৯
৮৮. মালদা জেলার পুরাকীর্তি - প্রদ্যোত ঘোষ, পৃ- ১০৬-১০৮ ও গৌড়বঙ্গেব স্থাপত্য-প্রদ্যোত ঘোষ, পৃ-৩৭-৩৮ Memoirs of Gaur and Pandua - Abid Ali Khan, p - 92-93
৮৯. Journals of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, Vol. LXIV, 1895, pt I,p 214
৮৯ক. History of Portugeese of Bengal, JJA Campas হোসেন শাহী বংশ, সুখময় মুখোপাধ্যায, বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃ-১০১
৯০. রিয়াজ-উস-সালাতিন, প্রাগুক্ত, পৃ-১২৯
৯১. Ain-I-Akbari, Vol.III Ed Jarret H.S. & Sarkar J.N
৯২. Corpus of Muslim Coins of Bengal, Ibid, p-161
৯৩. রিয়াজ-উস-সালাতিন, প্রাগুক্ত, পৃ-১২৯
৯৪. রিয়াজ-উস-সালাতিন, প্রাগুক্ত, পৃ-১২৯-১৩০
৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ-১৩০
৯৬. রিয়াজ-উস-সালাতিন, তদেব, পাদটীকা, পৃ-১৩১, The History and Culture of Indian People, Vol. VII. The Mughal Period, Ed. R.C. Majumdar, J.N Choudhury, P. 54.
৯৭ রিয়াজ-উস-সালাতিন, প্রাগুক্ত, পৃ-১৩২
৯৮. বাংলার ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৫৯
৯৮ক. প্রাগুক্ত, পৃ-৩৮৪
৯৯. বাংলা দেশের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ-১১২
৯৯ক. গৌড়ের ইতিহাস-রজনীকান্ত চক্রবর্তী, দে'জ, পৃ-২৫৮
১০০. প্রাগুক্ত, পৃ-১১২
১০১. প্রাগুক্ত, পৃ-১১২

১০২. বাংলার ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৬৯-৭০
১০৩. রিয়াজ-উস-সালাতিন, প্রাগুক্ত, পৃ-১৩৪
১০৪. প্রাগুক্ত, পৃ-১৩৪-৩৫
১০৫. বাংলা দেশের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ-১১৪-১১৫
১০৬. রিয়াজ-উস-সালাতিন, প্রাগুক্ত, পৃ-১৩৭-৩৮
১০৭. প্রাগুক্ত, পৃ-১৪২
১০৭ক. Akbarnama, Vol. III, p-293
১০৮. Akbarnama, Vol. III, p-50-51
১০৯. বাংলা দেশের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ-১২৬-২৭
১১০. প্রাগুক্ত, পৃ-১২৮-৩০
১১১. প্রাগুক্ত, পৃ-১২৯-৩০
১১২. প্রাগুক্ত, পৃ-১৩০
১১২ক. History of Bengal, Vol. II (Ed. J.N.Sarkar), Dr. S.N.Bhattacharya, p-270
১১৩. বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃ-১৩১-৩৮
১১৪. প্রাগুক্ত, পৃ-১৩৯-৪০
১১৫. History of Bengal, Vol.II p-345,
১১৬. ibid-Sir J.N.Sarkar -Bengal under Shaista Khan and Ibrahim Khan, p-375
১১৭. Op Cit. P-375
১১৮. Op. Cit. p-394-94
১১৯. Op. Cit. P-394
১২০. Op. Cit. p-395
১২১. Ahkam-i-Alamgiri - Inayet -Ullah (Rampur & Patna Mss ) Quoted by HBII, - p-40
১২২. সিয়ারে মুতাখ্‌খিরীন - সৈয়দ গোলাম হুমায়ুন খাঁন তাবতায়াবী অনু. ড. এম. আবদুল কাদের। পৃঃ- ৩১১ - ১২
১২৩. ibid, HB Sir Jadunath Sarkar, p-468
১২৪. HB-II- Sir Jadunath Sarkar - Thursday the 23rd of June, 1757, exactly one year and two days after the Nawab's capture of Calcutta, witnessed a battle which was destined to revolutionise the life of India, and indirectly and slowly that of the eastern hemisphere, though when judged as a trial of arms military critics are apt to slight it as a more skirmish or distant cannonade. p-490
১২৪. বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-২০৪
১২৫. প্রাগুক্ত, পৃ-২০৬
১২৬. West Bengal District Gazetteers, Malda - Jatindranath Chandra Sengupta, 1969, p-51-52
১২৭. কবিকঙ্কণ চণ্ডী - শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদিত, পুনর্মুদ্রিত, ১৯৯৬
১২৮. Statistical Account of Bengal, Vol-VII - W.W.Hunter, 1879, p-48

# আধুনিক যুগ

মুঘল প্রশাসনিক রূপ থেকেই এদেশে প্রশাসন সৃষ্ট, যদিও তা হিন্দু যুগেরই পরিবর্ধিত রূপেরই ফসল। পূর্বেই কথিত যে ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের কুঠি-প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই মালদহ জেলার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সুরু; যদিও তা হুগলীর কুঠির অধীনেই ছিল। পর্তুগীজদের কুঠি অবশ্য এর আগেই স্থাপিত হয়েছিল। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ মীরজাফরকে নবাব করে এবং পরবর্তী পর্বে মীর কাশিম নবাব হলেও ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধে বক্সার যুদ্ধের পর পলাতক হয়ে অতি দীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন (১৭৭৭ খ্রীঃ)। ১৭৬৫ সালে দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট থেকে বৎসরে ২৬ লক্ষ টাকা দেওয়ার পরিবর্তে বাংলা, বিহার ও ওড়িষার রাজস্ব আদায়ের অধিকার পায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার গভর্নর হয়ে আসেন এবং রাজস্ব আদায়ে ফোর্ট উইলিয়ামে কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট হন। কোর্ট অব ডিরেক্টরের নির্দেশ তিনি প্রয়োগ করার জন্য চারজনের সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি তৈরী করে নিজে প্রেসিডেন্ট হন এবং প্রধান জেলাগুলিতে গিয়ে পাঁচ বছরের জন্য রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করেন। ভারতীয় দেওয়ানদের দ্বারা এই সব তত্ত্বাবধায়কেরা 'কালেক্টর' হিসেবে অভিহিত হন এবং তাঁদের কাজে সহকারী থাকতেন ভারতীয় দেওয়ানরা। কারণ এই দেওয়ানরা তাঁদের সংযমী হতে সাহায্য করবে। এই সার্কিট কমিটি ১৭৭৩ সালের জানুয়ারী মাসে দিনাজপুর পরিদর্শন কালে মালদহ শহরের চতুষ্পার্শের কিছু অংশ সম্পর্কে এক অদ্ভুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তা হল এই যে, মালদার বাণিজ্যিক কুঠির অধ্যক্ষকে মালদহ ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের রাজস্ব আদায় করে মালদার কোম্পানীর জন্য বিনিয়োজিত অর্থ তোলার নির্দেশ দেন। মফঃস্বল দেওয়ানী আদালতে সমাহর্তাই সভাপতি হলেন — যেখানে সম্পত্তির উত্তরাধিকার, বিবাহ, জাতি ও ঋণ সম্পর্কিত দাবী দাওয়া, হিসাবপত্রের গরমিল, চুক্তি ইত্যাদি বিচারের অধিকার ছিল। অবশ্য জমিদারদের দাবী সম্পর্কিত বিষয়টি প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত ছিল। ফৌজদারী সংক্রান্ত বিষয়টি ফৌজদারী আদালতের উপর ন্যস্ত ছিল — যার প্রধান কাজী -- যিনি সম্ভবতঃ আদালতের দারোগা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আইন ব্যবস্থা, মুসলিম আইন এবং কালেক্টর স্থানীয় কোম্পানীর এজেণ্ট হিসেবে ন্যায়সংগত বিচার হচ্ছে কিনা তাঁর কাছে দেখা প্রত্যাশিত ছিল। মফঃস্বল দেওয়ানী আদালতের রায়ের উপরে কলকাতায় অবস্থিত দেওয়ানী আদালতে আপিল করার অধিকার ছিল। তেমনই

ফৌজদারী আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে কলকাতায় অবস্থিত নিজামত আদালতে আপিল করার অধিকার থাকতো। নবাব নিযুক্ত একজন কর্মচারী আদালতের প্রধান (দারোগা নামে অভিহিত) হলেন এবং মৃত্যুদণ্ড নবাবের অনুমতি ভিন্ন হত না। ১৭৭৩ সালে ইংরেজ সমাহর্তাদের এই অধিকার প্রত্যাহৃত হয়।[১]

গর্ভনর এবং কাউন্সিল প্রত্যেকটি জেলায় একজন দেওয়ান বা আসিল (Ausuil)-এর অধীনে রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং রাজস্ব আদায়ের অধিকার পাঁচটি প্রাদেশিক কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত হয় — যার অন্যতম ছিল দিনাজপুর। দিনাজপুরের এই প্রাদেশিক কাউন্সিল মালদহ ছাড়া আরও কতিপয় জেলার তত্ত্বাবধানে ছিল, যেহেতু সমকালে মালদহ দিনাজপুরের অন্তর্গত ছিল। তাই স্বাভাবিকভাবেই তা দিনাজপুরের প্রাদেশিক কাউন্সিলের কর্তৃত্বাধীনে ছিল। সদর কার্যালয় থেকে দূরবর্তী স্থানগুলির জন্য প্রত্যেক প্রাদেশিক কাউন্সিল একজন করে 'নায়েব' নিযুক্ত করে। দেওয়ানী আদালতের প্রধান নায়েব। নায়েবের রায়ের বিরুদ্ধে প্রাদেশিক কাউন্সিলে এবং সেখান থেকে সদর দেওয়ানী আদালতে আপিল করার অধিকার ন্যস্ত হয়। ফৌজদারী বিষয়ক সদর নিজামত আদালত মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয় এবং সেটি 'নায়েব সুবা' পদমর্যাদার অধিকার আসে। মোহাম্মদ রেজা খাঁ ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সে পদে বসেন। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ১২৭৬ বঙ্গাব্দের 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' প্রসঙ্গে রেজা খাঁর কার্যকলাপ ও কর্তব্য সম্পর্কে সরকার যে তদন্ত কমিটি স্থাপন করেন তাতে শেষ পর্যন্ত তিনি অব্যাহতি পান।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে ১৭৭৪ সালের ১লা আগস্টে বাংলার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান প্রতিনিধির পদ পরিবর্তিত করে গভর্নর জেনারেল করা হয়।[২] ১৭৭৩ সালে রেগুলেটিং আইন (Regulating Act) নামে এক নূতন বিধান প্রবর্তন করে বিলাতের ইংরেজ সরকার সমগ্র ভারতে কোম্পানীর অধিকৃত স্থানগুলির শাসনের নিমিত্ত এই গভর্নর জেনারেল বা বড়লাট এবং চার জন সদস্য বিশিষ্ট এক শাসন পরিষদের উপর ভার দেয়। বাংলার গভর্নর এই শাসন পরিষদের সভাপতি এবং গভর্নর জেনারেল হন। বোম্বাই ও মাদ্রাজের গভর্নর এবং শাসন পরিষদ বাংলার বড়লাট ও তাঁর শাসন পরিষদের অধীনে থাকেন। কোম্পানীর কর্মচারীদের অপরাধের বিচারের জন্য কলকাতায় সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেখানে একজন প্রধান বিচারপতি ও তাঁর অধীনে তিন জন বিচারপতি নিযুক্ত হন।[৩]

রেগুলেটিং আইন পাশ হওয়ায় বাংলার শাসন ব্যবস্থার কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। রাজস্ব পাঁচ বছরের জন্য দেওয়ার ফলে ইজারাদার, জমিদার ও প্রজা — সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে জমিদারদের সঙ্গে প্রতি বছর দেয় রাজস্বের পরিমাণ বন্দোবস্ত করা হয়।[৪]

১৭৮০ সালে সদর নিজামৎ পুনরায় মুর্শিদাবাদে আসে এবং 'নায়েব নাজিম' তার প্রধান হন। তাঁর অধীনে ফৌজদারী আদালতের বিচারকগণ ম্যাজিস্ট্রেটের এবং জমিদারগণ পুলিশের কাজ করতেন।[৫]

১৭৮১ সালে প্রাদেশিক সমিতি (Provincial Council) তুলে দিয়ে পুনরায় রাজস্ব সংগ্রহের জন্য কালেক্টর নিযুক্ত হন। এবং রাজস্বের ব্যাপারে কলকাতায় এক কেন্দ্রীভূত 'কমিটি অব্ রেভিনিউ' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৮৬ সালে এটি Board of Revenue বলে পরিচিত হয়।[৬]

১৭৯০ সালে গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস নায়েব-নাজিমের কর্তৃত্ব থেকে ফৌজদারী

বিচারের ভার ইংরেজ বিচারকের অধীনে নূতন এক শ্রেণীর ভ্রাম্যমাণ আদালত (Court of Circuit) সৃষ্টি করেন। এতে নবাবী আমল শেষ হয়ে বাংলায় ইংরেজ কোম্পানীর শাসন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।[৭] পরবর্তী পর্বে ইংরেজরা দিল্লী অধিকার করার পর বাদশাহ্ দ্বিতীয় শাহ্ আলমের সঙ্গে কোন সন্ধি করে নি — কেবলমাত্র একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করে তাঁর অধীনতাও অস্বীকার করে।[৮] ক্রমে ক্রমে এর শাসনব্যবস্থা ও রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতিও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে একটি বিশিষ্ট রূপ পায়। কর্ণওয়ালিসের সময় সমস্ত দেশ কতকগুলি জেলাতে বিভক্ত হয়। প্রত্যেক জেলায় এবং তিনটি শহরে ইংরেজ বিচারকের অধীনে এক একটি দেওয়ানী আদালত এবং কলকাতা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও পাটনা — এই চারটি বড় কেন্দ্রের চারটি আদালত চারটি আপীল আদালতে পরিণত হয়। ফৌজদারী মোকদ্দমা বিচারের নিমিত্ত চারটি সেসন আদালতও প্রতিষ্ঠিত হয়।[৯]

কর্ণওয়ালিসের সময় প্রতি জেলায় দুজন প্রধান কর্মচারী ছিলেন — ১. একজন কালেক্টর (রাজস্ব সংগ্রহের অধিকারী) ২. জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট (পুলিশও তাঁর অধীনে ছিল)। কিন্তু ১৮৩১ সালে রাজস্ব সংক্রান্ত ভারও কালেক্টরের হাতে ন্যস্ত হয় বলে ম্যাজিস্ট্রেট-কালেক্টরই জেলার প্রধান কর্মচারী হন।[১০] এই ব্যবস্থা স্বাধীনতার পরও ভারতীয় প্রশাসনে চালু আছে। এদেশে ডালহৌসী আভ্যন্তরীণ শাসনপদ্ধতিরও অনেক সংস্কার ও উন্নতি সাধন করেন।

অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে মালদহ তথা উত্তরবঙ্গ সন্ন্যাসী ও ফকিরদের লুঠতরাজ ও উপদ্রবে অস্থির হয়ে পড়ে। শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত দশনামী সম্প্রদায়ের এই সব সন্ন্যাসীরা পুরী, গিরি ও পারাবত ভুক্ত। কিন্তু কালক্রমে তার ধর্মকর্ম পরিত্যাগ করে ডাকাতি সুরু করে।[১১] তাদের সঙ্গে নিঃস্ব কৃষক, সম্পত্তিভ্রষ্ট জমিদার ও বেকার সৈন্যদলও যোগ দেয়। প্রতি দলে একজন নায়কের অধীনে পাঁচ সাত হাজার নাগা সন্ন্যাসী ও অন্য লোক থাকতো। আবার এদের মত সশস্ত্র মুসলমান ফকিরও ডাকাতি ও লুঠতরাজ সুরু করে। এদের সর্দার ছিলেন মাদারি সম্প্রদায়ের মজনুন শাহ। তাঁরই অন্যতম সহযোগী ছিলেন ভবানী পাঠক। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য ভবানী পাঠককে আদর্শায়িত করে অমর করে রেখেছেন[১২] 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে। মালদা অঞ্চলে মজনুন শাহর কীর্তিকলাপের ঐতিহাসিক তথ্য আছে। মালদহে আজও গিরিদের সম্পত্তি ও তাঁদের কারো কারো চিহ্ন বহন করে। কিন্তু উভয় অত্যাচারই সরকার দমন করে।

চার্লস গ্রাণ্ট ১৭৮০ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক অধ্যক্ষ হয়ে আসার আগে মালদায় তাদের বাণিজ্যিক কার্যকলাপের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। মালদা কুঠির বাণিজ্যিক অর্থ বিনিয়োগ তাঁর সময়ে ৫০০০০ পাউণ্ড পর্যন্ত হয়েছিল। তিনি ১৭৮৩ সালে গুয়ামালতীতে একটি নীলকুঠিও স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তী পর্বে ক্রিটন এখানকার কুঠিয়াল হন। ১৭৯৪ সালে বিখ্যাত ব্যাপটিস্ট মিশনারী উইলিয়াম কেরী বর্তমান বামনগোলা থানার অন্তর্গত মদনাবতীতে জর্জ উডনীর নীলকুঠির অধ্যক্ষ হয়ে আসেন। এখানেই তিনি বাইবেলের বাংলা অনুবাদ রচনা করেন। ১৭৯৯ সালে মালদা ত্যাগ করে তিনি শ্রীরামপুরে যান এবং ১৮০০ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ হন। কিন্তু বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশে তাঁর যে প্রচেষ্টা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় তা স্বতন্ত্রভাবে পরবর্তী পর্বে আলোচিতব্য।

প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয় যে সে সময়ে মালদহ অঞ্চলে যে সব লাভজনক নীলকুঠি স্থাপিত হয়েছিল তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য — গুয়ামালতী কুঠি, খৈলসনা কুঠি, কালিয়াচক কুঠি, মাধববাটি

(মদনাবতী) কুঠি, মথুরাপুর কুঠি, নাজিরপুর কুঠি, নারায়ণপুর কুঠি, সিঙ্গাতলা কুঠি, বাকরাবাদ কুঠি। নারায়ণপুরে রফিক মণ্ডলের নেতৃত্বে নীলবিদ্রোহ হয়েছিল। ১৮৭৩ সালে কুড়িটিরও বেশী নীলকুঠির খবর মেলে।[১৩]

১৮৫৭ সালে দেশব্যাপী সিপাহী বিদ্রোহে এ জেলার বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা নেই বটে, তবে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে এ জেলার প্রতিবাদ দেখা যায়। ১৯০৭ সালে ৬জুন মালদায় জাতীয় শিক্ষা সমিতি অধ্যাপক বিনয় সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। জাতীয় বিদ্যালয় (National School) মালদা, কলিগ্রাম, ধরমপুর, পরাণপুর, যদুপুর, নরোত্তমপুর ইত্যাদি স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সভাপতি ছিলেন প্রাণকৃষ্ণ ভাদুড়ী, অ্যাডভোকেট, সহ-সভাপতি রাধেশচন্দ্র শেঠ, প্লিডার মৌলভী মোহাম্মদ নূর বক্স এবং বিপিন-বিহারী ঘোষ, প্লিডার, সম্পাদক। ১৯০৭-৯ এ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ২০১।[১৪] এর কিছু ছাত্র সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গেও জড়িত ছিল।

স্বাধীনতা আন্দোলনে অনুশীলন সমিতি ও ব্রতী সমিতিরও শাখা মালদায় ছিল। আলালের মহেন্দ্র দাস, (জেল ১৪ বছর), পিপলার বিভূতিভূষণ চক্রবর্তী, অনাথবন্ধু ঘোষ ও মল্লিকপুরের দেবেন্দ্র দাস অনুশীলন সমিতির সক্রিয় সদস্য ছিলেন।[১৫] রাজাবাজার বোমার মামলার সঙ্গে জড়িত স্বদেশ পাকড়াশী মালদাতেই আত্মগোপন করেছিলেন।[১৬]

বিশ শতকের কুড়ির দশকে তেভাগা আন্দোলনেও মালদা জেলার ধরণীধর সরকার, নরেন দাস, জয়গোপাল গোস্বামী প্রমুখের অবদান কম নয়। ১৯২৭ সালে সাঁওতালের মধ্যে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় জিতু সাঁওতাল ও তার সহযোগী অর্জুন সাঁওতাল। এদের গুরু ছিলেন দিনাজপুরের কাশীশ্বর চক্রবর্তী। 'সত্যম্ শিবম্' নামে এই ধর্ম সাঁওতালরা গ্রহণ করে। তাদের কালীপূজার উদ্যোগ জেলাশাসক ১৪৪ ধারায় বন্ধ করেন এবং কাশীশ্বরকে এ জেলায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন। তবে ১৯২৭ সালের ৮ই মে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ব্যতিরেকে প্রায় ৩০০০ সাঁওতাল পূজায় যোগদান করে। কিন্তু সরকার ফৌজদারী আইনের ১১০ ধারা অনুযায়ী জিতু সাঁওতাল ও তার সহকারী অর্জুন সাঁওতালের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। দু বছর জিতু ও তার দলবল শান্তি রক্ষা করে, কিন্তু সেসন জজ ম্যাজিস্ট্রেটের রায় পরিবর্তন করেন। জিতু সাঁওতালদের নিকট থেকে অর্থ আদায় করতে থাকে এবং সাঁওতালদের বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করে এই বলে যে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটেছে এবং সেই সাঁওতালদের নেতা। ১৯৩২ সালের ৩রা ডিসেম্বর এক বিরাট সাঁওতাল জনতা সংরক্ষিত সৌধ আদিনা দখল করে এবং পূজাস্থান বলে ঘোষণা করে। তারা কোন মুসলমানকেও সেখানে প্রবেশে বাধা দেয়। তাতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদের সম্ভাবনা দেখা দেয়, কিন্তু জেলাশাসক ও পুলিশের অধ্যক্ষ (Superintendent of Police) হস্তক্ষেপ করায় সাঁওতালরা সে স্থান পরিত্যাগ করে। পুনরায় ১৪ই ডিসেম্বর আরও অধিক সংখ্যক সাঁওতাল আদিনা দখল করতে আসে এবং তাতে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। জনৈক কনেষ্টবলের তাদের তীরের আঘাতে মৃত্যু হয় এবং পুলিশের গুলিতে তিনজন সাঁওতালের মৃত্যু হয়।[১৭]

স্বাধীনতা সংগ্রামে মালদা জেলার অবদানও আছে। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনেরও খবর আছে। মালদা জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক নবীন বসুর হত্যাতে অভিযুক্ত গাজোলের আলালের মহেন্দ্র সরকার আন্দামানে নির্বাসিত হন। অবিভক্ত মালদার কানসাটের কৃষ্ণজীবন সান্যাল আলিপুর বোমার মামলায় সর্বকনিষ্ঠ আসামী হিসেবে অভিযুক্ত হন। বিয়াল্লিশের ভারত ছাড়ো কংগ্রেসের

আন্দোলনে পিপলার সুবোধ মিশ্র, বিভূতি মিশ্রের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রেলপথ ও টেলিগ্রাফের তার কাটা এবং পোস্ট অফিস ও রেলওয়ে স্টেশনে অগ্নি সংযোগ ঘটনায় আন্দোলনকে দুর্বার করায় তাঁরা স্মরণীয়। ১৯৪২ সালে ৪ঠা সেপ্টেম্বর সুবোধবাবু বন্দী হন বটে, কিন্তু জনতা তাঁকে উদ্ধার করে। পরবর্তী পর্বে তাঁর সাড়ে ৬ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।[১৮] ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মালদার অন্য উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বদের কতিপয় — চাঁপাই নবাবগঞ্জের রমেশচন্দ্র বাগচী, রমেশ ঘোষ, ভালুকার সুরেন্দ্রবালা রায়, দ্যুতিধর রায়, ব্যোমকেশ রায়, আড়াইডাঙ্গার অতুল কুমার, কালিয়াচকের শেরশাহীর সুধারানী চৌধুরাণী মিশ্র, বাঙ্গীটোলার দেবেন্দ্রনাথ ঝা ও ভূপেন্দ্রনাথ ঝা, বাচামারীর কৃষ্ণগোপাল সেন ও তাঁর স্ত্রী তরুবালা সেন, হরিশ্চন্দ্রপুরের শচীন্দ্রনাথ মিশ্র, নঘরিয়ার শিক্ষক যতীন্দ্রনাথ সিংহ, মানিক ঝা এবং সৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র, রামহরি রায়, বিজয় দাশগুপ্ত, নিকুঞ্জবিহারী গুপ্ত, সত্যরঞ্জন সেন, দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, মুকুটধারী সিং, রামরাঘব লাহিড়ী, হরিনন্দন ব্রহ্মচারী, নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সূর্যপ্রসাদ বিহানী, সতীশচাঁদ আগরওয়ালা, উমা রায়, কালীরঞ্জন রায় (দাশ) হরিমোহন ঝা, হংসগোপাল আগরওয়ালা, বিপিনবিহারী ঘোষ, রাধেশ শেঠ, প্রিয়নাথ ঘোষ, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, ড. গিরিজা মুখোপাধ্যায়, শান্তিগোপাল সেন, দ্বারিকাদাস বিহানী, কাজী আজাহারউদ্দিন, সরজুপ্রসাদ বিহানী, পশুপতি ঝা প্রমুখেরা।

● পাদটীকা

১. Jatindrachandra Sengupta - West Bengal District Gazetteers, Malda 1969, p 55-56
২. Op Cit, p 56
৩. রমেশচন্দ্র মজুমদার - বাংলাদেশের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ৮-৯
৪. প্রাগুক্ত, পৃ ১০
৫. তদেব, পৃ ১০
৬. West Bengal District Gazetteers, Malda, 1969, p 56
৭. বাংলাদেশের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ১১
৮. প্রাগুক্ত, পৃ ১১-১২
৯. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৭
১০. তদেব, পৃ ৪৮-৪৯
১১. Op. Cit, West Bengal District Gazetteers, Malda, 1969, p 56-57
১২. প্রাগুক্ত, বাংলাদেশের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ২২-২৩
১৩. Hunter W W, A Statistical Account of Bengal, Malda, Vol. vii, p 98
১৪. Baneswar Das, The Social and Economic Ideas of Benoy Sarkar, p-199
১৫. ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, - জেলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারত স্বাধীনতা সংগ্রাম, পরিশিষ্ট, পৃ ৭০
১৬. Op. Cit, District Gazetteers, Malda, p 61
১৭. Op. Cit, p 62
১৮. Op. Cit, p 62

# পৌরসভা

## ওল্ড মালদা মিউনিসিপ্যালিটি

কালিন্দী ও মহানন্দা নদীর সংযোগস্থলে ২৫° ৩০´´ অক্ষাংশ ও ৮৮° ১০´ ৫১´´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত এই মালদা শহরটি (বর্তমানে ওল্ড মালদা বা পুরাতন মালদা)। বর্তমান মালদা শহর বা ইংরেজবাজার শহরের পূর্ব থেকে জলপথের সুবিধা থাকায় মুসলমান শাসনে পাণ্ডুয়া রাজধানী হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ ছিল। অষ্টাদশ শতকে এটি তুলা ও রেশম শিল্পে গৌরবধন্য হয়ে উঠেছিল। তবে উনিশ শতকের প্রথমে বুকানন হ্যামিল্টনের আগমন সময়ে তার গৌরব হ্রাস পেলেও সম্পূর্ণ শহরটি ব্যবসায়ী ও তন্তুবায়দের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। ১৮৬৯ সালের ১ লা এপ্রিল মালদা মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিষ্ঠা। প্রথমদিকে পদাধিকার বলে জেলাশাসকই এই পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন। এবং তার সভ্য সংখ্যা ছিল ১২। প্রথম দিকে ওল্ড মালদা পৌরসভায় ছিল তিনটি ওয়ার্ড এবং প্রতি ওয়ার্ড থেকে তিনজন করে অর্থাৎ মোট ৯ জন কমিশনার ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হতেন। পরবর্তী পর্বে তিনটি ওয়ার্ড ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত হয়। বর্তমানে সেখানে ১৭টি ওয়ার্ড আছে। আগে পৌরসভা জনগণের করের মাধ্যমেই এলাকার উন্নতি বিধান করতো, রাস্তার ধারে খুঁটির উপর কাঁচের চিমনি সহ কেরোসিন তেলের আলো জ্বালানো হত। প্রতিদিন রাস্তাঘাট পরিস্কারের জন্য তিন জন ঝাড়ুদারও নিযুক্ত হয়। ছিল দাতব্য চিকিৎসালয়। রাস্তাঘাট অবশ্য প্রথম দিকে কাঁচা ছিল। পৌরসভার অধীনে প্রথমে তিনটি ফ্রি প্রাইমারী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। পরবর্তী পর্বে জনগণের অর্থে ও সাহায্যে একটি ছাত্রীদের জন্য আহ্লাদমণি বালিকা বিদ্যালয় এবং অন্যটি কালাচাঁদ উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। সম্ভবতঃ
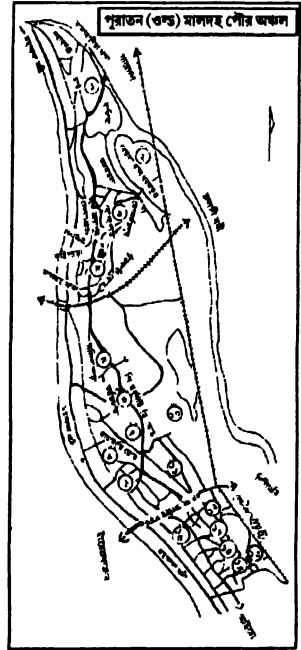
কৃষ্ণমোহন দাস প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে ১৯৯৫ সালে পৌরসভার এলাকা অনেক বৃদ্ধি পেয়ে ১৭টি ওয়ার্ডে বিভক্ত হয়ে মঙ্গলবাড়ী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এই পৌরসভার অধীনে 'নবাবগঞ্জ' হাট বর্তমান। ১৮৭২ সালে এর জনসংখ্যা ছিল ৫২৬২। পরবর্তী পর্বে ১৯০১ সাল থেকে আদমসুমারী অনুসারে শহরের জনসংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

| সাল | লোকসংখ্যা |
|---|---|
| ১৯০১ | ৩,৭৮৩ |
| ১৯১১ | ৩,৭৫০ |
| ১৯২১ | ৩,১৪৫ |
| ১৯৩১ | ২,৭৭৯ |
| ১৯৪১ | ৩,৮৪৫ |
| ১৯৫১ | ৪,৩৯৮ |
| ১৯৬১ | ৪,৮৮৫ |
| ১৯৭১ | ৬,৬৯১ |
| ১৯৮১ | ৮,৫৭৯ |
| ১৯৯১ | ১৩,০২১ |
| ২০০১ | ৬২,৮৭৫ |

বর্তমানে পৌর এলাকার আয়তন ৯.৫৮ বর্গ কিমি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে ওল্ড মালদা পৌরসভার আয় ছিল ১৮৭২ সালে ১৮৬ পাউণ্ড ১২ শিলিং এবং জনপ্রতি কর ছিল ৫ আনা ৮ পয়সা। ১৮৬৯-৭০ সালে বাড়ী ছিল ৯২৫টি।

## ইংরেজবাজার মিউনিসিপ্যালিটি

মালদা শহর বা ওল্ড মালদা শহরের ক্রম-অবনতিই ইংরেজবাজার শহরের শ্রীবৃদ্ধি আনে। এটিরও পৌরসভা ১৮৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন ইংরেজবাজার পৌরসভার সদস্য ছিল ১৮। সে সময়ে এর আয়তন ছিল ১৫০০ একর। ১৮৬৯-৭০ সালে বাড়ীর সংখ্যা ছিল ১৪৬২টি এবং ১৮৭২ সালের আদমসুমারীতে পৌরসভার আয় ৩৮৮ পাউণ্ড ২ শিলিং। এবং জনপ্রতি কর ছিল ৪ আনা ৭ পয়সা। ১৮৭২ সালে মোট জনসংখ্যা ছিল ১২৮৫৯। প্রথমে চেয়ারম্যান পদে ইংরেজ প্রতিনিধি এবং ভাইস-চেয়ারম্যান পদে কোন এক শিক্ষিত ধনী ব্যক্তি মনোনীত হতেন। তবে দেশীয়দের মধ্যে প্রথম এই পৌরসভায় ভাইস চেয়ারম্যান মনোনীত হন বিপিনবিহারী ঘোষ, প্লিডার (১৯১১-১৯১২) এবং ১৯২৫ সালে প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান ছিলেন নীলমণি ঘটক।

বর্তমানে ইংরেজবাজার পৌরসভার চৌহদ্দীর বিস্তৃতি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে জনসংখ্যাও। আদমসুমারী অনুসারে ১৯০১ সাল থেকে এই পৌরসভার অধীনস্থ জনসংখ্যা ঃ

| সাল | লোকসংখ্যা |
|---|---|
| ১৯০১ | ১৩,৬৬৭ |
| ১৯১১ | ১৪,৩২২ |
| ১৯২১ | ১৪,০৫৭ |
| ১৯৩১ | ১৬,৯০৭ |

| | |
|---|---|
| ১৯৪১ | ২৩.৩৩৪ |
| ১৯৫১ | ৩০,৬৬৩ |
| ১৯৬১ | ৪৫.৯০০ |
| ১৯৭১ | ৬১,৩৩৫ |
| ১৯৮১ | ৮৪,৬৬৫ |
| ১৯৯১ | ১,৩৯,২০৪ |

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে মালদা জেলার জনসংখ্যা স্ফীতির হার পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় অধিক। তেমনই ইংরেজবাজার পৌরসভার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও অনুরূপ কতিপয় শহরের জনবসতির ঘনত্বের অধিক। বর্তমানে এ শহরের চৌহদ্দী এলাকা ১৩.২৫ বর্গকিমি। ২৫টি ওয়ার্ডের সম্মিলনে এর চৌহদ্দী।
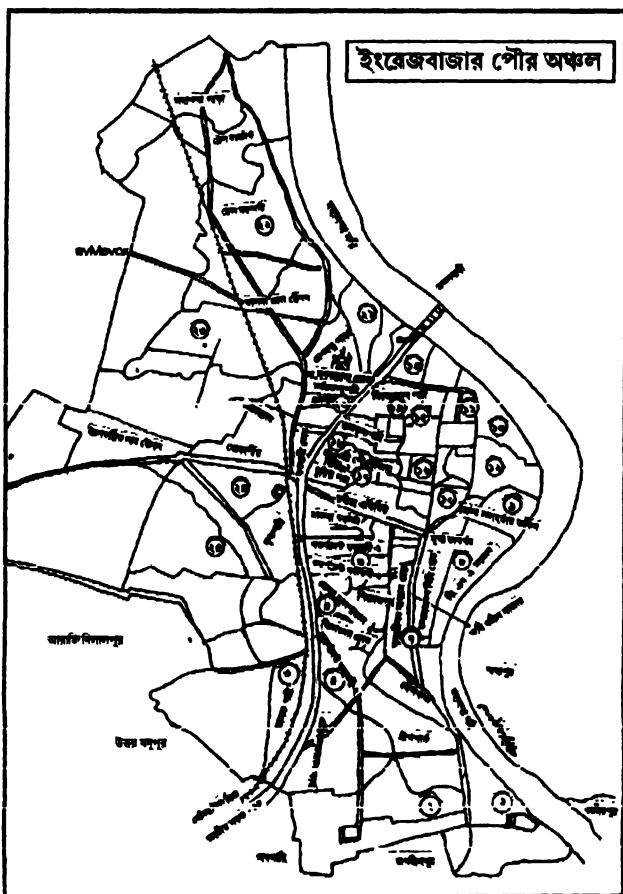
# জলবায়ু

মালদা জেলার আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য এই যে মোটামুটি এটি চরমভাবাপন্ন। গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরম, বর্ষাকালে প্রচণ্ড বারিপাত এবং প্রায় সারা বছরই বাতাসে জলীয় বাষ্প বিদ্যমান। তবে বরিন্দ এলাকার আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত শুষ্ক, কিন্তু টাল ও দিয়াড়া অঞ্চলের আবহাওয়া আংশিক শীতল।[১] আবহাওয়ার দিক থেকে এ জেলাকে মোটামুটি চারটি ভাগে ভাগ করা যায়।

১. শীতকাল নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ফেব্রুয়ারীর শেষ পর্যন্ত চলে।

২. গরমকাল মার্চ থেকে মে পর্যন্ত।

৩. দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু জুনের গোড়া থেকে সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত চলে।

৪. মৌসুমী-উত্তর আবহাওয়া অক্টোবরের শেষ থেকে নভেম্বরের মধ্যভাগ পর্যন্ত।

প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে এখানে সর্বাপেক্ষা শীত পড়ে ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে।

**জেলার বৃষ্টিপাতের মাসিক পরিসংখ্যান (১৯৯৩-১৯৯৯)**

মিলিলিটার

| নাম | স্বাভাবিক | প্রকৃত | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ১৯৯৩ | ১৯৯৪ | ১৯৯৫ | ১৯৯৬ | ১৯৯৭ | ১৯৯৮ | ১৯৯৯ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| জানুয়ারী | ১০ | ৩৯ | ২৯ | ৩ | ৪ | ১৬ | ৬ | ০ |
| ফেব্রুয়ারী | ২২ | ১ | ২৯ | ১০ | ১৯ | ১০ | ৭ | ০ |
| মার্চ | ১৮ | ১৮ | ০ | ৪ | ৭ | ৮ | ৮৪ | ০ |
| এপ্রিল | ৩৫ | ১১৭ | ১৪ | ৩ | ৩২ | ৮৮ | ৭২ | ১৩ |
| মে | ১১৫ | ১৪৩ | ৯৮ | ৫৩ | ৩৪ | ৮১ | ১১৮ | ১৩০ |
| জুন | ২৫৩ | ১৭৩ | ৪৩৭ | ৩০৭ | ২১২ | ২১৩ | ২৯৩ | ৩৩২ |
| জুলাই | ২৯২ | ১৯১ | ২৫৬ | ৩৬৩ | ২৬৫ | ৪০৭ | ৫৪০ | ৪৩২ |
| আগষ্ট | ২৮৪ | ৩০১ | ১৯৯ | ৫৯৪ | ৩৩৮ | ৫৪৯ | ৩২৩ | ৪৪২ |
| সেপ্টেম্বর | ২৮৭ | ৩২০ | ১৫৩ | ৭২০ | ৪৩৩ | ২৮৫ | ৩২২ | ৬৩১ |
| অক্টোবর | ১২১ | ৬২ | ১১০ | ৬ | ৭৪ | ২৭ | ২৭৭ | ১৫৭ |
| নভেম্বর | ১৪ | ৫৪ | ০ | ৮৬ | ০ | ২ | ১৭ | ৪ |
| ডিসেম্বর | ২ | ০ | ০ | ১০ | ০ | ২৩ | ০ | ০ |

(সূত্র — মিটিওরোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট, ভারত সরকার)[১৭]

গড় হিসেবে এ জেলায় বছরে মোটামুটি ৬৭ দিন বৃষ্টিপাত (কমপক্ষে ২.৫৫ মিমি - ১০ সেমি কিম্বা অতিরিক্ত) হয়। এটি গাজোল অঞ্চলে ৬৫ দিন এবং মালদায় ৭০ দিন। চব্বিশ ঘণ্টায় মালদা জেলায় সর্বাধিক বৃষ্টির পরিমাণ ১৮৯৩ সালে ২৬ শে সেপ্টেম্বরে গাজোলে ৩৯৩.৭ মিমি (১৫.৫০´´)।[২] তবে উপরি উক্ত পরিসংখ্যানে ১৯৯৭ সালের বৃষ্টিপাতই মালদা সহরে সর্বাধিক।

মালদা শহরের (ইংরেজবাজার) আবহ-অফিসের পরিসংখ্যান অনুযায়ী
সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (১৯৯৩-১৯৯৯) [ ডিগ্রী সেলসিয়াস ]

| মাস | ১৯৯৩ | | ১৯৯৪ | | ১৯৯৫ | | ১৯৯৬ | | ১৯৯৭ | | ১৯৯৮ | | ১৯৯৯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) | (১২) | (১৩) | (১৪) | (১৫) |
| জানুয়ারী | ২৯ | ৯ | ২৭ | ১১ | ২৭ | ৯ | ২৬ | ১১ | ২৭ | ৯ | ২৭ | ৮ | ২৯ | ৯ |
| ফেব্রুয়ারী | ৩৩ | ১৪ | ২৯ | ১৩ | ৩১ | ১২ | ৩২ | ১২ | ৩১ | ১০ | ৩২ | ১২ | ৩৪ | ১১ |
| মার্চ | ৩৭ | ১৫ | ৩৯ | ১৪ | ৪০ | ১৫ | ৩৮ | ১৭ | ৩৭ | ১৭ | ৩৫ | ১৪ | ৩৮ | ১৬ |
| এপ্রিল | ৪০ | ২০ | ৪১ | ১৯ | ৪৩ | ২১ | ৪১ | ১৮ | ৩৮ | ১৮ | ৩৯ | ১৮ | ৪২ | ২২ |
| মে | ৩৯ | ১৫ | ৪৫ | ... | ৪৪ | ২৫ | ৪৩ | ২০ | ৪১ | ১৪ | ৪১ | ২২ | ৪০ | ২২ |
| জুন | ৩৬ | ২৪ | ৩৭ | ২৩ | ৪০ | ১৮ | ৩৭ | ২২ | ৪১ | ২৪ | ৪৩ | ২৬ | ৪১ | ২০ |
| জুলাই | ৩৬ | ২৫ | ৩৪ | ২৫ | ... | ২৪ | ৩৬ | ২৬ | ৩৭ | ২৫ | ৩৭ | ২৫ | ৩৫ | ২৪ |
| আগষ্ট | ৩৪ | ২৫ | ৩৬ | ২৫ | ... | ২৫ | ৩৫ | ২৫ | ৩৭ | ২৫ | ৩৬ | ২৫ | ৩৬ | ২২ |
| সেপ্টেম্বর | ৩৫ | ১৪, | ৩৫ | ২৩ | ... | ২৩ | ৩৬ | ২৪ | ৩৫ | ২২ | ৩৭ | ২৪ | ৩৫ | ২৩ |
| অক্টোবর | ৩৩ | ২০ | ৩৩ | ২১ | ... | ২১ | ৩৪ | ২২ | ৩৫ | ২০ | ৩৬ | ২১ | ৩৫ | ২২ |
| নভেম্বর | ২৮ | ১৬ | ৩১ | ১৫ | ... | ১৫ | ৩৪ | ১৫ | ৩৪ | ১৫ | ৩৪ | ১৭ | ৩৩ | ১৬ |
| ডিসেম্বর | ২৮ | ১৩ | ২৭ | ১২ | ২৭ | ১৪ | ৩০ | ১১ | ৩০ | ৯ | ৩১ | ১১ | ৩০ | ১১ |

[ ... প্রাপ্ত নয় ][৩]

মোটামুটি মার্চ মাসের সুরু থেকেই এ জেলার তাপমাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে, যদিও এপ্রিল কিম্বা মে মাসের দিনের তাপমাত্রা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে মে-জুনে, এমন কি রাত্রের তাপমাত্রা মৌসুমী বায়ুর আওতাতে থাকলেও বৃদ্ধি পায়। এপ্রিলে গড় দিনের তাপমাত্রা ২১.৮° সেলসিয়াস। বাতাসের আর্দ্রতা বেশী থাকায় গ্রীষ্মের তাপ অসহ্য হয়ে ওঠে। জুনে মৌসুমী বায়ুর আগমন হেতু

দিনের তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রী হ্রাস পেলেও রাত্রের তাপমাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি ঘটে। বাতাসের আর্দ্রতা বৃদ্ধি হয় এবং রাতের তাপমাত্রার বৃদ্ধির দরুণ মৌসুমীকালে বৃষ্টির মধ্যেও চূড়ান্ত গরম অনুভূত হয়। অক্টোবরের প্রথম দিকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর আগমন বন্ধ হলে দিন ও রাতের তাপমাত্রা ক্রমশ কমতে থাকে। নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে শীত পড়তে থাকে এবং রাতের তাপমাত্রা দিনের তাপমাত্রা অপেক্ষা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। জানুয়ারী মাসে সর্বাপেক্ষা অধিক শীত অনুভূত হয় এবং তখন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০.৩° সেলসিয়াস (৫০.৫ ফারনেহাইট) এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৩.৮° সেলসিয়াস (৭৪.৯) ফারেনহাইট)।[৪] শীতকালে পশ্চিমা বাতাস (স্থানীয় ভাষায় 'পচ্ছ্যা' < পশ্চিমা) তাতে যুক্ত হয়ে ৪°/৫° ডিগ্রী সেলসিয়াসে নেমে আসে। এ পর্যন্ত মালদাতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৫° সেলসিয়াস (১১৩° ফারেনহাইট) নথিভুক্ত আছে ১৯৫৮ সালের ২৭শে মে তারিখে এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রার খবর আছে ১৯০৫ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী ৩.৯° সেলসিয়াস (৩৯.° ফারেনহাইট)।[৪] গত ২০০০ সালের ১৪ই জানুয়ারী প্রচণ্ড শীত পড়ে বটে, কিন্তু তার পরিমাপ ছিল ৬° সেলসিয়াস।

সারা বছরেই এ জেলার বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা (Relative Humidity) লক্ষণীয়। কিন্তু গ্রীষ্মের প্রথম দিকে তুলনামূলকভাবে কম — প্রাতে ৫০% - ৬০% এবং ৩০%-৪০% দ্বিপ্রহরে।[৪]

মে মাসে মেঘের আনাগোনা এবং দক্ষিণ-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে অধিক মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, অক্টোবর মাসেও কখনো বা মেঘাচ্ছন্ন

আকাশ দেখা যায়। তা ছাড়া বছরের অন্যান্য সময়ে প্রধানত আকাশ নির্মল থাকে, তবে কখনো কখনো সামান্য মেঘের আনাগোনা দেখা যায়।

শেষ গ্রীষ্মে এবং মৌসুমীকালে বাতাসের গতিবেগ বৃদ্ধি পায়। মৌসুমীকালে প্রধানতঃ দক্ষিণ ও পূর্ব দিক থেকে বাতাস প্রবাহিত হয়। অক্টোবরে তার দিকের পরিবর্তন হয়। নভেম্বরে পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব দিক থেকে এবং মার্চে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম বাতাসের আবির্ভাব ঘটে। মে মাসে উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ থেকে প্রধানত প্রবাহিত হয় বাতাস।

বঙ্গোপসাগর অঞ্চলের নিম্নচাপ সৃষ্টি হলে মে মাসে এবং মৌসুমী-উত্তর কালে অনেক সময় এ জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ঝড়-ঝঞ্ঝা সহ বিদ্যুৎ ও বজ্রপাত ঘটায়। মৌসুমী কালে বঙ্গোপসাগরের উপরে নিম্নচাপের ফলে এ জেলায় ভারী বর্ষণও দেখা যায়। আবার মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে বজ্র-বিদ্যুৎ সহ ঝড়-ঝঞ্ঝা সাধারণতঃ বিকেলের দিকে দেখা দেয়, কখনো ভারী বর্ষণ, কখনো বা শিলাবৃষ্টি সহ দমকা ঝড় উত্তর-পশ্চিম দিকে থেকে আবির্ভূত হয়। একে 'কালবৈশাখী' বলা হয় এবং প্রায়শ এতে তাপমাত্রা দ্রুত হ্রাস পায়। বর্ষাকালে বজ্র-বিদ্যুৎসহ বৃষ্টি এবং মাঝে মাঝে অক্টোবরেও ঝড়-ঝঞ্ঝা সহ বজ্রপাত ঘটে। শীতকালে মাঝে মাঝে কুয়াশা দেখা যায়।[৪]

## ● পাদটীকা

১. মালদহ (প্রচার বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার), ১৯৫৪, পৃ-৬

১ক. District Statistical Hand Book, 1998, 1999 & 2000, p-2

২. Gazetteer of India, West Bengal, Malda, 1969, p-15

৩. District Statistical Hand Book, 1999 & 2000, p-3

৪. Gazetteer of India, West Bengal, Malda, 1969, p-15

৫. ibid, p-15

৬. ibid, p-15

৭. ibid, p-16

# নদ-নদী

মালদা জেলার নদীগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গঙ্গা ও মহানন্দা। গঙ্গার প্রশাখা এখানে ভাগীরথী ও পাগলা। অন্যদিকে মহানন্দার উপনদী কালিন্দী, টাঙ্গন ও পুনর্ভবা। অবশ্য গঙ্গা এখন এ জেলার পশ্চিম-প্রান্তবাহিনী হয়ে রুদ্রাণী রূপে প্রবাহিতা।

**গঙ্গা**

উত্তর ভারতের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নদী এই গঙ্গা — ভারতের ইতিহাস ও ঐতিহ্য। ১৮১৭ সালে ক্যাপ্টেন হজসন গঙ্গার উৎস মুখের সঠিক চিত্র উপস্থিত করেন।[১] এডওয়ার্ড থর্নটন ক্যাপ্টেন স্ট্র্যাচেকেই গঙ্গার উৎসমুখের আবিষ্কারক বলে অভিহিত করেছেন।[২] প্রকৃতপক্ষে হিমালয় উৎসারিত পাঁচটি নদী — ভাগীরথী, অলকানন্দা, মন্দাকিনী, ধৌলি ও পিণ্ডারের সম্মিলিত জলধারায় গঙ্গার জন্ম। তন্মধ্যে অবশ্য ভাগীরথী ও অলকানন্দাই মুখ্য। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে ভাগীরথী আবার বঙ্গদেশেরও একাধিক নদীর নাম। দেবপ্রয়াগ থেকে উপরি উক্ত মিলিত ধারাটি গঙ্গা নাম নিয়ে হিমালয় ও শিবালিক পর্বতমালা ভেদ করে উত্তরপ্রদেশের হরিদ্বারে এসে সমতলভূমিতে তার অবতরণ। হরিদ্বার পর্যন্ত প্রায় ৩২০ কিমি তার প্রাথমিক গতি। গঙ্গা এবার হরিদ্বার ত্যাগ করে দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিনী হয়ে যমুনা ও অধুনা-লুপ্ত সরস্বতীর সঙ্গে মিলেছে। হরিদ্বার থেকে বঙ্গে প্রবেশ পথে রাজমহল পর্যন্ত তার মধ্যগতি। এই পর্বে যমুনা ব্যতীত রামগঙ্গা, গোমতী, টনস, কর্মনাশা, সারদা, ঘর্ঘরা, গণ্ডক, বুড়ীগণ্ডক, কুশী, শোন, ফল্গু, পুনপুন ও আরও অনেক নদ-নদীর সঙ্গে গঙ্গার মিলন ঘটেছে। বিহারের সাহেবগঞ্জের বিপরীত দিকে সকরীগলিতে এসে পৌঁছে রাজমহল পাহাড়ে প্রতিহত হয়ে বাধ্য হয়ে উত্তরবাহিনী হয়ে গারো ও রাজমহলের সংকীর্ণ গিরিবর্ত্ম (গারো-রাজমহল গ্যাপ) দিয়ে বক্রভাবে দক্ষিণে পৌঁছে মালদা জেলার পশ্চিম-প্রান্তবাহিনী হয়ে ফারাক্কা পেরিয়ে ধুলিয়ানগঞ্জের নিকটবর্তী গেরিয়া গ্রামে (বা ছাবঘাটি, অঃ ২৪°৬', দ্রা ৮৮°২' পুঃ) এসে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়েছে — ১. পূর্বগামী পদ্মা — যা বর্তমান বাংলাদেশের অভিমুখে প্রবাহিত। ২. দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে তিন অংশে তিনটি নাম — গেরিয়া থেকে নবদ্বীপের কাছে জলঙ্গী নদীর সঙ্গম পর্যন্ত ২৪০ কিমি প্রবাহ 'ভাগীরথী', এবং ৩. জলঙ্গী ও ভাগীরথীর মিলিত স্রোতধারা 'হুগলী' — যা মোহনা পর্যন্ত ৩৫০ কিমি বিস্তৃত। অবশ্য এ নদীর সম্পূর্ণটাই গঙ্গা নামে সাধারণ্যে পরিচিত।[৩]

মালদার পশ্চিমপ্রান্তের অপেক্ষাকৃত নবীন পলল মৃত্তিকায় গঠিত অংশকে পিছনে ফেলে গঙ্গা পশ্চিম দিকে তার গতিপথ তৈরী করেছে। কারণ গৌড়ের সমৃদ্ধির যুগে গঙ্গা তার পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত হতো। তার প্রাচীন খাদ আজও দেখা যায়। সুতরাং গৌড় ও মহানন্দা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল স্বাভাবিকভাবেই প্রাচীন পলল মৃত্তিকা অঞ্চল। একটি মতে বলা হয়েছে যে বর্তমান কালিন্দী নদীর মতই গঙ্গা আদিতে নীচের খাদে প্রবাহিত হতো এবং পূর্ব প্রান্তের গৌড়ের পাশ দিয়ে বহমান ছিল। এই তত্ত্বের পশ্চাতে যুক্তি হল বরিন্দের প্রাচীন রক্তিম পললভূমিই সম্ভবত নদীর প্রকৃত প্রবাহ পথ ছিল। মহানন্দা নদীর পশ্চিমপ্রান্তের বিলের সারি দৃশ্যমান, অথচ আরও উত্তরে প্রাচীন পলল মৃত্তিকা-ভূমি মহানন্দারই নদী পথ, অথচ তা কালিন্দীর গতিপথ নয়। সুতরাং এটি স্পষ্ট যে গৌড়ের পাশের গঙ্গার মূল প্রবাহ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পশ্চিমে রাজমহল পাহাড়ের দিকে সরে গেছে। ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে র‍্যালফ ফীচ গৌড়ের পর রাজধানী টাঁড়া বা তানদা সম্পর্কে বলেছেন যে এক লীগ (= ৪.৮ কিলোমিটার) দূরে ভাগীরথীর বিপরীত দিকে তা অবস্থিত ছিল। ১৭৬৪ এবং ১৭৭৩ সালের মধ্যে রেনেলের তৈরী মানচিত্রে কিন্তু গঙ্গার পশ্চিমামুখী অপসরণের চিহ্ন অবসিত। কারণ মূল গঙ্গার প্রবাহ রাজমহলের নীচ দিয়েই প্রবাহমান ছিল। এর একটি সহায়ক শাখা বেরিয়ে প্রায় ১৫ মাইল একটি দ্বীপ সৃষ্টি করত 'খাদির' তৈরী করে পুনরায় মূল প্রবাহে যুক্ত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত এই চিত্রটিই দেখা যায় বটে, কিন্তু মূল ভূতনী চরের আয়তন ক্ষুদ্রতর হয়েছে এবং মূল গঙ্গার প্রবাহ রাজমহল পাহাড়ের নীচে দিয়েই প্রবাহিত।[৪] বিংশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে গঙ্গার প্রবাহ পশ্চিম দিকে সরে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায় বলে সাঁওতাল পরগণা (বর্তমান ঝাড়খণ্ড ও মুর্শিদাবাদের দিকে ভাঙ্গন দেখা যায়। ফলে গঙ্গার পশ্চিম দিকের পাড় খাড়া এবং পূর্ব দিকে তটভূমি ঢালু। কারণ বেলে মাটি স্রোতের বেগকে প্রতিহত করায় নিতান্ত অক্ষম বলে একবার পাড় ভাঙতে সুরু করলে দ্রুতগতিতে নদীর আগ্রাসন চলে।
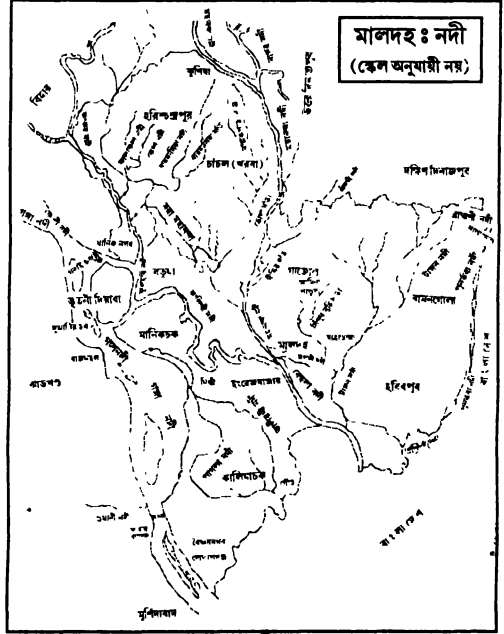
গঙ্গার গতিধারার শতাব্দীব্যাপী পরিবর্তনে জেলার পশ্চিমের চৌহদ্দী যেমন পরিবর্তিত হচ্ছে, তেমনই খাসমহলগুলি এক জেলা থেকে অন্য জেলায় স্থানান্তরিত হওয়ায় প্রশাসনের ক্ষেত্রেও (পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ড, বিহার) জটিলতা সৃষ্টি হয়ে চলেছে।

বিশ শতকের তৃতীয় দশকে গঙ্গার খাদ পশ্চিমের দূরতম দিক থেকে প্রবাহিত হওয়ায় তখন তার রাজমহল পাহাড়ের দিকে আরও সরে যাওয়ার পথ ছিল না। ১৮১০ সালে বুকানন হ্যামিলটন বলেছিলেন যে গঙ্গা মালদার সমভূমি অঞ্চল থেকে দূরে ছিল, এমন কি রাজস্ব জরীপের (Revenue Survey) সময়েও রাজমহল গঙ্গার তটোপরিই ছিল। কিন্তু ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে রাজমহল পরিত্যাগ করে পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে গঙ্গা কালিন্দী নদী কাটার উপক্রম করে। আসলে রাজমহল পাহাড় পরিবেষ্টনের পর পশ্চিম-খাদে অগ্রসর না হয়ে ভূতনী চরের খাদে প্রবাহিত হওয়ার ফলে মালদা অঞ্চলের ভূমি ব্যাপকভাবে ভাঙনের মুখে পড়ে। কিন্তু বিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে মূল প্রবাহ পশ্চিম প্রান্তের খাদ দিয়ে প্রবাহিত হলেও সে সময়েই কার্টার পূর্ব দিকের খাদ দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার আশঙ্কা করেছিলেন।[৫]

রাজমহলের ২ মাইল নীচে গঙ্গা একটি সংকীর্ণ নদী পরিত্যাগ করেছে — যা আদিতে তার নিজেরই গতিপথ ছিল। এটি পূর্ব দিকের প্রবাহিনী ভাগীরথী নামে মোটামুটি কালিয়াচক এবং ইংরেজবাজার থানার সীমানা নির্ধারণ করেছে। মহদীপুরের নিকটে এটি পাগলা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই পাগলা আগে গঙ্গারই শাখানদী ছিল। এই দুয়ের মিলিত স্রোতধারাই বর্তমান বাংলাদেশের কানসাটকে অতিক্রম করে নবাবগঞ্জের কাছে মহানন্দায় পতিত হয়েছে। গ্রীষ্মকালে দুটি নদীই শুষ্ক হয়ে নাব্যতা হারায়। ভাগীরথী বর্তমানে শুষ্কপ্রায় হলেও এটি মূল গঙ্গা নদীর প্রবাহপথ বলে সাদুল্লাপুরের শ্মশান ঘাট আজও হিন্দুদের বিভিন্ন তিথিতে স্নানের জন্য বিশেষ পবিত্র বলে পরিগণিত।
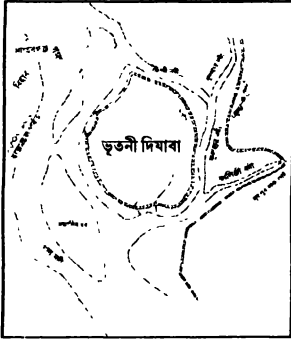
এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, সরলাকৃতি কোনও জলস্রোতের বেগ ও পরিমাণ নির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করলে জলকণাগুলি পাক খেয়ে খেয়ে অগ্রসর হয়। একে Helical Flow বলে। ফলে জলস্রোত এক দিকের পাড়ে চাপ সৃষ্টি করে সেখানে ভাঙন ধরায়। আবার সর্পিল আকৃতিতে প্রবাহিত নদীর অবতল বাঁকে (Concave bend) জনবসতি স্বাভাবিকভাবেই নদীগর্ভে বিলীন হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে উত্তল বাঁকের (Convex bend) পলি অবক্ষেপনের ফলে নূতন চরের আবির্ভাব হয়। মালদা জেলার পশ্চিম প্রান্তে ভূতনী থেকে ফারাক্কা ব্যারেজ পর্যন্ত এবং তার পূর্ব দিকেও যে ভাঙা-গড়ার চিত্র আজও নিত্য ক্রিয়াশীল, তার রূপ পরবর্তী পর্বে "গঙ্গার ভাঙন ও ফারাক্কা ব্যারেজ" শীর্ষক অংশে আলোচিতব্য।

## কালিন্দ্রী বা কালিন্দী

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে মিশরের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ, গণিতবিদ ও ভূবিদ্যাবিদ টলেমি (Klaudios Ptolemaios বা Ptolemy) সংস্কৃত শব্দ কালী নদীর গ্রীক অপভ্রষ্ট Kelydne বলে উল্লেখ করেছেন কালিন্দীকে।[৫ক]

মহানন্দা নদীর উপনদী কালিন্দী পূর্ণিয়া থেকে হাতিচাপার নিকটে এ জেলায় প্রবেশ করেছে। এর মূল জলধারা সিকিমের পার্বত্য অঞ্চল 'পনার' নদীর দ্বারা সঞ্জীবিত — যা প্রকৃতপক্ষে কোশী

নদীরই এক প্রশাখা। এবং এ জেলায় প্রবেশের ঠিক আগে কালিন্দী রূপে পরিচিত।[৬] রেনেলের মানচিত্রে কালিন্দীকে গঙ্গার একটি প্রশাখা হিসেবে দেখানো হয়েছে।[৭] অন্যদিকে ১৮১০ সালে বুকানন হ্যামিলটন লিখেছেন যে এ নদীর নিম্নপ্রবাহ অর্থাৎ মালদা অঞ্চলে প্রবাহিত অংশটি প্রকৃতপক্ষে গঙ্গার একটি শাখা ভিন্ন নয়।[৮] কার্টার এ ব্যাপারে হ্যামিলটনের সময়ে পূর্বের প্রবাহ রুদ্ধ হওয়ায় তাঁকে সমর্থন করেছিলেন। কারণ কালিন্দী সর্বকালেই গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত ছিল, নাব্যতাও ছিল এবং এর মাধ্যমে গঙ্গার অতিরিক্ত বন্যার জল প্রবাহিত হত। রাজমহলের নীচেই গঙ্গার মূল প্রবাহ, কিন্তু ১৮৭০ সালে গঙ্গা-দিয়াড়া জরিপের সময় রাজমহল-খাদ ত্যাগ করে ভূতনী-দিয়াড়ার পূর্ব দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পূর্ব দিকের পাড় কেটে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। ফলে কালিন্দী নদীতে জলের পরিমাণ বেশী হত। কিন্তু বর্তমানে পূর্ব দিকের প্রবাহ মন্দীভূত হওয়ায় বিরাট বালির চর সৃষ্ট হয়েছে। রর্ষাকালে ডান দিকের গঙ্গার সঙ্গে এটি মিলিত হয় এবং বামে 'টাল' এলাকা থেকে জল নিষ্কাষণ করায় পশ্চিমে হরিশ্চন্দ্রপুরের তুলসীহাটা ও রতুয়া থানার একটি দাঁড়া ও খাদের দ্বারা জলবিস্তার করেছে — যেগুলি কালকোশ, কঙ্কর, কোশ ও বারমাসিয়া নামে পরিচিত এবং এগুলির দ্বারা 'টাল' এলাকার জল বর্ষার পর নিষ্কাষণ করায় বটে, কিন্তু শুখা মরশুমে এগুলি জলহীন হয়ে পড়ে।[৯]

প্রকৃতপক্ষে কালিন্দী মহানন্দারই একটি শাখা, যা ফুলহার নামে বিহারের পূর্ণিয়া জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। এটি মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মিএগ্রাহাটের (জে.এল-১৬২) নিকট মালদা জেলায় প্রবেশ করেছে[১০] এবং পূর্ব দিকে রতুয়া (গরগরিবা) পর্যন্ত প্রবাহিত। এখান থেকে দক্ষিণে আচমকা বাঁক নিয়ে মিলকীর পাশ দিয়ে ঘুরে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে গিয়ে ওল্ড মালদার বিপরীত দিকে নিমাসরাই এর নিকট মহানন্দা নদীতে গিয়ে পতিত হয়েছে। রতুয়াতে পুরাতন গঙ্গার একটি ধারা 'বুড়ীগঙ্গা'র মিলন দেখা যেত এবং নিম্নে পনের মাইল গিয়ে আর একটি ছোট ভাগীরথী নামে পরিচিত। দুটি অংশই বর্ষাকালে নাব্য ছিল। সম্ভবতঃ এটিই গঙ্গার প্রাচীন পথ। সেজন্যই আজও এই শীর্ণ প্রবাহ পবিত্র বলে হিন্দু সমাজে মান্যতা পায়। এই নদীপথই প্রথমে পূর্বে এবং পরে গৌড় নগরীর ধার দিয়ে প্রবাহিত।[১১] অসংখ্যবার কালিন্দী তার গতিপথ পরিবর্তন করে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। ইংরেজবাজার-মথুরাপুর রাস্তা অর্থাৎ বর্তমান রাজমহল রোডের একাধিকবার পরিবর্তনও নদীর এই গতিপথ পরিবর্তনের জন্যই সংঘটিত। নদীটি দক্ষিণে ক্রমশ সরতে সুরু করায় রাস্তারও ক্রমিক পরিবর্তন ঘটেছে। ক্ষয়িত স্থানগুলির নদী তীর খাড়া এবং লাল মাটি যা বেলে মাটির এবং বিপরীত দিকে ধীরে ধীরে চড়া জমে। বর্ষায় এ নদীপৃষ্ঠে জলস্ফীতি দেখা দিলেও গ্রীষ্মকালে কোথাও কোথাও পায়ে হেঁটে নদী পার হওয়া যায়। কোথাও নদীখাদের সামান্য চিহ্নমাত্র আছে। শুখা মরশুমে কালিন্দীর রতুয়া থেকে চণ্ডীপুর পর্যন্ত জল থাকে না, মির্জাদপুর-আড়াইড়াঙ্গা পর্যন্ত সামান্য জল, মিলকী থেকে অমৃতি পর্যন্ত জলহীন। নদীর জল হ্রাস পাওয়ায় মাঝে মাঝে বদ্ধ জলাশয়ও সৃষ্টি হয়ে দুদিকের জনপদ অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়েছে। এই সব বদ্ধ জলাশয়ের জন্য গত শতাব্দীর বিশ ও ত্রিশের দশকে ম্যালেরিয়ার ব্যাপকতা দেখা দিয়েছিল এবং এখন ফাইলেরিয়ার প্রকোপ দেখা যায়।

প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে কালিন্দীর নদীখাত গভীর করে গঙ্গার জল প্রবাহ দ্বারা নাব্য করার প্রস্তাব ব্রিটিশ যুগে নদী বিশেষজ্ঞ অ্যাডামস উইলিয়াম বাতিল করেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে তা

হলে বন্যায় গঙ্গার জলে কালিন্দী ও তার উপকূলবর্তী অঞ্চলে প্লাবনের সম্ভাবনা থাকবে এবং বিশেষ করে টাল অঞ্চলে বন্যার প্রকোপ বাড়বে। কারণ নদীগর্ভ ক্রমাগত পলি ও বালিতে পূর্ণ হয়ে তার জল ধারণের ক্ষমতাও হ্রাসমান হয়। এ জেলায় এর দৈর্ঘ্য ৫৩ মাইল।

## মহানন্দা নদী

দার্জিলিং-এর কার্শিয়াং-এর সন্নিকটে হিমালয়ের নিম্নাংশের মহালদিরাম থেকে মহানন্দা উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণ-বিহারের পূর্ণিয়া জেলার মধ্য দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক দিয়ে পূর্ব দিকের উত্তর-দিনাজপুরের নাগর উপনদীকে সঙ্গে নিয়েই সে এ জেলায় প্রবেশ করেছে। তারপর পূর্ব দিকে চাঁচল থানার শেষে জেলার সীমান্তে গিয়ে দক্ষিণে ঘুরে প্রায় সোজাসুজি জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ দিক থেকে কালিন্দী ও পূর্ব দিকের টাঙ্গন এবং পুনর্ভবার জলপ্রবাহ গ্রহণ করে বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের রাজসাহী জেলায় প্রবেশ করেছে এবং পরে নবাবগঞ্জ মহকুমার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নবাবগঞ্জ শহরের দক্ষিণ দিকে পদ্মা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এ জেলায় এ নদীর দৈর্ঘ্য ৫৫ মাইল (৮৮.৬ কিমি)।[১২]

উনিশ শতকে মহানন্দার গতির কিছু পরিবর্তন লক্ষণীয়। রেনেলের মানচিত্রে এবং বিশ শতকের প্রথম দিকে রাজস্ব জরিপের (Revenue Survey) মধ্যবর্তী পর্বেই এর গতি ও নাব্যতার বিরাট পরিবর্তন দেখা যায়। রেনেলের মানচিত্রে খরবা থানার (বর্তমানে চাঁচল) পশ্চিমপার্শ্বে স্বরূপগঞ্জের নীচ দিয়ে প্রবাহিত হত মহানন্দা। যা বর্তমানে 'মরা মহানন্দা' নামে পরিচিত। অথচ এখন তা পূর্ব সীমান্ত দিয়ে বহমান। তখন মহানন্দা থেকে দুটি সহায়ক প্রবাহ যে নদীতে মেশে, তা রেনেলের মানচিত্রে 'নাগর' হিসেবে চিহ্নিত। এটি প্রায় বর্তমানের নদীপথ। এতে স্পষ্ট হয় যে মহানন্দা তার প্রকৃত খাদ পরিত্যাগ করে সহায়ক খাদ নাগর দিয়ে প্রবাহিত। স্থানীয় লোকেদের নিকট বর্তমানে এই নাগর অজানা।[১৩]

বুকানন হ্যামিলটন এ নদীতে সম্বৎসর 'পাঁচশ মনী' নৌকা টাঙ্গন নদীর সংযোগস্থল পর্যন্ত চলাচলের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু 'দুশ মনী' নৌকা মালদার (পুরাতন ও বর্তমান মালদা) এ পারে আসতে সক্ষম নয়। এক শতাব্দীর মধ্যে মহানন্দা গ্রীষ্মের সময় অনেক স্থানেই নাব্য নয়। মূল নদীপথ গভীর হলেও কোথাও কোথাও অপরিসর। গ্রীষ্মের সময় বালির চরও জেগে ওঠে। ওল্ড মালদা বা পুরাতন মালদার উত্তরে এটি অধিকতর সংকীর্ণ ও অগভীর। ফলে দুই নদীর (কালিন্দী ও মহানন্দা) সংযোগস্থলে গঙ্গার বন্যার জল নীচের মহানন্দার নদীতলকে খরস্রোত দ্বারা পরিষ্কার করে দেয়।

তবে সাধারণতঃ বর্ষার সময় ছাড়া মহানন্দা পলি বহন করে না এবং সে জন্যই তার স্বাভাবিক গতিপথেরও বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নি। অবশ্য কোথাও কোথাও একদিক ভেঙে অন্যদিক গড়েছে অথবা কোথাও বাঁক সোজা করে চলেছে। এমনভাবেই একদিকে খাড়া তীরভূমির ক্রম ও অন্যদিকে চর জেগেছে। ক্রমাগত ক্ষয় হওয়ার জন্য ইংরেজবাজারে বাঁধ ও তার নীচে আবক্ষ প্রাচীর দেওয়ার প্রয়োজন ইংরেজ সরকার প্রায় পঁচাত্তর বছর আগে মনে করেছিল, তবে ঐ প্রাচীরটি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশেষ সন্দেহ ছিল। তার কারণ ঘূর্ণিতে জলের পশ্চাদগতিতে

নদীগর্ভে গহ্বর তৈরী করে তীরের পাড় / জমি অপসারিত করার সম্ভাবনা থাকে। বাংলাদেশের রাজসাহী জেলার অন্তর্গত এ নদীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে মহানন্দার তীর পালাক্রমে খাড়া ও ঢালু। নদীর বিস্তৃতি ৪০০ থেকে ৬০০ গজ পর্যন্ত।[১৪]

মহানন্দা যেহেতু হিমালয় থেকে উৎপন্ন, তাই তুষারগলা জলের সঙ্গে প্রচণ্ড বৃষ্টির জল যুক্ত হয়ে ঘণ্টায় ১০ ফুট পর্যন্ত জলসীমা বাড়তে দেখা গেছে, তবে ৩০ ফুটের উপরে নয়। শীতের মরশুমে ওল্ড মালদার নীচে এর পরিসর ১০০ গজে এসে পৌঁছায়, কিন্তু বর্ষার মরশুমে তা ১/৪ মাইল হয়ে পড়ে। ওল্ড মালদা পর্যন্ত এর প্রসার ৫০ থেকে ১০০ গজ, তবে বৈরগাছির রেল সেতুর নিকট ২২০ ফুট। কালিন্দীর জলপুষ্ট হয়ে ওল্ড মালদায় এর প্রসার ২০০ থেকে ৬০০ গজ হয়। ১৯৯৮ সালের বন্যায় গঙ্গা-কালিন্দী ও বর্ষার জল মিলে মহানন্দার বাঁধ অতিক্রম করে ইংরেজবাজার শহরের কমপক্ষে পাঁচ জায়গা জলপ্লাবিত হয়েছিল।[১৫]

### টাঙ্গন

মহানন্দার বিশিষ্ট উপনদ টাঙ্গন। এটির উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে জানা যায় যে ২৬°৪৩ উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৮°৩১″ দ্রাঘিমাংশ থেকে উত্থিত হয়ে ২৪°৫৭″ উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৮°১৪″ দ্রাঘিমাংশে মহানন্দা নদীতে পতিত হয়েছে।[১৬] এবং উভয় দিকেই অসংখ্য শাখা প্রশাখা বিস্তার করেছে।

নদটির মূল উৎস প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিচ্ছিন্ন। জলপাইগুড়ি জেলা থেকে বর্তমানে উৎপন্ন হয়ে বাংলাদেশের দিনাজপুরের পানবারায় এসেছে এবং ঠাকুরগাঁও, পীরগঞ্জ এবং পশ্চিমবঙ্গের হেমতাবাদকে ছেদ করে বংশীহারী ও গঙ্গারামপুর থানার সীমা নির্দ্ধারণ করে[১৬ক] মালদা জেলার গাজোল ও বামনগোলা থানাদ্বয়ের সংযোগস্থলে এটি এ জেলায় প্রবেশ করেছে। অর্থাৎ দুটি থানার সীমানা নির্দেশক এই নদ, আবার হবিবপুর ও মালদা (ওল্ড মালদা) থানাদ্বয়েরও জ্ঞাপকতা। তার আর একটি প্রশাখা 'মরা টাঙ্গন' বহু মাইল গাজোল থানার মধ্য দিয়ে গিয়ে বামনগোলা থানার সন্নিকটে মূল টাঙ্গন নদেতে গিয়ে মিশেছে। পুরাতন মালদা থানায় নদটির একটি প্রাচীন পথ 'চুণাখালি খাল' নামে পরিচিত। এটি প্রধান নদীপথে হবিবপুর থানার পাথার হাইতো (জে.এল. নং ১৮২) থেকে বহির্গত হয়ে ওল্ড মালদা থানার ভিতর দিয়ে বেশ কয়েক মাইল অতিক্রম করে বুলবুলচণ্ডীর খেয়াঘাটের একটু উপরে মূল নদেতে মিশেছে।[১৭]

বিভিন্ন যুগে টাঙ্গনের গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছে। উনিশ শতকের প্রথম দিকে বুকানন হ্যামিলটন টাঙ্গনের সঙ্গে মহানন্দার মিলনস্থল আহিরিগঞ্জ বলে চিহ্নিত করেছিলেন। এটি বর্তমানের সংযোগস্থলের ৭ মাইল নীচে ছিল। পশ্চিম উপত্যকার রাণীগঞ্জের নিকট পাথরের ভগ্ন সেতু সেই মতকেই সমর্থন করে এবং তার পথ আরও পূর্বে অপসৃত। এখানে বিরাট বাঁধের কাটা অংশ দেখা যায়। এটি প্রকৃতপক্ষে পাণ্ডুয়া থেকে টাঙ্গন উপত্যকার মধ্য দিয়ে দিনাজপুরের দিকে প্রসারিত পথ। সুতরাং হ্যামিলটনের কথার সত্যতা স্বীকার করলে ১৭৬৭ থেকে ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই নদীপথের পরিবর্তন ঘটেছে এবং পরে আদি পথে ফিরে যায়। কারণ রেনেলের মানচিত্রে মহানন্দার সঙ্গে তার মিলনস্থল আইহো (lyo) বলে চিহ্নিত।[১৮] টাঙ্গনের গতিপথেও অনেক স্থলেই চড়া পড়েছে। বামনগোলার সন্নিকটে এটি ব্যাপক আকারে লক্ষণীয়।[১৯] এ জেলার টাঙ্গন ও পুনর্ভবা নদীর

সংযোগস্থল নীচু। তাই 'ডোবা' বা 'ডুবা' বলে কথিত এবং এলাকাটি উত্তর-পললভূমি (Latter Alluvium) দ্বারা গঠিত। টাঙ্গন ও পুনর্ভবার বিস্তৃত নদী-উপত্যকা বরিন্দ অঞ্চলে ত্রিভুজাকৃতিতে বিস্তৃত। এই ত্রিভুজাকৃতি অংশের পাদদেশ প্রায় মহানন্দা নদীর সমান্তরাল-রেখায় অবস্থিত। এ স্থান থেকে কয়েক মাইল পরে সাধারণতঃ উত্তর এবং পূর্বে প্রসারিত।[২০] আঁকা-বাঁকা গতিতে মুচিয়া-আইহোতে মহানন্দা নদীতে গিয়ে পতিত এই নদীর জেলার মধ্যে পথের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০ মাইল।

### পুনর্ভবা

এটিরও মূল উৎস ছিন্ন। বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁ থানার ব্রাহ্মণপুকুর বিল[২০ক] থেকে উৎপন্ন হয়ে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মধ্য দিয়ে তপন থানা ও মালদা জেলার বামনগোলা থানার কয়েক মাইল সীমানা নির্দ্ধারক হয়ে আরও দক্ষিণে বাংলাদেশের দিনাজপুর ও রাজসাহী জেলার পূর্ব প্রান্তের সীমানা হিসেবে কাজ করেছে। কোন কোন স্থানে এই নদী পার্শ্ববর্তী বেশ কিছু খাদ সৃষ্টি করেছে। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বামনগোলা থানার মহাদেবপুর মৌজা (জে. এল. নং- ১৪১) এবং খুটাদহের ( জে. এল নং-১৪২) দুটি খাদ। দুটি খাদের সম্মিলিত প্রবাহের কিয়দংশ "হাঁড়িয়া" নদী নামে স্থানীয় অঞ্চলে পরিচিত।[২১] এটি বাংলাদেশের পোরশা থানার নিকট রাজসাহী জেলায় প্রবেশ করেছে এবং রোহনপুরের নিকট মহানন্দার সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

পুনর্ভবার জলতলে বালির ভাগ বেশী এবং তার পুরাতন খাদের বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায় না। এবং তীরের ভাঙা-গড়াও বিশেষ নেই। মহানন্দার বন্যার ফলে এ নদীরও জলস্ফীতি দেখা যায়। এ জেলায় এর দৈর্ঘ্য ৪০ মাইল (৬৪.৪ কিমি)।

### ফুলহার

গঙ্গার পূর্ব পাড়ের এক প্রশাখা হিসেবে কালিন্দী গণ্য বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি মহানন্দা নদীরই একটি শাখা। এই শাখাই ফুলহার নাম নিয়ে বিহারের পূর্ণিয়া জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুরের মিঞাহাট ( জে. এল. নং-১৬২) পর্যন্ত। তার পর এর নাম হয়েছে কালিন্দী।[২২ক] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ইংরেজ আমলের কোন গ্রন্থেই 'ফুলহার' নামটি মেলে না।

### ব্রাহ্মণী

দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরের নিকট পুনর্ভবা নদী থেকে উৎপন্ন হয়ে প্রায় ১৮ মাইল প্রবাহিত হয়ে বামনগোলার কাছে পশ্চিম দিক থেকে আসা টাঙ্গনের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ঠিক একটু উপরে নালাগোলায় এর খাদ স্থানে স্থানে কেটে পুনর্ভবার সঙ্গে যুক্ত করে নাব্য করা হয়েছে।[২৩]

### পাগলা বা পাগলী

বর্তমান গৌড়ের কিছুটা নীচের দিকে গঙ্গার পূর্ব দিকের একটি বৃহৎ শাখাই পাগলা বা পাগলী[২৪] নাম নিয়েছে এবং এর মধ্যে ছোট ভাগীরথী প্রবাহিত। এটি গঙ্গার জলধারার দ্বারা গতিযুক্ত হওয়ার পূর্বে প্রায় ১৬ মাইল দীর্ঘ একটি দ্বীপকে বেষ্টন করে আছে। বর্ষার মরশুমে এটি

নাব্য হলেও অন্য সময়ে এ নদী গতিহীন হয়ে পড়ে। ঠিক এর উপরের অংশে এটি মালদা জেলা পরিত্যাগ করেছে। জহরপুর দাঁড়া নামে অন্য একটি খাল গঙ্গার প্রশাখা এই পাগলা নদীকে কানসাটের (বর্তমানে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অন্তর্গত) নিকট মহানন্দা নদীর সঙ্গে সংযুক্ত করেছে।

### বুড়ী গঙ্গা

গরগরিবার[২৫] (পরবর্তী পর্বে রতুয়া) নিকটে কালিন্দী ও প্রাচীন গঙ্গার এক খাদের সংযোগস্থল 'বুড়ীগঙ্গা' নামে পরিচিত। কেবল বর্ষার মরশুমে এর নাব্যতা দেখা যায়।[২৬]

### ছোট ভাগীরথী

কালিন্দীর নিম্নপ্রবাহে অর্থাৎ রতুয়ার বুড়িগঙ্গা-অংশের ১৫ মাইল নিম্নে এক বৃহৎ বাঁকের বহির্মুখী ধারায় গঙ্গার বর্তমানের এক ক্ষুদ্র শাখা 'ছোট ভাগীরথী' নামে অভিহিত। বর্ষায় এটি নাব্য হলেও গ্রীষ্মের মরশুমে এটি প্রায় শুষ্ক থাকে।

### বেহুলা, জলঙ্গী

অনেকে এটি কালিন্দীর মরা স্রোত বলেছেন।[২৭] কিন্তু তা নয়। বর্তমানে এটি ওল্ড মালদার রাঙামাটির ব্রিজের নীচ পর্যন্ত গিয়ে শুকিয়ে গেছে। এটি মহানন্দারই প্রশাখা বা খাল। তারপর সাহাপুর অঞ্চল দিয়ে মাধাইপুর দিয়ে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মীপুর হয়ে টাঙ্গনে মিশেছে। এর গতি দুই ঋতুতে অর্থাৎ বর্ষার মরশুমে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব মুখী এবং শুখা মরশুমে পশ্চিম দিকে হওয়ায় কালিন্দী মহানন্দা প্রশাখা হওয়াই স্বাভাবিক। লোকশ্রুতিতে এই নদী দিয়ে বেহুলা লখীন্দরের শব মান্দাসে করে কালিন্দীতে ভেসেছিল।[২৮] মহানন্দা থেকে রাঙ্গামাটিয়া খাল হয়ে উত্তরে 'জলঙ্গী' নাম নিয়ে একটি শীর্ণ খাল প্রবাহিত। এর মধ্য-ভাগ দিয়ে বেহুলা খাল — ধরম কুণ্ড প্রবাহিত।

### কালকোশ, কঙ্কর,কোশ এবং বারমাসিয়া

কালিন্দী ওল্ড মালদার বিপরীত দিকে মহানন্দার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। স্রোতোপথের উত্তর দিকে টাল অঞ্চল থেকে এই চারটি উপনদী বর্ষার মরশুমে টালের জলধারাকে বহির্গমনে সাহায্য করে। এগুলি সত্তর বছর আগেও জল নিষ্কাষণে বিশেষ সহায়ক খাদ হিসেবে পরিচিত ছিল। এগুলির নামই কালকোশ, কঙ্কর, কোশ ও বারমাসিয়া।[২৯] বৎসরের অন্য সময়ে এগুলি প্রায় শুষ্কই থাকে। 'বারমাসিয়া নদী পরিকল্পনা' প্রাক-স্বাধীনতা যুগে (১৯৪৪-৪৫) সেচ পরিকল্পনার কাজ সম্পূর্ণ করেছিল।[৩০]

### নদ-নদীর খাদ বা দাঁড়া-খাল

মালদা জেলায় নদ-নদীর অসংখ্য খাদ বা দাঁড়া দেখা যায়।। জল নিকাশের জন্য বর্ষা ও বন্যার সময়ে স্ফীত নদীবক্ষ নানা পথ ধরে। ভূপৃষ্ঠের বালি বা কোমল অংশ জলের গতিবেগে খাদ কেটে নিম্ন অঞ্চলে যাওয়ার প্রবণতাই এরূপ দাঁড়া সৃষ্টির কারণ। আবার অন্য অঞ্চল থেকে নদীবক্ষ বা অপেক্ষাকৃত নিম্ন অঞ্চলেও সেগুলির গতি দেখা যায়। কখনো খাল কেটেও জলপথকে

নানান কাজে লাগানো হয়েছে ইংরেজ রাজত্বে। পঞ্চাশের দশকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে এমন তথ্যযুক্ত পুস্তকও মেলে। কিন্তু তারপর পঞ্চাশ বছরে সাধারণের জন্য এমন তথ্য সমন্বিত পুস্তক দেখা যায় না।

মুখ্যত রতুয়া থানা (ও পার্শ্ববর্তী) এলাকায় আমাদের নিজস্ব ক্ষেত্রানুসন্ধানে একটি এলাকাতেই ফুলহার ও কালিন্দীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে এই ধরনের খাল/খাদ, দাঁড়ার একটি চিত্র দেওয়া গেল ঃ

১. 'মরা মহানন্দা'কে কালিন্দী নদীর সঙ্গে যুক্ত করার জন্য এই খাল খনন। খালটি পুকুরিয়া হাইস্কুলের পশ্চিম দিক থেকে কাগজচিড়া ও পুকুরিয়া মোড়কে ভেদ করে আড়াইডাঙ্গার ঘাটে কালিন্দীর সঙ্গে যুক্ত।

২. সাতমারা গ্রামের পূর্বাংশ থেকে মহানন্দার সঙ্গে যুক্ত খাল। সাতমারা মৌজার মধ্য দিয়ে চৌদুয়ার গ্রামের (চৌদুয়ার টাল) উত্তরাংশ দিয়ে পবিয়া নামক বিলের সঙ্গে মিশেছে।

৩. এটি মরা মহানন্দা থেকে সম্বলপুর অঞ্চলের মধ্য দিয়ে রামচন্দ্রপুর, হরিপুর, বোগলাদহ, শান্তিপুর, ইসলামপুর পর্যন্ত টাল এলাকায় গেছে।

৪. খানপুর (হাই মাদ্রাসা), গোরক্ষা, টাঁড়ি,নিমনডিহি, বাবলাবনা, ঘুরঘুরামণির মধ্য দিয়ে রতুয়ার চাফালে (= মাঠে) গিয়ে মিশেছে (হাসপাতালের পাশে)।

৫. টেঙ্গুইরা দাঁড়া — হরিপুর, চামাগ্রাম,সেখপুর, শান্তিপুর, কুমারিয়া, চাঁদমণি।

৬. লকড়িগোলা, মাটিহারি, ঝাওয়াবাড়ি, হলদিবাড়ী, ভাদো পর্যন্ত।

৭. দুর্গাপুরের দক্ষিণাংশের ইটাখোলোর দাঁড়া (বাবুপুরের পাশ দিয়ে এসে দুর্গামোড়ে কাঁটাবন্না নামক স্থান দিয়ে এসেছে শৈলপুরের মাঠে।
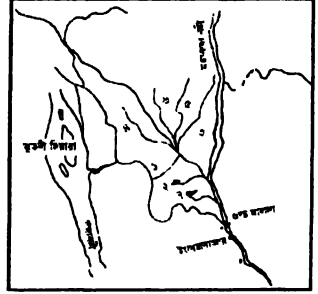
● পাদটীকা

১. অশোককুমার বসু — গঙ্গাপথের ইতিকথা, পৃ-৮
২. Thornton Edward – The Gazetteer of the Territories under the Government of the East-India Company, p-319
৩. অশোককুমার বসু — প্রাগুক্ত, পৃ-৮-৯
৪. Carter M. O. Op. Cit. – ibid, p-7
৫ ibid, p-8
৫ক. McCrindle J. W. – Ancient India as described by Ptolemy, Ed R.C.Jain, p-215
৬. Hunter W.W., ibid,p-25
৭. Carter M.O. p-8
৮. ibid, p-8
৯. ibid, p-9

১০. West Bengal District Gazetteers, Malda, 1969, p-5
১১. Hunter W.W.,ibid,p-23
১২. বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার — বৃহত্তর রাজশাহী, ১৯৯১, পৃ-১৪
১৩. Carter M.O., ibid, p-9
১৪. বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার — বৃহত্তর রাজশাহী, পৃ-১৪
১৫. মালদহে বন্যা, ১৯৯৮, রূপান্তরের পথে, প-২৭
১৬. Thornton Edward – Op. Cit, P-955
১৬ক. Hunter W. W – ibid, p-360
১৭. West Bengal Gazetteers, Malda, 1969, p-5
১৮. Carter, M O. – ibid, p-10
১৯. Hunter W.W. – ibid, p-26
২০. Lambourn G E. – Bengal District Gazetteers, Malda, 1918, p-4
২০ক. Hunter W. W., – ibid, p-361
২১. West Bengal District Gazetteer, Malda, 1969, p-5
২২. বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার -- বৃহত্তব রাজশাহী, পৃ-১৬
২২ক. West Bengal District Gazetteer, Malda, 1969, p-5
২৩. Lambourn G.E – Bengal District Gazetteers, Malda, 1918, p-4
২৪. Hunter W W. ,ibid, p-24
২৫. Carter M O., ibid, p-36
২৬. Hunter W. W., ibid, p-24
২৭. অশোককুমার বসু — পশ্চিমবঙ্গের নদ-নদী, পৃ-২৯
২৮. প্রাগুক্ত, পৃ-২৯
২৯. Carter M O., ibid, p-9
৩০. পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ -- মালদহ, ১৯৫৪, পৃ-২২
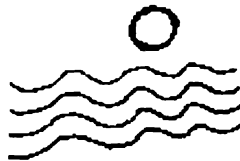
# মালদহ জেলায় গঙ্গার ভাঙন ও ফারাক্কা ব্যারেজ

নদীর জন্ম-মৃত্যুর বিষয়ে একথা অবশ্য স্মরণীয় যে নদীর উচ্চ ও মধ্যগতিতে যে ঢাল থাকে (উত্তরে মাইল প্রতি ঢাল ৬ ইঞ্চির কাছাকাছি ও মোহনা অঞ্চলে মাত্র ১ ইঞ্চি), নিম্ন ও সমুদ্র উপকূলে তার ঢাল একেবারে কমে যায় অর্থাৎ প্রায় আনুভূমিক (nearly horizontal) হয়ে পড়ে। ফলে বর্ষায় নরম বালি-মাটির মধ্য দিয়ে হানা পথ কেটে নূতন পথে তার প্রবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সে জন্য বিহার থেকে রাজমহল হয়ে গঙ্গা নদী যে গতি নিয়ে আসে, সেই পূর্বলব্ধ গতি (intertia of flow) প্রধানতঃ এই নদীপথকে নিয়ন্ত্রিত করে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে অধুনা মালদা জেলা-অঞ্চলে পঞ্চদশ শতকে নিম্নপ্রবাহের গঙ্গা কালিন্দ্রী-মহানন্দার পথেই কিন্তু প্রবাহিত হত এবং সমকালের গৌড় শহরের নিকটেই পদ্মা ও ভাগীরথী নামে দুটি ধারায় বিভক্ত হতো। অষ্টাদশ শতকে গঙ্গা বর্তমান সুতীর নিকটের একটি বাঁকের মাধ্যমে গঙ্গার জলের পূর্বলব্ধগতি পদ্মা ও ভাগীরথী উভয় পথে বজায় থাকায় দুটি নদীই সাবলীল গতিতে প্রবাহিত হতো। কিন্তু পরবর্তী যুগে গঙ্গা ফারাক্কার নিকট এক বাঁকে একটি নূতন পথ তৈরী করে এবং তার পথ পদ্মা-পথের সঙ্গে সরল রেখায় থাকায় গঙ্গা জলের পূর্বলব্ধগতি শুধুমাত্র পদ্মার পথেই ধাবমান হয় এবং লম্বভাবে ভাগীরথী থাকায় জলের মাত্রা আসা কম হয়ে যাওয়ায় তা দ্রুত মুমূর্ষু হয়ে পড়ে।
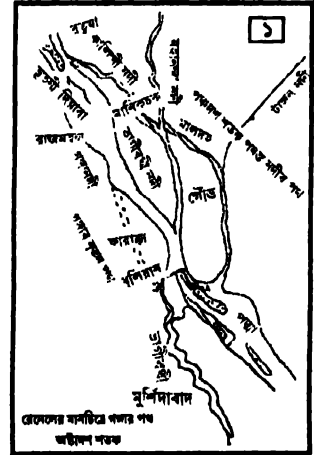
একটি কথা অবশ্য স্মরণীয় যে নদীর ঢাল ও নদীর গতিমুখের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সুষম বিস্তৃতপ্রায় সরল পথই কাম্য বলে সেখানে ভাঙ্গন কম হয়। তবে জলের স্বাভাবিক গতি অকস্মাৎ অধিক বৃষ্টির ফলে বা উর্ধ্বপ্রবাহে অধিক বৃষ্টির জল যুক্ত হলে এবং তার নির্গমনক্ষমতা হ্রাস পেলে (চড়া, ফারাক্কার কংক্রীট ভিত ও জমা পলি) স্বাভাবিকভাবেই তার বিস্তৃতি বেড়ে যায় এবং তরঙ্গাঘাতে পাড় ভাঙতে থাকে। ১৯৮০ সালের মালদা জেলায় তোফি বাঁধের ভাঙন ও জেলার

বিস্তীর্ণ অংশের প্রায় দুমাস জলে নিমজ্জিত হওয়ার চিত্র এরই অনিবার্য ফল।

এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে সব নদী নিম্নগতিতে পলল মৃত্তিকার সমভূমি অঞ্চলে যাত্রাকালে নিরন্তর গতিপথ পরিবর্তন করে। এ পর্বে নিম্ন দিকে ক্ষয় (Vertical Corosion) অপেক্ষা পার্শ্বদিকে ক্ষয় (Lateral Erosion) বেশী হয়। আসলে নদীর বহন ক্ষমতা তার গতিবেগের (Velocity) ষষ্ঠাঘাতে (Sixth Power) বৃদ্ধি পায়। এই ষষ্ঠাঘাতের সূত্রে মালদা জেলায় বারবার ক্ষয়কার্য ও পাড়গুলি ধ্বংস হচ্ছে। আসলে যে কোন নদীই তার চলার ফলে ক্রমাগত পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে এক গতিশীল ভারসাম্য (dynamic equilibrium) অবস্থায় সব সময় পৌঁছানোর চেষ্টায় থাকে। নদীতে জল ও পলির পরিমাণ, ঢাল, মানুষের তৈরী বাঁধ ইত্যাদি কারণগুলি ভারসাম্য অবস্থার নিয়ন্ত্রণরূপে কাজ করে। মালদা জেলায় ফারাক্কা ব্যারেজ গঙ্গার এই গতিশীল ভারসাম্যে গভীর প্রভাব ফেলেছে বলে সম্প্রতি তার দুরন্ত অস্থিরতা।[১৯] এর মধ্যে মানুষের হস্তক্ষেপই (ফারাক্কা ব্যারেজ) সর্বাপেক্ষা অধিক দায়ী।

গঙ্গার গতিপথের এই পরিবর্তনের চিত্রটি উত্তরে ও উত্তর-পশ্চিমে কুশীর জন্য। সাহেবগঞ্জ ও সকরিগলির নিকটে গঙ্গার প্রায়ই গতিপথের পরিবর্তন ঘটেছে। অদূর -অতীতে কুশী ও গঙ্গার সঙ্গম ছিল কহলগাঁও-এর উত্তরে। ১৭৬৮ সালের জেফরির নকশায় কুশীকে পূর্ণিয়ার পূর্বে দেখা যায়। দূর অতীতে সম্ভবতঃ কুশী ছিল ব্রহ্মপুত্রগামী। তখন গঙ্গার দুটি স্রোতের মধ্যে দক্ষিণের স্রোত (দক্ষিণের) রাজমহল ও সকরিগলি ঘাটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হত এবং উত্তরের খাদটিতে কুশীর অধিকারে থাকে। পরে কুশীর পথ বদলায়। বর্তমানে নওগাছিয়া ও কুর্শেলার নিকট কুশী-গঙ্গার সঙ্গম।[১]

উনিশ শতক : গঙ্গার খাদ পরিবর্তন
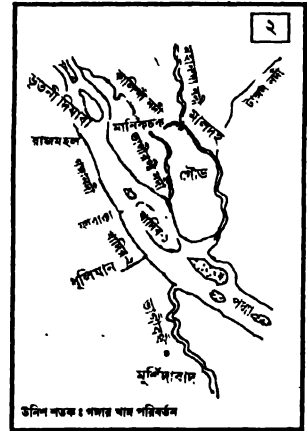
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৮৪৫ সালে রাজমহলের নিকট গঙ্গার খাড়ি যেখানে ছিল, সেখান থেকে কয়েক দশকের ব্যবধানে প্রায় ৮ কিমি উত্তরে সরে যায়।১৮৬৩ ও ১৮৮০ সালে রাজমহলের নিকট দুবার গঙ্গার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ১৮৭১ সালে গঙ্গার পথ পরিবর্তনে পাড় ভেঙ্গে মালদার নূরপুরের বহু স্থান নিমজ্জিত হয়। সার্ভেয়ার কোলব্রুকের মতে গঙ্গা এক সময়ে গৌড় দুর্গের পশ্চিম দিয়ে প্রবাহিত হত। অথচ তবকাত-ই-নাসিরীতে দেখা যায় গৌড় (লখনৌতি) গঙ্গার পশ্চিম দিকে। এখন আবার পশ্চিমে বহুদূর সরে গেছে।[২]

গঙ্গার এই অস্থিরতা মধ্য প্রবাহে সমস্ত নদীর ন্যায় তার শক্তি হ্রাস পাওয়ায় গতিপথে বাধা পেলেই এঁকে বেঁকে (winding course) চলে চুলের কাঁটার বাঁকের ন্যায় — যা তুরস্কের নদী মিয়েণ্ড্রস (Maiandros)-এর নামে মিয়েণ্ডার (Meander) বলে অভিহিত। পূর্বে রাজমহল পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে গঙ্গাও তেমনই মালদা-মুর্শিদাবাদের ফারাক্কা বাঁধ পর্যন্ত এই মিয়েণ্ডার স্বাভাবিকই থাকতো, তাই বন্যা ও মালদহের দিকে ভাঙনের রূপ এত ব্যাপক হত না। কিন্তু ১৯৯৬, ১৯৯৭ সালের ভাঙনকে অতিক্রম করে ১৯৯৮ সালে উত্তর ভারতের ব্যাপক বৃষ্টির জল প্রবাহিত হওয়ায়,

নদীর ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় বিপুল জলরাশি গঙ্গার বাম তীরের স্পার বাঁধ ভেঙ্গে কালিন্দী ও পাগলা নদীর খাত ধরে মালদা (ইংরেজবাজার) শহরকেও গ্রাস করে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৭০ সালের আগে ফারাক্কা ব্যারেজের স্রোতের প্রতিকূলে নদীর ভাঙনের প্রকৃত পরিসংখ্যান দেখা যায় না। জলের আঘাতে যে জমি নষ্ট হয় তাকে বলা হয় শিকস্তী (> ফারসী শিকস্ত) এবং অন্য দিকে বালি পড়ে আবাদের উপযোগী যে জমি সৃষ্ট হয়, তাকে বলে পয়স্তি (> ফারসী পয়বস্ত)। প্রীতম সিং রিপোর্টে পাঁচ বছরে এই ভূমিক্ষয়ের একটা খতিয়ান দেখা যায়।

| সাল | জমির পরিমাণ |
|---|---|
| ১৯৭৪ | ১৬২ হেক্টর |
| ১৯৭৫ | ৩০৮ হেক্টর |
| ১৯৭৬ | ৮৯ হেক্টর |
| ১৯৭৭ | ৮১ হেক্টর |
| ১৯৭৮ | ২২৮ হেক্টর |

(১ হেক্টর = ২.৪৭১ একর)

এবং ১৯৩১ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত মালদা জেলার ভূমিক্ষয়ের পরিমাণ ১৪,৩৩৫ হেক্টর।[৫] অন্যদিকে ১৯৭৯ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত যে ভাঙন তা নিম্নরূপ ঃ

| সাল | জমির পরিমাণ | সাল | জমির পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| ১৯৭৯ | ৬০ হেক্টর | ১৯৮০ | ১০৪ হেক্টর |
| ১৯৮১ | ২৫৯ হেক্টর | ১৯৮২ | ৬৫ হেক্টর |
| ১৯৮৩ | ৯২ হেক্টর | ১৯৮৪ | ৬৮ হেক্টর |
| ১৯৮৫ | ৯১ হেক্টব | ১৯৮৬ | ১০৬ হেক্টর |
| ১৯৮৭ | ২৪০ হেক্টর | ১৯৮৮ | ৭২ হেক্টর |
| ১৯৮৯ | ১৫২ হেক্টর | ১৯৯০ | ১৬০ হেক্টর |
| ১৯৯১ | ১৬৭ হেক্টর | ১৯৯২ | ১৩০ হেক্টর |
| ১৯৯৩ | ১৪৫ হেক্টর | ১৯৯৪ | ১৬০ হেক্টর |
| ১৯৯৫ | ১৪৫ হেক্টর | ১৯৯৬ | ৩১০ হেক্টর |

এর মধ্যে ১৯৯৬ সালে ৫ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে কাঁকড়িবাধা মৌজা, রেজাকপুর মৌজা, কামালুদিনপুর মৌজা, মহাদেবপুর মৌজা, গোপালপুর মৌজা ও পিয়ারপুর মৌজা ইত্যাদিতে ১৯৫৫ সাল থেকে ভাঙন সুরু হওয়ায় প্রায় বেশীরভাগই নিশ্চিহ্ন হয়েছে। এর মধ্যে খাস মহাল, দড়ি দিয়ারা, গোলোক টোলা, পিয়ারপুর, আলাদিটোলা, ঘাসিটোলা, আজমাতটোলা, উমেদ হাজী টোলা, দুর্গারাম টোলা, রহিমপুর, মতি টোলা, ঈশ্বরটোলা, উদ্ধবটোলা ইত্যাদি গ্রামগুলি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন। গ্রাম ভাঙনে গোপালপুর অঞ্চল, খাসমহল অঞ্চল, ধরমপুর অঞ্চল, পঞ্চানন্দপুর অঞ্চল, রহিমপুর অঞ্চল ও মাণিকচক অঞ্চলের গোলোকটোলা, কামালুদ্দিন টোলা, মুদি টোলা, গোপালপুর, বালুটোলা, কালীটোলা, আশিনটোলা, নাফিরটোলা, রান্নুটোলা, ঢোঁড়াইটোলা, রহিমপুর, রাইপাড়া, পোষণটোলা, বেজোটোলা, চামাটোলা, ঘোষপাড়া, পরেশটোলা, পরীক্ষিৎ টোলা, কদমতলা, কুরবানি টোলা, তোরাব আলি টোলা, প্রসাদীটোলা, রামুটোলা, লাচ্ছনটোলা, দরবারিটোলা, রাধুটোলা, দাল্লুটোলা, নতুন রাধুটোলা, খন্তরটোলা, ছাক্কুটোলা, বেচুটোলা, লোচনটোলা, রঘুটোলা, জোতগাট্টা,

নারায়ণটোলা, ওয়ারিশটোলা, ঘোরোইটোলা বিন্দপাড়া, দাল্লুটোলা, মীরপুর, ময়নাপুর, জেসারদটোলা, জাহিদটোলা, শোভানিটোলা,হাজার দীঘি, ছাতিয়ানটোলা, পাঁচকড়িটোলা, দুর্গারামটোলা, ঈশ্বরটোলা, দাউলতটোলা, নাশুটোলা, নাকিরটোলা, কামালতিপুর, কাঁকড়িবাঁধা, ঝাউটোলা ইত্যাদি গ্রাম সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন বা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত। এ প্রসঙ্গে মাণিকচক এলাকার একটি পরিসংখ্যানে তার ভয়াবহতার আংশিক চিত্র উপস্থাপিত করা যায় ঃ

| | মাণিকচক | মৌজা | জমির পরিমাণ (একরে) |
|---|---|---|---|
| ১. | নারায়ণপুর | ২২ | ৩৫০ |
| ২. | মাণিকচক | ৮৪ | ৫০০ |
| ৩. | রানীগঞ্জ | ৮৫ | ৭০ |
| ৪. | গোবিন্দপুর | ৮৬ | ১৫০ |
| ৫. | রহিমপুর | ৮৯ | ৪০০ |
| ৬. | রোস্তম্পুর | ৮৭ | ৩৮০ |
| ৭. | ধরমপুর | ৮৩ | ২৫০ |
| ৮. | মীরপুর | ৮৮ | ৩০০ |
| ৯. | গোপালপুর | ৯০ | ৪০০ |
| ১০. | জোতভবানী | ৮২ | ৬০ |
| ১১. | পশ্চিম নারায়ণপুর | ২১ | ৪৫০ |
| ১২. | দুআনি তাফীর | ১৯ | ৪০০ |
| ১৩. | সমস্তিপুর | ১৬ | ৩০০ |
| ১৪. | শোভাপুর | ১৭ | ১৫০ |
| ১৫. | বাগডুকরা | ১৫ | ৩৫০ |
| ১৬. | হীরানন্দপুর | ১২ | ৪০০ |
| ১৭. | সুখসেনা | ৮ | ২৫০ |
| ১৮. | শোভানাথপুর | ১১ | ১০০ |
| ১৯. | রামবাড়ী | ১০ | ৪০০ |
| ২০. | মাসাহা | ১৩ | ৬০ |
| ২১. | দেরগামা | ৯ | ৭০ |
| ২২. | কেশরীপুর | ২ | ২০০ |
| ২৩. | গদাই | ১ | ৪০০ |
| ২৪. | চণ্ডীপুরমাল | ৪ | ১৫০ |
| ২৫. | বাহাদুরপুর | ২৮ | ৫০ |
| ২৬. | তালিম নগর | ২৯ | ১০০ |
| ২৭. | দক্ষিণ চণ্ডীপুর | ১৯ | ২০০ |
| ২৮. | উত্তর চণ্ডীপুর | ১৮ | ২০০ |
| ২৯. | নাজিরপুর | ৩৬ | ১০০ |
| ৩০. | মহাব্বতপুর | ৩৭ | ১০০ |
| ৩১. | জীৎমনপুর | ৩৫ | ১০৫ |

[ ১ থেকে ২৩ পর্যন্ত গঙ্গার ভাঙ্গনে এবং ২৪ থেকে ৩১ পর্যন্ত ফুলহার নদীতে সিকস্তী হয়েছে। (০১.০৩.১৯৯৯ পর্যন্ত তথ্যের ভিত্তিতে)]

আবার ওপারে চর জাগলে পশ্চিমবাংলা ও বিহার (বর্তমানে ঝাড়খণ্ড) সরকারের মধ্যে

বিতর্কিত মৌজার সৃষ্টি করে এই ভাঙন প্রশাসনকে নিরন্তর অস্বস্তিতে নিক্ষেপ করে চলেছে। সুতরাং এই ভাঙন অন্যদিক থেকেও এক চিরকালীন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কালিয়াচক-২-এ এই ধরণের সমাধানহীন একটি পরিসংখ্যান দেখলে স্পষ্ট হয়।

| | মৌজার নাম | জে. এল নং | জমির পরিমাণ (হেক্টরে) |
|---|---|---|---|
| ১. | পলাশগাছি | ১ | ৫৯৩.৬৮ |
| ২. | পিয়ারপুর | ২ | ৫৫১.১৭ |
| ৩. | দাঁড়ি জয়রামপুর | ১২ | ১১০.৬০ |
| ৪. | দাস কাবিয়া | ১৩ | ৫৬.১০ |
| ৫. | ইসলামপুর | ১৪ | ১২০.৫৫ |
| ৬. | নিত্যানন্দপুর | ১৬ | ৩৫৪.১০ |
| ৭. | জিৎনগর | ১৭ | ৩৯৮.৮২ |
| ৮. | পরাণপুর | ১৮ | ১০৩৩.৪২ |
| ৯. | রতনলালপুর | ১৯ | ৮৪.৮১ |
| ১০. | শ্রীঘর | ২০ | ৯২৬.৩৩ |
| ১১. | কাঁচি যদুপুর | ২১ | ৭৫.২৭ |
| ১২. | বেগমগঞ্জ | ২২ | ২১৮.৫৩ |
| ১৩. | হাকিমগঞ্জ | ২৩ | ৬২.৩২ |
| ১৪. | মঙ্গতপুর | ২৪ | ১১৯.৭৯ |
| ১৫. | হোসেনাবাদ | ২৫ | ২৯০.১৬ |
| ১৬. | দোগাছি | ২৬ | ৪৭৫.৯২ |
| ১৭. | গাজিয়াপাড়া | ২৭ | ৪৬৬.২০ |
| ১৮. | চববাবুপুর | ২৯ | ৫১৩.০১ |

( ১ হেক্টর = ২.৪৭ একর)

[ ১৯৯৭ সালে ব্লক ডেভালপমেণ্ট আধিকারিক কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্ট ]

## ফারাক্কা ব্যারেজ ঃ ত্রুটি

ফারাক্কা ব্যারেজ যে কাঙ্ক্ষিত জলপ্রবাহ ভাগীরথীতে প্রবেশ করবে না এবং এই ব্যারেজ নদীর স্বভাবিক গতিপ্রবাহকে ব্যাহত করে মালদহ জেলাকে বন্যা কবলিত করবে, সে সম্পর্কে বিশিষ্ট নদী বিজ্ঞানী কপিল ভট্টাচার্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন বহু বছর আগে।[৪] এবং তা যে সত্যে পরিণত হতে পারে তার ফল দেখা গেল পর পর ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত মালদহ জেলায় ভয়াবহ বন্যা ও ব্যাপক ভাঙনে।

আসলে ফারাক্কা ব্যারেজের কংক্রীট-ভিত গঙ্গা গর্ভ থেকে গড়ে ১৮ ফুট উঁচু থাকায় পলি জমে গঙ্গার নির্গমন ক্ষমতা (Discharge Capacity) প্রায় চল্লিশ শতাংশ হ্রাস পাচ্ছে। তা ছাড়া জলের গতি বাধা পাওয়ায় ফারাক্কার উজানে বিরাট চরও জাগছে — যা মালদা জেলায় বন্যার আশু সহায়ক হিসেবে কাজ করছে। সুতরাং ব্যারেজের কংক্রীট তলটি (Barrage Sill) খাদ-পৃষ্ঠ অপেক্ষা ৫২ ফুট উঁচু না করে যদি গঙ্গাগর্ভের অনুরূপে রাখা হত, তবে ভাঙন ও প্লাবন অনেকাংশে

হ্রাস পেত। এবং প্রবল বন্যায় গঙ্গার খাদকে কেটে ৫০ থেকে ১৫০ ফুট পর্যন্ত গভীরতর করে নিত। কিন্তু কংক্রীট ভিতটির জন্য তা আর এখন হয়ে ওঠে না।[৫]

তা ছাড়া বর্ষার সময় ড্রেজিং (Dredging) বা চর কাটলে এই মাটি প্রবল জলস্রোতে সাগরে চলে যেতে পারতো। ফারাক্কার মধ্যবর্তী ২৫ টি স্লুইসের কংক্রীট ভিত অন্যগুলি অপেক্ষা ৮ ফুট নীচে আছে -- যেখানে ৮ ফুট উঁচু স্টপ্ গেট (Stop Gate) বসানো আছে। ঐ Stop-Gateগুলিকে ডানদিকে ৫ ফুট নীচু স্লুইস্ গেটগুলির উপরে বসালে বর্ষার মরশুমে গঙ্গার প্রচণ্ড স্রোত ডান তীর থেকে মাঝামাঝি নিয়ে আসা সম্ভব হত এবং তা মুর্শিদাবাদের গঙ্গার ভাঙন রোধে সহায়ক হত বলে কোন কোন বিশেষজ্ঞের অভিমত।[৬] তাই মালদহ জেলায় মোট ২৭ টি স্পারের (Spur) মধ্যে ১২ টি ভাল অবস্থায় থাকলেও ৯ টি সম্পূর্ণ এবং ৬ টি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত।

প্রীতম সিং কমিটির রিপোর্টগুলিও কার্যকর করার চেষ্টা হলে বন্যা ও ভাঙন অনেকটাই এড়ানো সম্ভব হতো।[৭] কিন্তু তা রূপায়ণে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের চাপান-উতোর, সেচ দপ্তরের নানাবিধ পরিকল্পনাহীন কার্যকলাপ ও বিভিন্ন দুষ্টচক্রই অসহায় হাজার হাজার মানুষের দুর্গতিকে আশ্রয় করেই পুষ্ট হচ্ছে — যার অভিভাবক সরকার নামক বস্তু।[৮]

আসলে Shallow Ecologyর ফলে মানুষের শুধু আকাঙ্ক্ষা পূর্তিকে বাঁধ, স্পার ও বোল্ডার ফেলা ইত্যাদির মাধ্যমে এই বন্যা স্থায়ীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় না। সে হিসেবে Deep Ecologyর দৃষ্টিতে এই সমস্যার সমাধান করা প্রয়োজন — যাতে প্রকৃতির প্রতিটি উপাদানের সঙ্গে নিবিড় সান্নিধ্য থাকে।[৯] এ দিক থেকে বন্যার সঙ্গে সহাবস্থানের অনুশীলনই কাম্য এ অঞ্চলের বন্যার চরিত্রের নিরিখে। তাই শুধু মানুষের স্বার্থে প্রাকৃতিক সম্পদ যথেচ্ছ ব্যবহার করে প্রকৃতির চরিত্র অনুধাবনে ব্যর্থ হয়ে এবং তাকে আঘাত করলে সে প্রতিশোধ নেবেই।
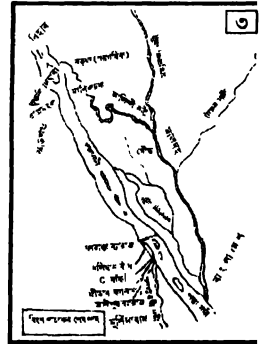
তবে যেহেতু ফারাক্কা সরানো সম্ভব নয় অথচ ফারাক্কা ব্যারেজকে মধ্যে রেখে গঙ্গা তার স্বাভাবিক meander সৃষ্টি করতে চাইছে, তাই জলের চাপও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে মাণিকচকের দিকে এবং নীচে মুর্শিদাবাদের দিকে। এই স্বাভাবিক meander পদ্ধতিকে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ও মডেল টেস্টিং-এর সাহায্যে দ্রুত বন্ধ করা প্রয়োজন বলেও বিশেষজ্ঞের অভিমত।[১০]

প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, ১৯৯৮ সালের মালদা জেলার বিধ্বংসী বন্যার পরে ২০০৩ সালেও কালিয়াচক পঞ্চাননপুরের ভাঙ্গনে 'গঙ্গাভবন' সহ অনেক গ্রামের গঙ্গা গর্ভে সমাধি ঘটায় আবার গঙ্গা প্রতিরোধে সক্রিয় করে তুলেছে সরকার পক্ষ সহ স্বনিযুক্ত (self appointed or self designated) নদী বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিক ও সাধারণ মানুষকে। এ ব্যাপারে সরকারী পরিসংখ্যানের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে ১৯৩১ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত ১৪,৩৩৫ হেক্টর এবং ১৯৭৯ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ২৫৬৬ হেক্টর জমি গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়েছে। অর্থাৎ ভাঙনের হার গড়ে কমেছে প্রায় অর্ধেক। তবুও পাড় ভাঙার সমাধান প্রয়োজন। এ জন্য একশ্রেণীর বিশেষজ্ঞ ফারাক্কা বাঁধকেই সকল ত্রুটির মূল নিদান বলে নির্দেশ দিলেও অনেক নদী-বিশেষজ্ঞ ভূতনী দিয়ারার দীর্ঘ

চক্রবাঁধ (Circuit Embankment) কেই গঙ্গার স্বাভাবিক দিকের গতিপথের অবরোধের ফলে উদ্ভুত সমস্যা'ই আসল কারণ হিসেবে মনে করেন। তাই বিশেষজ্ঞের প্রস্তাব অনুযায়ী চক্রবাঁধের পূর্বদিকের অংশ কিছুটা পশ্চিম দিকে অপসারিত করলে এবং পূর্বের খাদ আরও গভীরভাবে কেটে দিলে গঙ্গা দু-দশক আগের ন্যায় ভূতনীর দুদিক দিয়ে সমানভাবে প্রবাহিত হবে এবং জলের গতিবেগের তীব্রতা হ্রাসের ফলে মানিকচক ও কালিয়াচক অঞ্চলে ভাঙন রোধ করা সম্ভব। এ অঞ্চলে স্পার ও বোল্ডার বিশেষ কোন কাজ দেবে না। তাছাড়া হল্যাণ্ডের ইঞ্জিনীয়ারদের নির্দেশিত পদ্ধতি flexible fascine mattress দ্বারা নদীপাড় বাঁধলে মালদার এ সব অঞ্চলের ভাঙন রোধ সম্ভব হবে। তবে গঙ্গার পশ্চিম দিকের সরে যাওয়ার প্রবণতাও 'স্যাটেলাইট' ছবিতে দেখা যায়, যা আতঙ্কিত মালদার জনগণকে হয়ত বা আশা জোগায়।[১১]

## ● পাদটীকা

১.ক. ফারাক্কা ব্যারেজ ও গঙ্গাব গতিপথ পবিবর্তন, কল্যাণ রুদ্র, মালদহ মহিলা মহাবিদ্যালয়ের রজতজয়ন্তী বর্ষ স্মারক সংখ্যা, ১৯৯৫, পৃ - ২২

১. অশোককুমার বসু — গঙ্গাপথের ইতিকথা , পৃ-৪৭

২. প্রাগুক্ত, পৃ - ১৩২

৩. Report -- Pritam Singh, P-9

৪. কপিল ভট্টাচার্য — ফারাক্কা ব্যারেজ, বিচিন্তা, প্রথমবর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, এপ্রিল-মে, ১৯৭৩

৫. কপিল ভট্টাচার্য — স্বাধীন ভাবতে নদ-নদী পরিকল্পনা, পৃ-৪১

৬. শিবরাম বেরা — নদীবিজ্ঞানের কথা, পৃ-৬০

৭. মালদহের বন্যা, ১৯৯৮, রূপান্তরের পথে, শারদ সংখ্যা, পৃ-২০

৮. প্রাগুক্ত, পৃ-৩৭

৯. ড. মলয় মুখোপাধ্যায় — বন্যা প্রতিরোধ নয়, সহাবস্থানেই বিচক্ষণতা, কম্পাস, ৩৮শ বর্ষ, জুলাই, ২০০১, পৃ-১৫০৪ - ০৫

১০. সোমেন্দ্রকুমার মজুমদার — ১৯৯৮ সালের মালদহের বন্যার জন্য ফারাক্কা ব্যারেজ কতটা দায়ী , রূপান্তরের পথে, বন্যা ক্রোড়পত্র, শারদ সংখ্যা, ১৯৯৮, পৃ-১৩

১১. প্রসাদ সেন — গঙ্গার ভাঙ্গন - মালদহ — গৌড় মালদা সংবাদ, শারদীয় সংখ্যা, ১৪১০, পৃ-১০-১২

# গাছ-গাছালি

পেমবারটন উনিশ শতকের মধ্যবর্তী পর্বে জবি জরিপ কালে মালদা জেলায় ঘন জল-জঙ্গলের কথা বলেছেন।[১] ঐ শতকের চতুর্থ পাদে হাণ্টার তাঁর সময়েও টাঙ্গন ও পুনর্ভবার মধ্যবর্তী অঞ্চল কাঁটাগাছের ঝোপঝাড় ও জঙ্গলের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে বিংশ শতকের প্রথম থেকেই এই ব্যাপক জঙ্গল পরিষ্কার করে আবাদযোগ্য হতে সুরু করে।[২] মালদা মুখ্যত সমতলভূমি পলিমাটি অঞ্চল হওয়ায় বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মত এখানেও আম, জাম, কাঁঠাল, নিম, লিচু, কলা, আতা, নোনা, তরমুজ, বেল, কুল, বুনোকুল, পেয়ারা, সুপারী, পিঁপুল, বট, অশ্বত্থ, সিসু, পাকুড়, খেজুর, লেবু, বেদানা, কাঠবাদাম, ডুমুর, টাবালেবু (Citron), বাবলা, বাঁশ ইত্যাদি বর্তমান। তবে মালদা জেলার মাটি আমের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী বলে স্মরণাতীত কাল থেকে আমের জন্য এ অঞ্চল বিখ্যাত। তা ছাড়া রেশমের চাষও বহু যুগ প্রসিদ্ধি লাভ করায় তুঁত গাছের চাষও এ অঞ্চলে খ্যাতিলাভ করেছে। ওল্ড মালদা, ইংরেজবাজার,কালিয়াচক, সুজাপুর এমন কি ভূতনীর হীরানন্দপুর অঞ্চলের নন্দীটোলা, ডোমনটোলা গ্রামেও এখন তুঁত চাষ হয়।

সিসু গাছ

## আম ঃ

মালদায় যেহেতু আমই প্রধান ফসল, তাই আম সম্পর্কিত আলোচনাই সিংহভাগ জুড়ে আছে জেলার অর্থনীতিতে। ভারতবর্ষের প্রায় ২৩ লক্ষ একর জমিতে চাষের মধ্যে বিভক্ত মালদাতেই প্রায় পঞ্চাশ হাজার একর জমিতে তার চাষ। আম চাষ এ জেলার সব থানাতে হলেও বামনগোলা, হবিবপুর তার মাটির জন্য উল্লেখযোগ্য নয়। অন্য থানাতে তার পরিসংখ্যান মালদা ম্যাঙ্গো মার্চেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন মারফৎ যা পাওয়া যায়, তাতে পূর্ণ হিসাব না পাওয়া গেলেও সামগ্রিক চেহারা মেলে—

| | থানা | আম চাষের এলাকা (একর) |
|---|---|---|
| ১. | ইংরেজবাজার | ১৯,৩৩৯.৭২ |
| ২. | রতুয়া (১ নং ও ২ নং ব্লক) | ৮,৯১৯.৩৭ |

| | | |
|---|---|---|
| ৩. | কালিয়াচক (অধুনা বৈষ্ণবনগর থানা) (১, ২, ও ৩ নং ব্লক) | ৬,৩১১.৩৫ |
| ৪. | মাণিকচক | ৫,৪৫৯.৫৯ |
| ৫. | (ওল্ড) মালদা | ৩,২১৮.৪১ |
| ৬. | হরিশ্চন্দ্রপুর | ২,২৪৯.৪৭ |
| ৭. | চাঁচল (১ নং ও ২ নং ব্লক) | ২,২১৭.১৬ |

আম বা অম্র বা আম্রের (Mangifera indica) উর্বর পলল মৃত্তিকায় চাষ ভাল হয়। দোঁয়াশ মাটি, পলিমাটি যুক্ত জল জমতে পারে না যে জমি এবং যে মাটিতে জৈব (Humus) সার আছে এবং যার PHর পরিমাণ ৮ থেকে ৮.৬ পর্যন্ত সে মাটিই আমচাযের উপযুক্ত। তার সঙ্গে অনুকূল গ্রীষ্মকালীন তথা নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া প্রয়োজন। শীতপ্রধান দেশে আমগাছ জন্মে না। সমুদ্রস্তর থেকে ১৫০০ মিটার উঁচু স্থানে নাতিশীতোষ্ণ বা গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে আম জন্মাতে পারে। এর জন্য বছরে ৭৫-৩৭৫ সেমি বৃষ্টির দরকার। তাপমাত্রা, বাতাসের গতি এবং উষ্ণতা আমের ফলনকে প্রধানত প্রভাবিত করে। বাতাসের আর্দ্রতার (Humidity) ভাগ খুব হ্রাস পেলে এবং তার সঙ্গে দীর্ঘ ঝোড়ো হাওয়ায় আমের চারার ক্ষতি হয়। আবার এককালীন বৃষ্টিপাতের পরিমাণ থেকে বৃষ্টিপাত পর্যায়ক্রমে হওয়া অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। মুকুল উদ্গমের সময়ে বারিপাত পরাগমিলনের প্রতিকূল হয়ে দাঁড়ায়। তাই ঝোড়ো বাতাস, ঝড়-ঝঞ্ঝা এবং শিলাবৃষ্টি আমের মুকুল ও কুসি-গুঁটি এমনকি পরিণত আমেরও বিশেষ ক্ষতি করে। আসলে প্রাক্-মুকুল পর্ব থেকে আমের মুকুল-পর্ব ও গুটি-পর্ব পর্যন্ত নির্মল প্রকৃতি বেশী ফল উৎপাদনে সহায়তা করে।[৪]

আমের ইংরেজী নাম Mango; শব্দটি তামিল শব্দ man-Kay- কিম্বা man-Gay থেকে পর্তুগীজে manga এবং তা থেকে ইংরেজীতে mango শব্দ এসেছে।[৫] আবার এর ভাষাতাত্ত্বিক রূপ এমন ভাবেই করা হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন — পর্তু. manga < মালয়ী maága < তামিল mán-káy < mán অর্থে একটি mango গাছ+ káy একটি ফল।[৬] এর উদ্ভিদ বিজ্ঞানের নাম Mangifera indica. Linn. Family Anacard iaceac শব্দটিতেই ভারতে এর উৎপত্তির কথা সমর্থিত হয়। সংস্কৃতের আম্র শব্দটি হিউ এন সাঙের (আনুমানিক ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দ) উচ্চারণে An-mo-lo.[৭] বার্ণিয়ে ভারতবর্ষের সমস্ত আমের মধ্যে বাংলা, গোলকুণ্ডা ও গোয়ার আমকেই শ্রেষ্ঠ বলেছেন।[৮]

মহাকবি কালিদাস তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'মেঘদূত'-এ আষাঢ়ে পরিপক্ক আম্রের কথা লিপিবদ্ধ করে তাকে ধন্য করেছেন — ছন্নোপান্তঃ পরিণতফলো ফলদ্যোতিভিঃ কাননাম্রৈঃ।[৯] সম্রাট বাবর হিন্দুস্তানের 'আম্বে'র প্রশংসা করেছেন।[১০] তবে সব জাতের আমই যে প্রশংসাধন্য হয়ে ওঠে তা নয়। সে দিক থেকে সামগ্রিক ভাবে মালদা জেলার আমের খ্যাতি বহু যুগ ধরে। তবে গাছে মুকুল বা বোল (বউল) ধরার সময়ে শীতের আধিক্য, মুকুল উদ্গমের পর কুয়াশা বা মেঘাচ্ছন্ন পরিবেশ, অথবা মুকুল উদ্গমের পর বৃষ্টি, পশ্চিমের বাতাস, বৈশাখে বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি ইত্যাদি থেকে রক্ষা পেলেই মালদার আম ফলনের সুদিন দেখা দেয়।

ইদানীংকালে পটাস ও ফসফরাস ইত্যাদি সার প্রয়োগ করে গাছের সুষম বৃদ্ধির চেষ্টা অনেকে করলেও আগে ভাঙা প্রাচীরের মাটি এবং শুকনো পাঁকমাটি আমগাছের সার হিসেবে

ব্যবহৃত হতো। ডাক-পুরুষের বচনে এ বিষয়ে নির্দেশ আছে — " গোয়ে গোবর, আমে মাটি, নারিকেলের শিকড় কাটি।"[১১]

আয়ুর্বেদাচার্য শিবকালী ভট্টাচার্য অথর্ব বৈদ্যকল্পের (১৫৭/২৯-৩২) এক শ্লোকে উদ্ধৃত করে তার অর্থ ও মহীধর ভাষ্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর 'চিরঞ্জীব বনৌষধি' গ্রন্থে (১৩৮৩ বঙ্গাব্দ)। সেখানে তার রূপ-স্বরূপ ও গুণাবলী বিধৃত ঃ—

উর্জ্জস্বানঃ পয়সা পিন্বমানঃ অস্মৎ সীতে পয়সা।
পবস্ব মাকন্দঃ অভ্যাবৃৎ স্ব।।
স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া পবস্ব সোমধারয়া।
সমুদায় ভিষক্ পাতবে সুতঃ যোনিমর।

অর্থাৎ তুমি মাকন্দ, পরিমিত কন্দ তোমার, দূর থেকে তোমার সৌরভ আগমন করে। তুমি বলাধান কর। তুমি আকর্ষিত ভূমিতে জন্মগ্রহণ কর। তোমার রস দুগ্ধসহ যুক্ত হয়ে আমাদের সম্মুখে এস। আমাদের অনুকূল হও। তোমার পঞ্চরসের ধারা স্বাদিষ্ঠ ও মত্তকারক। তোমার বৃক্ষও পত্রের রস যোনি ও গর্ভদ বলেই ভিষগ্ গ্রহণ করেন।[১২] এর বিভিন্ন নাম মাকন্দ, আম্র, সহকার,সোমধারা ইত্যাদিও গভীর অর্থবহ।[১৩] শুধুমাত্র পাকা আমই নয়, এ গাছের ছাল, পাতা, কাঁচা আম, এমন কি আঁঠি অর্থাৎ বীজও বহু রোগের মহৌষধ।

সম্রাট বাবর হিন্দুস্তানের শ্রেষ্ঠ ফল হিসেবে আম ('নাখজাক') কেই শ্রেষ্ঠ বলে বাংলা এবং গুজরাটের উৎপন্ন আমকেই শ্রেষ্ঠ শিরোপা দিয়েছেন। খাজা খশরুর প্রশস্তিমূলক কবিতা এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃতব্য ঃ

নাখ্জাক-ই মা (খাওয়াস) নাখজ -কুন-ই-বাস্তান।
নাখ্জতারিন মেঁওয়া (নামাত) ই-হিন্দুস্তান।

অ্যানেট সুজানা বেভারিজ এর ইংরেজী তর্জমা করেছেন —

Our Fairling (i.e. mango) beauty maker
of the garden.
Fairest Fruit of Hindusthan.[১৪]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে দৌলত খান বাবরকে মধুর মধ্যে সংরক্ষণ করে আম উপহার দিয়েছিলেন এবং বাবর বাংলা ও গুজরাটের আমগাছের রম্য কান্তির কথাও লিখেছেন।[১৫]

আকবর বাদশাহ লাহোরে রাজধানী প্রতিষ্ঠার সময়ে আমকে সুমিষ্ট করার জন্য গাছের চারপাশে দুধ ও গুড় থেকে তৈরী রোগ-প্রতিষেধক দ্রব্যাদি প্রয়োগ করান।[১৬] আবুল ফজল দ্রুত পচনশীল আমকে দীর্ঘদিন রাখার এক প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে অর্ধপক্ক আমের দু আঙ্গুল পরিমিত বোঁটাকে গরম মোম দিয়ে আঁটকে মাখন অথবা মধুর মধ্যে রাখলে তার স্বাদ ২/৩ মাস একই থাকে এবং তার রঙ এক বৎসরকাল পর্যন্ত একই রকম থাকে।[১৭]

ভারতে অসংখ্য বিদেশী পর্যটক বাংলার আমের প্রশংসা করেছেন। যেমন বার্ণিয়ে ভারতের শ্রেষ্ঠ আম বলতে বাংলা, গোলকুণ্ডা ও গোয়ার আমকেই নির্দেশ করেছেন।[১৮] গার্চিয়া বাংলা, পেগু

ও মালাস্কার আমের প্রশংসা করেছেন।[১৯] আবার ইবন বাতুতা আমগাছের ছায়া অস্বাস্থ্যকর বলে জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এ গাছের নীচে ঘুমালেই নাকি জ্বর হয়।[২০] মনে হয় ইবন বাতুতা ভুলক্রমে আমের কথা বলেছেন তেঁতুলের পরিবর্তে। কারণ তেঁতুল বৃক্ষের পারিমাণ্ডলিক বায়ু স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বলে বৈদিক তথ্যের সমীক্ষায় লিপিবদ্ধ।[২১] আবার চীন পরিব্রাজক ফেই শিনের গ্রন্থ শিং-ছা—শ্যং লান-এ বাংলার আমের উল্লেখ আছে।[২২]

মালদা জেলার বরিন্দ অঞ্চলের Red alluvium-এ এবং অতিরিক্ত বেলেমাটি যুক্ত গঙ্গার দিয়ারার ফালি অংশে (Strip) আম ভাল হয় না। সে দিক থেকে ইংরেজবাজার থানাই আম উৎপাদনে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। সত্তর বছর আগেও এ থানার এক ষষ্ঠাংশই আম বাগানে পূর্ণ ছিল। অবিভক্ত মালদার ইংরেজবাজার থানার পরই আম উৎপাদনের থানাগুলি ক্রম অনুসারে এমনই — রতুয়া,শিবগঞ্জ, কালিয়াচক, খরবা (চাঁচল), (ওল্ড) মালদা, হরিশ্চন্দ্রপুর, গোমস্তাপুর ও ভোলাহাট। চাঁচল, হরিশ্চন্দ্রপুর এবং ভালুকার জমিদারদের গত শতাব্দীর গোড়ার দিকেও বৃহৎ আম বাগান ছিল। ইংরেজ রাজত্বেও (১৭৮৮) খাস আমবাগানগুলিতে আমের মরশুমে নবাব মুবারক-উদ-দৌল্লার নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়কেরা (Superintendent) আম সংগ্রহ করে নবাবের নিকট পাঠাতেন।[২৩]

আম গাছের পরিচর্যা একটি শিশু পরিচর্যারই মত। মাটি ভাল করে চাষ করে, কখনো জমির পাশে গর্ত কেটে জল অপসারণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, দরকার বেড়া দেওয়া। জুলাই মাসে এ গাছ পোঁতা হয়। প্রতিটি গাছের জন্যই গোল বাঁশের বা চাটাইয়ের বেড়া ও প্রথম বছরে নিত্য জলসেচ এবং ষষ্ঠ বছর পর্যন্ত নিয়ত রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন। দশ ফুট বাদে বাদে গাছ অর্থাৎ চতুর্ভুজ-ক্ষেত্রই এর আদর্শ বাগান-বিন্যাস। আঁঠির আম (স্থানীয় ভাষায় গুঁটি) এবং কলমের (Grafting) আম এই দু ধরণের আম বর্তমান। প্রসঙ্গ তঃ উল্লেখ্য যে পৃথিবীর কোন ফলের আমের ন্যায় এত রূপ, রঙ ও স্বাদ-আস্বাদেব বৈচিত্র্য নেই।

আমবাগান

মালদা জেলায় আম একটু দেরীতে হয়। প্রথমে গোপালভোগ (অন্যত্র বোম্বাই নাম) এবং বৃন্দাবনী। তার পরে সুপরিণত বা বাতি (matured) হতে থাকে ল্যাংড়া, খিরসাপাতি (হিমসাগর) কিষানভোগ ও অন্যান্য হাজার রকমের রূপ, রঙ ও স্বাদের আম। তারপর ফজলী এবং শেষে আশ্বিনা।

দেশ বিভাগের পূর্বে এবং তারপরে ১৯৫০-৫১ পর্যন্ত নদীপথে মালদার আম পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে সাদরে গৃহীত হত। তার পরিবর্তে এখন আসাম, কলকাতা, দিল্লী ও কয়লাখনি এলাকায় ট্রাক যোগে আম চালান হচ্ছে বটে, কিন্তু পরিণত (matured) আম হওয়ার আগে পাড়া, কারবাইড ইত্যাদি প্রয়োগে বাজারে পাঠানো ইত্যাদির ফলে মালদার আমের ঐতিহাসিক সুনাম ইদানীংকালে ক্রম হ্রাসমান।

বর্তমানে বাগানের স্বাস্থ্য রক্ষাও (Health of the Orchard) মালদায় দু তরফের পক্ষেই দায়সারা কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাগানের মালিক থেকে এক বা একাধিক হাত ঘুরে শেষ পর্যন্ত ফলের মালিকের কাছে পৌঁছে। এখানে পাতা দেখে ফলের সম্ভাব্য (probable) অবস্থায় কেনাকে

'পাতা কেনা' বলে। এর পর মুকুল হওয়া থেকে আমের গুঁটি ধরা ও তা টেঁকানোর জন্য অনুকূল প্রাকৃতিক আবহাওয়া যেমন প্রয়োজন, তেমনই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মধুঝরা রোগ, বাগানের গাছ রোগাক্রান্ত বা অপুষ্টির শিকার হলে তাকে সবল ও সুস্থ করে তোলার দায়িত্ব ভাগ হয়ে যাওয়ায় ফলপ্রাপ্তি অর্থাৎ কোন রকমে লাভের দিকে নজর দেওয়া লক্ষ্য বলে সুশৃঙ্খল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যেমন বাগান মালিকের গাছ তৈরী ও তার লালন-পালনে অনীহা থেকে গেছে, তেমনই গাছ কেনার পর (সাধারণতঃ এ জেলায় তিন বছরের জন্য ডাক হয়) সাময়িক ফলের জন্য মালিকেরও তার সুরক্ষা ও তত্ত্বাবধানে দৃষ্টি ও যত্নশীলতা দেখা যায় না। এই আভ্যন্তরীণ পরিচর্যাও অধিকাংশেরই দায়িত্ব বা কর্তব্যের মধ্যে না পড়ায় আমের গুণমান যেমন হ্রাস পেয়েছে, তেমনই আমের সর্টিং (sorting) ও গ্রেডিং (Grading) না করা, পরিবহনে সনাতনী বাঁশের ঝুড়িতে প্যাকেজিং পদ্ধতি আমের আমিরী চেহারায় আঘাত ও ক্ষত তার অর্থকরী বাজারকে নষ্ট করে চলেছে।

শুধুমাত্র পাকা আমই নয়, কাঁচা আম থেকে আমসী, আচার, আমচুর ইত্যাদি বহু ধরণের ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা প্রচুর। চার মাস ধরে এই আম জেলার লক্ষ লক্ষ মানুষের রুজি রোজগার। তাই এ জেলায় ভোগ্য পণ্য হিসেবে এর গুরুত্ব সমধিক।

মালদার অর্থনীতির ধমনী এই আম। এই আম উৎপাদন, চালান ইত্যাদির একটি পরিসংখ্যান দেওয়া হল ঃ

| সাল | চাষের এলাকা (হেক্টরে) | উৎপাদন (মেট্রিক টন) |
|---|---|---|
| ১৯৯৫ | ২২,২০০ | ২,৬০,০০০ |
| ১৯৯৬ | ২২,৪০০ | ২২,০০০ |
| ১৯৯৭ | ২২,৪২০ | ২,২০,০০০ |
| ১৯৯৮ | ২৩,০০০ | ৬৫,০০০ |
| ১৯৯৯ | ২৪,০৮০ | ২,৭০,০০০ |
| ২০০০ | ২৪,১২০ | ১,০৫,০০০ |
| ২০০১ | ২৪,২৫৯ | ২,৫৩,৮৭৬ |
| ২০০২ | ২৪,৫০০ | ৬৩,৬৭৮ |
| ২০০৩ | ২৪,৮৫০ | ২,৫০,০০০ (সম্ভাব্য) [২৪] |

প্রসঙ্গতঃ মালদার অসংখ্য নামী-অনামী আমের মধ্যে কিছু নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ঃ যেমন — গোপালভোগ, (অন্যত্র নাম বোম্বাই), ক্ষীরসাপাতি (অন্যত্র নাম হিমসাগর), আকৃতি ও ওজনের জন্য এ জেলারই 'ফজলী' বিখ্যাত। কলম, মাটি, আবহাওয়া, সার ও পরিচর্যার ভেদে একই কলমের আম এ জেলারই নানা এলাকায় সৃষ্ট এবং বাগান মালিকের বা তার প্রদত্ত বা সে এলাকার নামে পরিচিত হয়। এখানে ভাষাতত্ত্বের শব্দার্থের অর্থ প্রসার (Expansion of meaning) পদ্ধতি দেখা যায়। যেমন গঙ্গাপ্রসাদ (স্থান), আড়াজন্মা (আড়াপুর) ইত্যাদি। আবার ঠাকুর-দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা হেতু নাম — কিষাণভোগ (<কৃষ্ণ), কিষ্টভোগ, বিষ্ণুভোগ, লক্ষ্মীভোগ, সীতাভোগ, গোপালভোগ (< গোপাল-বাল গোপাল, কৃষ্ণ), আবার বাগানের মালিকের নামেও কিছু নাম — লক্ষ্মণভোগ (স্থানীয় ভাষায় লখ্ণা), সন্ধ্যাভোগ, দ্বারিকভোগ, মোহনভোগ, শঙ্করপসন্দ (মুর্শিদাবাদের নবাবপসন্দ, বেগম পসন্দ-এর অনুকারী), চিন্তামণি গুঁটি, রাখালভোগ, হান্নাৎভোগ,কালীভোগ, রাণীপসন্দ, নাজিমপসন্দ,ভূদেবভোগ,আমীরপসন্দ, বেগমবাহার, বৃন্দাবনী ইত্যাদি।

**আকৃতির নিরিখে** — মোহনবাঁশী, পরবলিয়া (= পব্বল, পটল), আতা,কাঁচ্চা কলা, গোলিয়া (< গোল), প্যাটকাট্রি (মধ্যে দাগ), লিচুফল, তোতাপুলি, রুহিমগুা,কাঠুয়া, মোহনভোগ, কুমড়াজালি, ফজলী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে 'ফজলী' নামটির উৎপত্তি সম্পর্কে নানা গল্প-কাহিনী প্রচলিত আছে। সেগুলি ভ্রমাত্মক। ফারসী শব্দ 'ফজল', ফজিলৎ এর উদ্ভবের সূত্রে আছে। এর অর্থ-উৎকর্ষ, শ্রেষ্ঠতা। আমটি রূপে উৎকর্ষ। তাই ভাষাতত্ত্বের নিরিখে স্বাভাবিক ভাবেই ফজ্‌ল+ঈ = ফজ্‌লী হয়েছে।

**রঙের নিরিখে** — আলতা গুটি, কেলুয়া, চন্দনচূড় সিঁদুরকুটি (< কোটা)।

**স্বাদ ও গন্ধের নিরিখে** — লেবুয়া, মরিচা, পপিতা, কর্পূরিয়া।

**মাসের নিরিখে** — শাওনিয়া (< শ্রাবণ)

**রস ও স্বাদের নিরিখে** — মিছরিকন্‌, ক্ষীরুয়া (<ক্ষীর), চিনি মিছরী, মধুচুষকী, মিঠুয়া, আনারস।

**মিশ্র রূপ** — জগৎ বেল [জগৎ (নাম) + বেল (আকৃতি)]

আবার স্থান, কাল, খাদক ইত্যাদির নামে — শিয়াল খাউকি, গিধ্‌নীহাগ্‌গা ইত্যাদি।
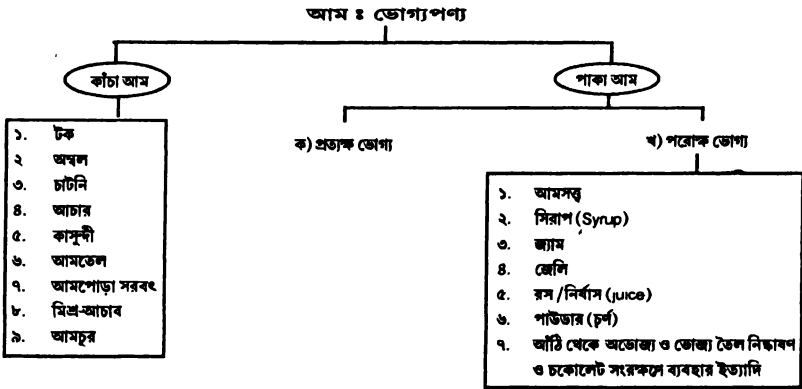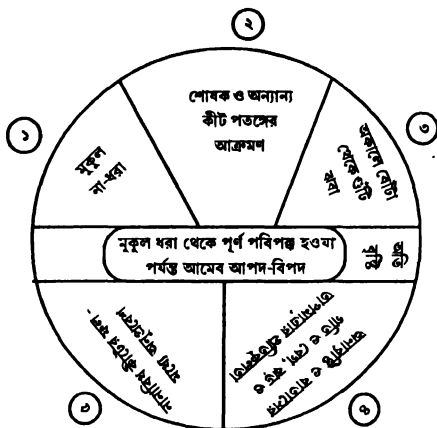
চিত্র–২

চিত্র–৩

চিত্র–৪
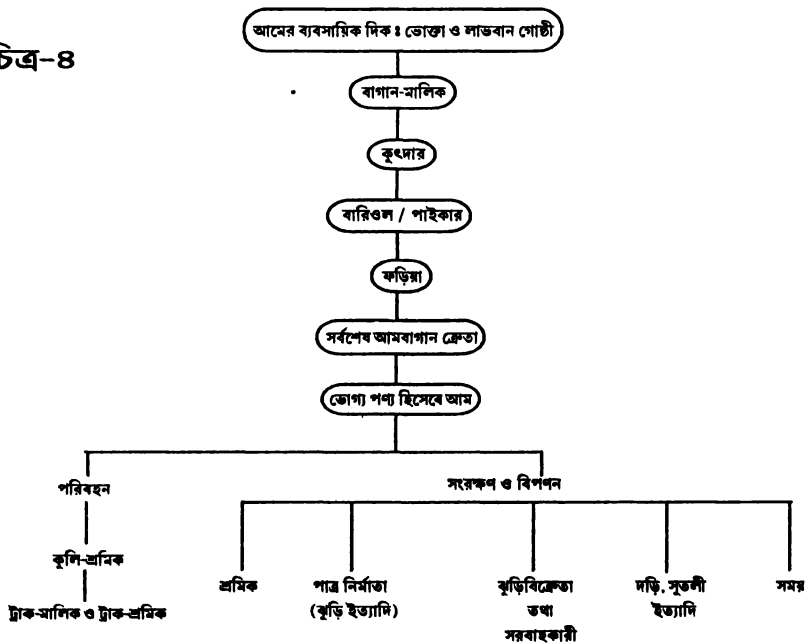
## ● পাদটীকা


১. West Bengal District Gazetteers, Malda, 1969, P-9

২. Hunter W.W. - A Statistical Account of Bengal, Vol.-Vii, P-34

৩. মালদহ জেলা কৃষি দপ্তর পুস্তিকা, ২০০০

৪. সুভাষ চৌধুরী - আম্র ব্যবসায়ের ইতিবৃত্তঃ পাখীর চোখে, জরুরী গাইড ১/৬

৫. Hobson-Jobson, p-554

৬. Webster – Comprehensive Dictionary, International Edition, vol II, 1986, p-774

৭. Hobson – Jobson, p-554

৮. Bernier, Ed Constable, p-249

৯. কালিদাস - মেঘদূতম্, পূ- মেঘ, শ্লোক ১৮

১০. Memoirs of Juhir-ed-din Muhammed Babur, Emperor of Hindusthan, Tran. Leyden & Erskine, p-324

১১. বাংলা বিশ্বকোষ, প্রথম ভাগ, রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় সংকলিত,পৃ-৫০৮

১২. শিবকালী ভট্টাচার্য - চিরঞ্জীব বনৌষধি, পৃ- ১১১-১১৩

১৩. তদেব,পৃ-১২৩

১৪. Babur-Nama - Tr. Annette Susannah Beveridge, p-503

১৫. ibid, p-504

১৬. Abul Fazal Allame - AIN-I-Akbari, Tr. Blockmann, Reprint, Vol. I, p-72

১৭. ibid, p-72

১৮. Bernier-Ed. Constable, P-249

১৯. Garcia de Orta, Colloquios, 1563

২০. Voyages d'Ibn Butoutah, III, P-125

২১. শিবকালী ভট্টাচার্য - তদেব, পৃ-১৯১

২২. সুখময় মুখোপাধ্যায় - বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর, তৃয় সং, পৃ-৩২৮

২৩. Carter M.O., Op. Cit, p-24

২৪. রাজা আম উৎসব, ২০০৩ উপলক্ষে মালদা মার্চেন্ট চেম্বার্স অব কমার্স এব তথ্য, জুন ২০০৩

# রেশম

মালদা জেলায় স্মরণাতীত কাল থেকে রেশম তার এক প্রধান পণ্য। রেশম প্রস্তুতকারীরা দুভাগে বিভক্ত — ১. কোয়া বা গুঁটি থেকে সুতো প্রস্তুতকারী এবং ২. রেশমবস্ত্র নির্মাতা অথবা রেশম ও কার্পাসবস্ত্রের সংমিশ্রণে বস্ত্র উৎপাদনকারী। প্রথমটি বিশ শতকের গোড়াতেও রমরমা ছিল, কিন্তু দ্বিতীয়টির বৈশিষ্ট্যের জন্য মালদার যে সুনাম ছিল তা ক্রম হ্রাসমান হয়ে পড়ে গত শতাব্দীর প্রথমার্ধেই।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে এ দেশে বৈদিক যুগের শিল্পের মধ্যে বস্ত্র বয়নের চারটি উপাদানের কথা লিখিত আছে — ১. পশম ২. চর্ম ৩. কার্পাস ও ৪. মেষলোম।[১] গোভিলের গৃহ্যসূত্রে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের ব্রহ্মচর্যাবস্থায় চার প্রকার বস্ত্র ব্যবহারের উপদেশ লিখিত — ১. ক্ষৌম ২. শাণ ৩. কার্পাস এবং ৪. ঔর্ণ —

ক্ষৌম-শাণ-কার্পাসৌর্ণান্যেষাং বসনানি। (২/১০/৮)

মধ্যযুগের সাহিত্যেও চার শ্রেণীর বস্ত্রের উল্লেখ আছে। হেমচন্দ্র বলেন —

ক্ষৌম-কার্পাস-কৌশেয়-রাঙ্কবাদি-বিভেদতঃ।

এই কৌশেয় বা কৌশিক বস্ত্র ( রেশমের কাপড়) পট্টবস্ত্র নামে অভিহিত হতে থাকে।[২]

'মনুসংহিতা'য় রেশম ও তসর বস্ত্রের স্পষ্ট উল্লেখ মেলে —

কৌষেয়াবিকয়ো রূষৈ কুতপানামরিষ্টকৈঃ।

শ্রীফলৈরংশুপট্টানাং ক্ষৌমাণাং গৌরবসর্ষপেঃ।। (৫/১২০)

এখানে দু ধরণের রেশমের সন্ধান মেলে। তসর গুটী থেকে যে নিকৃষ্ট রেশম পাওয়া যায়, তা কৌষেয় এবং পট্ট বা বড় পাট নামে এবং পলুর কোষ থেকে যে অংশু মেলে, তাই অংশুপট্ট নামে অভিহিত। মনুসংহিতায় চীন প্রভৃতি জনপদবাসী ভারতবর্ষের অন্তর্গত জাতি বলেই বর্ণিত। সেজন্যই বোধ হয় 'চীনাংশুক' অনুল্লেখিত।[৩] তবে মহাভারতে রাজসূয় পর্বে রাজা যুধিষ্ঠিরকে চীনাদের চীনাংশুক উপহারের কথা আছে —

প্রমাণরাগস্পর্শাদ্যান বাহ্লীচীনসমুদ্ভবম্।
উর্ণঞ্চ রাঙ্কবঞ্চৈব পট্টনং কীটজন্তুথা।। (সভাপর্ব ৫২/২৬)

আবার মহাকবি কালিদাসে চীনাংশুককে ভারতবাসীর বিলাস-সামগ্রী হিসেবে দেখা যায় —

চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য।

(অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, প্রথম অঙ্ক)

তবে চীন দেশ থেকে আসার বহু পূর্বেই যে রেশম এ দেশে প্রচলিত ছিল তা প্রতিষ্ঠিত সত্য। খ্রীষ্টপূর্ব কয়েক শতাব্দী পূর্বে পৌণ্ড্রবর্ধনের পুণ্ডরীক নামে এক বণিক শাখার খবর মেলে। এখনও মালদা জেলার ঐতিহ্যবাহী প্রতিপালনকারীরা পুণ্ডরীকাক্ষ বা পুণ্ড্র বা পুঁড়ো বা পুঁড়া নামে খ্যাত। সংস্কৃত সাহিত্যে রেশম কীটের নামও 'পুণ্ডরীক'।[৩ক] জৈনশাস্ত্রেও 'পুণ্ডরীক' নামে এক শ্রেণীর পলুর ব্যবসায়ীদের প্রসিদ্ধি আছে। সংস্কৃতে কৌষেয়, পট্ট, ক্রিমিজসূত্র, কীটতন্তু, কীটসূত্র, কীটজ, দুকুল ও দুগুল — প্রভৃতি রেশমের পর্যায় দেখা যায়।[৪]

ফরাসী পণ্ডিত এম. বৈতার্ড (M. Boitard) রেশমকে ভারতের উৎপাদিত দ্রব্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। রোম-সম্রাট জাষ্টিনিয়ান উত্তর ভারতের পাঞ্জাবের পার্শ্ববর্তী সিরহিন্দ থেকে সন্ন্যাসীদের মাধ্যমে রেশম কীটের ডিম আনিয়েছিলেন। অবশ্য এর আগে পারস্য থেকে তাঁরা রেশম ক্রয় করতেন।[৫]

তবে ভারতে যত রকমের রেশম কীট আছে, তার সবগুলিই ভারতে জাত নয়। চীন, ইতালী, বোখারা, জাপান প্রভৃতি দেশ থেকে বিভিন্ন সময়ে এ দেশে রেশম কীট এসেছে।

যাই হোক, সুঐতিহ্যবাহী ভারতের রেশম শিল্পের এক সময়ে ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ছিল সন্দেহ নেই। হিন্দু রাজত্বে গৌড় বা মালদা অঞ্চলের রেশম্ বা পট্টবস্ত্রের প্রচলন এবং তা ঢাকা, সপ্তগ্রাম ও সোনারগাঁও ইত্যাদি শহরে রপ্তানির কথা জানা যায়।[৬] মুসলমান রাজত্বে ধর্মীয় অনুশাসনে রেশম শিল্পের অবনতি ঘটে। সুতা ও সুতী বস্ত্রের বিপুল সমাবেশ ও ব্যবসায় অবশ্য চলতে থাকে। র‍্যালফ ফিচ্ টাঁড়া সম্পর্কে এর উল্লেখ করেছেন।[৭] বারথেমা (১৫০৩-০৮) বাঙ্গেলা (গৌড়) নগরী থেকে প্রতি বছর ৫০ টি জাহাজ ভর্তি সুতী ও রেশম বস্ত্রের রপ্তানির কথা পর্তুগীজ পর্যটক দ্য ব্যারোজের বিবরণ অনুসারে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি তৃতীয় মামুদের রাজত্বকালে এসেছিলেন।[৮] কিন্তু গৌড় রাজধানী হিসেবে মড়কের জন্য পরিত্যক্ত হলে এ শিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটে এবং শোনা যায় যে জালালপুরের জনৈকা সীতা বসনী রেশমের গুটিপোকা (পলু) এ অঞ্চলে আনে। জনশ্রুতি আছে যে প্রায় সাড়ে চারশ বছর আগে (১৫৫৭ খ্রী) মালদার জনৈক সেখ ভিক (ভিখু সেখ বা সেখ ভিখু?) মালদহী 'কাতার' ও 'মুসরি' বস্ত্রের বাণিজ্য করতেন এবং জলপথে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে চালান দিতেন। রাশিয়ার পথে পারস্য উপসাগরে তাঁর জাহাজ যাওয়ার পথে তিনটি জাহাজের মধ্যে দুটি জাহাজ ডুবির সংবাদ মিললেও[৯] তার সমর্থিত তথ্য মেলে না।[১০] পাটনার ইংরেজ প্রতিনিধিদের ১৬২০ সালের চিঠিতে সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় পাদের বস্ত্র শিল্পে মালদার উল্লেখ আছে।

মালদার ইংরেজবাজারে ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রাচীনতম ইংরেজ কুঠির সংবাদ মেলে।[১১] এ

বছরে নবাব শায়েস্তা খানের আদেশে বাংলার সমস্ত ইংরেজ কুঠি বাজেয়াপ্ত হয়। স্থানীয় ফৌজদার এবং কর্মচারীদের অর্থলিপ্সা, চক্রান্ত ও দমন-পীড়নে বিপর্যস্ত হয়ে (১৬৮০ খ্রীঃ) ইংরেজরা মহানন্দা নদীর বিপরীত দিকে মকদুমপুরের জমিদারের নিকট থেকে জমি কিনে কর থেকে অব্যাহতি লাভ করে। পুরাতন মালদার কুঠি ১৭৭০ সালে বন্ধ হয় এবং ১৭৭১ সালে টমাস হেঞ্চম্যান ইংরেজবাজারে কুঠিয়াল হন। এই কুঠিটিই মালদা জেলা শাসকের পুরাতন অফিস। এর কোণগুলিতে বুরুজযুক্ত সুউচ্চ প্রাচীরে সুরক্ষার জন্য আটটি কামান স্থাপিত ছিল। সাত দশক আগেও তার দুটি অবশিষ্ট ছিল। সে দুটি এখনকার সার্কিট হাউসের সম্মুখে (এখনকার পশ্চাতে)রক্ষিত আছে।[১২] এখানে রেশমের থান তৈরী হত এবং বিভিন্ন এলাকা থেকে সংগৃহীত হতো। ১৮৩৫ সালে এই কুঠি বন্ধ হওয়ার পূর্বে তারা একচেটিয়া রেশম শিল্পের কারবার করে। কিন্তু তারপরেও অর্থাৎ ১৮৬৬ থেকে ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত রেশম শিল্পের রপ্তানিতে শীর্ষ স্থান অধিকার করেছিল। এ সময়ে লুই পোঁয়ে (Louis Poyen) এবং সিয়ে অব লায়নস (Cie of Lyons) -এর ফরাসী সংস্থা ভিন্ন আরও দুটি সংস্থা রেশম ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল। এই সংস্থাগুলি বছরে ৬২০ মন কাঁচা রেশম উৎপন্ন করতো এবং স্থানীয় পাকদারেরা (Reelers) উৎপন্ন করতো ১৫০০ মন সুতো— যার মূল্য ছিল দেড় লক্ষ টাকা। পরবর্তী পর্বে তসর ও বন্য রেশম যথা এণ্ডি ও মুগার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং ফ্রান্স ও জাপানে এ শিল্পের বিশেষ অগ্রগতি হওয়ায় তুঁত রেশমের (Mulbury) রপ্তানি হ্রাস পায়[১৩] এবং এ দেশের রেশম শিল্পে মন্দা দেখা দেয়। এমত পরিস্থিতিতে ১৮৮৬ সালে রেশমের উন্নতিবিধান কল্পে স্যার টমাস ওয়ার্ডেল কলকাতায় এসে উডম্যানসন এবং নিত্যগোপাল মুখার্জিকে কারণ অনুসন্ধানের জন্য নিয়োগ করেন এবং নিত্যগোপাল ইউরোপে গিয়ে ফরাসী ও ইতালীয় পদ্ধতি শিক্ষা করে বাংলার কতিপয় জেলায় রোগহীন বিশুদ্ধ সঞ্চ (Seed) সরবরাহের জন্য 'নার্সারী' স্থাপন করেন। এবার স্থাপিত হল সরকার ও অন্যান্য বিদেশী সংস্থাগুলির সহায়তায় 'সিল্ক কমিটি'। পলুপালন ও উন্নত জাতের সঞ্চ (Seed) সরবরাহের জন্য অধিক অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা হল বটে, কিন্তু তাতেও বিশেষ উন্নতি না দেখায় ১৯০৮ সালে বাংলা সরকার কৃষি বিভাগের অধীনে Seri culture খোলে।[১৪]

গুটি পালনের 'চানারকি'

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, রেশম কীট বা পলু প্রধানতঃ দু শ্রেণীর — বন্য ও গৃহপালিত। গৃহপালিত তুঁতপোকা বা রেশমকীটও নানবিধ। যেমন — ১. বিলাতী পলু (Bombayx more) ২. বড় পলু (Bombayx textor) ৩. নিস্তারি, মাদ্রাজী বা কেনারী পলু (Bombayx croesi) ৪. দেশী বা ছোটপলু.(Bombayx fortunatus) ৫. চীনা পলু (Bombayx sinenses) ও ৬. আরাকানী পলু (Bombayx arracanenses)। বন্য রেশম কীটও নানা প্রকার। এর মধ্যে থিওফিলা (Theophyla) জাতীয় কীটই ভাল কোষ তৈরী করে। ওসিনারা (Ocenara), ট্রিলোকা (Trilocha) এবং রণ্ডোসিয়া (Rondocia) শ্রেণীর কীট নিকৃষ্ট কোয়া প্রস্তুত করে।

তুঁতপাতাই পলুর জীবন। পলু চাষে দিবা-রাত্র পরিশ্রম ও অতন্দ্র দৃষ্টি প্রয়োজন। কারণ পলুর রোগ বহুবিধ। কটা রোগ (Pebrene), সরা (Grasserie), কালশিরা (Flacherie), চুণা

বা ছিট (Muscardine) ছাড়া লাল বা রাঙ্গি মাছি, কোয়াকাট পোকা বা কাণ কুটুর ও সোরেপোকা, গাজ্‌লা কোয়া, ডবল কোয়া বা গেঁটে কোয়া প্রভৃতি রোগ এবং পিঁপড়ে, মাকড়সা, টিকটিকি ও বোলতা প্রভৃতির উৎপাত পলুর অনিষ্ট করে।[১৫]

মালদা জেলায় এখন প্রধানত পাঁচটি বন্দ অর্থাৎ বছরে পাঁচবার পলু উৎপাদিত হয়। মাসের নামেই তার নামকরণ। সেগুলি যথাক্রমে — ১. বৈশাখী, ২. আষাঢ়ী, ৩. ভাদুরী (ভাদ্র মাসে জাত), ৪. অগ্রহায়ণী এবং ৫. ফাল্গুনী। ১৯৫৫ সাল থেকে ই পাঁচটি বন্দ নির্দিষ্ট হয়েছে সরকারের অনুমোদনে। এখানে নিস্তারি, জাপানী পলু এবং মিশ্র (Cross Breed) পলু অর্থাৎ নিস্তারি BV (= Byvoltine) = CB (Cross Breed) এবং YB(= Yellow Breed) নামে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই দপ্তর রোগহীন পলু পোকা সরবরাহের জন্য কতিপয় সঞ্চ অঞ্চল বা Seed Zone সৃষ্টি করেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে পশ্চিমবঙ্গের রেশমের মূল সমস্যা নিস্তারি জাতের নিম্নমানের পলু। এ গুলি মাদ্রাজের 'কারগিল' জেলা থেকে আমদানি হয়। এই 'নিস্তারি'র একটি কৌতূহলোদ্দীপক ইতিহাসও উল্লেখযোগ্য। তা হল এই যে, উনিশ শতকের শেষ দশকে পেব্রিন রোগের মড়কে মালদার ঐতিহ্যবাহী পলু-পালন এলাকাগুলি অর্থাৎ আরাপুর, কোতোয়ালী, ধানতলা, গণিপুর, কাজিগ্রাম, অমৃতি, যদুপুর, মুচিয়া, আইহো ইত্যাদি গ্রামে এবং বীরভূম, মুর্শিদাবাদে ৮০/৯০ ভাগ পলু ধ্বংস হলে উদ্ধার বা নিস্তার পাওয়ার উদ্দেশ্যে ছোট জাতের বহুচক্রী যে পলু আমদানি হয়েছিল (১৯০০-১৯১৫ সাল নাগাদ) তাই 'নিস্তারি' জাতের পলু হিসেবে চিহ্নিত। প্রধানতঃ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বা পুঁড়া বা পোদ সম্প্রদায়ের এ চাষে সমকালে খ্যাতি ছিল, অথচ এই মড়কে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে তারাই ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সেই সব জমিতে অর্থকরী ফসল আম গাছ রোপণ করে। এ বিষয়ে স্মরণীয় যে 'নিস্তারি' পলুর কোয়া থেকে যেখানে ২৫০ থেকে ৩০০ মিটার সুতো উৎপাদন করা যায়, সেখানে জাপানী দ্বিচক্রী ৮০০ থেকে ১০০০ মিটার এবং একচক্রী ১০০০ থেকে ১২০০ মিটার সুতো উৎপাদিত হয়।[১৬]

তুঁত ক্ষেত

পূর্বেই কথিত যে স্মরণাতীত কাল থেকেই মালদহের রেশমের খ্যাতি। মোট জাতীয় উৎপাদিত রেশমের (গুঁটি বা পলু) ৬ শতাংশ এবং পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদিত রেশমের ৭৫ শতাংশ মালদা জেলা উৎপন্ন করে।

মালদা জেলায় রেশমের সঙ্গে যুক্ত মানুষের মধ্যে তুঁতগাছের চাষ এবং পলুর চাষ ৫৬ শতাংশ, ২২ শতাংশ পলুর জমি চাষ করে এবং ১১ শতাংশ লোক শ্রমিক এবং ১১ শতাংশ ব্যবসায়ী।

আবার পলু চাষে ৫৬ শতাংশ মানুষ বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা এবং ৪৪ শতাংশ মানুষ পাঁচ হাজারের বেশী রোজগার করে।

অধুনা মালদা জেলার তুঁতগাছের ৬০ শতাংশ H.Y.V (উচ্চ ফলনশীল) এবং বাদবাকী ৪০ শতাংশ দেশী-শ্রেণীর। সরকারী তরফে দেশীকে H.Y.Vতে ক্রমান্বয়ে উন্নীত করার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়।[১৭]

**মালদা জেলার রেশমশিল্প এক নজরে দেখলে এমন ঃ**

| | ২০০১-২০০২ | ২০০২-২০০৩ |
|---|---|---|
| ১. মোট তুঁত চাষের জমি | ১৮৬০৯ (একর) | ১৮৯৭৪ (একর) |
| ২. অন্তর্ভুক্ত ব্লক (Block covered) | ১৫ | |
| ৩. অন্তর্ভুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েত | ১০২ | |
| ৪. অন্তর্ভুক্ত গ্রাম | ৬৬০ | |
| ৫. অন্তর্ভুক্ত পরিবার | ৬১,১০৫ | |
| ৬. Reeler (কাঠা বা চরকী কর্মী) | ৪,২৩১ | |
| ৭. Spinner (সুতো কাটনী) | ৩,২৩৪ | |
| ৮. কাঠখাই | ১৩২৪ | |
| ৯. উৎপাদিত সঞ্চ পলু (Seed Cocoon) - সরকারী বিভাগ | ৩৭০০৮৩৯ (হাজারে) | ৩৬৮৮৯১৯ |
| ১০. উৎপাদিত কাঠাম বা চরকী পলু (মেট্রিক টন) | ১০২৫৭.৪৬ | ১০৫১৬.০০ |
| ১১. উৎপাদিত কাঁচা রেশম (মেট্রিক টন) | ১০৩৫.০০ | ১০৭৪.০০ |
| ১২. উৎপাদিত বাতিল রেশম (Silk Waste) (মেট্রিক টন) | ৩৬৪.০০ | ৩৭০.০০ |

(সূত্র — Status Report on Malda Sericulture, Deputy Director, Reeling, W.B. 2003)[১৮]

● **পাদটীকা**

১. অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, বৈদিক যুগের শিল্প, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ- ১৩৩
২. গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ, প্রাচীন শিল্প পরিচয়, পৃ-২০
৩. নগেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদিত) বাংলা বিশ্বকোষ, ষষ্ঠদশ ভাগ, পৃ-৭৫২
৪ক.. প্রাগুক্ত, পৃ-৭৫২
৪. তদেব, পৃ-৪৫২
৫. প্রাগুক্ত, ৭৫৪
৬. Hunter W.W - A Statistical Account of Bengal, Vol. VII,p-94
৭. Purchas S - His Pilgrims, X, p-181
৮. Radhakumud Mukherji, Indian Shipping,p-221
৯. Hunter,ibid, p- 95

১০. আবদুর রহিম — বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ( মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত), পৃ-৩৫৩

১১. Stuart - History of Bengal, p-199

১২. Abid Ali Khan - Memoirs of Gaur and Pandua, p-156

১৩. Carter, M.O, Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Malda, 1928-1935 ।

১৪. অগ্রগামী রেশমচাষী ও শ্রমিক সংঘের প্রথম রাজ্য সম্মেলনের পুস্তিকা, ১৯৮৯ (সুভাষ চৌধুরী প্রকাশিত), পৃ-৩০-৩১

১৫ নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত বাংলা বিশ্বকোষ, ষষ্ঠদশ ভাগ, পৃ-৭৪৫

১৬ তদেব, অগ্রগামী রেশমচাষী ও শ্রমিক সংঘেব প্রথম রাজ্য সম্মেলনের পুস্তিকা, পৃ-১১

১৭. Status Report on Malda Sericulture, Deputy Director, Reeling, West Bengal, Malda, 2003

১৮. ibid, p-10

# জীব-জন্তু

উনিশ শতকের শেষপাদেও মালদা জেলায় বন্য প্রাণীকুলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল — বাঘ, চিতাবাঘ, বনবিড়াল, গন্ধগোকুল, বেজী, ভোঁদড়, বন্য শূকর, বন্য মহিষ, বিভিন্ন শ্রেণীর হরিণ, শিয়াল, এবং কদাচিৎ হায়না ও গণ্ডার।[১] সমকালের কাঁটালের প্রায় ১৫০ বর্গ মাইলে অর্থাৎ টাঙ্গন ও পুনর্ভবার মধ্যবর্তী অঞ্চলের ঘন জঙ্গলে বন্যপ্রাণী বিশেষতঃ বাঘ, বুনো শূকর ও হরিণের অনুকূল প্রসূতিভূমি ছিল। রাজস্ব নিরীক্ষক (Revenue Surveyor) ১৮৪৮ সালে গৌড়-এলাকার অধিবাসীদের ব্যাঘ্র নিধনে অনীহা লক্ষ্য করেছিলেন। কারণ ফসলের শত্রু বুনো শূয়র ও হরিণদের দৌরাত্ম্য তারা হ্রাস করতো। তবে প্রসঙ্গক্রমে মালদা-দিনাজপুরের মধ্যবর্তী পাণ্ডুয়া এলাকায় এক দুর্দান্ত নরখাদক বাঘের সন্ধান পাওয়া যায়। এই প্রাণীটি গুলি খেয়ে মরার আগে কমপক্ষে ১১০টি মানুষ মারে।[২]

পেমবারটন উনিশ শতকের মধ্যভাগের বন্যপ্রাণীদের মধ্যে বাঘ, চিতাবাঘ, বন বিড়াল, ভোঁদড়, শজারু, খাটাশ, নানান জাতের হরিণ, চিতল হরিণ (Spotted Deer) নখহারিণী হরিণ (Hog Deer), বড় শিঙ্গা (Hog Deer), বুনো শুয়োর, সম্বর, বুনো মহিষ, নেকড়ে, গোসাপ, গন্ধগোকুল, ময়াল সাপ ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেছিলেন।[৩] শিকারীদের স্বর্গরাজ্য ছিল এক সময় এই জেলা।

কিন্তু বিশ শতকের প্রথম পাদে গণ্ডার ও অন্যান্য হরিণের সংবাদ নেই। চিতাবাঘ যাট বছর আগেও দেখা যেত কাঁটালের জঙ্গলে, এমন কি বর্তমান ইংরেজবাজার পৌরসভার অন্তর্গত ঝলঝলিয়ার বাগানগুলিতে। ছিল গৌড় এলাকায়। তবে মাঝে-মধ্যে পূর্ণিয়া থেকে আসা নীলগাইয়ের অস্তিত্ব সাত দশক আগেও ছিল।[৪] নদী ও অনেক দীঘিতে ঘড়িয়াল ও কুমীরের বাস ছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্ব থেকে বরিন্দ ও কাঁটালের জঙ্গল পরিষ্কার করে আবাদযোগ্য হওয়ায় অধুনা সাধারণ বন্যপ্রাণী যথা খাটাশ, গোসাপ, শজারু, বাঁদর, হনূমান, খরগোস, ও ইতস্ততঃ দু একটি ময়াল সাপের সাক্ষাৎ মেলে। তবে গ্রামাঞ্চলে কেউটে,গোখুরা ও আলাদ নামে বিষধর সাপ দেখা যায়।

মালদা জেলার নদ-নদী, বিল, পুকুর ও ডোবাগুলিতে আজ পূর্বের মত মাছ না পাওয়া

গেলেও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতে প্রাপ্ত অনেক মাছ যেমন এখানে মেলে, তেমনই তার নিজস্ব জেলার মাছও তেমন আছে, যেমন রায়েখ বা রায়খড়। অন্যান্য মাছের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শঙ্কর, কর্তি, খয়রা, ইলিশ, সোনা খড়কে বা সুবর্ণ খড়িকা, ফ্যাঁসা, তেলগাগরা, ফলুই, চিতল, কুচে, বাম, দাঁড়িকা এলেঙ্গা, মৌরলা, সরল পুঁটি, সোনা পুঁটি, কাঞ্চন পুঁটি, তিত পুঁটি, কাতলা, মৃগেল, বাটা, চ্যালা বাটা, নাদিন (Labeo nandina (Ham) L. Fimbriatus (Bloch), রুই, ভাঙ্গন, সিঙ্গি, মাগুর, কানী পাবদা (Collichrous bimaculatus (Bloch), পাবদা (C. Pabda - চারপ্রকার (Ham), বোয়াল, চেঙ্গা, বাচা, গারুয়া, বাতাসী, শিলং, পাঙ্গাস, আড় (M. aor (Ham. Buch)), আড় (Mystus Seenghla (Sykes), M. menoda (Ham), টেংরা তিন প্রকার — (M. Corsula (Ham) গোলসা টেংরা, M. tengra (Ham) বাজারী টেংরা, M. Vitatus (Bloch) টেংরা, রীটা, বাঘা আড়, কাঁকলে, উরল মাছ (Cypsilurus poecilopterus (Cuv), শোল, শাল, গজাল, ল্যাটা, চ্যাং – তিন প্রকার, ডুডু চ্যাং (O. Stewartiiplayfair), চ্যাং (O. gachua (Ham), বড়ো চ্যাং (O. amphibius) ল্যাটা, কৈ, খলিশা বা খলশে -- তিন প্রকার (চূণা খলশে, খলশে ও লাল খলশে), চাঁদা — দু-প্রকার (চাঁদা - Ambasses nama এবং রাঙ্গা চাঁদা (Ambasses ranga), মহাশোল, বাম -- দু প্রকার বাম M. armatus (Lacep) এবং তারা বাম (Macrognathus aculatus (Bloch), পটকা, চিংড়ি ( ছোট বা ঘুসো, গলদা, ছটকা ও চাকা) প্রভৃতি।

● পাদটীকা

১. W.W. Hunter, A Statistical Account of Malda, Vol VII, p-34

২. প্রাগুক্ত, পৃ-৩৫

৩. District Gazetteer, Malda, 1969, p-9 - 12

৪. Carter M O , Op. Cit, p-6
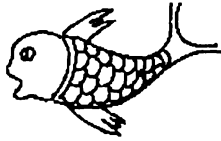
# পাখী

বাংলার সাধারণ পাখীদের মধ্যে অধিকাংশই মালদা জেলায় দেখা যায়। যেমন কাক, (পাতি কাক, দাঁড়কাক অবশ্য কম), পায়রা; বুলবুল (সিপাহী বুলবুল ও বুলবুল), খঞ্জন, ঘুঘু (ছিটে, রাম, কণ্ঠি ), দোয়েল (চাক দোয়েল), চড়াই, মাঠচড়াই, শালিখ ( গোশালিখ, ঝুঁট শালিখ, গাঙ্গ শঙ্খ শালিখ), বাবুই, ফিঙে, কাঠঠোকরা, মাছরাঙ্গা ( ছোট মাছরাঙ্গা, ফটকা), কুবো, প্যাঁচা (খুরুলে, কুটুরে, লক্ষ্মী, ভূতুম) হরিয়াল, সাতভাই বা সাতবোন (ছাতারে), হট্টিটি, তিতির (সাধারণ ও কাল তিতির) বাঁশপাতি লালমাথা, বাঁশপাতি নীলকণ্ঠ, মোহনচূড়া, বসন্ত বৌরী, টুনটুনি, শ্যামা, পাতা ফুটকি, টিয়া, তালচড়াই, কোকিল, চাতক, টিয়া, চন্দনা, ফুলটুসি, পাপিয়া, চিল (গাঙ, ঢেঁকচিল, শঙ্খচিল), কালোপিঠ কাঠঠোকরা, তারলেজা, বেনে বৌ, সোনা বৌ, হাঁড়িচাচা, মধুচুষী, তেলি মুনিয়া, শকুন, রাজশকুন ইত্যাদি এবং যেহেতু মালদায় প্রচুর জলাভূমি, বিল ও গঙ্গার চর ইত্যাদি আছে, তাই জলের পাখী হিসেবে ডাহুক, কায়েম, জলপিপি, সাহেব বাটন, পানডুবি, পানকৌড়ী, গয়ার, বক, খুন্তে বক, কোর্চে বক, গো বক, শামুকখোল, মাণিকজোড়, কাস্তেচরা, বড় গুলিন্দা, গোত্রা ইত্যাদি যেমন দেখা যায়, তেমনই শীতকালে এ রাজ্যের অতিথি হয়ে আসে অনেক প্রজাতির হাঁস।

খাল, বিলে হাঁস জাতীয় কিছু পাখী এ রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা, আবার অনেকগুলি অতিথি হয়ে খাল, বিল ও গঙ্গার চরগুলিতে প্রধানতঃ অক্টোবর মাস থেকে মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত আসে খাদ্যের অন্বেষণে। বেশ কয়েক বছর ধরে মানুষের উপদ্রবে ও আক্রমণে তথা খাদ্যাভাবে এই সব পাখীর সংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস পেয়েছে। উপরন্তু নানা শ্রেণীর পাখীদের মধ্যে এখন সবগুলির দেখা পাওয়া ভার। গঠন ও ক্রমবিবর্তনের মৌল প্রকৃতি অনুসারে পক্ষী জগৎকে ২৭টি প্রধান বর্গে (order) ভাগ করা হয়। সেই বর্গগুলি আবার কতিপয় গোষ্ঠীতে (Family) বিভিক্ত। এই গোষ্ঠী আবার গণ (Genus) এবং গণ প্রজাতি (Species)-তে বিভক্ত।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, হাণ্টার যে সব পাখী দেখেছিলেন উনিশ শতকের শেষার্ধে, কার্টার তন্মধ্যে অনেকগুলিই হয় দেখেন নি, নয় কম দেখেছেন বিশ শতকের তিন দশকের মধ্যে। যেমন আগে ময়ূর (Pea fowl) ও Goosander বা Eastern Merganser(বাংলা নাম মেলে নি) --

কালমাথা, ঘাড়, ঠোঁট ও ঠ্যাং লাল। সমকালের পাখীদের মধ্যে উল্লেখ্য বালি হাঁস (Barheaded Goose), রাজহাঁস (Greylag Goose), পিইং হাঁস (Gadwall), শরাল (Lesser Whistling Teal), বড় শরাল, (Large Whistling Teal), ভূতি হাঁস, (White eyed pochard) বালি হাঁস (Cotton Teal), লাল মুড়ি বা লাল বিগরি (Common Pochard), বড় রাঙামুড়ি (Red Crested Pochard), ছোট লাল শির (Wigeon), দিগ হাঁস বা বড় দিগর (Pintail), তুলসী বিগরি , পাতারি হাঁস (Common Teal), পান্তামুখী বা খুন্তে হাঁস(Shóveller), গিরিয়া হাঁস (Garganey) বা Blue Winged Teal), নাকটা (Comb Duck), বামুনিয়া হাঁস (Tufted Pochard), নানা ধরনের বক, কাদাখোঁচা (Snife – Fantail Snife, Pintail Snife), তিতির (Grey Patridge), কালো তিতির (Black Patridge), চখা-চখী (Ruddy Shelduck বা Brahminy Duck), সোনাবাটান (Golden Plover) ইত্যাদি। বিভিন্ন শ্রেণীর দীর্ঘজঙ্ঘ বর্গের (Order Ciconiiformes) বক বংশের (Ardeidae) গো বক, কর্চে বক, কাঁক এবং দীর্ঘজঙ্ঘ বংশের (Cicohiidae) শামুকখোল, মাণিকজোড়, গরুড় পাখী বা হাড়গিলে প্রভৃতি, শরাটি বংশের (Threskiornithidae) কাস্তেচরা, খুন্তে বক, জলকাম বংশের (Phalacrocoracidae) পানকৌড়ী বা বজ্জুল বংশের (Podicipedidae) পানডুবি; ক্রৌঞ্চবর্গ-এর (Order Gruiformes) অম্বকুক্কুট বংশের (Rallidae) ডাহুক বা ডাক, কামপাখি (কায়েম); সৈকতবর্গের (Order Charadriiformes) টিট্টিভ বংশের (Charadriidae) হাট্টিমা (টিট্টিভ), সোনালী বাটান; পারাবত বর্গের (Order Columbiformes), কৃকল বংশের (Pteroclididae) ভাট তিতির, কপোত বংশের (Pteroclididae) গোলা পায়রা, তিলেঘুঘু (ছিটে ঘুঘু), রামঘুঘু, ছোট ঘুঘু, কণ্ঠী ঘুঘু, হরিয়াল; পরভৃত বর্গের (Order Cuculiformes) পরভৃত বংশের বৌ কথা কও, কুকো, চাতক, পাপিয়া ( চোখ গেল), কোকিল; কাষ্ঠকুট্ট বর্গের (Order Piciformes) কাষ্ঠকুট্ট বংশের কাঠঠোকরা, ছোট কাঠঠোকরা, পিপ্পল বংশের (Cafitonıdae) বসন্তবৌরী; নীলকণ্ঠ বর্গের (Order Coraciiformes) মৎস্যরঙ্গ বংশের (Alcedimidae) মাছরাঙা, ছোট মাছরাঙা; বাঁশপাতি, লালমাথা বাঁশপাতি; প্রিয়াত্মজ বংশের (Bucerotidae) ধনেশ, পুত্রপ্রিয় বংশের (Upupidae) মোহনচূড়া (হুপো); অপাদবর্গের (Order Apodiformes) অপাদ বংশের তালচড়াই এবং কর্ষকবর্গের (Order Galliformes) বিষ্কির বংশের (Phasianidae) ধূসর তিতির, কালো তিতির, শুষ্কবর্গের (Psittacifadal) শুক বংশের (Psittaciormes) টিয়া, চন্দনা; উলুক বর্গের (Order Strigiformes), উলুক বংশের (strigidae), ভূতুম পেঁচা, কুটুরে পেঁচা, লক্ষ্মী পেঁচা ইত্যাদি এ জেলায় দেখা যায়।

প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয় যে মালদা জেলায় ঝোপ-ঝাড়, বন বাদাড় বাদে যে সব বিলে আজও পাখী (স্থানীয় ও পরিযায়ী — পরিযায়ী অবশ্য ইদানীং কালে ক্রম হ্রাসমান) দেখা যায় তাদের মধ্যে উল্লেখ্য হল — মালদা থানার মাধাইপুরের বিল, মুচিয়ার নিকটে পুতুল বিল, যাত্রাডাঙ্গার নীচে বড় বিল, গাজোল থানায় আহোড়া বিল, লোহাচাঁড়া বিল, রানীগঞ্জ বিল, ইংরেজবাজার থানার কৃষ্ণপল্লীর বিল, মালঞ্চপল্লীর নীচে বিল, সামদহ বিল, লক্ষ্মীপুরের বিল, কালিয়াচক থানার গোলাপগঞ্জ ঢাব, কালিয়াচক (গঙ্গা), ফারাক্কার গঙ্গার চর, পঞ্চানন্দপুরের গঙ্গার চর, ভূতনী দিয়ারা চর, হবিবপুর থানার আতলা বিল, দাঁড়িডুবা বিল, বাকলা বিল, ভীখন বিল, সাতাসিং

বিল, দামোস বিল, মশাইচক বিল, চোরোল বিল ও হবিবপুর-গাজোল অঞ্চলের জলকর বিথান।

বর্তমানে প্রাপ্ত পাখীদের মধ্যে বিল ও নদীনালায় বিচরণকারী কিছু পাখি চেনার জন্য নাতিদীর্ঘ বিবরণ দেওয়া হল ঃ-

### বালিহাঁস (Cotton Teal)

মনে হয় এরা পরিযায়ী অর্থাৎ শীতের অতিথি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয় — এরা বুনো হাঁস। হিন্দী নাম - গিরজা, গিররি, গিরিয়া, বাংলাদেশে - ভুল্লিয়া হাঁস। বুনো হাঁসের মধ্যে সবচেয়ে ছোট, সাধারণ হাঁসের মত ঠোঁট, কিন্তু চ্যাপটা নয় - সামান্য বাঁকা, পালকে সাদা রঙই বেশী। পুরুষ হাঁসের পিঠের উপর চকচকে কালো রঙ, মাথা, গলা আর শরীরের নীচের অংশ সাদা, গলার চতুর্দিকে কলারের মত একটা কালো দাগ, ডানাতে সাদা ছোপ, স্ত্রী হাঁসের রঙ ফিকে বাদামী, তাদের গলা কালো দাগহীন, ডানাও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নয়। প্রজননকালে পুরুষ বালিহাঁসের মাথা ও পিঠের রঙ কালচে পাটকিলে হয় এবং তার উপরে চকচকে বেগুনী এবং সবুজ রঙের আভা দেখা যায়, মুখ, গলা ও নীচের পালক সাদা। গলার নীচে কালো কলার। অবশ্য শীতে এটি দেখা যায় না। স্ত্রী বালিহাঁসের ডানার সাদা টানগুলো খুব স্পষ্ট নয়। জলজ উদ্ভিদ, শস্যকণা, জলজ পোকামাকড় এদের খাদ্য। সাধারণতঃ ৫ থেকে ১৫ টি পাখি একসঙ্গে চলাফেরা করে, তবে কখনো কখনো ৪০/৫০টিও থাকে। জলের মধ্যে বা ধারে কোন গাছের ফোকরে সাধারণতঃ ২ থেকে ১০ মিটার উচ্চতায় এরা বাসা বাঁধে এবং ৬টা থেকে ১২টা পর্যন্ত সাদা মুক্তোর ন্যায় ডিম পাড়ে। স্ত্রী পাখী একাই ডিমে তা দেয়। ১৫/১৬ দিন পরে ডিম ফুটে বাচ্চা হয়। বাচ্চাগুলো অন্যের সাহায্য ছাড়াই মাটিতে বা জলে নেমে পড়ে।

### লাল শির বা রাঙামুড়ি বা লালমুড়ি (Common Pochard)

হিন্দীতে লাল শির। এই পরিযায়ী পাখি, ছাইরঙা। এই হাঁসেদের বুক এবং লেজের ডগা কালো, মাথার রঙ লালচে বাদামী। স্ত্রী পাখীর মাথা, গলা, পিঠের উপরের অংশ এবং বুক লালচে। পিঠের অন্য অংশ ধূসরাভ সাদা এবং তার উপর আবছা আঁকাবাঁকা কালো লাইন, বুকের তলায় ধূসরাভ পাটকিলে রঙ এবং অন্য অংশ লালচে-হলুদ, ঠোঁটের গোড়া ও গলা হলুদাভ, পা এবং আঙ্গুল স্লেট- নীল।

এরা ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ থেকে পশ্চিম সাইবেরিয়া পর্যন্ত স্থান থেকে শীতকালে এদেশে পরিযায়ী হয়। বিশাল বিশাল ঝাঁকে এরা চলাফেরা করে। জলাশয়ের গভীর অংশ থেকে জলের তলার জলজ গাছপালার শিষ, কুঁড়ি, বীজ, জলজ পোকামাকড়, ব্যাঙাচি ও ছোটমাছও খায়। এরা প্রধানত নিশাচর।

### দিগ হাঁস, বড় দিগর (Pintail)

শীতের অতিথি হয়ে এরা জলা, বিল ও নদীর ধারে সাধারণতঃ ১৫/২০টির ঝাঁকে

থাকে। পুরুষের উপরের পালক ধূসর, মাথা, মুখ ও গলা গাঢ় খয়েরী এবং গ্রীবার পশ্চাতের রঙ কালো। তবে ঘাড়ের দু-পাশের দুটি সরু সাদা পটি নেমে বুক ও পেটের সঙ্গে মিশেছে। উপরের পালক ও শরীরের দু'পাশ মুখ্যত ধূসর এবং খুব পাতলা কালো কালো টান আছে। পুচ্ছের উপরের দিক ও পৃষ্ঠের একেবারে শেষের পালকের মাঝে কৃষ্ণবর্ণ, ধার রূপালি-ধূসর। ঠোঁট সীসে-ধূসর। স্ত্রী দিগহাঁস বাদামী চিত্র-বিচিত্র ফিকে পীত লম্বাটে এবং লেজ পর্যন্ত সরু, কিন্তু সরু পটি নেই। কাস্পিয়ান সাগর অঞ্চল ও সাইবেরিয়া থেকে প্রায় ৫ হাজার কিমি পথ পাড়ি দিয়ে এরা আসে। সাধারণতঃ সন্ধ্যার পর থেকে ভোর পর্যন্ত অগভীর বিল, ঝিল, ধান ক্ষেতে ঘাস, জলজ গাছের ডগা, বীজ, ধান, জলজ পোকা, শূক ইত্যাদি খেয়ে সূর্য ওঠার আগেই অন্য স্থানে উড়ে যায়।

**নীলশির (Mallard)**

হিন্দীতেও নীলশির বা নীলরাগী। সমস্ত ইউরোপ এবং এশিয়ার উত্তর ভূখণ্ড থেকে ভূমধ্যসাগরের তীরের দেশগুলিতে এদের বাসস্থান। ভারতের নীলশির পরিযায়ী হয়ে আসে প্রধানত সাইবেরিয়া অঞ্চল থেকে ৮০ কিমি বেগে। এ প্রজাতির হাঁসের মাথা, গলা ও ঘাড় উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের। গলার কলার সাদা, বেশীর ভাগ শরীরের অংশ ধূসর রঙের এবং তার উপর পেন্সিল টানা আঁকাবাঁকা রেখা, বুক বাদামী। বস্তি প্রদেশ, লেজের আচ্ছাদক ও মাঝের দুটি কালো পালক উপর-দিক করা। খাদ্য অন্যান্য হাঁসের মতই। সাধারণতঃ ১০/১২ আবার কখনও ৪০/৫০ টার দল এদের দেখা যায়। এরাও নিশাচর। জলের উপরিভাগ থেকেই খাদ্য খায় বটে, তবে আহত অবস্থায় ধরা পড়ার ভয়ে ডুব সাঁতারে দক্ষ। আবার ভয় পেলে জল বা মাটি থেকেই খাড়াভাবে দ্রুত উড়তে সক্ষম। এরা কাশ্মীরে সবুজ রঙের ডিম পাড়ে একসঙ্গে ৬টা থেকে ১০টা। ডিম তা দেয় স্ত্রী নীলশির, ডিম থেকে বাচ্চা হয় ২৬ দিনে।

**মরাল বা শরাল (Lesser Whistling Teal)**

হিন্দীতে সিল্লি, শিলকাহী। আকারে ছোট হাঁস, গায়ের রঙ বাদামী, তামাটে বাদামী, ঠোঁট ছোট ও কালো। ওড়ার সময় এদের মুখে সুতীক্ষ্ণ শিসের মত ডাক শোনা যায় (ঘুঙুরের শব্দের মত) যেটি এদের বৈশিষ্ট্য। স্থানীয় ও পরিযায়ী। জলজ উদ্ভিদে পূর্ণ পুকুর, দীঘি, বিল অথবা জলের ধারের ধানক্ষেতে এরা ১০/১২টা দলে চলাফেরা করে। জলের পাশে গাছ থাকলে এদের বিশ্রামের সুবিধা হয়। এই বৃক্ষপ্রীতির জন্য এদের Tree Duck বা গেছো হাঁসও বলে। খাবার খায় রাত্রে, ডুব সাঁতারে সুদক্ষ। জুন থেকে অক্টোবরের মধ্যে এরা প্রাচীন বৃক্ষের খোঁদলে ঘাস ও কাঠিকুঠি দিয়ে বা কাক-চিল-বকের পরিত্যক্ত বাসায় অথবা জলের ধারে নল-খাগড়ার বনে মাটিতে জল থেকে বহুদূরে ৭টা থেকে ১২টা হাতির দাঁতের মত সাদা ডিম পাড়ে। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই ডিমে তা দেয়।

এই ধরণের আরও একটু বড় ধরণের হাঁস Large Whistling বা বড় শরাল। এদের পুচ্ছের শেষ প্রান্তের উপরের দিক বাদামী না হয়ে সাদা রঙের হয়। এই সব হাঁসেদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট আকারের বালিহাঁস বা Cotton Teal. (আগেই পরিচিতি লিপিবদ্ধ)

### তুলসী বিগরী (Common Teal)

হিন্দী নাম কের্‌রা। এই শ্রেণীর পুরুষ পাখীর রঙ পেন্সিল-ধূসর, মাথা বাদামী রঙের এবং চওড়া ধাতব সবুজ পটি চোখ থেকে ঘাড় পর্যন্ত দেখা যায়। উপরে বর্ডার এবং নীচের অংশে সাদা দাগ, কাল-সবুজ এবং হালকা পীতাভ, ডানা ও পুচ্ছ ওড়ার সময় স্পষ্ট হয়। স্ত্রী পাখী গভীর ও হালকা চিত্র-বিচিত্র, তলপেট হালকা রঙের, পক্ষ ও পুচ্ছ ঘন কাল,ও সবুজ রঙের। ঝিল, বিল ও ডোবা ইত্যাদিতে একসঙ্গে দল বেঁধে চলাফেরা করে। শীতে ইউরোপের আইসল্যাণ্ড, চীন, মাঞ্চুরিয়া ও জাপান থেকে নানা দেশে পরিযায়ী হয়। এরা প্রায় শাকাহারী। জলজ আগাছার বীজ, জলজ গাছের শীষ, কচিপাতা, ধান, স্ফীত কন্দ ইত্যাদি এদের খাদ্য। পুরুষ পাখী মৃদুস্বরে ক্রিট্ ক্রিট্ শব্দ করে, কিন্তু স্ত্রী-পাখী ভয় পেলে 'কোয়াক' শব্দ করে। শীত-শেষে দেশে ফিরে জলার ধারে নল-খাগড়া ইত্যাদির মধ্যে ৭টা থেকে ১০টা হলুদ রঙা ডিম পাড়ে।

### বাদি হাঁস বা বড়ি হাঁস (Barheaded Goose)

হিন্দীতে হান্‌স, রাজহান্‌স, কারেরী হান্‌স, বিরওয়া সাওয়ান, সংস্কৃতে কলহংস। পাতিহাঁসের চেয়ে বড়, কালো-পাটকিলে এবং সাদায় মেশানো রাজহাঁস। লম্বায় প্রায় ৭৫ সেমি। মাথা, মুখ, গলা, চিবুক সাদা ও ধূসর পাটকিলে রঙ; গলার দুদিক থেকে সাদা টান নেমেছে। একটি কাল টান এক চোখের পাশ দিয়ে অন্য চোখের পাশে, অন্য একটি প্রথম কালো টানটির নীচে ঘাড়ের উপর দিয়ে ঘুরে এসেছে। চঞ্চু ও জালপাদ হলুদ রঙের, নখ কালো। স্ত্রী পুরুষ একই রকমের। এরাও শীতের অতিথি। লাদাখ ও তিব্বতে ডিম পাড়ে এপ্রিল থেকে জুনে ৩/৪ টি হাতির দাঁতের মত শুভ্র বর্ণের।

### নাকটা (Comb Duck)

হিন্দীতেও নাকটা। পাতিহাঁসের চেয়ে একটু বড়। এদের পুরুষের উপরাংশে কালোর উপরে নীলচে সবুজ, পেটের নীচে সাদা, মাথা ও গলায় সাদা রঙ, উপরে কালো ছিট। প্রজনন ঋতুতে পুরুষের চঞ্চুর গোড়ায় স্ফীত মাংসপিণ্ড আরও বৃদ্ধি পায়। স্ত্রী-হাঁস ছোট আকৃতির এবং তাদের মাংসপিণ্ড থাকে না। ওড়ে দ্রুতগতিতে। ৪ থেকে ১২ টা দলবদ্ধভাবে থাকে। নানা শস্য, জলজ বীজ, ধান অল্প জলে গলা ডুবিয়ে খায়। বিশেষ ডাকে না, তবে প্রজননকালে একটা তীক্ষ্ণ সুরে ডাক দেয়। জলের মধ্যে বা ধারে-কাছে গাছের গর্তে ঘাস-পালক, শুকনো পাতা ইত্যাদি দিয়ে বাসা তৈরী করে ৮টা থেকে ১২টা হালকা ঘিয়ে রঙের চকচকে ডিম পাড়ে।

### চখা (Ruddy Shel duck or Brahminy Duck)

হিন্দীতে চখা, চখী, লাল, সুরখার। অক্টোবর-নভেম্বর নাগাদ শীতকালে তিব্বতের লাদাখ থেকে এদেশে পরিযায়ী হয়। পুরুষ চখার কমলা পাটকিলে দেহ, মাথা ও গলা হালকা এবং কখনো কখনো গলার নীচে একটা কলার থাকে। এদের পাখা সাদা, কালো ও উজ্জ্বল সবুজ, লেজ কালো। স্ত্রী চখী একই বটে, কিন্তু তার গলায় ঐ দাগটি নেই। রঙ ফ্যাকাশে, গলা ও মাথা প্রায় সাদা। অন্যান্য হাঁসদের মত এরা বিশেষ সংঘবদ্ধ নয়। জোড়ায় না ঘুরলেও ২০/৩০-এর দল খুব কম দেখা যায়। জলের পাড়েই এদের বেশী চলাফেরা।

সানুনাসিক অ্যাং অ্যাং শব্দ করে এবং খুবই সতর্ক পাখি। তিব্বতে জল থেকে উঁচুতে পাহাড়ের গর্তে বা বাড়ীর গর্তে পালক দিয়ে ৬-১০ টা মুক্তোর মত চকচকে ডিম পাড়ে চখী এবং ২৮-৩০ দিনে স্ত্রী-পাখী তা দিয়ে বাচ্চা ফোটায়।

### কায়েম বা কামপাখী (Purple Moorhen)

হিন্দীতে কায়েম, কাইম, কলিম। জলা এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা। আকারে পোষা মুরগী-সদৃশ। গায়ের রঙ বেগুনী ও নীল মেশানো, পা লম্বা, লাল ও সরু পায়ের আঙ্গুলগুলোও লম্বা, কিন্তু ঠোঁট লম্বা নয়। ঠোঁট থেকে কপাল পর্যন্ত ঘোর লাল। লাল রঙের একটি ঢালের মত কপাল। বড় ঝাঁকে এরা চলাফেরা করে। প্রজনন ঋতুতে ডাকাডাকি বেড়ে যায়, পুরুষের স্ত্রীর মনোরঞ্জনের ভঙ্গি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। খাবার সময় নীচু স্বরে 'চাক্ চাক্' শব্দ করে। মেঘলা দিনে কর্কশ শব্দে অবিশ্রান্ত ডাকে। ধানগাছ এবং জলজ উদ্ভিদ এদের

খাদ্য। তবে ধান খাওয়া অপেক্ষা পা দিয়ে নষ্ট করে বেশী। জলের উপর ভাসমান জলজ উদ্ভিদের ডালপালা ও ধানের পাতা ইত্যাদি দিয়ে পুরু করে বাসা তৈরী করে ৩ থেকে ৭টি ফিকে হলুদ বা লালচে হলুদ রঙের ডিম পাড়ে। ডিমগুলিতে লালচে বাদামী ছিটছিট দেখা যায়।
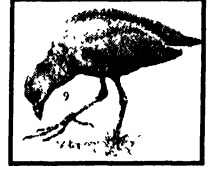
### চা, চাহা (Snife)

বাংলায় কাদাখোঁচা, হিন্দীতে চাহা। এই চাহা পাখীদের অনেকগুলি প্রজাতি আছে। যেমন Common Snife, বা Fantail Snife, Wood Snife, Pintail Snife, Painted Snife, Great Snife, Jack Snife। কিন্তু বাংলা ভাষায় সবগুলিই কাদাখোঁচা। Common Snife বা Fantail Snife লম্বায় ২৭ সেমির মত চঞ্চু লম্বা ৫ সেমি। চঞ্চুর গোড়ার দিকের অর্ধেকটার রঙ হলদেটে শিঙে, বাকীটা শিঙে-পাটকিলে এবং চঞ্চুর আগা একটু বাঁকা। গায়ের উপরের অংশ গাঢ় বাদামী রঙের উপরে কালো, পিঙ্গল ও পীতাভ আঁকা বাঁকা ডোরা টানা

এবং শরীরের নিম্নাংশ সাদা। আঙ্গুলগুলি লম্বা। জলকাদায় কখনো একাকী, কখনো বা দলে ঘোরাফেরা করে। কাদামাটির ভিতর থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। কাশ্মীর অঞ্চল সহ লাদাখ, গাড়োয়াল থেকে শীতে এদেশে পরিযায়ী হয় বলে এদের কাশ্মীরী চাহাও বলে।

এদের আর একটি Pintail, পিনের মত সূচ্যগ্র পুচ্ছ। উপরের Fantail থেকে পৃথক করা কঠিন। উড়তে উড়তে ডাকে এবং এঁকে বেঁকে চলে। প্রত্যুষে, সন্ধ্যায় ও রাতেই এরা বেশী বিচরণ করে। এরা পরিযায়ী হয় এদেশে পূর্ব সাইবেরিয়া, তিব্বত ইত্যাদি অঞ্চল থেকে।

Great Snife বা বড় কাদখোঁচা বেশ হৃষ্টপুষ্ট, রঙ গাঢ়, ওড়াটি ধীরে, লম্বায় ২৮ সেমি এবং Jack Snife আকারে বেশ ছোট। এরা ওড়ে অনেক আস্তে। তাই শিকারীরা সুবিধা পায়। উত্তর ইউরোপ ও এশিয়ার উত্তরাংশ থেকে ভারত সহ অনেক দেশে শীতে পরিযায়ী হয়।

### ধূসর বা খয়েরি তিতির (Grey Patridge)

হিন্দী নাম সফেদ তিতর। এরা দেশী বাসিন্দা। গোলগাল, লম্বায় ৩৩ সেমি এবং লেজটি ছোট। রঙ ধূসর, কালো ও হলুদের তরঙ্গায়িত ডোরা, গলা লালচে, গলায় ভঙ্গ ঢেউ-খেলানো কাল দাগ, পুচ্ছটি বাদামী রঙের, পায়ে একটা তীক্ষ্ণ কাঁটার মত উদ্গত অংশ। উচ্চৈস্বরে সুরেলা ডাক দেয়। ঘাস ও কাঁটা ঝোপ যুক্ত খোলা মাঠে প্রজনন ঋতুতেই জোড়ায় জোড়ায় এবং অন্য সময় চার-ছ'টাকে একসঙ্গে দেখা যায়। নানাবিধ বীজ, কীটপতঙ্গ এবং গোবরের মধ্যে জাত পোকা, ছোট ফল বিশেষ প্রিয় খাদ্য। ভীত হলে একসঙ্গে ছুটে গিয়ে ঘনপাতার মধ্যে লুকোয়। বিশেষ ওড়ে না, তবে বিপদাপন্ন হয়ে উড়লেও বেশ কিছুটা উড়ে আবার মাটিতে নামে। বাচ্চা তিতির পোষ মানে। কোথাও কোথাও পোষা তিতিরের লড়াই -অনুষ্ঠান উৎসাহ-ব্যঞ্জক। অনাবাদী ঘাসের জমিতে, কাঁটা-ঝোপে মাটিতেই ঘাসের মোটা গদী তৈরী করে ৪ থেকে ৮টা খয়েরী আভাযুক্ত ঘিয়ে রঙের ডিম পাড়ে। ডিমে স্ত্রী পাখি তা দেয় এবং ১৮/১৯ দিনে বাচ্চা ফোটে। বাচ্চাদের স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই দেখাশোনা করে।

### কাল তিতির (Black Patridge)

হিন্দী নাম কালা তিতর। লম্বা ৩৪ সেমি। প্রধানত কালো রঙের, শরীরের উপরের অংশে সাদা ও হলুদ-লালচে খোলাকাটা — যেন মোজাইক (Mosaic) করা, সঙ্গে সাদা ছিট। পুচ্ছ নাতিদীর্ঘ, গোলগাল চেহারার। পুরুষ পাখীর মুখের দুপাশে দুটি উজ্জ্বল সাদা দাগ এবং গলায় বাদামী রঙের কলারের দাগ। স্ত্রী পাখীদের রঙ একটু হালকা ও তার উপরে সাদা-কাল ছিট আছে। ঘাড়ের নিকট ও লেজের তলা বাদামী, কলারে বাদামী ভাব নেই। কেবল বৈচিত্র্যে ৪টি ভাগ আছে। — ১. খয়েরি, ২. কাল, ৩. চিত্র-বিচিত্র (Painted) ও ৪. বিলুয়া (Swamp)। আসামে Swamp (কৈরা) পাখীর লড়াইয়ে ব্যবহৃত।

### হাড়গিলা বা গরুড় (Adjutant Stork)

হিন্দীতে হাড়গিলা গরুড়, পেড়া ডাউক, ঢেঙ্ক — শকুনজাতীয় স্থানীয় পাখী। গায়ের রঙ ফ্যাকাশে, কালো, ধূসর এবং ময়লাটে সাদায় মেশানো, পালকহীন, গলা লালচে, মাথা চতুষ্কোণী কীলক আকারের, সবচেয়ে বিরাট ঠোঁট। এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে — এদের বুকের কাছে একটি পালকহীন চামড়ার প্রায় ৩০ সেমি লম্বা, ঝুলন্ত থলি থাকে। ঐ থলির কার্যকারিতা সম্পর্কে

জানা যায় নি। আহারের সন্ধানে ভারিক্কীচালে চলে বলেই ইংরেজীতে এর নাম Adjutant Stork অর্থাৎ 'সেনাপতির সহকারী'। বিভিন্ন বিলে, ভূতনীর চরে মাঝে মধ্যে এদের সাক্ষাৎ মেলে। এরা একসঙ্গে বিশেষ ঘোরা না। জ্যান্ত বা মরা মাছ, ব্যাঙ, সরীসৃপ, ছোট-বড় পতঙ্গ, এমন কি বিষাক্ত সাপ পেলেও মুহূর্তে মেরে খেয়ে নেয়। উড়তে এরা স্বচ্ছন্দ নয়। অত্যন্ত দ্রুত ডানা ঝাপটিয়ে মাটির উপর কিছুটা দৌড়ে তারপর আকাশে ওড়ে। সাধারণতঃ অক্টোবর থেকে জানুয়ারীর মধ্যে উঁচুগাছের উপর বা পাহাড়ের খাঁজে ডালপালা দিয়ে বিশাল বাসা তৈরী করে ৩/৪ টে সাদা ময়লাটে ডিম পাড়ে।

### কালী হাঁস বা স্থানীয় ভাষায় 'কাজলা' (Scaup Duck)

গঙ্গার চরে বিশেষতঃ ভূতনী এলাকায় দেখা যায়। লম্বায় ৪৩ সেমি। প্রজননকালে পুরুষ হাঁসের মাথা, ঘাড়, বুক, পুচ্ছ এবং তলপেটের শেষে কুচকুচে কালোর উপর বেগুনী আভা দেখা যায়। ডানার ধারে আয়নার মতো চৌকো জায়গায় দাগ, পা ও আঙ্গুল ধূসরাভ-নীল, ঠোঁট ম্যাড়মেড়ে স্লেট-ধূসর। স্ত্রী পাখীর উপরের অংশ গাঢ় বাদামী, নিম্নাংশ পাটকিলে সাদা, ঠোঁটের গোড়ায় কপালের নীচে সাদা রঙের পটি। এরা উত্তর ইউরোপ ও এশিয়ার উত্তরাংশ থেকে পরিযায়ী হয়ে এদেশে আসে। এদের বাসা বাঁধার ব্যাপারে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে বামুনিয়া হাঁসের মতই এদের আচরণ। হালকা জলপাই রঙের ডিম ৭টা থেকে ১২টা পাড়ে এরা।

### বামুনিয়া হাঁস (Tufted Pochard)

অসমীয়া ভাষায়ও বামুনিয়া হাঁস। হিন্দীতে ডুবারু, আবলক, রাওয়ারা। এই হাঁসগুলি উপরের কালী হাঁসের মত, তবে পাশ থেকে দেখলে মাথায় একটা ঝুঁটি দেখা যায়। স্ত্রী হাঁসের এই ঝুঁটি নেই। ওড়ার সময় উভয়ের পাখার ধারে সাদার অংশ স্পষ্ট হয়। শীতে উত্তর-ইউরোপ এবং মধ্য এশিয়া থেকে পরিযায়ী হয়। এরা দলে দলে থাকে। গভীর জলে ডুব দিয়ে এমন কি বহুক্ষণ ডুবে থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। জলীয় উদ্ভিদ, কীট-পতঙ্গ, গুগলী ইত্যাদি এদের খাদ্য।

● **পাদটীকা**


১. Hunter W. W. — A Statistical Account of Bengal, Vol. VII, P 34-35

২. Salim Ali — The Book of Indian Birds, 1996

৩. অজয় হোম — চেনা-অচেনা পাখী, ১৯৯৫

৪. সালিম আলি ও লাইক ফতেহ্ আলি — সাধারণ পাখী, ১৯৭৯

৫. প্রণবেশ সান্যাল ও বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরী — পশ্চিম বাংলার পাখী, ১৯৯৭

৬. ব্যক্তি ঋণ — শঙ্কর রায়, সিঙ্গাবাদ; ইমাজ-উদ-দীন আহ্মেদ, বাসিলাদহ; উমাচরণ মণ্ডল, মানিকচক।

## জনসংখ্যা

ইংরেজ আমলে আমাদের দেশে সরকারীভাবে লোকগণনার কাজ সুরু হয় ১৮৭২ সালে। তখন অবিভক্ত রাজসাহী বিভাগের অন্তর্গত মালদা জেলার লোকসংখ্যা ছিল ৬,৭৬,৪২৬।[১] কিন্তু ১৮৮১ সালের জনগণনায় এ জেলা ভাগলপুর বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য হয়ে তার লোকসংখ্যা হয় ৭,১০৪৪৮, এবং তার আয়তন ছিল ১৮৯১ বর্গ মাইল।[২] ১৯০১ সাল থেকে জনগণনায় বাংলা বিভাগ পর্যন্ত জেলার আয়তন যা ছিল, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পর তা অনেকাংশে কর্তৃত হয় অর্থাৎ আয়তন অনেক কমে গেলেও বিশেষতঃ নূতন পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের দ্বারায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। নীচের সারণীতে অবিভক্ত ও বিভক্ত মালদার জনসংখ্যা এমনই ঃ

| সাল | জনসংখ্যা |
|---|---|
| ১৯০১ | ৬,০৩,৬৪৯ |
| ১৯১১ | ৬,৯৮,৫৪৭ |
| ১৯২১ | ৬,৮৬,১৭৪ |
| ১৯৩১ | ৭,২০,৪৪০ |
| ১৯৪১ | ৮,৪৪,৩১৫ |
| ১৯৫১ | ৯,৩৭,৫৮০ |
| ১৯৬১ | ১২,২১,৯২৩ |
| ১৯৭১ | ১৬,১২,৬৫৭ |
| ১৯৮১ | ২০,৩১,৮৭১ |
| ১৯৯১ | ২৬,৩৭,০৩২ |
| ২০০১ | ৩২,৯০,১৬০ |

বিশ শতকের আগে মালদার জনসংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে কম ছিল। কিন্তু ১৯০১-১১ এবং ১৯১১-২১-এ দশকওয়াড়ি পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য জেলার অনুপাতে বেশী ছিল। যেমন বিশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে যেখানে পশ্চিমবঙ্গে সামগ্রিক লোকসংখ্যা বৃদ্ধি শতকরা ৬.২৫ হয়েছে, সেখানে মালদার এক দশকে শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু পরবর্তী চার দশক অর্থাৎ ১৯২১ - ৬১ পর্যন্ত যেখানে পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যা

বৃদ্ধির হার শতকরা ১০০ ভাগ, সেখানে মালদায় ১৯২১ সালের গণনায় লোকসংখ্যা শতকরা ৭৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯১৮-১৯-এ ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী আকারে দেখা দিয়েছিল এবং ১৮৭২-৮১ সালে ম্যালেরিয়ায় বহু মানুষের মৃত্যুও লোকসংখ্যা হ্রাস করে। ১৮৭৬ সালের পর থেকে বরিন্দ এলাকায় সাঁওতালদের আগমনে এবং ১৮৮১-৯২-এ রতুয়া ও মানিকচক থানাগুলিতে মুর্শিদাবাদের ফারাক্কা, শামসেরগঞ্জ এবং সুতী থানা এলাকা থেকে শেরশাবাদিয়া মুসলিমদের আগমনে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে কাটিহার-গোদাগরি রেলপথ খোলায় জনবিরল এলাকাগুলিও ঘন জনবসতিপূর্ণ হতে সুরু করে। বরিন্দে চাষ আবাদের জন্য যেমন সাঁওতালদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তেমনই দিয়ারা অঞ্চলে আসে শেরশাবাদিয়ারা। ১৯১১ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে মহামারীরূপে ম্যালেরিয়া ও ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে লোকসংখ্যা হ্রাস পায়। ১৯২১-৩১-এ কালিয়াচক অঞ্চলে রেশম শিল্পের ক্ষতি ও লাক্ষা চাষের অবনতিতে জনসংখ্যা হ্রাসের সম্ভাবনা দেখা দিলেও গঙ্গার অপর পারে চর এলাকায় মুর্শিদাবাদ থেকে মানুষের অভিবাসন (immigration) লক্ষ্য করা যায়। তবে ১৯২৫-২৬ সালে বরিন্দ এলাকায় শস্য উৎপাদন হ্রাসে এ এলাকায় অভিবাসনে ঝোঁক দেখা যায় না। ১৯৩১-৪১ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেখা যায়, তবে ১৯৪৩ (বাংলার ১৩৫০) সালে যা বাংলায় 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' বলে পরিচিত, সেই মহামারীতে লোকসংখ্যা হ্রাস পেলেও হবিবপুর ও মানিকচক থানায় লোকসংখ্যার আধিক্য দেখা যায়। কিন্তু ১৯৪৭ সালে বাংলা দ্বিধাবিভক্ত হলে তদানীন্তন কালের পূর্ব পাকিস্তান থেকে দলে দলে উদ্বাস্তুরা এ জেলায় আসে এবং তাতে ১৯৫১-৬১ সালের মধ্যে ইংরেজবাজার ও মালদা থানার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।[৩] তারপর থেকে জনসংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান, ১৯৮১-১৯৯১ ও ১৯৯১-২০০১-এ রেকর্ড সংখ্যক জনবৃদ্ধি হয়েছে।
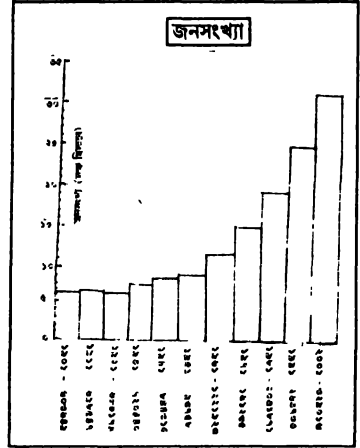
## ● পাদটীকা

১. Beverley H, Report on the Census of Bengal, 1872, p12

২. Bourdillon J. A., Report on the Census of Bengal, 1881, p38(B)

৩. B. Roy- Census 1961, West Bengal, District Census Handbook, Malda, pxiv - xvi

# জনজাতি

ক. নৃতত্ত্বের দিক থেকে প্রত্যেকটি জনজাতির রূপাকৃতিতে থাকে তার মাথার চুলের বৈশিষ্ট্য ও রঙ, গায়ের রঙ, চোখের রঙ ও বৈশিষ্ট্য, দেহের দৈর্ঘ্য, মাথার আকার, মুখের গড়ন এবং নাকের আকার।[১] তা ছাড়া দেহের রক্তের শ্রেণীও বিবেচ্য হয়। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে পণ্ডিতেরা এ পর্যন্ত বিভিন্ন মানদণ্ডে ভারতীয় তথা বাঙালীর জনতত্ত্ব সম্পর্কে যে গবেষণা করেছেন, তাতে তাঁদের পরিমিতি একই মানদণ্ডে বিচার্য হয় নি বলেই বিভিন্ন মত বর্তমান। তবে সামগ্রিকভাবে বাংলার নৃতত্ত্ব সম্পর্কে ড. নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষায় বলা যায় যে — "... বাংলার জনসমষ্টি মোটামুটি দীর্ঘমুণ্ড, প্রশস্তনাস আদি -অস্ট্রেলিয় বা 'কোলিড', দীর্ঘমুণ্ড, দীর্ঘ ও মধ্যোন্নত নাস মিশর-এশীয় বা 'মেলানিড়্' এবং বিশেষভাবে গোলমুণ্ড উন্নতনাস অ্যালপাইন বা 'পূর্ব ব্রাকিড়্', এই তিন জনের (people) সমন্বয়ে গঠিত। নিগ্রোবটু রক্তের স্বল্প প্রভাব উপস্থিত, কিন্তু তাহা সমাজের খুব নিম্নস্তর এবং সংকীর্ণ স্থানগণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। মোঙ্গলীয় রক্তের কিছুটা প্রভাবও আছে, কিন্তু তাও উত্তর ও পূর্ব দিকের স্থানগণ্ডীর সীমা অতিক্রম করে নাই। আদি-নর্ডিক বা খাঁটি 'ইণ্ডিড়্' রক্তপ্রবাহও অনস্বীকার্য, কিন্তু সে ধারা অত্যন্ত শীর্ণ ও ক্ষীণ। মোটামুটিভাবে এটিই বাংলা ভাষা-ভাষী জন-সৌধের চেহারা, এবং এই জন-সৌধের উপরই বাঙালীর ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে। এই বিচিত্র সংকর জন লইয়াই বাংলার ও বাঙালীর ইতিহাসের সূত্রপাত।"[২]

সংক্ষেপে বলা যায় যে আদি-অস্ত্রাল (Proto-Australoid) ও ভূমধ্য-নরগোষ্ঠীর (Mediterranean) লোকেদের সংমিশ্রণেই বাংলার নৃতাত্ত্বিক বনিয়াদ গঠিত।[৩] ভারতে মুসলমান আগমনের পূর্বে বৈদিক যুগ থেকে হিন্দু-সমাজ চারটি বর্ণ ও অনেকগুলি জাতিতে বিভক্ত ছিল। ঋকবেদের পুরুষ সূক্তে চতুর্বর্ণের কথা আছে। ইন্দো-ইরানীয়দের নিকট তা পরিচিত ছিল। ইরানীয় সমাজেও চারটি ভাগ ছিল।[৩ক] উত্তর-পশ্চিম ভারতের চ্যালকোলিথিক উপনিবেশ ধ্বংসকারী আর্যগোষ্ঠী মূলত পুরোহিত, যোদ্ধা এবং উৎপাদক অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, রাজন্যবর্গ বা ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। তারা এ সব অঞ্চলের বিজিত মানুষজনকে এক পৃথক শ্রেণীতে ভাগ করে চতুর্থ বর্ণ আর্যদের দাস 'শূদ্র' বলে অভিহিত করে।

কিন্তু আর্যসমাজ থেকে বাংলার সমাজ সংগঠনে চাতুর্বর্ণের স্থান ছিল না। গুপ্ত যুগে ব্রাহ্মণদের বাংলাদেশে দলে দলে আগমন ঘটলেও এবং পালযুগের ভূমিদান সংক্রান্ত তাম্রপট্ট

লিপিসমূহে ব্রাহ্মণদের কথা থাকলেও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। কায়স্থেরা পেশাদারী শ্রেণী হিসেবেই গণ্য হত এবং তারা রাজাদের মন্ত্রী এমন কি ভিষ্‌গ হিসেবেও নিযুক্ত হতো। সম্ভবত নবম ও দশম শতক থেকেই কায়স্থেরা নিজেদের স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে গণ্য করতে সুরু করে এবং সম্ভবতঃ এ কালেই অন্যান্য জাতি সমূহেরও অভ্যুত্থান ঘটেছিল।[৪] সমাজের নিম্নকোটির অন্তর্ভুক্ত মেদ, অন্ধ্র, চণ্ডাল, যেমন অনুশাসনগুলিতে পাওয়া যায়, তেমনই চর্যাপদে ডোম,চণ্ডাল, শবর ও কাপালিকদের খবর মেলে।[৫]

তবে কিম্বদন্তী অনুসারে বল্লালসেনই কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তন করেন। সেন রাজত্বের অব্যবহিত পর্বে রাঢ়ে ব্রাহ্মণ-লেখক রচিত বৃহদ্ধর্মপুরাণ-এ শূদ্রবর্ণের নানা জাতি-উপজাতির খবর মেলে। যেমন —

১. উত্তম সঙ্কর বিভাগ ঃ করণ (সৎশূদ্র), অম্বষ্ঠ (বৈদ্য), উগ্র, মাগধ, গান্ধিক বণিক, শাংখিক, কংসকার, কুম্ভকার, তন্তুবায়, কর্মকার, গোপ, দাস (চাষী), রাজপুত্র, নাপিত, মোদক, বারজীবি, সূত (সূত্রধর), মালাকর, তাম্বুলি ও তৌলিক। (২০)

২. মধ্যম সঙ্কর ঃ তক্ষ, রজক, স্বর্ণকার,স্বর্ণবণিক, আভীর, তৈলকারক, ধীবর, শৌণ্ডিক, নট, শাবাক (শাবার), শেখর ও জালিক। (১২)

৩. অন্ত্যজ বা অধম সঙ্কর (বর্ণাশ্রম-বহিষ্কৃত) ঃ মলেগ্রহী, কুড়ব, চণ্ডাল, বরুড়, চর্মকার, ঘণ্টজীবী বা ঘট্টজীবী, ডোলাবাহী, মল্ল ও তক্ষ। (৯)

এ গুলি ব্যতীত আরও কতিপয় অবাঙালী ও বৈদেশিক ম্লেচ্ছ-কৌমের নাম আছে। সেগুলি দেবল বা শাকদ্বীপ ব্রাহ্মণ, গণক-গ্রহবিপ্র, বাদক, পুলিন্দ, পুক্‌কশ, খশ, যবন, সুহ্ম, কম্বোজ, শবর, খর ইত্যাদি।[৬] তবে তালিকা থেকে বোঝা যায় যে সমকালে জাতিসমূহের এই বিভাগ পেশাগত, কর্মগত ও নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীগত — এই তিন ভাবে ঘটেছিল।

সুতরাং নতুন নতুন জাতি ও শ্রেণীগুলির উদ্ভব নির্দেশ করে যে হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরে এক বিরামহীন পরিবর্তনের প্রক্রিয়া চলেছিল। তথাকথিত এই নীচু জাতিগুলিকে হয়ত কলঙ্কিত জীবনাবস্থায় থাকতে হতো, কিন্তু চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে তাদেরও উপরে ওঠার তথা নিজেদের অবস্থান উন্নয়ন এবং উচ্চতর ধর্মীয় আচার-ভিত্তিক পদমর্যাদা অর্জনের সুযোগ ছিল।[৭]আধুনিক সঙ্কর বাঙালীর ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বিনয় সরকার সামগ্রিকভাবে মন্তব্য করেছেন — ''অনার্য, আদিম, বুনো, 'পারিয়া', কাক-পায়রা, পাহাড়ী ইত্যাদি নরনারীর ধর্ম ও / বা সংস্কৃতি হইল বাঙালীর খাঁটি স্বদেশী ধর্ম ও / বা সংস্কৃতি।[৮] আসলে আর্যদের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং অন্য উচ্চবর্ণ বাংলার আদিম জনজাতিদের উপর তাদের সংস্কৃতি ও রাজনীতিক কর্তৃত্ব বলবৎ করেছিল।[৯]
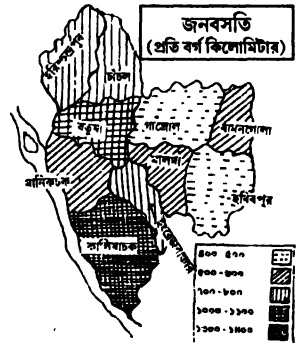
মোট কথা, বাংলার আদিম অধিবাসীদের বংশধর বাংলার উপজাতিগুলি। এর মধ্যে তথাকথিত 'অন্ত্যজ' জাতিসমূহও আছে। ১৮৭২ ও ১৮৮১ সালের 'সেন্সাসে' এদের অনেকগুলিকে

হিন্দুসমাজের আওতার বাইরে রাখার যুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন বিধানে হিন্দু সমাজভুক্ত অনুন্নত সম্প্রদায়গুলিকে 'তফশীলভুক্ত জাতি' (Scheduled Caste) বলে চিহ্নিত করা হয়। এমনভাবেই উপজাতিসমূহকে 'অনুন্নত উপজাতি' (Backward Tribe) বলা হয়। কিন্তু স্বাধীনোত্তর যুগে এদের তফশীলভুক্ত উপজাতি (Scheduled Tribe) বলে নির্দিষ্ট করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই উপজাতিসমূহের কতিপয় লক্ষণ হল — ক. উপজাতি থেকে জাত, খ. আদিম জীবনযাত্রা প্রণালী অনুসরণ, গ. দুরধিগম্য স্থানে বাস, ঘ. অনুন্নত অবস্থা।

সর্বাপেক্ষা প্রাচীন অবিভক্ত মালদা জেলার জনজাতির চিত্র মেলে ১৮৭২ সালের সি. এফ. ম্যাগ্রার পেশাভিত্তিক আদমসুমারীর সংকলনে।[১] অবশ্য তাতে অ-এশীয় (Non-Asiatic), মিশ্র-সম্প্রদায় (Mixed Races), এশীয় (Asiatics), আদিবাসী উপজাতি (Aboriginal), ইউরেশীয় হিন্দু আদিবাসী (Semi-Hinduized Aboriginal), হিন্দু-উচ্চবর্ণ (Superior Castes), মধ্যবর্ণের (Intermediate Castes), ব্যবসায়ী সম্প্রদায় (Trading Castes), রাখালিয়া সম্প্রদায় (Pastoral Castes), খাদ্য ও মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারী সম্প্রদায় (Castes engaged in preparing cooked food), কৃষিজীবী সম্প্রদায় (Agricultural Castes), মুখ্যত ব্যক্তিগত কাজে যুক্ত (Castes engaged chiefly in personal service), কারিগর সম্প্রদায় (Artisan Castes), তন্তুবায় সম্প্রদায় (Weaver Castes), শ্রমিক বা মজুর সম্প্রদায় (Labouring Castes), মাছ ও সবজী বিক্রেতা সম্প্রদায় (Castes engaged in selling fish and vegetables), নৌচালনায় নিযুক্ত ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায় (Boating and Fishing Castes), নর্তক, যন্ত্রী, ভিক্ষুক ও যাযাবর সম্প্রদায় (Dancer, Musician, Beggar and Vagabond Castes), জাতি-সম্প্রদায় অমান্যকারী হিন্দু-ধর্মের কতিপয় শাখা (Persons of Hindu Origin not recognising caste), মুসলমান সম্প্রদায় (Muhammadans), অজ্ঞাত বা অনির্দিষ্ট সম্প্রদায় (Persons of unknown or unspecified castes)।[১১]

১৮৭২ সালে অবিভক্ত মালদা জেলায় ইংরেজ-৬, আইরিশ-১, স্কচ্-১২, ফরাসী-২ ও সুইস-২ জন, ইউরেশীয়-১১ জন ছাড়া ভড় (Bhar), ভূমিজ, ধাঙ্গর, খারোয়ার, কোল, পাহাড়িয়া, সাঁওতাল, বাগদী, বাহেলিয়া, বাউরী, বেদিয়া, ভুঁইয়া, বিন্দ, বুনা, চাঁই, চামার ও মুচি, চণ্ডাল, ডোম, দোসাদ, গঙ্গোতা, হাড়ি, কাওরা, করঙ্গা, কোচ, পলি, রাজবংশী, মাহিলী, মাল, মালো, মরকণ্ডে, মেথর, ভুঁইমালী, মুশাহর, পাসি, রাজওয়ার, ব্রাহ্মণ, রাজপুত, ঘাটওয়াল, কায়স্থ, ভাট, বৈদ্য, আগরওয়ালা ও মাড়য়ারী, ক্ষত্রী, অসওয়াল, বাক্কাল, বানিয়া, সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, গোয়ালা, গরেরি, গানরার, মোদক, কৈবর্ত, আগুরি, বারুই, তামলি, সদগোপ, মালি, কোয়েরি, কুর্মী, নাগর, ধোপা, হাজ্জাম, বেহারা এবং ডুলিয়া, কাহার, ধানুক, কামার, কাঁসারি, সোনার, সূত্রধর, কুমার, লাহেরি, শাঁখারি, শুঁড়ি, তেলি, কলু, তাঁতী, যোগী (যুগী), গণেশ, কপালি, ধুনিয়া, বেলদার, চুনারী, নায়েক, নুনিয়া, পুণ্ডারি, কাণ্ডারী, তুরহা, জালিয়া, মালা, মাছুয়া, তিয়র, পাটনী, পোদ, গণ্‌রি, বানফোঁড়, বাথুয়া, কেউট, মুরিয়ারি, সুরাহিয়া, বাইতি, বৈষ্ণব, গোঁসাই, দেশী খ্রীষ্টান এবং মুসলমানদের মধ্যে জুলাহা (জোলা), মুঘল, পাঠান, সৈয়দ, সেখ নথিভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে লোকসংখ্যায় চারহাজারের উর্ধ্বে জাতি-উপজাতিগুলি এমন — খারওয়ার (৬,০০৫), বিন্দ (৬,০০২), চাঁই (৩০,০৮২), চামার ও মুচি (৪,৮২৯), হাড়ি (১১,৬৭৫), কোচ (১৩,৯০৮), পলি (২৪,৩২০), রাজবংশী (২৪,৭২৪), ব্রাহ্মণ (৮,২৮৭), কায়স্থ (৪,৬০১), গোয়ালা (১৩,৭২৮)

কৈবর্ত (২৪,৯০২), নাগর (১৯,২২৮), হাজ্জাম (৬,৩৫৭) ধানুক (৭,৮০৫), কামার (৪,৩১২) তেলি (১৬,৯৭২), তাঁতী (৪,৭৯১), গণেশ (১১,৫৫৯), পুণ্ডারি (১১,১০২), তিওর (১৩,৭১৭) বৈষ্ণব (৫,৮৪৯)।[১২] কিন্তু একটি বিষয় স্মরণীয় যে এ বছরের পরিসংখ্যানে সাঁওতাল জনসংখ্যা ২১৫ কিন্তু ১৯৫১ সালের আদম সুমারীর জনসংখ্যা ৭২,৮০০।[১৩]

শেষ ১৯৫১ সালের আদমসুমারীতে মালদা জেলায় এই তপশিলী উপজাতির (Tribes) পরিসংখ্যান নিম্নলিখিত ঃ-

| | | |
|---|---|---|
| ১. সাঁওতাল - | ৭২,৮০০ | তপশিলী উপজাতি |
| ২. ওঁরাও - | ৭,৫০৩ | |
| ৩. মুণ্ডা - | ১৩২ | |
| ৪. মু - | ২৮[১৪] | |

১৯৬১ সালের জনগণনায় এই চিত্রটিতে আবার অন্যান্য উপজাতি যুক্ত হয়ে এমনই —

| | |
|---|---|
| সাঁওতাল | ৮৪,২০৭ |
| ওঁরাও | ৪,৭৮৩ |
| কোরা | ২,৪৭৮ |
| মুণ্ডা | ১,৫৩৩ |
| মাহালী | ১,৩২৭ |
| মালপাহাড়িয়া | ১,১৮২ |
| অন্যান্য | ৪,০১২ |
| মোট | ৯৯,৫২২ |

১৯৭১ সালের জনগণনায় এ জেলায় তাদের মোট সংখ্যা ১,৩০,৭১৫ (পুরুষ - ৬৫,৯৮৫ এবং মহিলা - ৬৪,৭৩০)। ১৯৮১ সালের জনগণনায় এই তপশিলী উপজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে মোট ১,৫৩,৩০২ (পুরুষ - ৭৪৯৫৬, মহিলা - ৭৮,৩৪৬) এবং ১৯৯১ সালের জনগণনায় তাদের মোট জনসংখ্যা ১,৭১,৩২৬ (পুরুষ - ৮৫,৯৬৩, মহিলা - ৮৫,৩৬৩)।[১৫]

১৯৫১ সালের জনগণনায় মালদা জেলার তপশিলী জাতির পরিসংখ্যান এমনই ঃ-

| তপশিলী সম্প্রদায় | জনসংখ্যা |
|---|---|
| ১. বাগদী | ২,৮৮১ |
| ২. বাহেলিয়া | ৩৮ |
| ৩. বাইতি | ৫১ |
| ৪. বেলদার | ২৪৫ |
| ৫. ভুঁইমালী | ১,৯৬৬ |
| ৬. ভুঁইয়া | ৪,৯৪০ |
| ৭. বিন্দ | ৪,৯৪০ |

| তপশিলী সম্প্রদায় | জনসংখ্যা |
|---|---|
| ৮. চামার, মুচি | ১১,৬২৯ |
| ৯. ধোপা | ৩,১৪৪ |
| ১০. ডোম | ৭৬৭ |
| ১১. দোসাদ | ২,৫৭০ |
| ১২. ঘাসি | ১৪৫ |
| ১৩. গণরি | ১১ |
| ১৪. হাড়ি-মেথর | ৫,৯২১ |
| ১৫. জালিয়া-কৈবর্ত | ৪,৭২৯ |
| ১৬. মালো-ঝালোমালো | ২,৯৮১ |
| ১৭. কদর | ৬৬ |
| ১৮. কেওড়া | ৬,৬৬৯ |
| ১৯. কাউর | ১৫ |
| ২০ খয়রা | ৭৪৬ |
| ২১. খটিক | ৬ |
| ২২. কোচ | ৩১৮ |
| ২৩. কনওয়ার | ১৭০ |
| ২৪. কোটাল | ১০ |
| ২৫. লোহার | ৪৬১ |
| ২৬. মাহার | ৩০২ |
| ২৭. মাল | ১,১৪৩ |
| ২৮. মাল্লা | ৪,০৮৫ |
| ২৯. মুসাহার | ৫,৪৪২ |
| ৩০. নমশূদ্র | ৪,৪৯৭ |
| ৩১. নুনিয়া | ৩,৯৯৯ |
| ৩২. পলিয়া | ১,৭৭৯ |
| ৩৩. পাসি | ২৭৮ |
| ৩৪. পাটনী | ১,১৮৫ |
| ৩৫. পোদ | ২,৭৬১ |
| ৩৬. রাজবংশী | ২০,২৯৪ |
| ৩৭. শুঁড়ি | ৯০৭ |
| ৩৮. তিয়র | ২০,০৬৩ |
| ৩৯. তূরী | ৪,০২৭ |

● **পাদটীকা**

১. অতুল সুর, বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, পৃ-৪
২. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, পৃ-৪৮-৪৯
৩. অতুল সুর, প্রগুক্ত, পৃ-২৬
৩ক. R. C. Majumdar, Corporate Life in Ancient India, p-311
৪. অতুল সুর, বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস, পৃ-৩৬
৫. তদেব, পৃ-৩৭
৬. নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৩-৩৪
৭. হিতেশরঞ্জন সান্যাল, বাংলায় 'জাতির' উৎপত্তি, জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ (সম্পাদনা - শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ দাশগুপ্ত) পৃ-৩৬-৩৭
৮. বিনয় সবকাবের বৈঠকে, প্রথম খণ্ড, পৃ-৫৮০
৯. S. K. Chatterjee - Indo-Aryan and Hindi, p-30ff.
১০. অজয়কুমাব ঘোষ, মালদা জেলার তপশীলী উপজাতি, স্মরণিকা - সিধু-কানু-বিরসা-জিতু মেলা, ২০০১
১০. Beverley H - Report on the Census of Bengal, 1872, (Magrath), PCX/ii – Clxiv
১১. Hunter W W - A Statistical Account of Bengal, Vol. viii, p. 42-44
১২. Op. Cit, p. 42-44
১৩. Mitra A - The Tribes and Castes of West Bengal, p. 118
১৪. Op Cit p. 93
১৫. অজয়কুমার ঘোষ - মালদা জেলার তপশিলী উপজাতি, স্মবণিকা - সিধু-কানু-বিবসা-জিতু মেলা, ২০০১
১৬. Mitra A , Op Cit, p 91

**প্রসঙ্গতঃ মালদা জেলার কতিপয় তপশীলী জাতি ও উপজাতির পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হলো**

# সাঁওতাল

সান্তাল, সন্তাল বা সাওনতার নামে ভারতের প্রাচীনতম জনগোষ্ঠী অস্ট্রো-এশিয়াটিক কোল বা খেরওয়াল গোষ্ঠীর প্রধান শাখা এই সাঁওতাল সমাজ। সাঁওতাল পরগণা, ভাগলপুর, উত্তর উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গে এদের প্রধান বাস। স্ক্রেপাস্রুডের মতে এরা মেদিনীপুরের অন্তর্গত সাঁওত নামে একটি স্থানের প্রথমে অধিবাসী ছিল এবং খরবার (খারোয়ার) হিসেবে তাদের পরিচিতি ছিল।[১] আবার ডালটনের মতে সাঁওতাল নাম থেকেই মেদিনীপুরের একটি স্থানের নাম সাঁওত।[২]

সাঁওতাল জাতির কিম্বদন্তীতে প্রচলিত আছে যে এক বন্য হংসী দুটি ডিম পাড়ে, তা থেকে তাদের প্রথম পুরুষ পিলচু হড়ম এবং প্রথম নারী পিলচু বুড়ি জন্মগ্রহণ করে।

সাঁওতালেরা বারোটি শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ ১. হাসডক, ২. মুর্মু, ৩. কিসকু, ৪. হেমব্রম, ৫. মারাণ্ডি, ৬. সরেন, ৭. টুডু, ৮. বাসকে, ৯. বেসরা, ১০. পাউরিয়া, ১১. চোড়ে, ১২. বিদিয়া। সাঁওতালরা আপন গোষ্ঠীর লোকদের 'হড়' এবং তার বাইরের সকলকে 'দিকু' বলে। এদের পারিস বা গোত্র পদবীর উপর ভিত্তি করে বিভক্ত। এদের সমাজের নিয়ম-কানুন আজও অত্যন্ত কঠোরভাবে মান্য।

সাঁওতাল সমাজ তিনটি ভাগে বিভক্ত ঃ

১. বিন্দির হড় সমাজ

২. সাফা হড় সমাজ

৩. ইসৈঁয় হড় সমাজ

**ক. বিন্দির হড় সমাজ**

এ সমাজে পাঁচজন মহৎ বা কর্তা থাকে। এরা হল যথাক্রমে ১. মাঝি হাড়াম (গ্রামের মোড়ল), ২. পরামাণিক বা পারাণিক (উপ-মোড়ল), ৩. গোডায়েৎ বা গোডেত, গোরাইত বা কাইলি (সমাজের সকলের নিকট উৎসব অনুষ্ঠানের বার্তাবহ), ৪. জগ মাঝি, ৫. জগ পরামাণিক। এবং গ্রামের সমাজের একজন প্রধান থাকে — নাইকি বা পূজারী। সে উৎসব-অনুষ্ঠানে পূজা দেয়। এবং তার সহকারী কুডম নাইকি। পাহাড়ের ভূতদের তুষ্ট করার কাজে তার বিশেষ ক্রিয়া-কলাপ আছে।

### খ. সাফা হড় সমাজ

বিন্দির সমাজের মতই এদের সমাজের রীতি-নীতি। মোড়লের সংখ্যাও একই। তবে তাদের বিবাহের রীতি কিছুটা পৃথক, যেমন বিন্দির হড় সমাজের বিবাহ হয় ডালার মধ্যে, কিন্তু এদের বিবাহ হয় মারোয়ার মাঝখানে আসন পেতে।

### গ. ইসেঁয় হড় সমাজ

ইসৈঁয় হড় সমাজ আবার তিন ভাগে বিভক্ত। উপরি উক্ত দুই সমাজ থেকে এরা পৃথক। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে আদিতে এদের সমাজ বিন্দির হড় ছিল, পরবর্তীকালে অন্য দুটি ভিন্ন রীতি-নীতিতে বিভক্ত হয়েছে।

সাঁওতাল সমাজে বিবাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। এদের বিয়েকে 'বাপলা' বলে। এ সমাজে সাত প্রকার বিবাহের প্রচলন আছে, যেমন — ১. দুয়ার বাপ্‌লা, ২. টুংকি দিপিল বাপলা, ৩. অর বাপলা, ৪. আপাঙ্গির বাপলা, ৫. ঘরদি জায়ায় বাপলা, ৬. শাঁখা বাপলা, ৭. ইপতুৎ অর বাপলা। আবার কোথাও কোথাও ছ প্রকারের বিবাহের কথার উল্লেখ আছে। সেগুলি — ১. বাপলা বা ফিরিং বেহু (আক্ষরিক অর্থে পাত্রী কেনা), ২. খরদি জায়ায়, ৩. ইতুৎ, ৪. নীর বোলক, ৫. সাঙ্গা, ৬. ফিরিং জায়ায়।[৩]

### ১. দুয়ার বাপলা

এ বিবাহের মাধ্যম ঘটক। পাত্র ও পাত্রী-পক্ষের বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে এই ঘটক। 'সার আগুন' বা শুভ লক্ষণগুলি বিবাহে শুভ বলে মনে হয়। অন্যদিকে গ্রামের সীমান্তে যদি কুড়ুল বা কাঠারি (দা, দাও), জ্বালানি কাঠওয়ালা লোক, আগুন, সাপ, শেয়াল ইত্যাদি দেখা দেয়, তবে যাত্রা অশুভ বলে গণ্য হয়।[৪] এ বিবাহ পাত্রীর বাড়ীতেও বিয়ে হয়। আবার বিয়ে করে বরযাত্রী ফেরার পর বরের বাড়ীতেও বিয়ে হয়। তবে এ বিয়েতে কোন ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয় না। বিবাহের পর ডুলি/পালকীতে মেয়ের বাড়ী থেকে ছেলের বাড়ীতে বরকন্যাকে নিয়ে যাওয়া হয়। বরযাত্রী ফিরে আসার পর ভোজের ব্যবস্থা হয়। কন্যার গ্রামের জগ মাঝি বিবাহ-অনুষ্ঠানে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে।

### ২. টুংকি দিপিল বাপ্‌লা

এই বিবাহ পূর্বের মত, তবে এক নয়। এখানে ঘটক থাকে বটে, কিন্তু এখানে মেয়ের বাড়ীতে বিয়ে না হয়ে ছেলের বাড়ীতে হয়।

### ৩. অর বাপলা

এই বিয়েতে ছেলে মেয়েকে টেনে নিয়ে আসে। এ বিয়েতে বিশেষ খরচ হয় না, তবে ছেলেকে পণের টাকা দিতে হয়। নচেৎ এক বা দু বছর থেকে বিয়ে হয়।

### ৪. আপাঙ্গির বাপ্‌লা

এই বিয়ে সাধারণতঃ সমাজ-স্বীকৃত নয়। এই বিয়ে ছেলে-মেয়ের পছন্দের উপর নির্ভরশীল। সাধারণতঃ মেয়েটি সধবা কিম্বা নিকট সম্বন্ধীয় হলে (অর্থাৎ যাকে বিয়ে করা প্রথাসিদ্ধ আইনে অসঙ্গত) পুরুষটি জাতিচ্যুত হবার ভয়ে তাকে বের করে নিয়ে পালায়। আগে এমন হলে সকলে

তার খোঁজ নিয়ে তাকে কেটে ফেলতো। ইদানীংকালে দুগুণ পণ আদায় করে।[৫] বিবাহের পর সন্তান হলে, যতদিন পর্যন্ত দশ সমাজের খাওয়া (জরিমানা) না দেয়, ততদিন তারা সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয় না। খাওয়ার টাকা বা জরিমানা দেওয়ার পর সমাজকে মান্য করায় তারা সমাজে স্থান পায়।

**৫. খরদি জায়ায় বাপলা**

এই বিয়ে মেয়ের বাড়িতে হয়। দরিদ্র অথবা পিতৃমাতৃহীন বালকেরাই ঘরজামাই হয়। ছেলেকে পণ কিম্বা অন্য খরচ বাবদ কোন টাকাও দিতে হয় না।

**৬. শাঁখা বাপ্‌লা**

এই ধরণের বিয়েতে বরকে শাঁখা-সিঁদুর নিয়ে মেয়ের বাড়ীতে যেতে হয় এবং সেখানে বিয়ে হয়।

**৭. ইপতুৎ অর বাপলা - (জোর করে সিঁদুর দান বিবাহ বা রাক্ষস বিবাহ)**

এ ধরণের বিবাহে কোন পুরুষ বিবাহযোগ্যা কোন নারীর কপালে সিঁদুর ঘষে দিলে সে প্রথাসিদ্ধ আইনে তার বিবাহিত স্ত্রী বলে পরিগণিত হয়। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে সাঁওতাল সমাজে বিবাহে সিঁদুর দান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। এর পশ্চাতে Fertility Cult বা উর্বরাশক্তি-চেতনার প্রতীক ক্রিয়াশীল। ইপতুৎ দু ধরণের — ১. মেয়ের গোপন ইচ্ছায় হতে পারে, ২. সম্পূর্ণ অমতেও হতে পারে। তবে এই ইপতুৎ-এর সুযোগে কোনো সাঁওতাল পুরুষ যা খুশী করতে পারে না, একেবারে অবৈধ বা অসম্ভব হলে সমাজ পুরুষকে নিদারুণ শাস্তি দেয়।

**এ ছাড়া আছে নির-বোলক** — কন্যা যখন জোর করে কখনো কখনো নিজের মনোমত পাত্রকে বিবাহ করে, তখন তাকে বলে নির-বোলক। যুবতী সাঁওতাল নারী একটি হাঁড়িতে হাঁড়িয়া ( দেশী তৈরী মদ) নিয়ে তার প্রেমাস্পদের গৃহে গিয়ে সেখানে বাস করার অনুমতির জন্য অনুরোধ করে। এই পাত্রীকে জোর করে গৃহ থেকে বিতাড়ন করা রীতিও রুচি বিরুদ্ধ। তাই পাত্রের মাতা তাকে বিতাড়নের উদ্দেশ্যে আগুনে লঙ্কা নিক্ষেপ করায় লঙ্কার ধোঁয়া সহ্য করে যদি মেয়েটি সেখানে অবস্থান করে, তাহলে পাত্রের মাতা তার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দেয়।

আবার বিধবা বা পরিত্যক্তা স্ত্রীর বিবাহকে **'সাঙ্গা'** বলে। কন্যার পাত্রের বাড়ীতে এলে, পাত্র দিম্বু ফুল সিঁদুর চিহ্নিত করে বাম হাতে কন্যার মাথার চুলের পিছনে লাগিয়ে দেয়।

আর এ ধরণের বিবাহের নাম **ফিরিং-জায়ায়**।

এখানে কোন অবিবাহিত কন্যা তার অতিবাহ্য শ্রেণীর কোন যুবক দ্বারা অন্তঃসত্ত্বা হলে, তার অভিভাবকেরা একটি পাত্র খোঁজে। কন্যার প্রেমাস্পদ তাকে দুটি বলদ, একটি গাই ও কিছু চাল দিতে স্বীকৃত হলে সে সেই কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করতে সম্মত হয়। তারপরে গ্রামের প্রধান তাদের স্বামী-স্ত্রী বলে স্বীকার করলে **'ফিরিং জায়ায়'** বিবাহ সম্পন্ন হয়।[৬]

বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে পাল্‌টি-বিয়ে সাঁওতাল সমাজে 'গোলাত্‌' বিবাহ বলে পরিচিত। এখানে দুই পরিবারের ছেলে-মেয়ের সঙ্গে অন্য পরিবারের ছেলে-মেয়ের বিয়ে হয়। এখানে কন্যা-পণ কোন পক্ষই দেয় না।[৭]

সাঁওতালদের মধ্যে যদিও বিধবা বিবাহের প্রচলন আছে তবুও মৃত পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে

বিবাহ করাই তাদের প্রশস্ত। বিধবা নারী নিজের ভাসুরকে কোনক্রমেই বিবাহ করতে পারে না। বিবাহ বিচ্ছেদ স্বামী-স্ত্রীর ইচ্ছানুসারে হতে পারে। তবে বিনা ত্রুটির কারণে বিচ্ছেদ হলে যে বিবাহ বিচ্ছেদ চায়, সে খরচাদি বহন করবে। যেমন এ ক্ষেত্রে স্বামী কন্যাপণের যে টাকা পূর্বে প্রদত্ত হয়েছিল তা পায় না। তা ছাড়া তাকে জরিমানা এবং কন্যাকে প্রথাসিদ্ধ পাওনাগণ্ডা দিতে হয়। অন্যদিকে মেয়ে যথার্থ কারণ ছাড়া যদি বিবাহ বিচ্ছেদ চায়, তবে তার পিতা কন্যাপণ ও জরিমানা দিতে বাধ্য হয়। সমবেত পাড়ার লোকের সম্মুখে পুরুষটি তাদের বিবাহ-ভঙ্গের চিহ্ন স্বরূপ তিনটি শালপাতা ছেঁড়ে এবং একটি জলপূর্ণ পিতলের কলসী উল্টে দেয়।[৮]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে এদের কোন কোন ভিন্ন দু পদবীর তরুণ-তরুণীরা বিবাহ করতে পারে না। যেমন মার্ডি ও কিসকু পদবীধারীর বা একই পদবীরও কেউ বিবাহ করতে পারে না। তা হলে সমাজচ্যুত হতে হয়। তবে ইদানীংকালে এ নিয়ম অনেক স্থানে লঙ্ঘিত হচ্ছে।

এদের গায়ে-হলুদের সময়কার একটি গান ঃ

পাটিয়া রে দুড়ব কাতে
সুনুম সাসাং অজঃ কাতে
চেদার হপন মায়েম কোচেয়েনা
নতে বেনগেদ মে আচুরকাতে
মারে দোলাস গাড় দম বাগিয়াদাঃ

বঙ্গানুবাদ —

পাটির মধ্যে বসে
তেল হলুদ মেখে
কেন (ছোট মেয়ে) তুমি মাথা নীচু করে আছো?
এ দিকে ঘুরে তাকাও
পুরানো ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছো।

সাঁওতালরা উৎসব প্রিয় জাতি। সাংস্কৃতিক জীবন এদের ঐতিহ্যময় ও বর্ণময়। প্রায় প্রত্যেক সাঁওতালের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, পূজা-পার্বণকে কেন্দ্র করে উৎসব-অনুষ্ঠান লক্ষ্য করা যায়। কৃষিজীবী সাঁওতালদের বীজ বপন, ফসল ফলানো ও ফসল তোলা ইত্যাদি পর্যায়কে কেন্দ্র করে অসংখ্য অনুষ্ঠান দেখা যায়, এবং প্রতিটি উৎসব-অনুষ্ঠানেই নারী-পুরুষের সম্মিলিত নৃত্য-গীত লক্ষণীয়। এই সব উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সোহরায় বা বাদনা পরব। পৌষ মাসে প্রধান ফসল ধান ওঠার পর ঘরে ঘরে পচানি (দেশী ধানী মদ) রাখা হয়। এই পচানি খেয়ে তারা গ্রামের রাস্তার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে মাদল, হারমোনিয়াম, ইত্যাদি নিয়ে নৃত্য করতে থাকে। সাতদিন ধরে চলে এই উৎসব। এ উৎসবের একটি গান —

গুলাই কুলাই তেদ দাইনা
সাক্কদাইনায় আতিঞ কান,
সাঁক দাইনা মালা মেনাঃ তায়
সাঁক রেয়াঃ মালা বাড়ে

কোই ইং খান দই না দই
বার লারফা সাঃ লেকাঞ্জ লেওয়ের কদরঃ
তালা কাগু দাঃ লেকাং ছিলকাউ উড়ুকঃ

বঙ্গানুবাদ —

রাস্তায় রাস্তায় দিদি
রাজহাঁস চরে বেড়ায়
রাজহাঁসের মালা আছে
রাজহাঁসের মালা দিদি যদি চেয়ে দাও
দুটি বাঁশের মতো দুলবো
অর্ধেক কলসীর জলের মতো ছলকে উঠবো।

**২. বাহা বা দোলযাত্রা**

ফাল্গুন মাসে শালের কচিপাতা উদ্গমের সময় এ উৎসবে রঙ খেলায় সাঁওতালরা মেতে ওঠে। খাওয়া-দাওয়া এবং মোরগ, শূকর, ছাগল ইত্যাদি দিয়ে যেমন ভোজ হয়, তেমনই নানা পিঠে-পুলিও তৈরী হয় ঘরে ঘরে।

**৩. নবান্ন**

লোকায়ত কৃষিজীবী সমাজের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতোই অঘ্রাণ মাসে নূতন চালের ভাত রান্না করার উপলক্ষে এ উৎসব।

এ ছাড়া আছে এরক-সিম (আষাঢ়), হরিআর-সিম (ভাদ্র), ত্রিগুণ্ডলি নাউআই, গুণড়লি (ভাদ্র), যন্থর পূজা (অঘ্রান), সংক্রান্ত পূজা (পৌষ সংক্রান্তি), মাঘ-সিম (মাঘ) ইত্যাদি।[৯]

সাঁওতালদের সর্বপ্রধান দেবতা 'ঠাকুর'। অবশ্য তাঁকে অর্চনা সুদীর্ঘকাল ধরে তারা করে না। কারণ তিনি মানুষের ভালমন্দের অতীত। কেউ কেউ ঠাকুরকে সূর্যদেবতা বলে গণ্য করে। সাধারণতঃ সাঁওতালদের জনপ্রিয় দেবতারা হলেন — মারাং বুরু, মোরেকো, যাইর এরা, গোঁসাই এরা, পরগণা (বঙ্গাদের বা দেবতাদের প্রধান এবং ডাইনীদের কর্তা) এবং মান্ঝি। তা ছাড়া প্রতিটি পরিবারের পৃথক দু জন দেবতা থাকেন — ১. ওরক্-বঙ্গা বা গৃহদেবতা এবং আব্গে-বঙ্গা বা গুপ্তদেবতা। ওরক-বঙ্গার নামগুলি — ১. বস্পহর ২. দেশওয়ালী ৩. শাস ৪. গোরহ ৫. বরপহর ৬. সরচওদি ৭. থুনতাতুরসা। অন্যদিকে আব্গে বঙ্গাগণ হলেন — ১. ধরোশোর বা ধরোশগু ২. কোটকোম কুড্র ৩. চম্প-ডেনগর ৪. গরসিঙ্ক ৫. লীলচণ্ডী ৬. ধনঘর ৭. কুড্রচণ্ডী ৮: বহরা ৯. দুয়াসেরি ১০. কুডরজ ১১. গোঁসাই এরা ১২. অচলি ১৩. দেশওয়ালি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে সব সাঁওতালই ওরক-বঙ্গা এবং আব্গে-বঙ্গা-র নাম জ্যেষ্ঠপুত্র ছাড়া অন্য সকলের নিকট গোপন রাখে।[১০] মালদা

জেলার গাজোল, বামনগোলা ও হবিবপুর থানার অসংখ্য গ্রামে সাঁওতালদের বাস।

প্রসঙ্গতঃ আদমসুমারী অনুসারে মালদা জেলার সাঁওতালদের জন সংখ্যা ঃ

| ১৮৭২ | ১৮৮১ | ১৮৯১ | ১৯০১ | ১৯১১ | ১৯৩১ | ১৯৪১ | ১৯৫১ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২১৫ | ৮৩৩ | ২০,৯৮৯ | ৫২.১২৬ | ৬৬,৫০৪ | ৭২,১৪৫ | ৩৮,৩৪৫ | ৭২,৮০০ |

সূত্র — ( Mitra A, ıbid, p-118)

● পাদটীকা

১. Skrefsrud in Risley H. H. – The Tribes and Castes of Bengal, Vol. II, p-224

২. Dalton in Risley H. H.– ıbid, Vol II, p-224

৩. Risley H H. - ibid, p-229

৪. সুহৃদকুমার ভৌমিক - প্রথা সিদ্ধ আইন ঃ খেরওয়াল সমাজের বিবাহ রীতি, লোক সংস্কৃতি গবেষণা, ১০/৪, পৃঃ ৫৫

৫. সুরেন্দ্রমোহন ভৌমিক — সাঁওতালী কথা, পৃ-৯০

৬. নগেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদিত)- বাংলা বিশ্বকোষ, একবিংশ ভাগ, পৃ-৩৮৬

৭. Risley H. H. Vol. II, Op. Cıt., p-229

৮. Op. Cit., Vol. II. p-231, বাংলা বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৮৭

৯. Op. Cit., p-233

১০. Op. Cit., p-232

ক্ষেত্রানুসন্ধানে ও তথ্যদানে -- বুদু হেমব্রম, সুজাতা মার্ডি, আমিন সোরেন, মাইকেল সোরেন, ডরোথী সোরেন, রেজিনা মূর্মু, শিবনাথ মার্ডি ও মোহিত রায়।

# মালপহাড়ী, মালপাহাড়ি, মালপহাড়িয়া, মাল পাহাড়িয়া

বীরভূম জেলার রামগড় পর্বতবাসী এবং সাঁওতাল পরগণা তথা রাজমহল পর্বতের পাদদেশের জাতিবিশেষ এরা। তবে তারা রাজমহল-পর্বতবাসী থেকে পৃথক।[১] বল সাহেব মালভূমের খেড়িয়া ও পাহাড়িয়াদের সঙ্গে এদের সাদৃশ্য থেকে কোল গোষ্ঠী সম্ভূত বলে মনে করলেও তাদের ভাষার নিরিখে তারা দ্রাবিড় জাতিরই গোত্রভুক্ত বলে কেউ কেউ মনে করেন।[২] ক্যানিংহাম প্লিনির উক্তি উদ্ধৃত করে কালিঙ্গা (কালিন্দী?) এবং গঙ্গার মধ্যবর্তী পর্যায়ে এই মাল পাহাড়ীদের দেশ বলে অভিহিত করেছেন। সে দুটি পংক্তি এমনই — "Gentes : Calingae proximi mari, et supra Mondei Malli, quodrum mons Malless finisque ejus tractus est Ganges." অন্য আর একটি পংক্তিতে দেখা যায় Ab iis (Palibothris) in interiore situ Mondes et Suari, quorum mons Maleus. এর মাধ্যমে ক্যানিংহাম মল্লি, মালে, মাল, মাল্লা ভাগলপুরের দক্ষিণে মন্দর পর্বতের সঙ্গে জড়িত বলে মনে করেন। পুরাণে কথিত এই মন্দর পর্বত দেব-দানবদের সমুদ্র মন্থনে সহায়ক হয়েছিল। বেভারলির আদম সুমারীর বিবরণে ক্যানিংহামের মত উল্লেখ করে বলেন যে ভাগলপুরের মন্দর পর্বতের ম্যন্দৈ (Mandei) নামক অধিবাসীদিগের সঙ্গে মহানদী তীরের মানদা ও টলেমি-কথিত Mandalae জাতি একই শাখা সম্ভূত।[২খ]

পাটনার দক্ষিণ-গঙ্গাতীরে যে সমস্ত মল্লী বা মলৈ জাতি বাস করে সম্ভবত তারাই টলেমি-প্রোক্ত মণ্ডলী জাতি। বর্তমান মুণ্ডা-কোলদের সঙ্গে এদের পার্থক্য অতি অল্প। তামিল ভাষায় 'মলয়' শব্দে পাহাড় বোঝায়। সুতরাং 'মাল' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ পাহাড়িয়া বা পার্বত্যজাতি। দু হাজার বছর আগে এই সব দ্রাবিড়ীয় জাতি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপ্ত হয়েছিল। পরে অন্যান্য জাতির সঙ্গে প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্বে ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে তারা।

হাণ্টার মালভূমি (মানভূম) বা মল্লভূমিকে মল্ল বা বীরদের নিবাস বলে যে নির্দেশ করেছেন তা অযথার্থ। মালভূমি অর্থে মাল বা পাহাড়িয়া জাতির বাসভূমি। সম্ভবতঃ মালদহ সর্বপ্রথমে মাল জাতি কর্তৃক উপনিবিষ্ট হয়েছিল। এই সমস্ত মালরা পূর্বাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণের মধ্যে পরিগণিত হয়েছে। অন্যান্য আদিম অধিবাসীদের ন্যায় মাল জাতি ৪৫ প্রকার চণ্ডাল জাতির মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট হয়েছে।[২গ] তবে তাঁর এই বক্তব্য মালদহ নাম-প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি আমরা।

মাল পাহাড়িয়ারা প্রধানতঃ মৃগয়া দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করতো। এবং 'ঝুম' ও 'করাও' প্রথায় চাষ করতো।[৩] উত্তরের এই জাতি দক্ষিণ দিকের মালপাহাড়ীদের 'মালের' বলে এবং স্বজাতি বলে তাদের স্বীকৃতি দেয় না। অধিকন্তু তাদের ছিদ্রান্বেষী। তারা উত্তরের মালপাহাড়ীদের ' চেট' বলে নিজেদেরই 'মাল' বা 'মার' বলে। মালদের তিনটি শ্রেণী আছে — ১. কুমারপলি ২. দাঙ্গারপলি ৩. মারপলি। তারা উত্তর পর্বতবাসী 'থাক'কে বলে সুমরপলি'।[৪] আসলে এরা একই জাতি থেকে উৎপন্ন এবং আচার-ব্যবহারও প্রায় একই রকমের। তবে তাদের মধ্যে ধনীরা সিংহ উপাধি নেয় এবং মধ্যবিত্তেরা 'গৃহী' নামে পরিচিত। তৃতীয় শ্রেণী গ্রামের 'মাঁঝি' বা মোড়ল এবং চতুর্থ সম্প্রদায় 'আহৃতি' পশু শিকারী।[৫] রাজমহল পর্বতবাসী পহাড়িয়াদের সঙ্গে এই মালপাহাড়িয়াদের কোন সম্পর্ক নেই।[৬] অন্যদিকে বল্ সাহেব রাজমহল পাহাড়ের পর্বতবাসী মালপাহাড়িয়াদের সঙ্গে বিচারে এদের আকৃতি, প্রকৃতি, আচার-অনুষ্ঠান ও ভাষারও পার্থক্য দেখেছেন।[৭]

মাল পাহাড়িয়াদের দুটি উপবিভাগ আছে — ১. মাল পাহাড়িয়া ২. কুমার বা কোমর-ভাগ। দ্বিতীয়টি উপরিউক্ত কুমার পালিকেই সমর্থন করে। মাল পাহাড়িয়াদের সমাজে কতিপয় কর্মনির্বাহক আছে। যেমন — মাঝি, গিরি, আঢ়ি, ডোড়, পূজড় ও সিকদার। সিকদারকে 'বড় মোড়ল' বলে কেউ কেউ মনে করে। মাঝি — মোড়ল, গিরি — সংবাদ বাহক/ঘোষক, পূজড় — পূজারী, আঢ়ি — বিচারকারী এবং ডোড় তার সহায়ক।[৭ক]

মাল পাহাড়িয়াদের বাল্যবিবাহও যেমন আছে, তেমনই প্রাপ্তবয়সেও বিবাহ হয়। দশ/এগার বছরের পূর্বে সাধারণত মেয়েদের বিয়ে হয় না। বিবাহের পূর্বে কোন কন্যার গর্ভ হলে সেই ছেলেটিকেই বিয়ে করতে হয়। কন্যাপণ গ্রহণের নিয়ম বেজোড় সংখ্যায়। একসঙ্গে বা কিস্তিতে তা দেওয়া যেতে পারে। এদের ঘটককে বলে 'সিথু'। যেদিন কন্যার পিতাকে কন্যাপণ সম্পূর্ণ অর্থ শোধ করে, সেদিন বরের পিতা কন্যার জন্য সিথুর হাত দিয়ে বজরা থেকে প্রস্তুত মদ এবং একটি শাড়ী বরের মাতুলকে পাঠায়। এদের কন্যার বিবাহে মাতুলের প্রাধান্য দেখে অনেকের ধারণা যে অতীতে মাতার সম্পর্কেই সকলে পরিচিত হত। কন্যাপণ দেওয়া হলে ঘটক পুনরায় কন্যার বাড়ীতে যায়। সে সময় ঘটকের হাতে একটি তীরের ক্ষতচিহ্ন থাকে এবং তার চতুর্দিকে হলুদ রঙের সুতো বাঁধা হয়। বিয়ের যে কদিন বাকী থাকে, সেই কটি গিঁট দেওয়া হয়। কন্যাপক্ষের লোকেরা প্রত্যেকদিন একটি করে গিঁট খোলে। বিয়ের আগের দিন বর কন্যার বাড়ীর নিকটেই অবস্থান করে। কন্যার বাবাকে বিয়ের দিন পূর্বাহ্নে একটা বড় ভোজ দিতে হয়। সেখানে বরকে পূর্বমুখী করে কন্যার সঙ্গে মিলনের ব্যবস্থা হয়। কন্যার পরিধানে থাকে হলুদ রঙের শাড়ী। কন্যার বন্ধু ও সমবয়স্করা বরের হাতে সিঁদুর দেয় এবং বর সেই সিঁদুর কন্যার সিঁথিতে মাখায়। কন্যার সঙ্গিনীরা কন্যার আঙুলে সিঁদুর মাখিয়ে বরের কপালে সাতটি ফোঁটা কেটে দেয়। শেষের এই অনুষ্ঠানটির সময় নৃত্য-গীত চলে — ডোম বাদ্যকরেরা উপস্থিত থাকে। সন্ধ্যার দিকে বরের বাড়ীতে যাত্রা এবং সেখানে নাচ-গান ও মদ্যপান চলে।[৮] মালদা জেলার মালপাহাড়ীদের বিবাহের একটি রীতি এই যে ছেলের বাবা ছেলেকে এবং মেয়ের বাবা মেয়েকে কোলে নিয়ে খড়ের আঁটির উপর বসে থাকে। পরে মেয়ের ভগ্নীপতি মেয়ের চোখ পান দিয়ে ঢেকে রাখে এবং ছেলে সিঁদুর দান করে।

মাল পাহাড়িয়াদের মধ্যে আছে বহু বিবাহের প্রচলন। সাধারণতঃ স্ত্রী বন্ধ্যা হলেই দ্বিতীয়বার এরা বিবাহ করে। স্ত্রীর ২/৩ জন ভগিনী থাকলে স্ত্রীর জ্যেষ্ঠা ভিন্ন সকলেই বিয়ে করতে পারে। বিধবা-বিবাহ এদের মধ্যে প্রচলিত। দেবর থাকলে তাকেই বিবাহ করতে হয় বিধবাকে। তবে দেবরের অসম্মতিতে অন্য কাউকে বিবাহ করতে পারে বটে, কিন্তু সে ক্ষেত্রে নূতন স্বামীকে পূর্ব স্বামীর আত্মীয়-স্বজনদের কিছু অর্থ দিতে হয়। তবে বিধবা-বিবাহে সিঁদুর দান হয় না বা অন্য কোন আচার-অনুষ্ঠানও হয় না। কেবল স্বামী একখানা নূতন বস্ত্র পরিয়ে তাকে ঘরে নিয়ে আসে। স্ত্রী মুখরা, কলহপ্রিয়া ও দ্বিচারিণী হলে গ্রাম পঞ্চায়েতের মতানুসারে স্বামী তাকে ত্যাগ করতে পারে। কিম্বা উভয়ে বিবাহ বিচ্ছেদে রাজী হলে তারা পঞ্চায়েতের সামনে একটি শালপাতা ছিঁড়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে পারে। স্বামীর বর্তমানে স্ত্রী উপপতি গ্রহণ করলে উপপতিকে স্বামী -প্রদত্ত বিবাহ-পণ দিতে হয়। কিন্তু পরিত্যক্তা স্ত্রীর সম্বন্ধে প্রত্যর্পিত বিবাহ-পণ সেই স্ত্রী পায়।[৯]

সূর্যদেবতাই এদের প্রধান উপাস্য দেবতা। সূর্যকে এরা 'গোঁসাই' নামে অভিহিত করে। সকাল-সন্ধ্যায় তারা সূর্য প্রণাম করে। বিশেষ এক রবিবারে গৃহস্বামীর এই সূর্য পূজাকালে সূর্য ওঠার আগে একটি মাটির পাত্র, নতুন ঝুড়ি, চাল, তেল, সুপারী, সিঁদুর ও তামার 'লোটার' মধ্যে আম্রপল্লব নিয়ে বাড়ীর সম্মুখে মুক্ত প্রান্তরে উপস্থিত হয়। ক্রম-উদিত সূর্যের প্রতি তখন অর্ঘ্যাদি নিবেদন করে গৃহস্বামী এবং পরিবারের মঙ্গলকামনা তথা আপদ-বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য গোঁসাইকে প্রার্থনা করে। এ সময় ছাগলকে চাল খেতে দেওয়া হয় এবং ছাগলটি চাল খেতে সুরু করলে পিছন থেকে তাকে এককোপে বলি দেওয়া হয়। সেই ছাগমাংস পরিবারবর্গ এবং প্রতিবেশীরা খায় এবং ছাগমুণ্ড প্রসাদ হিসেবে গণ্য হয়ে পৃথকভাবে রান্না করে কেবল সেই পরিবারের সদস্যেরাই গ্রহণ করার অধিকারী।[১০]

সূর্য বা গোঁসাই ব্যতীত ধরতি মাই (ধরিত্রী মাতা), তাঁর পরিচারিকা 'গরামী (অন্য মতে ভগিনী) এবং সিংবাহিনীর পূজাও তারা করে। এই সিংবাহিনীর বাঘ, সাপ, বিছা প্রভৃতির উপর আছে আধিপত্য। আষাঢ় ও মাঘ মাসে এই ধরতি মাই-এর পূজায় শূওর, ছাগ, মুরগী ইত্যাদি বলি হয় এবং দুর্গা পূজোর সময় সিংবাহিনীর পূজা হয়। পূজারীর গৃহ সম্মুখে তেল-সিঁদুর লিপ্ত একতাল মাটি উৎসর্গ-উদ্দেশ্যে রেখে মহিষ বা ছাগল বলি দেওয়া হয়। গ্রামের মাঝিই পুরোহিতের কাজ করে। মাঘ মাসের এই 'ধরতি মাই' ডালটন কথিত 'ভুঁই' দেব। এদের পৃথক কোন পুরোহিত নেই। নিজেদের মধ্যেই কাউকে পূজারী করে।[১১] মালদা জেলার কোন কোন অঞ্চলে এই মালপাহাড়িদের (যেমন মদনাবতী অঞ্চলে) তারা দুর্গা, কালী, মনসা বা বিষহরি প্রভৃতির পূজাও করে এবং পৌষ-পার্বণের মত পৌষ উৎসবও পালন করে। প্রায় দেড়শ বছর আগে বুকাননের সময় মালপাহাড়িরা সর্বত্র তাদের শবদেহকে সেদিনই সমাধিস্থ করতো।[১২] কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে এসে এই রীতিরও পরিবর্তন ঘটেছে। এখন এই সম্প্রদায় শবদেহকে সমাধিস্থ করে, আবার দাহও করে। অত্যন্ত দরিদ্র মালপাহাড়িরা সমাধিস্থ করার সময় শবদেহের মস্তকটি দক্ষিণ দিকে স্থাপন করে এবং শ্মশান-বান্ধবদের নুন ও ছাতুমাত্র দিয়ে আপ্যায়ন করে। এ জেলায় আবার শ্রাদ্ধাদির ভিন্নরূপও দেখা যায়। ওল্ড মালদা অঞ্চলে শবদাহ করার দিনই তারা দাঁড়ি কামিয়ে বাড়ি ফেরে এবং মৃতের পুত্র মস্তক মুন্ডন করে। ১৩ দিন পর নাপিত সকলের চুল দাঁড়ি কাটে। শ্রাদ্ধদিবসে মৃতের উদ্দেশে খিচুড়ি রান্না করে হাঁড়িশুদ্ধ ভাত নিয়ে ফেলতে ফেলতে বাড়ী থেকে সমাধিস্থল বা শ্মশান পর্যন্ত

ছেলে যায়। আবার পুত্রের মৃত্যুতে পিতাও সেই ক্রিয়া করে। পরে আত্মীয় স্বজন ও বান্ধবদের প্রথমে ছাতু, মুড়ি ইত্যাদি খাইয়ে পরে ভাত, মাছ ইত্যাদি খাওয়ানো হয়। পুত্র ১৩ দিন তেল-নুন ছাড়া ফ্যান-ভাত খায়।[১৩] কিন্তু বামনগোলা অঞ্চলে ১৩ দিন মৃতের পুত্র ঘটিতে তামার পয়সা, জল, তুলসীপাতা ও কাঁচি নিয়ে তুলসীপাতার জল সকলের গায়ে জল ছিটিয়ে শুদ্ধ করে তারপর ছাতু খায় এবং অবশেষে ভাত মাছ তরকারী দিয়ে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হয়। পরদিন সমাজের সকলকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয়।

মালদা জেলায় পুরাতন মালদার ঝাঁঝরা, কাটাবাড়ী, মশালডাঙ্গা, গোয়ালপাড়া এবং ইংরেজ বাজারের আজিমপুর, গোপালপুর, সুলতানপুর, নাজিরখানি, কিষানপুর, রামকেলী, সাগরদীঘি; গাজোলের বকদীঘি, ভালুকডাঙ্গা, মজলিসবাগ, আলমপুর, রাণীপুর, একান্দর, ফতেপুর, ঘাকসোল, মীরজাতপুর, শুকানদীঘি ইত্যাদি অঞ্চলে মালপাহাড়ীদের অধিক বাস।

আদমসুমারী অনুসারে অবিভক্ত ও বিভক্ত মালদায় মালপাহাড়ীদের জনসংখ্যা—

| ১৮৭২ | ১৮৮১ | ১৮৯১ | ১৯০১ | ১৯১১ | ১৯২১ | ১৯৩১ | ১৯৪১ | ১৯৫১ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ৫০ | ১২৯২ | ... | ৯৩০ | ৩৯৬ | ১৩৩ |

... (১০০০-এর কম হওয়ায় নথিভুক্ত হয়নি।)[১৪]

## পাদটীকা

১. Dalton E.T. - Descriptive Ethnology of Bengal, P-274
২. Ibid, P-274
২খ. Beverley H – Report on the Census of Bengal, 1872. P-184-85
২গ. বাংলা বিশ্বকোষ, চতুর্দশ ভাগ, পৃ - ৬৫১
৩. Risley H. H -The Tribes and Castes of Bengal, Vol. II, P-66
৪. Buchanan - Eastern India, II, P-126
৫. Ibid, P-274
৬. Dalton, Ibid P-274
৭. Ball - Jungle life in India, P-229
৭খ. চঞ্চল বসু - মালদার আদিবাসী, পৃষ্ঠা-১১
৮. Risley, Op. Cit., P-70
৯. Op. Cit., P-70
১০. Op. Cit., P-274
১১. Dalton E.T. - Ibid, P-274
১২. Risley H H - Ibid, P-72
১৩. চঞ্চল বসু - প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১২
১৪. Mitra A. Op. Cit. P-108

ক্ষেত্রানুসন্ধানে ও তথ্যদানে - পোহাতু পুঝড়, সমিত সরকার, আফাজুর রহমান।

# মাহালি, মহালি, মহিলি, মহলি

এরা ছোটনাগপুর এবং পশ্চিমবাংলার এক মজুর শ্রেণী, পাল্কীবহন ও বাঁশ-বেতের কাজে নিযুক্ত অস্ট্রিক-ভাষী আদিবাসী। মাহালিদের উপবিভাগ পাঁচটি —

১. বঁশফোড়-মাহালি — সবরকম বাঁশের সরঞ্জাম বা দ্রব্যাদি নির্মাতা

২. পাটর-মাহালি — ঝুড়ি নির্মাতা ও কৃষিজীবী

৩. সুলুঙ্খী-মাহালি — কৃষিজীবী ও মজুর

৪. তাঁতী-মাহালি — পাল্কী-বেহারা

৫. মাহালি-মুণ্ডা — এই উপসম্প্রদায় অতি ক্ষুদ্র এবং এরা লোহারডাঙ্গা অঞ্চলেই কেবল সীমাবদ্ধ।[১] সম্ভবতঃ এরা মুণ্ডাদের সঙ্গে মিশে এক মিশ্র গোষ্ঠী হয়েছে। রিজলির ধারণা যে কুলদেবতা বিভাগে মাহালিরা সাঁওতাল গোষ্ঠীরই কোন কোন পরিবার। ধীরে ধীরে বাঁশের কাজে দক্ষ হয়ে উঠলে কালক্রমে তারা পৃথক আদিবাসী গোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।[২]

আদিবাসী সাঁওতাল ও কোড়াদের মত মাহালিদেরও কতকগুলি 'পারিস' বা গোত্র আছে। যেমন কুঁড়িয়ার, হাঁসদা, ডুংরি, মাররী, সিল্লি, টিরকি, কারকুসা, কেরকেটা, মারমুয়ার, টাপায়ের ইত্যাদি। এক পারিসের সঙ্গে অন্য পারিসের রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, বিধি-নিষেধের পার্থক্য লক্ষ্য করা গেলেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করে। সকলেই স্বীকার করেন যে মাহালিরা 'হড়' গোষ্ঠীভুক্ত।[৩]

মাহালিদের সমাজ কোড়া বা সাঁওতালদের মত বড় নয়। সাধারণতঃ একটি গ্রামে এদের একটি সমাজ থাকে, তবে বড় গ্রাম হলে দুটি সমাজ থাকতে পারে। এ সমাজের দুটি ভাগ — ১. দিগর সমাজ ২. গ্রাম সমাজ। অনেক গ্রাম সমাজ (৪০/৫০টি) মিলে দিগর সমাজ হয়। দিগর সমাজ জাতিগত কোন বড় ব্যাপারে বসে। যেমন সাঁওতাল মেয়ে ও মাহালি ছেলে পরস্পরে পছন্দ করে বিয়ে করলে বিবাহের স্বীকৃতির জন্য দিগর সমাজের 'মহত' বিচার করতে আসে। বিচারে ছেলেটিকে সাধারণতঃ ভোজ দিতে হয় এবং তাতে মীমাংসা হয়। অন্যদিকে গ্রাম-সমাজে তিনজন 'মহত' থাকে। যথা — ১. মাঁঝি হারাম অর্থাৎ গ্রামের প্রধান — বিচারের সিদ্ধান্ত

গ্রহণকারী। ২. পারানিক বা পরামাণিক — সহকারী (যুক্তি, তর্ক-বিতর্ক সংগত কিনা তা লক্ষ্য করবে)

৩. গোডেৎ বা গড়েৎ — গ্রামের বিভিন্ন সংবাদ নেওয়া-দেওয়া করে। তাকে সহকারী মাঁঝি বলা হয়।[৪]

এই মাঁঝির দায়িত্ব বংশানুক্রমিক। এদের মধ্যে এক গোত্র বা পারিসে বিবাহের চল নেই। মাহালিদের মধ্যে চার রকমের বিবাহের প্রচলন আছে — ১. ঘটক দ্বারা সম্বন্ধ স্থির করে বিবাহ। ২. ঢুক (intrusion) বিবাহ। ৩. আমাপর বা টানা। ৪. সিঁদুর-ঘসা বিবাহ। 'ঢুক বিবাহ' বলতে বোঝায় যে কোন যুবতী তার পছন্দ মতো পুরুষকে জোর করে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করে হঠাৎ সেই ছেলেটির বাড়ীতে ঢুকে পড়ে। সাধারণতঃ ওরা একে 'ঘরামী হারণে' বলে। তখন পাত্রের বাড়ীর নারীরা তাকে নানাভাবে নির্যাতন করে। সেই নির্যাতন সহ্য করেও যদি মেয়েটি সে বাড়ীতে থেকে যায়, তবে সেই বিবাহ সিদ্ধ হবে এবং সামাজিক অনুমোদন লাভ করে। অন্যদিকে ফুসলিয়ে মেয়ে নিয়ে পালানো বা টেনে নিয়ে বিবাহ। একে 'আমাপর' বলে। প্রকাশ্য রাস্তায় বা হাটে-বাজারে যদি কোন পুরুষ কোন মেয়ের মাথায় সিঁদুর পরিয়ে দেয়, তখন ঐ মেয়েটি তার স্ত্রী হিসেবে পরিগণিত হবে। তবে তৃতীয় শ্রেণীর বিবাহে তাদের ছেলে-মেয়ে হওয়ার পর গ্রাম সমাজের মহত দিগর সমাজের মহতকে আমন্ত্রণ জানায়, আসে আত্মীয়-স্বজনেরা, এবং সেখানে ভোজ দেওয়ার পর তাদের সমাজে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

ঘটক দ্বারা সম্বন্ধের বিবাহ এদের মারোয়ার (মণ্ডপ > মংডর > মঁড়রা) মধ্যে হলেও 'বলু'তে (জানু) বিবাহ হয় অর্থাৎ মেয়ে পিতার 'বলু' বা জানুতে বসে পশ্চিম দিকে এবং পূর্ব দিকে ছেলে থাকে তার পিতার 'বলু'তে। এদের ভাষায় — "বলুরে দুরূপ কেতে বাপলা হুয়ুইয়া" (বাপলা = বিবাহ, দুরূপ = বসা বা বসে, হুয়ুইয়া = হয়) উভয়পক্ষের আর্জি হয়ে বিয়ে হয়। মারোয়াতে বিবাহের আগে পূজা হয়। এই পূজার উপকরণ দুটি পাঁঠা, সাতটি মোরগ এবং মদ। বিয়ের সময় নাচ-গান হয়। এদের বিবাহে পুরোহিত লাগে না। নিজেরাই পৌরোহিত্যের কাজ করে। মেয়ে পক্ষের মায়েদের বরযাত্রীর উদ্দেশে একটি গান —

হেড় কুলহী হানা গোনা<br>
উপর কুলহী আওয়াই লো বারিযাত<br>
কিয়া দিয়া হাতিরে ঘোড়াওয়া<br>
ডালে ভাতে বুঝাবো বারিয়াতকে

(অর্থ ঃ বরযাত্রীরা এসেছে হাতি-ঘোড়ায় চড়ে। তাদের কি দিয়ে মান-সম্মান করবো। ডাল-ভাত খাইয়ে সম্মান জানাবো।)

মাহালিদের বিবাহে সিঁদুর-দান প্রথা আছে।

এদের ছেলেদের বাম হাতে উলকি (ওদের ভাষায় 'গোদ্না') দিয়ে নিজের নাম লেখা হয় এবং মেয়েদের বুকে ফুল আঁকা থাকে।

মাহালিদের প্রত্যেকটি বিবাহ-বাসরে মাঁঝি বা গ্রাম্য প্রধান উপস্থিত থাকে এবং তাদের দশটি পান পাতা ও দশটি সুপারী দেওয়া হয় 'মাঁঝি-মান্য' হিসেবে। অর্থাৎ তার কর্তৃত্বকে স্বীকৃতি দিতে হয়। মাঝে-মাঝে বর-কনের পক্ষ থেকে কাপড় ও নগদ অর্থ প্রাপ্তিও তাদের হয়ে থাকে।[৫] গোড়েৎ বিবাহের কিছু আচার-অনুষ্ঠানও করে। তাদের শ্রাদ্ধ-শান্তিতে কিছু আচার-অনুষ্ঠানও থাকে। এই গোড়েৎ সামাজিক খাওয়া-দাওয়ার উৎসবে রান্নাও করে। বিয়ে বাড়ীতে রান্না করলে সাধারণতঃ ধুতি সহ দশটি পান পাতা 'পরানিক মান্য' হিসেবে পায়।[৬] বিধবা-বিবাহ বা 'সাঙ্গা' মাহালিদের সমাজে প্রচলিত আছে।

মালদা জেলায় মাহালিরা বিহারের বর্তমান ঝাড়খণ্ড থেকে প্রায় একশ বছর আগে এসে বসতি স্থাপন করে। এ জেলায় ওল্ড মালদা ব্লকের শিমূলঢাব (রাঙামাটির অন্তর্গত), জহুরী, গাজোল ব্লকের মঞ্জুলি বাগ (আলমপুর), একান্দর ও চিরাকুটি ইত্যাদি গ্রামে এদের অধিক বাস। মালদার মাহালিদের প্রধান পূজা ও উৎসবের মধ্যে আছে দুর্গা পূজা (গ্রাম পূজা) ও নবান্ন উৎসব।

মাহালিদের মধ্যে দরিদ্ররা শবদেহ কবর দেয়, কিন্তু যারা সঙ্গতিপূর্ণ তারা দাহ করে। যে মুখাগ্নি করে সে মৃতদেহের মারকিন বস্ত্রের একটি ফালি ছিঁড়ে গলায় 'কাছা' পরে। হাতে থাকে কুশের আসন। মুখাগ্নি যে করে, সেই ক্রিয়া-কর্মে পৌরোহিত্য করে। গ্রামের লোকেরা নিমন্ত্রিত হয় ও আত্মীয়-স্বজনেরা আসে মদ ও মুরগী নিয়ে (ওদের ভাষায় 'সানদিশ')। পুরোহিত নূতন ধুতি পরে এবং মস্তক মুণ্ডন করে।

আদমসুমারী আনুসারে মালদা জেলায় মাহালিদের জনসংখ্যা ঃ

| ১৮৭২ | ১৮৮১ | ১৮৯১ | ১৯০১ | ১৯১১ | ১৯২১ | ১৯৩১ | ১৯৪১ | ১৯৫১ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ১৯৬৫ | ১৫৭৪ | ২৭০৭ | ... | ১৯৬৮ | ১৩৯৩ | ১২৪৭[৭] |

● পাদটীকা

১. Risley H. H., The Tribes and Castes of Bengal, Vol.II, p-40
২. ibid, p-40
৩. প্রবোধকুমার ভৌমিক - প্রথাসিদ্ধ আইন প্রসঙ্গে ঃ মাহালি, লোকসংস্কৃতি গবেষণা, ১০/৪, পৃ-৪৮৮
৪. প্রাগুক্ত, পৃ-৪৮৮
৫. Shyamalkanti Sengupta, Social Profiles of the Mahalis,p=190
৬. ibid, p-191
৭. Mitra A - Op. Cit, p-107

ক্ষেত্রানুসন্ধানে ও তথ্যদানে ঃ মোহিত রায়, সমিত সরকার, দেওয়ান সোরেন,লক্ষ্মীরাম মাহালি।

# মালে, মাল, শামরিয়া মলে, শবর পহাড়িয়া, শবরিয়া পাহাড়িয়া, শৌরীয়া, শামিল পাহাড়িয়া, আসল পহাড়িয়া, সঙ্গী

এরা রাজমহল পর্বতের দ্রাবিড়ীয় কৃষক বংশ থেকে উদ্ভূত। সম্ভবত এরা ওঁরাওদের সমগোত্রীয় এবং বৃহৎ বিক্ষিপ্তভাবে শবর জাতিরই একটি বিচ্ছিন্ন শাখা।[১] টলেমি এদের Sabarae এবং প্লিনি Suari শব্দে উল্লেখ করেছেন।[২] এই অতি প্রাচীন জাতির কথা ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৭/১৮)-এ আছে।[৩] এই জাতির প্রকৃত নাম মাল। অবশ্য সিংভূমের ভুঁইয়া কৈরীর এক উপসম্প্রদায়, তুরী সম্প্রদায়ের এবং সাঁওতাল জাতির উপসম্প্রদায়ের বিভাজন-সপ্তের অন্যতমকেও মাল বলে। এদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য চরম দ্রাবিড়ীয় রূপ। মাল বা মালে বা শৌরীয়া পাহাড়িয়া মাল পাহাড়িয়াদের থেকে দৈহিক ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপে বেশ স্বতন্ত্র। এদের নাসিকা সূচক ৯৪.৫, নিগ্রবটুদেরই আনুপাতিকভাবে নিকটতম।[৪] সাধারণতঃ মধ্য উচ্চতা বিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণের বলিষ্ঠ চেহারা এদের। সম্ভবত মুণ্ডাদের সঙ্গেও তাদের নৈকট্য আছে। পুরাণে এদের বর্ণনা আছে —

মালা ভিল্লাঃ কিরাতাশ্চ সর্ব্বেঽপি ম্লেচ্ছজাতয়ঃ। (ভা. ৬/৯/৩৯)। আগে এরা চৌকীদারের পদেই বেশী কাজ করেছে। রাজমহল পর্বতের মালেরা অরণ্যবেষ্টিত পার্বত্যময় অঞ্চলে এবং বিশেষতঃ তাদের অন্তহীন অন্তর্গোষ্ঠীর বিবাদে তারা মুসলিম শাসনেও স্বাধীনতা ভোগ করেছিল। তারা ইংরেজ শাসনকেও সম্পূর্ণ স্বীকার করে নি। কেবলমাত্র স্থানীয় জমিদারের সঙ্গে তাদের বোঝাপড়া ছিল। পর্বতের সীমান্তবর্তী জমিতে তারা চাষের অধিকার পেতো। পার্বত্য জমিতে 'টপ্পা' নামে যে বিভাগ বা ভুক্তি ছিল তা এক বা একাধিক 'সর্দার'-এর অধীনে থাকতো, তাদের অধীনে গ্রামের মোড়ল (মাঁঝি) থাকতো এবং এর পরিবর্তে অপরাধী দমন ও অপরাধ হ্রাসের দায়িত্ব তাদের উপর ন্যস্ত ছিল। তা ছাড়া পার্বত্য অঞ্চল থেকে সমভূমি অঞ্চলের পথের নিরাপত্তার জন্য পাহারার ব্যবস্থাদিও তাদের কর্তব্যের অন্তর্গত ছিল। প্রতি বছর 'দশহরা' উৎসবে 'সর্দার' ও মাঁঝিরা সমভূমিতে এসে ভোজ ইত্যাদিতে যোগ দিয়ে জমিদারের 'পাগড়ী' তারা গ্রহণ করতো এবং জমিতে চাষ বাসের স্বত্ব পুনর্নবীকরণ করা হত।[৫] কিন্তু অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে এই বার্ষিক ভোজন-উৎসবের সময় চাতুরির দ্বারা বহু গ্রামের মোড়লকে হত্যা করায় তারা পথ রক্ষার

কাজ ত্যাগ করে এবং চারিদিকে লুঠতরাজ সুরু করে। কিন্তু ১৭৭০ সাল পর্যন্ত জমিদারের পুলিশী ব্যবস্থায় এ অবস্থা আংশিক বন্ধ হলেও, ১৭৭০ সালে (বাংলা ১২৭৬ সন) অর্থাৎ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়ে রাজমহল পাহাড় ও গঙ্গার মধ্যবর্তী এলাকায় এই পুলিশী ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হওয়ায় এই মালদের করুণার উপরে এলাকার নিরাপত্তা ন্যস্ত হয়। কিন্তু যেহেতু জঙ্গলের খাদ্যের উপর এই সব আদিম জাতি নির্ভরশীল, তাই মন্বন্তর তাদের বিশেষ সমস্যা আনে নি। মন্বন্তরোত্তর পর্বে তাদের লুণ্ঠন পর্ব এবং পূর্ববর্তী পর্যায়ে তাদের মোড়লদের হত্যা করায় তার প্রতিশোধ গ্রহণ করায় বদ্ধপরিকর ছিল। তা ছাড়া রাজমহলের পথে এবং তেলিয়াগড়ি গিরিপথে সরকারী ডাক প্রায়শই ছিনতাই এবং ডাক হরকরা হত্যা দেখা গেল। ব্রিটিশ সরকারের মুসলমান শাসকদের ন্যায় তাদের দমন করার চেষ্টাও বার বার ব্যর্থ হয়। ১৭৭২ সালে ক্যাপ্টেন ব্রুকের অধীনে এক লঘুভার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী (Light infantry) সৃষ্ট হয়। কিন্তু দুর্গম পার্বত্য প্রদেশে ম্যালেরিয়া -প্রবণ অঞ্চলে মালেদের তীর-ধনুকের নিকট ইংরেজ সৈন্য পর্যুদস্ত হয়। ১৭৭৮ সালে ক্যাপ্টেন ব্রাউন সেনাবাহিনীর প্রধান হয়ে এই পাহাড়িয়াদের শান্ত করার জন্য সরকারের নিকট কতিপয় প্রস্তাব পাঠান। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতিপয় প্রস্তাব ঃ

১. বিভাগের (Division) সর্দ্দারদের মাল জাতিদের প্রধান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে সরকার কর্তৃক সনদ দান এবং চুক্তি (এটি প্রতি বৎসর নবীকরণ যোগ্য) হিসেবে তাদের কতকগুলি কর্তব্য করতে হবে। এমনভাবে মাঁঝিদের ও সর্দ্দারদের মান্য করতে হবে এবং সমস্ত দায় দায়িত্ব পাকা করতে হবে সনদের ভিত্তিতে।

২. যে সব সর্দ্দারের 'টপ্‌পা' রাজপথের পাশে, তারা কিছু আর্থিক ভাতা পাবে। কারণ ডাক হরকরাদের নিরাপত্তার জন্য পুলিশী-প্রহরার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে এটি তাদের দ্বারা ডাকাতি যাতে না হয়, তার জন্য এটি উৎকোচ-বিশেষ।

৩. যে কোন কাজ-কারবার, লেন-দেন — সবই সর্দ্দার ও মাঁঝিদের মাধ্যমেই হবে এবং সমভূমি বা পর্বতের পাদদেশে বাজার স্থাপন করে পার্বত্য ও সমভূমি এলাকার মানুষের মেলামেশার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

৪. ১৭৭০ সাল থেকে বন্ধ পুরাতন 'চৌকী বন্দী' (পর পর পুলিশ ফাঁড়ি) পুনরায় চালু করতে হবে। কিন্তু এই পুলিশ ফাঁড়িগুলি জমিদারদের হাত থেকে 'থানাদার' বা সরকারী পুলিশ অফিসারের হাতে দিতে হবে। তাঁরা আবার 'সজাওল' বা বিভাগীয় পরিচালকের (Divisional Superintendent) অধীনে থাকবেন। এই পুলিশ বাহিনীর মধ্যে যারা অকর্মণ্য তাদের পর্বতের সানুদেশের জমির অধিকার দিতে হবে, কারণ তারা মাল আক্রমণ প্রতিহত করায় সরকারকে সাহায্য করেছিল।

কিন্তু ১৭৭৯ সালে পার্বত্য-রাজমহল অঞ্চল ভাগলপুর বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ক্যাপ্টেন ব্রাউনের হাত থেকে প্রশাসনিক অধিকার অগস্টাস ক্লিভল্যাণ্ডের উপরে ন্যস্ত হয়। ক্লিভল্যাণ্ড মালদের দ্বারায় গঠিত একটি চারশ পার্বত্য তীরন্দাজ বাহিনী (Corps of Hill Archers) গঠনের প্রস্তাব দেন। তাতে বলা হয় যে ঐ বাহিনী ৮ জন সর্দ্দার-অফিসারের অধীনে থাকবে এবং তারা থাকবে ভাগলপুর জেলা সমাহর্তার অধীনে। সর্দ্দার-অফিসাররা মাসিক পাঁচ টাকা ও সৈনিকরা তিন টাকা

বেতন পাবে এবং তাদের লাল জামা ও পাগড়ী থাকবে। কিন্তু সমকালের গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এই প্রস্তাব বিশেষ ব্যয়বহুল হওয়ায় নাকচ করে ক্লিভল্যাণ্ডের অপর একটি প্রস্তাব — বিভাগের সমস্ত সর্দ্দারকে মাসিক ১০ টাকা ও তাদের সহকারী 'নায়িব'দের পাঁচ টাকা করে ভাতা মঞ্জুর করেন। ১৭৮০ সালে অবশ্য 'তীরন্দাজ বাহিনী' গঠনের প্রস্তাব পাশ হয়। ইতিমধ্যে পার্বত্য প্রদেশে সংঘর্ষ সুরু হলে ঐ তীরন্দাজ বাহিনীই তা ঠাণ্ডা করলে 'ভাগলপুর হিল রেঞ্জার্স' নামে এক বাহিনী গঠিত হয় এবং লেফটেন্যাণ্ট শ তার প্রধান হন। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর এটি বন্ধ হয়। মাল সৈন্যদের অপরাধের শাস্তিও দেওয়া হত। পার্বত্য জাতিদের নিয়ে গঠিত সংস্থার প্রধান জেলা শাসকের দরবারে অপরাধের বিচার ও শাস্তির সিদ্ধান্ত হতো। গুরুতর শাস্তির ব্যাপারটি উচ্চতর নিজামত আদালতের অধীন ছিল।[৭] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে ক্লিভল্যাণ্ড তাঁর মৃত্যুর এক বছর আগে অর্থাৎ ১৭৮৩ সালে প্রচুর অনাবাদী পাহাড়ের পাদদেশের পতিত-জমি বিলিবণ্টনের জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব দেন। তন্মধ্যে উল্লেখ্য —

১. প্রত্যেক সর্দ্দারকে ১০০ থেকে ৩০০ বিঘা নিষ্কর জমি দিতে হবে।

২. সর্দ্দারের অধস্তন যে কোন মাল যে কোন পরিমাণ নিষ্কর জমি প্রথম দশ বছরের জন্য পাবে।

৩. সকল সর্দ্দার এবং মাঁঝিদের সরকারী পেনসন বন্ধ হবে, যদি তারা এক বছরের মধ্যে সমভূমিতে অবতরণ না করে। এবং এইভাবে সমভূমি অঞ্চলের ভূমি-মালিকদের সঙ্গে মত বিনিময়ে তারা সুশিক্ষিত হবে।

কিন্তু পশ্চিম অঞ্চল থেকে সাঁওতালদের অভিবাসনের (immigration) ফলে সমতলভূমির অধিবাসীর সঙ্গে তাদের সামাজিক আদান প্রদানের পথ বন্ধ হয়।[৮]

আদিতে মাল বা শৌরীয়া/শবর পাহাড়িয়ারা শিকার করে দলবদ্ধভাবেই থাকতো, কিন্তু পরবর্তী পর্বে চাষবাস ও অন্যান্য পরিশ্রম-সাধ্য কর্মের দ্বারই জীবিকা নির্বাহ করতে সুরু করে। তাদের কিছু সংখ্যক সাপুড়ে, আবার কিছু সংখ্যক বেদে।[৮ক]

প্রথম দিকে এদের বিবাহে ঘটক (ওদের ভাষায় 'সিথু') যোগাযোগ করে, কিন্তু কন্যাপণ নিয়ে পাত্রপক্ষ রাজী হলে একটি শুভদিন ঠিক করে পাত্র তার বন্ধুবান্ধব ও বিবাহের আপ্যায়নের জন্য একটি ছাগল সহ কনে-গৃহে যেত। উভয় পক্ষ বিপরীত দিকে বসতো। পাত্র পূর্ব দিকে মুখ করে ও কন্যা পশ্চিম দিকে মুখ করে বসতো এবং কন্যার বন্ধুবান্ধবরা তৈলাদি দ্বারা তার কেশবিন্যাস পর্ব সাঙ্গ করলে কন্যার পিতা মেয়ের হাত ধরে কন্যা কানা, খোঁড়া বা বধির নয় তা ঘোষণা করে বরের হাতে সমর্পণ করে তাকে স্নেহের সাথে গ্রহণ করার জন্য বলতো এ পর্ব শেষ হলে 'সিথু' বরের ডান হাতের কড়ে আঙ্গুলে সিঁদুর লাগিয়ে মেয়ের কপালে পাঁচটি ফোঁটা পরিয়ে দিত। কন্যাটি এর পর এমন ভাবেই বরের কপালে পাঁচটি সিঁদুর ফোঁটা পরিয়ে দেওয়ায় সাহায্য করতো। অনুষ্ঠান-পর্ব সমাপ্তির নিদর্শন রূপে বন্দুকের গুলি ছোঁড়া হত এবং বর-কনে এক থালায় আহার-পর্বের মধ্যে দুটি জীবনের মিলনের-প্রতীক চিহ্নিত হত। এর পর ভোজন-পর্ব সুরু।

মাল বা পাহাড়ীরা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। তারা বিশ্বাস করে যে মৃত্যুর পর তাদের প্রথম পূর্ব-পুরুষের ধর্মোপদেশে কর্ম অনুযায়ী তারা পুরস্কৃত হয় বা শাস্তি পায়।[৯]

দেবতাকে মালেরা বেড়ো (Bedo) বলে। তাদের সমস্ত দেবতার নামের সঙ্গে গোঁসাই (সং < গোস্বামী) যোগ করে। কখনো কখনো 'নড়' (Nad) শব্দটিও ব্যবহৃত হয়। অপ্রধান দেবতাগুলি নিম্নরূপ ঃ

১. রক্সি

নরখাদক বাঘ যখন গ্রামে প্রবেশ করে কিম্বা মহামারী দেখা গেলে পুরোহিতের সহায়তায় একটি বড় গাছের নীচে একটি 'কালো পাথর' রেখে তার পাশে 'সিজ' মনসার (Euphorbia) পাতা দিয়ে ঘিরে প্রার্থনা জানানো হয়।

২. চাল/চালনাড়

গ্রামে কোন দুর্দশা দেখা দিলে কালো পাথর 'মাক্‌সুম' গাছের নীচে রেখে প্রার্থনা করে তারা। এবং প্রতি তিন বছর অন্তর 'চিতারিন' উৎসবে একটি গাভী উৎসর্গিত হয়।

৩. পাও গোঁসাই

বড় রাস্তার যাত্রীরা এঁর অর্চনা করে। বেল গাছের নীচে তাঁর বেদী স্থাপন করে মোরগ বলি দেওয়া হয়। তখন একবার পূজায় বহুবার পথচলা সুগম হয়ে যায়। কোন দুর্ঘটনা হলে আবার তাঁর অর্চনা প্রয়োজন।

৪. দোয়ার গোঁসাই

প্রতি গ্রামের রক্ষাকারিণী দেবতা। ইনি ওঁরাওদের 'দাবা' বা 'দারহা'-র সমতুল। পারিবারিক ক্ষেত্রে বিপদ-আপদ উপস্থিত হলে এই দেবতার অর্চনার ব্যবস্থা হয়। গৃহের সম্মুখে একটি স্থান পরিষ্কার করে 'মুকমুম' বৃক্ষের ডাল পোঁতা হয়। এই বৃক্ষ ছোটনাগপুরের 'করম' বৃক্ষের ন্যায় পবিত্র হিসেবে গণ্য। এ ডালটির পাশে একটি ডিম রাখা হয় এবং একটি শূকর বধ করে বন্ধু-বান্ধবদের আপ্যায়িত করা হয়। পূজার্চনা শেষ হলে ডিমটি ভাঙ্গা হয় এবং 'মুকমুম'-এর ডালটি গৃহস্বামীর ঘরের উপরে স্থাপন করা হয়।

৫. কুল গোঁসাই

পর্বত আরোহণকারীদের রক্ষক দেবতার বার্ষিক-অর্চনা বীজ বপনের সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্গতিসম্পন্নেরা ছিন্নমুষ্ক ছাগ বা ভেড়া বলি দেয়। আর দরিদ্রেরা পাখী-মুরগী (Fowl) নিবেদন করে। পরিবারের প্রধান কোন বৃক্ষতলে 'মুকমুম' গাছের ডাল পুঁতে নৈবেদ্য দেয়। গ্রামের পূজারী তাকে সাহায্য করে এবং বলির পশু বা পাখীর রক্ত পান করার ভান করে। বলির এক চতুর্থাংশ মাঁঝিকে উপহার দিতে হয়।

৬. আউট্‌গা

শিকারের দেবতা। প্রতিটি সফল অভিযানের পর কৃতজ্ঞতা-সূচক এ উৎসব অত্যন্ত জনপ্রিয়। তাদের শিকার সম্পর্কিত অলিখিত আইন অত্যন্ত কঠোরভাবে পালিত হয়।[১০]

**৭. গুমু গোঁসাই**

কখনো কখনো এই দেবতা কুল গোঁসাই-এর সঙ্গে যুক্তভাবে পূজা পান। তবে পৃথকভাবেও করা হয়। যে এঁর পূজা করে সে বাড়ীর-খাবার খায় না এবং বলির মাংসও খায় না। শুধু তাই নয়, অনুষ্ঠানের পর পাঁচদিন পর পর্যন্ত এই নিয়ম মানতে হয়।

লেপ্টেন্যাণ্ট শ' আরও একটি দেবতার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন —

**৮. চামড়া গোঁসাই**

এ দেবতার পূজার উপকরণ ও ক্রিয়া-কর্মাদি এত বেশী যে প্রধানেরা এবং বিত্তবানেরাই তা করায় সক্ষম। পূজারীর নির্দেশমত তাকে সব জিনিস সংগ্রহ করতে হয় — যাতে হয়তো ১২টি শূকর, বহু সংখ্যক ছাগল এবং সেই অনুপাতে চাল ও তেল জোগান দিতে হয়। তিনটি বাঁশের গায়ে গাছের ছাল এমনভাবে জড়াতে হয় যে ত্রিবর্ণের পতাকার মত হয় এবং তার শেষাংশটি কাল বা লাল রঙ করে মধ্যভাগটি স্বাভাবিক রঙ হিসেবে ছেড়ে দিতে হয়। তিনটি বাঁশের মধ্যে একটিতে নব্বুইটি, অন্যটিতে ষাটটি এবং তৃতীয়টিতে কুড়িটি পতাকা যুক্ত করে ময়ূরের পালকে ভূষিত করা হয়। এটি চামড়া গোঁসাই হিসাবে গৃহস্বামীর বাড়ীর সামনে স্থাপিত হয়। খাওয়া-দাওয়া পর্বের পর সমস্ত অতিথিই সারা রাত্রি নাচে মত্ত থাকে। এর মধ্যে তিনজন চামড়া গোঁসাই-র প্রতিমূর্তি ধরে রাখে। প্রাতে গৃহস্বামীর গৃহ, মাঠে উৎপন্ন শস্য এবং পরিবারের সকলের মঙ্গল কামনায় বলি চলে। 'মুকমুম' শাখায় বলির রক্ত ছিটিয়ে বেদীতে দাগ দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের সমাপ্তিতে বাঁশগুলি ভিতরে নিয়ে গিয়ে গৃহস্বামীর গৃহশীর্ষে বেঁধে দিলে এই অনুষ্ঠান পূর্ণতার পরিচায়ক হয়ে ওঠে।[১১]

পূর্বে ঝাড়খণ্ডের রাজমহল পার্বত্য অঞ্চলের খুটা ইত্যাদি পাহাড় থেকে এরা গঙ্গা পেরিয়ে মালদা অঞ্চলে এসে প্রায় চার পুরুষ আগে বসবাস করছে। তবে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের মাল বা শবরিয়া পাহাড়িয়াদের পুরাতন সমাজ বিন্যাসেরও খবর পাওয়া যায়। এর কারণ হিসেবে বলা যায় যে ঝাড়খণ্ড এলাকায় ·. বিশিষ্ট সমাজ ব্যবস্থা ও শ্রেণী বিন্যাস ছিল, তা এখানকার পরিবেশ-প্রাতিবেশে ও পার্শ্ববর্তী হিন্দু সমাজের অনেক রীতি-নীতিতে পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন ওল্ড মালদা অঞ্চলে তাদের জাতিগত ভাবে কতিপয় শ্রেণী দেখা যায়। যেমন — কুজুর, কেরকাটা, পাহাড়িয়া মুণ্ডা, ওঁরাও তিরকি। আবার সমাজ ব্যবস্থায় তারা সাঁওতাল সমাজের মত পাঁচ বিশিষ্ট-ব্যক্তিত্বের নির্দেশ মানে। সেগুলি হলো — ১. মাঁঝি হারাম ২. পরামাণিক/পারাণিক ৩. নাইকি (সমাজের পুরোহিত) ৪. জগ মাঁঝি ৫. গড়িৎ (বার্তা বাহক)। আবার পোপড়া অঞ্চলে তাদের চারটি শ্রেণী আছে বলে জানা যায় — ১. বালকো ২. গোঢ়া ৩. কচলু ও ৪. কক্‌কো। আবার সেখানে গড়িৎকে 'ডাকুয়া'ও বলে। সমাজের বিচার মাঁঝি হারাম গ্রহণ করে।[১২]

এ জেলায় মাল বা পাহাড়িয়াদের পূর্বে পুরোহিত ব্যতীতই বিবাহ অনুষ্ঠিত হতো। কিন্তু অধুনা পুরোহিতের তারা সাহায্য নেয়। বাল্য বিবাহের প্রচলন এখনও আছে। সম্পত্তি আজও ছেলেরা পায় তিনভাগ ও মেয়েরা একভাগ।

মালে বা মালদের মধ্যে ডাইনী প্রথা প্রচলিত। কয়েকবছর আগে কোতয়ালী অঞ্চলে রাধিকা পাহাড়ী (৪০) নামে এক মহিলা ডাইনী সন্দেহে গ্রামবাসী দ্বারা খুন হয়েছে বলে জানা যায়।

রাজমহলের এক গুণীনের নিকট তার নাম নাকি জানা যায়। যদিও পুলিশি তদন্ত চলে এবং জনা চারেক ব্যক্তিরও কারাদণ্ড হয় বলে প্রকাশ।

এ জেলার মালেদের মুখ্য পেশা চাষবাস, মজদুরি, ধানকাটা, ধান মাড়াই, ধান লাগানো, ধান সিদ্ধ করা ইত্যাদি।

মালে বা মাল বা শবরিয়া পাহাড়ীদের মধ্যে বিবাহের গীতও প্রচলিত আছে। যেমন একটি গীত —

চার্চ পুনু পন্দে কী
ফুটা নারাণী।
এঙ্গেহো জোড়া পুনু
রূপে ঝিং ঝিরি।

(অর্থ ঃ তুমি পাথরের মালা পরে দেমাক দেখাচ্ছ। দেখ তোমার চেয়ে আমার অনেক বেশী ও উজ্জ্বল রূপোর মালা আছে)

আদমসুমারী অনুসারে এ জেলার মালদের জনসংখ্যা ঃ

| ১৮৭২ | ১৮৮১ | ১৮৯১ | ১৯০১ | ১৯১১ | ১৯২১ | ১৯৩১ | ১৯৪১ | ১৯৫১ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২,০৬২ | ৮৬২ | ..... | ২,৫৫৩ | ২,০০৬ | ১,১৮৩ | ৩,০৪৫ | ১,৪৫২ | ১,১৪৩ |

● পাদটীকা

১. Risley H. H - The Tribes and Castes of Bengal, Vol.II, p-57
২. McCrindle J. W - Ancient India as described by Ptolemy (Ed. Jain R C.), p-173
৩. নগেন্দ্রনাথ বসু - বাংলা বিশ্বকোষ, বিংশতি ভাগ, পৃ-১৮৯
৪. Risley, ibid, p-51
৫. ibid, p-52
৬. ibid, p-52-56
৭. Dalton E. T - Descriptive Ethnology of Bengal, p-267
৮. Risley H. H. - ibid, p-55-56
৮ক. Mitra A, Op. Cit., p-74
৯ ibid, p-57
১০. Shaw Lieutenant - Asiatic Researches, Vol.IV, p-48
১১. Dalton E. T. - ibid, p-268-69
১২. চঞ্চল বসু - মালদার আদিবাসী, পৃ-৫
১৩. Mitra A, Op. Cit. p-108

ক্ষেত্রানুসন্ধানে ও তথ্যদানে ঃ ফর্সা পাহাড়ীয়া, সালিচারা পাহাড়ী, ঠাকুর পাহাড়ী, গোপালচন্দ্র পাঠক, সমিত সরকার

# কোরা, কোড়া, কাওরা, খইরা, খয়রা, কারা

রিজলি তাদের উপরি উক্ত উচ্চারণে অভিহিত করেছেন।[১] অন্যদিকে গেইট 'কারা' বলে অভিহিত করেছেন। মাটির কাজে যুক্ত এই কৃষিজীবী সম্প্রদায় মূলতঃ ছোটনাগপুর এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ বাংলার অধিবাসী মুণ্ডা জাতিরই এক শাখা। মানভূম ও বাঁকুড়ার কোরা বা খয়রাদের গোত্র দেবতা (Totem) অনেকাংশে এক।[২]

প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, বিভিন্ন প্রদেশে এদের বিভিন্ন উপভাগ দেখা যায়। সাঁওতাল পরগণার যে সব কোড়ারা নাগপুর থেকে এসেছে বলে দাবী করে তাদের সম্প্রদায় সম্পর্কে অনেক কিম্বদন্তীর প্রচলন আছে। আবার আরও পূর্বদিক থেকে যে সব কোড়াদের আগমন, তারা চারটি ভাগে বিভক্ত ঃ ১. ধলো ২. মলো ৩. শিখরিয়া ৪. বাদামীয়া। বাঁকুড়া জেলায় আবার এই শিখরিয়াদের তিনটি ভাগ ঃ ১. সোনারেখা ২. ঝেটিয়া ৩. গুরি বায়া।[২ক]

মালদা অঞ্চলে কোড়াদের সমাজ কতকগুলি গোত্রকে অবলম্বন করে গঠিত হয় — যা তাদের ভাষায়'পারিস' নামে অভিহিত। এই পারিসের অনেকগুলি ভাগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সামদোয়ার, হারদি, কোরি, কাঁচ, তিরকি, চিরু, কিসার নাগরু, ছাগেড় ইত্যাদি।

এদের সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব থাকে চারজন 'মহৎ'-এর উপর। এরা যথাক্রমে গড়াৎ, পরামাণিক, মাহাত এবং আইন মোড়ল। এদের কর্তব্যও চার প্রকার। যেমন গড়াৎ কোন উৎসব-অনুষ্ঠানের আগে সমাজের অন্তর্ভুক্ত সকলকে জানায় এবং আলাপ-আলোচনার জন্য কোন জায়গা (গাছতলা বা কোন একটি স্থান), যা তাদের ভাষায় 'আখড়া' — তা স্থির করে। 'আইন' মোড়ল-এর কাজ হল গড়াৎ-এর কাছ থেকে এ সবের কারণ জিজ্ঞাসা করা এবং জানা। পরামাণিকের উপর ভার থাকে সম্পূর্ণ আলোচনা ভালভাবে শোনার ও মনে রাখা এবং শেষে মাহাত সব আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সারা ভারতের সমস্ত কোড়া সম্প্রদায়ের নিয়ম-শৃঙ্খলার ধারক ও বাহক তিনজন — পাড়ে, ছেড়দার ও আইন মহত। কোন গোত্রের নিয়ম-নীতি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এ তিনজনের রিশেষ ভূমিকা আছে। তবে বর্তমানে নানা সম্প্রদায় পাশাপাশি বাস করার ফলে তাদের সম্প্রদায়ের বিধিনিষেধ ও সামাজিক সম্পর্কের মধ্যেও শৈথিল্য এসেছে। কোড়াদের খাদ্যবস্তুর মধ্যে গরু

ব্যতীত অন্যান্য গৃহপালিত পশু — যেমন ছাগল, ভেড়া, শূকর, মুরগী ইত্যাদি আছে। তবে তারা মাঠের ইঁদুর খায় না বলে কেউ কেউ বললেও প্রকৃতপক্ষে তা যথার্থ নয়।[৮] ছোটনাগপুর ও মানভূমের কোড়ারা গোমাংসও ভক্ষণ করে। এবং তাদের পূজারী নিজেদের সম্প্রদায়েরই 'লাইয়া'।

কোড়াদের বিবাহ দু ধরনের — ১. ঘটকের মাধ্যমে পাত্র-পাত্রী ঠিক করে বিবাহ ২. টেনে এনে বিবাহ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, একই গোত্রের মধ্যে এদের বিবাহ সিদ্ধ নয়। যেমন 'হারদি' গোত্রের ছেলে ও মেয়ের বিবাহ হবে না। কিন্তু 'হারদি'র সঙ্গে 'চিরু' বা 'তিরকির বিবাহ হতে পারে। এদের মধ্যে নাবালিকার বিবাহ পছন্দের এবং বিধবার বিবাহ প্রায় পরিত্যক্ত। বিবাহ-বাসরে (মারোয়া) প্রথমে লাল মোরগ ও মদ দিয়ে পূজো হয়। এ পূজোর সময় মেয়েরা চারপাক ঘুরে গান করে —

চারু কোনা কোলসা বেসালো
চরিয়ো রাজা উগি গেলো
চরিয়ো রাজা উগি গেলো।
(অর্থ ঃ চার কোণায় ঘট বসালো, সূর্য রাজা উদিত হলো)

এদের বিবাহে পুরোহিত বা ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয় না। বিবাহের একটা অনুষ্ঠানের মধ্যে কোঠারি নাহা বা ঘটি নাহা উল্লেখ্য। তা হল বর-কন্যার স্নানের সময় কন্যা ঘটি বা ঘট হারায় এবং বর তা জলের মধ্য থেকে খুঁজে বের করে।

কোড়ারা মনসা, ভৈরব ঠাকুর, ভাদু ইত্যাদি পূজা করে। তাদের প্রধান উৎসব মূলতঃ তিনটি — ১. ভাদ্রমাসের কর্মা পূজা

২. অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন উৎসব

৩. মাঘ মাসে সহরায়

কর্মা পূজা 'দশালি' পূজা হিসেবে পরিচিত। কোড়াদের নিজেদের মধ্যেরই কোন পূজারী কর্মা পূজার ডালা তৈরী করে এবং পূজার সমস্ত বিধি করে কুমারী মেয়েরা। পূজার আয়োজন চলে পাঁচদিন ধরে। ডালা পূজার প্রথম দিন মেয়েদের একটি গীত —

হোরিয়ারে গোবরা ঘাড়ে
আঙনা নিপাল ওরে
ঘাটেরে মাঠেরে।

(অর্থ ঃ প্রথম দিনে গোবর দিয়ে ঘর, বাড়ী, আঙিনা, মাঠ, ঘাট মোছা হল)

এমন ভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দিনে গানের মাধ্যমে পূজার পর পঞ্চম দিনে কর্মা গাছের ডাল পুঁতে পূজা হয় এবং এ দিনে হয় 'বারাম' অর্থাৎ দেবতারা ভর করেন। এ দিন সমস্ত রাত জেগে থাকতে হয় এবং কাহিনী শোনা ও নাচের মধ্য দিয়ে রাত কাটে। হয় ঝুমোর (ঝুমুর) নাচ এবং সঙ্গে থাকে গান।

একটি গান —

আনদিনে করাম গসায় (=গোঁসাই), শ্রীবৃন্দাবনে

আজো করাম গসায়, মাঝ কুলি আওরে।

(অর্থ ঃ অন্যদিনে করম দেবতা বৃন্দাবনে থাকেন। আজকে করম দেবতা আমাদের মধ্যে আছেন)

নবান্নের মত সহরায় বা বাদনা পরবও এদের বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গরু, ছাগল, মহিষ ইত্যাদি চরায় যে সব রাখালেরা, তারাই এ উৎসবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এ পূজা মাঠে হয়। সন্ধ্যার সময় রাখালেরা সকল বাড়ী থেকে চাল সংগ্রহ করে থাকে। এবং সে সময়ে একটা গীত গায় —

এক লথ ঝিঙালথ<br>
বাড়ী বাড়ী যাই,<br>
কাকারো বহু বেটি<br>
ঝিঙানা খাই।<br>
যে সানা রাজাক বেটি<br>
তেসানা ডুমোরেকে ফুল।

কোড়াদের মধ্যে ডাইনী প্রথা, ভূতে পাওয়া, হাওয়া ধরা ইত্যাদি কুসংস্কারগুলি আজও দেখা যায়। তারা বাদনা পরবের সময় একবার ধনুক, বল্লম, বাঁটুল ইত্যাদি নিয়ে শিকারে যায় এবং ইঁদুর, পাখী ইত্যাদি শিকার করে সবাই একস্থানে মিলিত হয়ে রান্না করে খাওয়া-দাওয়া করে।

১৮৭২ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত এ জেলায় কোড়া সম্প্রদায়ের পরিসংখ্যান (আদমসুমারী অনুযায়ী) ঃ

| ১৮৭২ | ১৮৮১ | ১৮৯১ | ১৯০১ | ১৯১১ | ১৯২১ | ১৯৩১ | ১৯৪১ | ১৯৫১ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .... | .... | .... | ৩৪৯২ | ২৮৭১ | .... | ৩৩৭১ | ১৬০১ | ১৬৫৮ |

[.... প্রাপ্ত নয় / সূত্র — A. Mitra – ibid, p-105]

মালদা জেলায় গাজোলের মল্লিকপুর, পাহাড়িভিটা, আমলিতলা, কাগাসুরা, দক্ষিণ মালডাঙা, মোল্লাদীঘি, নিজগ্রাম, আটগ্রাম, উত্তর মাহিনগর, কালীপুকুর, তুলসীডাঙ্গা, শঙ্করপুর, সরাকান্দর, মাতইল কোড়াপাড়া, কাটনা, দুর্গাপুর ইত্যাদি গ্রামে, ওল্ড মালদা ব্লকে নেমুয়া, কামাত, খেড়কাঠি তুলাডাঙ্গী, সৈয়দপুর, কুইকুড়ি, পূর্ব বাঞ্ছাপুর এবং হবিবপুর ব্লকের সিমুলজুরী ইত্যাদি গ্রামে কোড়াদের অধিক বাস।

## ● পাদটীকা

১. Risley H. H. – The Tribes and Castes of Bengal, Vol. I, p-506

২. ibid, p-506

২ক. ibid, p-507

৩. Mitra A – The Tribes and Castes of West Bengal, p-74

ক্ষেত্রানুসন্ধানে ও তথ্যদানে — ধনেশ্বর মুদি, বাকসরাই, হাঁতিপুতি, গাজোল, মোহিত রায়, হাট ফতেরাজ (মৌজা), গাজোল

# খারোয়ার, খরবার, খেরওয়ার

এরা ছোটনাগপুর ও দক্ষিণ বিহারের কৃষিজীবী। ডালটন ছোটনাগপুরের খারোয়ার সমাজ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তাদের আদিবাসী চরিত্রের বিশেষতঃ Turanian রূপ লুপ্ত হওয়ার ব্যাপারে আর্য জাতির বিভিন্ন প্রশাখার সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ককেই কারণ বলে মনে করেন।[১] তিনি যশপুরের রাজার সম্ভ্রান্ত রাজপুত নারীর সঙ্গে বিবাহের কথাও উল্লেখ করেছেন। অন্যত্র ডালটন খারোয়ার ও চেরোদের সম্পর্কের কথাও বলেছেন। তারা রোটাস থেকে পালামৌ-এ রাজপুত প্রধানকে বিতাড়িত করে 'সরগুজা' নামে একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করে। চেরো ও খারোয়ারদের মধ্যে বিবাহও প্রচলিত ছিল। ডালটনের মতে সাঁওতালদের সঙ্গে খারোয়ারদের আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। চম্পাদেশে সাঁওতাল, মুণ্ডা, কুড়মী প্রভৃতি জাতি খারোয়ার নামে অভিহিত হত।[২]

বাংলাদেশের খারোয়াররা বাঙালীর আচার-অনুষ্ঠান, ধর্ম-কর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নানান বিষয় গ্রহণ করেছে বটে, কিন্তু তাদের আদিম বৈশিষ্ট্য দেড় শতাধিক বৎসর আগে পালামৌ ইত্যাদি অঞ্চলে বিদ্যমান ছিল। যেমন পালামৌ অঞ্চলে খারোয়ারদের নিকট সূর্য পৃথক দেবতা না হলেও প্রচণ্ড দুঃখ-দুর্দশায় তারা সূর্য পূজা করে, তবে তাঁর আলাদা নাম নেই। তাঁকে 'সূরজ' নামে ডাকা হয় এবং যে কোন সূর্যালোকিত স্থানই তাঁর বেদী।[৩] মালদহ অঞ্চলে খারোয়ারদের আগমনে তারা পুরাতন অনেক রীতি-নীতিই বর্জন করেছে। যেমন তাদের পুরোহিত কোন ব্রাহ্মণ নয়। প্রত্যেকটি গ্রামেই তাদের একজন পুরোহিত থাকতো, যাকে 'পাহন্' বলতো — যারা মিশ্র-আদিবাসী, ভুঁইয়া, খারোয়ার কিম্বা 'পারহেয়া' (পাহাড়ীয়া?)। তাকে 'ভাইগা'ও বলা হতো। তারাই প্রতি তিন বছর অন্তর চেরোদের মত একটি মহিষ বা অন্য কোন প্রাণী পবিত্র 'সরণায়' বলি দেওয়ার ব্যাপারে অধিকারী ছিল।[৩ক] এখানে কোন ব্রাহ্মণের অধিকার ছিল না। গ্রাম দেবতা কখনো দুয়ার পাহাড়, কখনো ধর্তি (ধরিত্রী), কখনো 'পার্গাহাইলি' কিম্বা 'ডাকনাই' বা 'দুরা' বলে অভিহিত হতো। বর্ণ হিন্দুদের কোন দেবতার স্থান সেখানে ছিল না।[৪]

প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে কোথাও কোথাও খারোয়ারদের মধ্যে অনেকগুলি 'থর' আছে। কছুয়া, কাঁশ, গাই, বেল, বাঘ, নাগ, মুরগি ইত্যাদি থর দেখে অনেকে এদের দ্রাবিড়জাতি-সম্ভূত মনে করেন। যার যে 'থর' সেই থরের জীবজন্তু বা বৃক্ষাদিকে তারা সম্মান করে।[৫]

শতাধিক বছর আগে বাংলার বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, রাজসাহী, মালদহ ইত্যাদি জেলায় খারোয়ারদের বসতি স্থাপন করতে দেখা যায়। ১৮৭২ ও ১৮৮১ — এই দুই আদমসুমারীতে অনেক জেলায় তাদের নূতন বসতির খবরও মেলে। আবার মালদা জেলায় ১৮৭২ সালে ও ১৮৮১ সালে তাদের লোকসংখ্যা যথাক্রমে ৬০০৫ এবং ৪০৯৫। বর্তমানে মালদা জেলার রতুয়া অঞ্চলের রতুয়া, রুকুন্দিপুর, জাননগর, দেবীপুর, হরিপুর, মোর্চা, পীরগাঁই, ঘাসিনগর, খৈলসনা, নশীপুর, কুমারগঞ্জ, রঘুনাথপুর, বইরিয়া, গোরক্ষাপেরান, গোপালপুর ইত্যাদি গ্রামে, মাণিকচকের ব্রাহ্মণ গ্রাম, চাঁচলের ক্ষেমপুর, চাঁচল, কাশিমপুর, কালিগঞ্জ, রণঘাট, পরাণপুর, এবং গাজোল ব্লকে মহরিয়া ইত্যাদি অধিক গ্রামে বাস। প্রায় দেড়শ/দুশো বছর আগে তাদের এসব ভূখণ্ডে আগমন।

পূর্বে খারোয়ারদের গ্রামের বিচার ব্যবস্থা মোড়লদের উপর ন্যস্ত ছিল। 'বাইশী মোড়ল' এবং তারপর সর্বোচ্চ 'চুরাশি মোড়ল'। অপরাধীর অবস্থানুসারে অর্থদণ্ড ধার্য হতো, বর্তমানে পঞ্চায়েত সে স্থান অধিকার করেছে। 'ডাইনী'তে তাদের বিশ্বাস আগে ছিল। ডাইনী সন্দেহে তার দৈহিক নির্যাতন এবং গ্রাম থেকে নির্বাসনের দণ্ড ছিল।

এদের মধ্যে বরপণ আছে। আগের দিন সন্ধ্যায় সত্যনারায়ণ পূজা এবং "কাসাভাজা" (হলুদ ও ধান) হয় এবং সে রাত্রে অন্য বাড়িতে তা যাঁতাতে পেষাই করা হয় এবং সেটি (উটকন) পরের দিন মেয়ের গায়ে সাতবার মাখানো হয়। অন্যান্য মহিলারা দুপুরে আ-ফসলী জমি থেকে মাটি ও নদী থেকে জল নিয়ে আসে। এরপর একটা ছোট মাটির হাঁড়িতে তিনটি কাঠি পুঁতে ত্রিকোণাকার উনুন তৈরী করে কাসা ভাজা হয় — যা বিয়ের সময় দাদা ও ভাইয়েরা দেয়। রাত্রে বিবাহের পর সিঁদুর দান এবং বরের হাত দুধ দিয়ে ধোয়া ইত্যাদি নানা রীতি আছে। বিবাহের পর গীতানুষ্ঠান আছে। সে সব গীতে যেমন বর্ষীয়সীদের নব পরিণীতা বধূর উদ্দেশে নানা উপদেশ-নির্দেশ আছে, তেমনই মেয়েরও বরপণ না দেওয়ার জন্য পিতার কাছে নিবেদনও আছে, আছে পিতৃকুল ছাড়ার বেদনা। যেমন —

আগলামে উবিজিল মা তুলসীর গাছ
আমার কোখে জন্ম নিল মা সুন্দর বেটি,
বারে বারে মানা করি বাবা, তুই পরের হাতে না দিও টাকাকড়ি
কাটিবে চন্দন গাছ, বাড়ি নিয়ে যাবে তোমার বেটিরে।

সাধারণতঃ মাতুলালয়ে এদের সন্তান হয়। অন্য ঘরে মা ও সন্তান ছয় দিন থাকে এবং ছদিনের দিন ষষ্ঠীপূজা করে সাতদিন বা নয়দিনে নদীতে স্নান করিয়ে ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজা হয়। পুত্র সন্তান হলে পামাড়িয়াদের গান হয়। গ্রামদেবতার (গ্রাম দেব্‌তী) পূজা ব্যতীত ইদানীংকালে মালদায় তাদের গম্ভীরা পূজা ও হোলির গান হয় এবং বিবাহিতা মেয়েরা গীতাষ্টমী পূজা করে। তবে বিহার অঞ্চলে এরা মূর্তিপূজক ছিল না। এরা পরমেশ্বর-এ বিশ্বাস করে। দড়া, ডাকিন, গাঁহেল, পচিয়ান, চেরি, চত্তর ও দুজাগিয়া — একটি এদের উপাস্য দেবতা বলে কথিত।* দুজাগিয়ার অপর নাম মুচুকরাণী। মুচুকরাণীর বিবাহ এদের মধ্যে একটি প্রধান উৎসব।

মালদা জেলায় হরিশ্চন্দ্রপুরের দক্ষিণ ভাকুরিয়া, সহড়া বহড়া, মোহরিয়া, চাঁচল ২ নং

ব্লকের ক্ষেমপুর, কাশিমপুর, রতুয়ার এক নম্বর ব্লকের বইরিয়া, দেবীপুর, রতুয়া খারোয়ারতলা, রঘুনাথপুর, রতুয়া দু'নম্বর ব্লকের কুমারগঞ্জ, খৈলসনা, গোকুলপুর, মুর্চা, ঘাসিনগর, নসীপুর, নওগামা, আইলপাড়া, হরিপুর, পীরগাই, গাজোল ব্লকের গোবিন্দপুর ইত্যাদি গ্রামে এদের অধিক বাস।

## ● পাদটীকা

১. Dalton – Descriptive Ethnology of Bengal (Risley H. H, The Tribes and Castes of Bengal, Vol. I, p-473)

২. সুরেন্দ্রমোহন ভৌমিক - সাঁওতালী কথা, পৃ-১৫

৩. Dalton – Descriptive Ethnology of Bengal, p-130

৩খ. Ditto, p-127

৪. Dalton in Risley, p-475

৫. নগেন্দ্রনাথ বসু - বাংলা বিশ্বকোষ, পঞ্চম ভাগ, পৃ-৭১

৬. প্রাগুক্ত, পৃ-৭১

ক্ষেত্রানুসন্ধানে ও তথ্য দানে — পিংকি মণ্ডল, অতুলচন্দ্র মণ্ডল, খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, সুবলচন্দ্র মণ্ডল ও মোহাম্মদ খাইজামান আলি।

# কোঁচ, কোচ, কোচ্-মণ্ডই, রাজবংশী, পলিয়া, পলি, দেশী

কোচ উত্তর-পূর্ব ও পূর্ববঙ্গের কিঞ্চিৎ মঙ্গোলীয় রক্ত মিশ্রণে এক দ্রাবিড়ীয় উপজাতি।[১] ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মতে মাংসচ্ছেদির গর্ভে তীবরের ঔরসে এ জাতির উৎপত্তি —

মাংসচ্ছেদাং তীবরেণ কোঁচশ্চ পরিকীর্তিতঃ। ব্রহ্মখণ্ড (১০/১০৪)।[২]

মোটামুটি কামরূপ, প্রাচীন মৎস্যদেশ, অর্থাৎ নিম্ন আসাম, রংপুর, পূর্ণিয়া অর্থাৎ ৮৭°৪৫ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ থেকে প্রাচীন মিথিলা এবং পূর্বে ৯৩° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে কোচদের বাস।[৩]

কোচেরা এখন আর নিজেদের কোচ না বলে কোচবিহার, রংপুর, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর ও মালদায় রাজবংশী বলে পরিচয় দেয়। কথিত আছে যে এদের মধ্যে বিচক্ষণ শক্তিমান জনৈক হরিয়া মণ্ডল কোচবিহারের রাজার প্রথমে মন্ত্রী হয়ে পরে ষড়যন্ত্র করে তাঁকে হত্যা করে নিজে ঐ বংশের রাজার দাবীদার হয়।[৪] তখন থেকেই ঐ বংশের প্রত্যেকেই 'রাজবংশী' বলে পরিচয় দিতে সুরু করে। রাজবংশীদের কেউ কেউ আবার নিজেদের সূর্যবংশীয় দশরথের বংশ বলেও দাবী করে। এই রাজবংশীরা ক্ষত্রিয় বলেও দাবী করে। কারণ পরশুরামের ক্ষত্রিয় নিধনে ভীত হয়ে এরা পলায়ন করে বেঁচেছিল বলেও প্রচার করে। ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের আবার দুটি ভাগ — ১. ক্ষত্রিয় ও ২. ভঙ্গ ক্ষত্রিয়। যারা পৈতা পরিধান করে তারা ক্ষত্রিয় এবং পৈতাহীনরা ভঙ্গ ক্ষত্রিয়। এদের গোত্র কাশ্যপ। অনেকে এদের নারীদের বস্ত্রাদি পরিধানের ধরণ-ধারণে দ্রাবিড় সমাজের গোত্রভুক্ত বলে অনুমান করেন। কারণ আর্যদের বাংলায় প্রবেশের পর এরা বিতাড়িত হয়ে বাংলার উত্তর ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের বনাঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে। তা ছাড়া শিরোসূচক, নাসিকাসূচক ও নাসিক-হনু সূচক (Cephalic, nasal ও naso-malar indices)-এ তারা দ্রাবিড়ীয় বংশোদ্ভূত বলেও অনুমান। তবে দৈহিক উচ্চতা, গায়ের রঙ, হনু ও দাঁড়ি গোঁফের হ্রস্বতায় মঙ্গোলীয়[৫] রক্তও এদের কম নয়।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশীরা 'শিববংশী' বলেও পরিচয় দেয়। এ প্রসঙ্গে তারা ষোড়শ শতকের কোচসর্দ্দার হাজুর কন্যা হীরার সঙ্গে দেবাদিদেব শিবের সম্পর্ক উথাপন করে। এদের সমার্থক ভঙ্গ ক্ষত্রিয়, পতিত ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রি-সংকোচ এবং সূরজবংশী। পরশুরামের ভয়ে ভীত হয়ে পলাতক

বলে এদের এক শ্রেণী 'পলিয়া'। অবশ্য বুকানন মনে করেন যে এককালে যারা দিনাজপুর ও রংপুরে পানিকোচ নামে পরিচিত ছিল, তারাই 'পলিয়া' নামে পরিচিত। উত্তরাধিকার ও পারিবারিক পরিচয়ে এরা ছিল মাতৃতান্ত্রিক।[৬] ডালটন গারো পাহাড়ের প্রান্তবর্তী পানিকোচ গ্রাম সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে রাভা জাতির সঙ্গেও তাদের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন।[৭] কোচবিহারের রাজবংশ ও জলপাইগুড়ির রায়কত বংশের সঙ্গে যারা সংস্রব যুক্ত, তারাই বাবু পলিয়া বা কেবলমাত্র রাজবংশী বলে পরিচয় দেয়। আবার এই পলিয়াদের দুটি ভাগ আছে। ১. সাধু পলিয়া ২. বাবু পলিয়া। উপবীত যারা ধারণ করে তারা সাধু পলিয়া। সাধু পলিয়ারা বাবু পলিয়া অপেক্ষা কিছুটা শুদ্ধাচারী। বাবু পলিয়ারা শূকর, পক্ষী, গোসাপ, কুমীর ইত্যাদির মাংস খায় ও অত্যধিক মদ্যপান করে। কিন্তু সাধু পলিয়াদের নিকট তার কোনটিই গ্রাহ্য নয়। দিনাজপুরের এক শ্রেণীর 'কোচ' 'দেশী' নামে খ্যাত। যারা পালিয়ে গিয়েও দেশে ফিরেছিল তাদের 'দেশী' বলে অনেকে মনে করেন। আবার বেভারলির মতে যারা পূর্ব থেকেই ছিল তারাই দেশী।[৮] দেশী ও গৌড়দেশী (গৌড় অঞ্চলে বাস) বলেও তাদের ভাগ আছে কোথাও কোথাও। পলিয়াদের থেকে তারা নিজেদের উচ্চ শ্রেণী বলে মনে করে। দেশী কোচেরা পুরুষ পলিয়া-কোচের হাতের অন্ন, জল, মিষ্টান্ন গ্রহণ করে বটে, কিন্তু পলিয়া-নারীর হাত থেকে গ্রহণ করে না। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে বিবাহও চলে না।[৯]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে বিভিন্ন জেলায় এই সব কোচ-রাজবংশীরা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। যেমন জলপাইগুড়িতে আছে তিনটি শ্রেণী — ১. দোভাষী ২. মোদাসী ও ৩. জালুয়া। দোভাষী কোচেরা শূকর, পাখীর মাংস ও মদ খায়। মোদাসীরা পাখীর মাংস খায় না। অন্যদিকে জালুয়ারা মাছ ধরে ও তা বিক্রী করে। আবার দার্জিলিং-এ আছে তিনটি শ্রেণী — ১. টেঙ্গিয়া, ২. খোপ্রিয়া ও ৩. গোব্রিয়া। এদের বাসস্থান থেকেই এমন নাম বলে মনে হয়। টেঙ্গিয়ারা বাঁশ বা কাঠের টঙ্গের উপর, ছোট ছোট নীচু খুপরি সদৃশ ঘরে খোপ্রিয়ারা (খুপরী) এবং গরু বাছুর নিয়ে এক ঘরে থাকে বলে তাদের নাম গোব্রিয়া। অবশ্য এ পার্থক্য আজ লুপ্ত।

মালদায় রাজবংশীদের চারটি শ্রেণী আছে — ১. হাইলা ২. জাইলা ৩. কোচ ৪. পলিয়া।

হাইলা বা হেলে অর্থাৎ হাল-চাষ করে হাইলা শ্রেণী। জাইলা বা জেলে অর্থাৎ মাছ ধরা ও বিক্রী করা এদের পেশা।

মালদা জেলায় বামনগোলা থানায় নিমডাঙ্গা, নালাগোলা, হবিবপুর থানায় আতলা, দোক্‌লা, সিঙাবাদ, গাজোল থানায় রাণীগঞ্জ, ওল্ড মালদায় বালিয়া- নবাবগঞ্জ, কালিয়াচক থানায় গোলাপগঞ্জ, সুকুলপুর, চক বাহাদুরপুর, শ্মশানী, এবং চাঁচল থানায় দৈভাণ্ডা ইত্যাদি গ্রামে জালিয়া রাজবংশীর অধিক বাস। অন্যদিকে হাইলা রাজবংশীদের বাস বামনগোলা থানার শুকইল, নেপালপুর, কাশিমপুর, ডাবর, সিমলা, গাঙ্গুরিয়া, শ্রীপুর, শালালপুর, মীর্জাপুর, কানতুর্কা, কাদিরপুর, হবিবপুর, খানপুর, গোবিন্দপুর, বিনাকইল, সাদাপুর, গোপালপুর, বৈচপুর, চৌকীবাড়ী, ছুচইল, মুরগীকান্দর, আহরইল, সিংরা; গাজোল থানায় হাটনগর, পাইল, আহিল, দহিল প্রভৃতি গ্রামে।

আবার পলিয়াদের বাস অধিক বামনগোলা থানায় সবমুড়া, জাইতন, শিশকুড়ি, পলাশবাড়ি, হরিপুর, কাঁটাবাড়ি, বেলডাঙ্গা; হবিবপুর থানার দাল্লা, মানিকোরা, বৈদ্যপুর, বিজইল, তুলাভিটা, কাচিয়াডাঙ্গা, ভাজাডাঙ্গা, বাঙ্গার, কলাইবাড়ি, আগ্রা, কোটালপুর এবং গাজোল থানার আগমপুর, রাজাপুর ইত্যাদি গ্রামে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, পলিয়াদের মধ্যে আগে প্রতি গ্রামের সম্মানীয় ব্যক্তি

'পোচাস' ও 'মোহত' নামে অভিহিত হত। গ্রামের সকল প্রকার সমস্যার সমাধান তারা করতো। এটিকে 'দশ' বলে। আবার কতকগুলি 'পোচাস' মিলে একটি 'পটি'। ১২ ও ১৮টি পোচাস নিয়ে এমন একটি পটি। তার নেতা বা মালিকেরা প্রতি বছরে মিলিত হয়ে বিভিন্ন নির্দেশ দিলে তা পোচাসদের মাধ্যমে সমাজে পৌঁছাতো। আগে এদের মধ্যে দু'ধরণের বিবাহ ছিল — ১. চড়া বিয়ে ও ২. মাটি বিয়ে। চড়া বিয়ে ঘটকের মাধ্যমে পাত্রীর বাড়ীতে গিয়ে এবং মাটি বিয়েতে বরকে মেয়ের বাবা তার বাড়ীতে এনে একা সমস্ত খরচ বহন করে করতো।

অন্যদিকে 'দেশী'দের এ জেলায় অধিক বাস বামনগোলা থানার তেলিপাড়া, বাশড়া, কিশোরপাতি, গড়পাড়া, চোখপুকুর, বারিন্দা; হবিবপুর থানার দোলমালপুর, কালপেঁচী, ভালুকবোনা, নইবাড়ী, ডাঙ্গাপাড়া, খুটাকাটি, সেকেন্দারা, উলাওর, বাঙ্গা ইর, ওলতারা, গলাকাটি, নাখরিয়া, মাছনিকান্দর, খোঁচাকান্দর, আকতৈল, রাঙামাটি, জামালপুর, ডোমপুকুর, কদমডাঙ্গা; গাজোল থানার শুকানদীঘি, চাঁদপুর; ওল্ড মালদা থানার নয়পাড়া, গুয়াবাড়ী, চৈতা, পোপড়া, বান্দরবোনা ইত্যাদি গ্রামে।

আগেকার দিনের বিবাহ বাসরে 'কলাতলা' বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল। এবং জল পূর্ণ কলসী ও কলাগাছ দিয়ে 'কন্যাসন' ও 'বরাসন' ইত্যাদি সাজানো উল্লেখযোগ্য ছিল। বরাতীরা (যে চারজন সধবা স্ত্রী বরের পরিচর্যা করে) বিবাহের নানা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে এবং সোলার কড়ি ও আতপ চাল ইত্যাদি নিক্ষেপ করার সময় তারা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। এখন তাদের বিয়ের অনুষ্ঠান অনেক সরলীকৃত হয়েছে বর্ণ হিন্দুদের নানা অনুষ্ঠানের প্রভাবে। তবে কন্যার গায়ে হলুদ বা বিবাহ বাসরের নানান গান উল্লেখযোগ্য। যেমন একটি গায়ে হলুদের গানের অংশ —

হলুদরে তোর জন্ম কোন স্থানে —
আমার জন্ম শুনতে পাবে পুরুর দোকানে,
হলুদ আনতে হবে।
কাপড়রে তোর জন্ম কোন স্থানে —
আমার জন্ম শুনতে পাবে তাঁতির দোকানে,
কাপড় আনতে হবে।
শাঁখারে তোর জন্ম কোন স্থানে —
আমার জন্ম শুনতে পাবে শাঁখারুর দোকানে,
শাঁখা আনতে হবে।

পূর্বে বাল্য বিবাহের রীতি বেশী প্রচলিত ছিল। রংপুর, কোচবিহার ইত্যাদি স্থানের রাজবংশীরা বিধবা বিবাহ অনুমোদন করে না। এদের বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথা আছে। নিজেদের পঞ্চায়েত আগে ছিল। স্ত্রী দোষী সাব্যস্ত হলে সেখানে পুরোহিত ও নাপিতের উপস্থিতিতে নাপিত তার মস্তকের চুল কর্তন করে তাকে স্বজাতি থেকে বিতাড়িত করত।

কোচ-রাজবংশীরা অধিকাংশই বৈষ্ণব ও শৈব। দার্জিলিং-এ তান্ত্রিক অধিক। তারা স্থানীয় দেবদেবীর প্রভাবে অনেক পূজা-উৎসব সুরু করেছে। দেশীদের মধ্যে আবার এক শ্রেণীর লোকেরা আকারের পূজারী, আবার অন্য শ্রেণী নিরাকারের পূজারী। কালী, বিষহরি (মনসা), বাস্তুদেবতা,

চামুণ্ডা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, বলীভদ্র ঠাকুর, হনুমান, কোরাকুরী , হুদুমদেও ইত্যাদির পূজা করে। জলপাইগুড়ি অঞ্চলে কাদা বা গোবর দিয়ে দুটি প্রতিমা তৈরী করে কোচ রমণীরা অনাবৃষ্টির সময়ে রাত্রে মাঠে নগ্ন হয়ে অশ্লীল গান গায়। এই অনুষ্ঠান পুরুষের দেখা নিষিদ্ধ।[১০] পেখানী ও যোগিনী স্ত্রী পূজ্য ও সন্ন্যাসী পূজা বর্তমান। নবান্ন তাদের জনপ্রিয় উৎসব। আবার মালদা অঞ্চলে তাদের সম্প্রদায় ভেদে লোকসঙ্গীত প্রিয়তারও পার্থক্য দেখা যায়। যেমন জাইলা (জেলে) রাজবংশীরা ভাটিয়ালি, বাউল, জারি, সারি এবং ঝুমুরের বেশী অনুরাগী। পক্ষান্তরে হাইলা রাজবংশীরা ভাওয়াইয়া, বাউল, কাওয়ালি ও গম্ভীরা পূজায় বেশী আগ্রহী। তবে ইদানীংকালে সকল সম্প্রদায়ের নিকট বাউল অধিকতর প্রিয় হচ্ছে দেখা যায়।

কিছু পরিসংখ্যানে কোচ এবং পরবর্তীকালে রাজবংশী হিসেবেও পলিয়াদের মালদহ জেলায় (অবিভক্ত ও বিভক্ত বাংলায়) জনসংখ্যা দেখানো হলো ঃ

প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, আশি বছরের এই পরিসংখ্যানে তাদের পরিযানের (Migration) নানা কারণ যথা অজন্মা, জিনিসের অপ্রতুলতা, ভূমিকম্প, শিলাবৃষ্টি, ভীষণ ঝড়ে ক্ষতি, ইত্যাদি বর্তমান।

| | ১৮৭২ | ১৮৮১ | ১৮৯১ | ১৯০১ | ১৯১১ | ১৯২১ | ১৯৩১ | ১৯৪১ | ১৯৫১ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কোচ | ১৪,১৭৩ | ৬০,৭০০ | ৬২৯৭৫ | ৮ | ৫,৫৬৩ | ৭৬৩০ | ২৮৩০ | ১১১২ | ৩১৮ |
| রাজবংশী | ২৪৭২৪ | — | — | ৩৮৭৯৯ | ৬০৩৪৬ | ৩৯৪২৯ | ৪২০০৯ | ২৪৪২১ | ২০২৯৪ |
| পালিয়া | ২৪৩২০ | — | — | ১৩৮৭৬ | - | — | ৬১৫৩ | ১৬৬৮ | ১৭৭৯ |

সূত্র - [ Mitra A – The tribes and castes of West Bengal, page-104, 111, 113]

* আদমসুমারীতে দেশীদের পৃথকভাবে চিহ্নিত করা হয় নি।

## ● পাদটীকা

১. Risley H. H. – The Tribes and Castes of Bengal, Vol. I, p-491

২. নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত - বাংলা বিশ্বকোষ, চতুর্থ ভাগ, পৃ-৫১৪

৩. Dalton C.T. – Descriptive Ethnology of Bengal, p-89

৪. Gait E.A. – History of Assam, p-49

৫. Risley, Op. Cit., p-492

৬. Buchanan Francis – Account of the District or Zilla of Rangpur, BK.II, p-133-34

৭. Dalton, ibid, p-91

Beverly H – A Report on the Census of Bengal, p-183

৯. বাংলা বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ-৫১৫

১০. তদেব, পৃ-৫১৭

ক্ষেত্রানুসন্ধানে ও তথ্য দানেঃ বাসুদের সরকার, ডোমাডাঙ্গা, যুগল সরকার, কোচপাড়া, দুর্গামোহন রায়, ঝাড় সাবইল, মাধবচন্দ্র রায়, ঝাড় সাবইল, আমোদিনী বিশ্বাস, রাণীগঞ্জ, দেবযানী বিশ্বাস, রাণীগঞ্জ, বিউটি ঘোষ, হরিশ্চন্দ্রপুর মন্দিরপাড়া।

# বিন্দ, বিন, ভিন্দ, বিন্দু

বিহার এবং উত্তর ভারতের বিরাট কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী, শিকারী এবং শোরা তৈরী, মাটিকাটা কাজ এবং ভেষজ লতাপাতা সংগ্রহকারী এক অন-আর্য জাতি বিশেষ।[১] বিন্ধ্য পাহাড় অঞ্চলে তাদের প্রথম বাস এবং প্রবাদ অনুসারে জানা যায় যে জনৈক পথিক পর্বতের সানুদেশে বাঁশঝাড়ের মধ্যে শব্দ শুনে বাঁশ কেটে ফেলতে তার মধ্য থেকে মাংসল পদার্থ দেখে। সেটি পরে একটি মনুষ্যমূর্তি নেয় এবং সেই পুরুষই বিন্দদের আদিপুরুষ।[২] প্রকৃতপক্ষে এই কিম্বদন্তী কুলদেবতা স্বরূপ। অন্য একটি গল্প-কাহিনীতে জানা যায় যে বিন্দ এবং নুনিয়ারা সকলেই বিন্দ ছিল এবং বর্তমানের নুনিয়ারা বিন্দদেরই বংশধর। এই নুনিয়ারা জনৈক মুসলমান সুলতানের কবর খোঁড়ায় তারা জাতিচ্যুত হয়।[৩] বাংলাদেশে এদের বিন্দুও বলা হয়। ম্যাগ্রা অবশ্য বিন্ ও বিন্দকে পৃথক বলে মনে করেছেন।[৪] শেরিং নুনিয়াদের বিন্দদের একটি শাখা বলে মনে করেছেন। অন্যরা নুনিয়াদের বিন্দদেরই উপ -বিভাগ বলে মনে করেন।
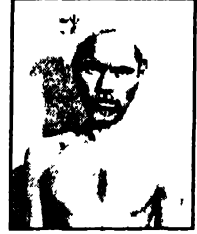
বিহারে বিন্দদের দুটি খণ্ডজাতি বিদ্যমান — ১. খরিয়াত, ২. গোন্ড,। এ দুটি আবার দু ভাগে বিভক্ত — ১. লোধিয়া ও ২. আওধিয়া।[৫] মালদা জেলায় এই জাতির চারটি উপবিভাগ আছে — ১. ভাটিয়াল বিন্দ বা জেঠ বিন্দ বা জেঠাউত বিন্দ ২. পচিয়া (পশ্চিমা) বিন্দ ৩. নুন বিন্দ এবং ৪. ক্ষরবিন্দ। আবার অন্য প্রকার ভেদও দেখা যায়। যেমন — ১. জেঠাউত বিন্দ ২. ভাটিয়া বিন্দ ৩. নুন বিন্দ ৪. আহিড় বিন্দ ৫. গোয়াল বিন্দ ৬. মালাউ বিন্দ ৭. কেওট বিন্দ। এর মধ্যে জেঠ্ বিন্দই শ্রেষ্ঠ। কোন পূজা-পার্বণে এদের বাদ দিয়ে পাঁঠা বা শূওর বলি অন্য বিন্দরা দেয় না। মনে হয় জীবিকা হিসেবে এই প্রকারভেদ। মালাউ ও কেওট বিন্দ ভিন্ন অন্যান্য বিন্দেরা জমিতে সবজি চাষ করে, মালাউ নৌকা বায় এবং কেওট বিন্দ মাছ ধরার কাজে লিপ্ত। বিশেষ কারণবশত বহুবিবাহ প্রচলিত। বিধবা 'সাগাই' রীতিতে দেবর শ্রেণীর বিবাহ করতে পারে। কিন্তু ভাশুরদের মধ্যে কাউকে বিবাহ করতে পারে না।

মালদা জেলার বিন্দরা যেমন বিহার (বালিয়া) থেকে এসেছে, তেমনই পূর্ববঙ্গের (বর্তমান

বাংলাদেশ রাষ্ট্র) রাজশাহী, পাবনা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল প্রভৃতি জেলা থেকে দেশ বিভাগের পূর্বেই অর্থাৎ ৭০/৮০ বছর আগে এ জেলায় বসতি স্থাপন করেছে। এ জেলায় মানিকচক থানার ভুতনীর ধর্মশীল টোলা, ছবি পণ্ডিত টোলা (হীরানন্দপুর অঞ্চল), বাঁকীপুর, শিবনটোলা, রহিমপুর, হাজার বিঘি, খাসমহল, আটগামা, বলরামপুর, লস্করপুর, রতুয়া থানার কাহালা, নরোত্তমপুর, খনিয়া, দুর্গাপুর, রাশুপুর, বালুপুর, চৈতুটোলা, গোবিন্দপুর, দিয়ারা, কালিয়াচক থানার পঞ্চানন্দপুর, (নয়াবাজার), সাকুল্লাপুর, দামোদরটোলো, কুম্ভীরা বা যুগলতলা, নয়াগ্রাম, রাজনগর বাজার, বৈষ্ণবনগর, আকন্দবাড়িয়া, বড় মহদীপুর, ছোট মহদীপুর, মালদা থানার মঙ্গলবাড়ী, সাহাপুর, ইংরেজবাজার থানার রায়পুর, বাগবাড়ী, শান্তিপুর এবং হবিবপুর থানার ঋষিপুর ইত্যাদি গ্রামে এদের বেশী বাস।

বিন্দদের পূজার মধ্যে মশান কালী, গোঠ (সূর্যব্রত), সত্যনারায়ণ পূজা, যম্না মাঈর পূজা, এবং শ্রেষ্ঠ কাশীবাবার পূজা উল্লেখযোগ্য। কাশীবাবার পূজা বা 'সাং' পূজা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই পূজা ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারা হয় না। বিন্দ সম্প্রদায়ের কোন মন্ত্রসিদ্ধ গুণিন্ বা ওঝা (ওদের ভাষায় 'কাফ্রী') এই পূজার পুরোহিত। সাধারণতঃ কার্তিক / অগ্রহায়ণ মাসে এ পূজা হয়। একটি 'সাং' অর্থাৎ তীক্ষ্ণ বর্শা জাতীয় অস্ত্র পূজিত হয়। এ পূজায় সাধারণতঃ পাঁঠা, ভেঁড়া বলি দেওয়া হয়। পাকা কাফ্রী বা পূজারী না হলে এ পূজা করা সম্ভব হয় না। কারণ তাদের বিশ্বাস যে পূজা যথার্থ ভাবে সম্পন্ন না হলে কাফ্রীর মৃত্যু পর্যন্ত হয়। সকলের বিশ্বাস যে কাশীবাবা পূজারীর শরীরে ভর করেন। এই দেবতা যখন পূজারীর শরীরে ভর করেন, তখন কাফ্রী নাকি ২০/২৫ হাত ঊর্ধ্বে উত্থিত হয়ে আবার নীচে নামে। এ পূজায় নূতন মাটির পাত্রে পাঁচ / দশ কেজি দুধ ও আতপ চাল সহযোগে পায়স (ওদের ভাষায় 'ক্ষীর') রান্না হয়। কাশীবাবা কাফ্রীর শরীরে থাকেন বলে কাফরী সেই ফুটন্ত পায়েস খালি হাতে নেড়ে দেয় এবং আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে যায়। তার পিছন পিছন কয়েকবার অনেক ভক্ত খালি পায়ে হাঁটে। এই কাশীবাবা মঙ্গলদায়ক অনেক অসাধ্যসাধন করেন বলে বিশ্বাস। আধুনিক কালে কালীপূজা, দুর্গাপূজা, সরস্বতী পূজা, গৃহদেবতা বা 'দেবাশী' পূজা, — বা মত্ মা, দুলারী মা, শীতলা মা, চামুণ্ডা কালী, ঝাপড়ী কালী, শত্তি বহ্নি মা প্রভৃতি দেবী পূজিতা হন। কারুবীরের পূজাও হয়। কোন কোন পরিবারে 'দেবাশী' পূজায় গোঁসাই ঘরের ছাঁচের ধারে শূকর ছানা বা ছোট ছাগী বলি দিয়ে পুঁতে দেওয়া হয়। গম্ভীরা ইত্যাদি পরিবেশ প্রভাবের ফলেই বিন্দেরা করে থাকে। কাশীবাবার পূজায় সকলের মদ্যপান অবশ্য বিধি।

বিন্দদের মধ্যে আগে কন্যাপণ ছিল। গোঁড়া হিন্দুদের মতই তাদের আচার। বাল্য বিবাহ এদের মধ্যে প্রচলিত। বিন্দ্দের বিবাহে বর বরণ, কন্যা বরণ, গাত্র-হরিদ্রা, মাটি খোড়, জল সাজা, উপটন ভাজা (খই ভাজা) বা লাবা ভাজা এবং সিঁদুর দান ইত্যাদি থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মালদার চার শ্রেণী বিন্দদের মধ্যে একশ্রেণীর সঙ্গে অন্য শ্রেণীর বিবাহের প্রথা নেই। বিবাহের লগ্নের প্রাক্-সন্ধ্যায় 'দেবাশী' বা গৃহদেবতা পূজার সময় যে গীত হয় তন্মধ্যে একটি —

এই তে রুনু ঝুনু, চৈতে রোধনা,
কাহে লগৌলা এতা দেরিয়া হে।
শত্তি লাগি পটিয়া বসাঅনু

পটিয়া ভেল ভরপুর,
কাহে লগৌলা এতা দোরিয়া হে।
এই তে রুনু ঝুনু চৈতে রোধ না।। (২ বার)

[ অর্থ ঃ মা আসার সময় তোমার পায়ে নূপুরের রুনু ঝুনু বাজছে, কিন্তু যাওয়ার সময় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছো। কিন্তু আসতে দেরী হচ্ছে কেন? শক্তিমায়ের জন্য মাদুর পাতলাম, সেই মাদুর মায়ের চরণধূলিতে পূর্ণ হল। ]

আবার কন্যার বিবাহের পর পতিগৃহে যাত্রাকালীন একটি গীত —

যাহো, বেটি গে, যাহো, সাতো, নদী পার
সংমে লগাবো ছোটা ভাই।

[ অর্থ ঃ যাও বৎসে! যাও, আর কেঁদো না। সাত নদী পারে শ্বশুরবাড়ীতে হাসিমুখে যাও, তোমার ছোটভাইকে সঙ্গে পাঠাবো, তোমার কোন অসুবিধা হবে না। ]

এদের মৃতদেহ সৎকারের সময় মুখাগ্নি হয়। স্বচ্ছল না হলে সমাধিস্থ করা হয়। ১১ দিনে ক্ষৌরকর্ম, ১২ দিনে আদ্য শ্রাদ্ধ, ১৩ দিনে সপিণ্ডকরণ এবং ১৫ দিনে আত্মীয়স্বজন ও গ্রামের মানুষের ভোজ অনুষ্ঠিত হয়।

আদমসুমারী অনুসারে এ জেলায় বিন্দদের সংখ্যা ঃ—

| ১৮৭২ | ১৮৮১ | ১৮৯১ | ১৯০১ | ১৯১১ | ১৯২১ | ১৯৩১ | ১৯৪১ | ১৯৫১ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৬০০২ | ৭৫৭৮ | ১০৩৯৫ | ১০২০৯ | ১১৯৫৭ | ১০৪৩৭ | ১০৯৬০ | ৭২০৪১ | ১৬২৯ |

● **পাদটীকা**

১. Risley H H - The Tribes and Castes of Bengal, Vol I, p-130
২. Op. Cit. p- 130-131
৩. Op. Cit. p-131
৪. Magrath C. F. in the Report on the Census of Bengal, 1872, P-162
৫. Risley H H. Op. Cit, p-131, Op. Cit Vol.II, Appendix - 12
৬. Ashok Mitra, The Tribes and Castes of West Bengal, p-98

ক্ষেত্রানুসন্ধান ও তথ্যদানে ঃ সুধীরচন্দ্র দাস, ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল, রামায়ণ মণ্ডল ও ড. রিয়াজুল হক।

# তিয়র, তিওর, তিয়ার, রাজবংশী, মাছুয়া

রিজলি তিয়রদের বাংলা ও বিহারের দ্রাবিড়ীয়, নৌকো চালনায় যুক্ত শ্রমজীবী এবং মৎসজীবী সম্প্রদায় হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।[১] সংস্কৃত 'তিয়র' অর্থ শিকারী। আবার সংস্কৃত 'ধীবর' থেকে 'তিওর' শব্দটি এসেছে বলেই মনে হয়। তাদের উপ-সম্প্রদায়ের নামটি 'ধীবর' থেকে এসেছে মনে করাও স্বাভাবিক। কিন্তু বিমস কাহারদের উপ-সম্প্রদায় ধীমর (ধীবর) থেকে এসেছে মনে করলেও বিস্ময়ের কথা এই যে রিজলি বা মিত্র তাদের 'তিবর' শব্দ থেকে আগত বলে মনে করেছেন।[২] পূর্বে এদের নৌকা চালনা ও মাছধরা পেশা হলেও মালদা জেলায় এদের পেশা প্রধানত চাষ-বাস। বেভারলি তাদের সঙ্গে কৈবর্তদের সম্পর্ক আছে বলে অনুমান করেছেন। তারা তাদের রাজবংশী বলে অভিহিত করে বটে, কিন্তু ভার্নারের মতে এটি তিয়রদের একটি শাখাকেই বোঝায়। কিম্বদন্তী আছে যে জনৈক তিয়র রাজা বল্লালসেনের হারানো পুত্রকে এনে দিয়েছিল বলে ঐ উপাধি পায়।[২ক]

পূর্ববঙ্গে তিয়রদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ নেই বটে, কিন্তু তারা নিজেদের রাজবংশী কিম্বা ময়মনসিংহে তিলক দাস, অন্যদিকে গঙ্গা-পারের তিয়রেরা সূরজ-বংশী বলে নিজেদের পরিচয় দেয়। বুকানন ভাগলপুর অঞ্চলের তিয়রদের দুটি ভাগ দেখেছেন — ১. বামন যজ্ঞ — এরা কৃষিজীবী এবং ২. গোবরীয় — এরা মাছ ও শূকরের মাংস খায় এবং মদ্যপান করে বলে এরা অন্ত্যজ বলে পরিচিত। তবে যারা যেখানে সাত্ত্বিক বলে মনে করে, সেখানে দশনামী সাধু তাদের গুরু এবং মৈথিল ব্রাহ্মণ তাদের পুরোহিত হিসাবে ক্রিয়াকর্ম করেন। অপবিত্র হলে বঙ্গদেশের গোঁসাই গুরু হিসাবে এবং অনেক পতিত ব্রাহ্মণ পুরোহিত হিসাবে পূজা করেন।[৩]

বাল্যবিবাহ তিয়রদের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত, তবে বয়স্থার বিবাহেরও খবর মেলে। বহুবিবাহও আছে। বিহারে তিয়র-বিধবাদের বিবাহ সিদ্ধ হলেও বাংলায় এ বিধবাবিবাহের প্রচলন নেই। তবে এটি বিভিন্ন স্থানে পৃথক। বিধবারা মাছ বিক্রয়, সুতো তৈরী ইত্যাদি জীবিকা গ্রহণ করে বা বৈষ্ণবীও হয়ে যায়।

বঙ্গের তিয়রদের সাধারণতঃ তিনটি উপবিভাগ মেলে — ১. প্রধান, ২. পরামাণিক, ৩. গণ। এর মধ্যে প্রধানই শ্রেষ্ঠ, এবং তার পরে পরামানিক। বিপুল অর্থ পণ দিয়ে প্রধান দুটি উপ-সম্প্রদায়ের মেয়ে বিবাহে তৃতীয়রা অধিকারী।

তাই কন্যাসন্তান তাদের কাছে মহার্ঘ। কিন্তু এখন বরপণেরই প্রচলন হচ্ছে। মালদা জেলায় তিয়রদের মধ্যে পূর্বে 'ডাইনী' সন্দেহে মেরে ফেলা হত বা সমাজচ্যুত করা হত। সাধারণত তিয়রদের নিকট শেওড়া (Trophis aspera) গাছতলা পূজাচর্নার জন্য নির্ধারিত হয়। শেওড়া গাছের অভাবে নিম, বেল বা গুজালি (Shorea robusta) তলা। বাংলার তিয়রেরা পূর্বে পৌষসংক্রান্তিতে 'বুড়াবুড়ি' পূজায় শূকর উৎসর্গ করতো। তবে বলির পরবর্তে তীক্ষ্ণ কাঠের শলাকা দিয়ে শূকর বধ করা হত এবং ভক্তেরা বলির মাংস খেতো।

এদের বিবাহে নারায়ণ পূজা ও বাস্তুপূজা হলে গায়ে হলুদের পালা। বাস্তুপূজায় পায়রা, কোথাও বা ভেড়া বলি হয়। সাধারণত ছেলে বা মেয়ের ভগ্নীপতি ও দিদিরাই গায়ে সাতবার হলুদ দেয়। এই সময়ের গানকে 'গীতমঙ্গল' বলে। গায়ে হলুদের গান —

কুলা খেতে হয় হলদি জালান বাবা
হলুদ বেসাল মা হলুদ দিবে দাদা
হলুদও বেসাল ঠাকুরমা................

বিবাহের জন্য ছেলের যাত্রাকালে বিধিকর্তারা (যারা আচার-অনুষ্ঠান করে) অনেক গান করে। তন্মধ্যে একটি —

দুলহা যাবে শাশুরালে (= শ্বশুরাল বা শ্বশুরবাড়ীতে)
দুধা (= দুধ) খাইল মায়ে কোলে
দুলহা যাবে শাশুরালে ..........
(অর্থ ঃ বর শ্বশুরবাড়ী যাবে এবং মায়ের কোলে দুধ খেলো)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মালদা জেলায় ইংরেজবাজারের মাদিয়া, শোভানগর, কোতয়ালী, মানিকচকের যোগিনীগ্রাম, বড়ভবানীপুর, নিরঞ্জনপুর, কালিয়াচকের মহাদেবপুর, আকন্দবাড়িয়া, ওল্ড মালদায় নলডুবি, চাঁচলের কাশীপুর, কুশমাই, সিঙ্গিয়া, হরিশ্চন্দ্রপুরের তুলসীহাটা, উত্তর ও দক্ষিণ হরিশ্চন্দ্রপুর, পিপলা, মালিওর, দৌলতনগর ইত্যাদি অঞ্চলে তিয়রদের অধিকসংখ্যায় বাস।

সাধারণত তিয়ররা বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভুক্ত। মালদায় রামকেলী উৎসব তাদের পলিয়াদের মতই বিপুল সংখ্যায় যোগদান করতে দেখা যায়। গঙ্গা ও মনসাও তাদের পূজ্যদেবী। অন্যান্য মাঝিমাল্লার মত বদর পীর, খাজা খিজির এবং মাদার শাহের প্রতি যেমন তাদের ভক্তি, তেমনই ঝড়-ঝঞ্ঝা এক প্রাকৃতিক দুর্যোগে এবং মাছের আকালে 'খল-কুমারী' বলে এক জলপরীকে তারা প্রথম ফলটি প্রদান করে।[৪]

প্রসঙ্গক্রমে আদমসুমারী অনুসারে অবিভক্ত ও বিভক্ত মালদায় তিয়র সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা ঃ

| ১৮৭২ | ১৮৮১ | ১৮৯১ | ১৯০১ | ১৯১১ | ১৯২১ | ১৯৩১ | ১৯৪১ | ১৯৫১ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৩৭১৭ | ১৫৭৩৬ | ১৪৩০১ | ১২৯৪৮ | ১৪০২৫ | ১১৬১৫ | ১০৩১৪ | ৫৪৮৪ | ২০০৬৩ |

[৫]

১৯৪১ সালের আদমসুমারীতে তিয়রদের জনসংখ্যা হ্রাসের কারণ সম্ভবত রাজবংশী কিম্বা মাহিষ্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবীর জন্যই।[৬]

## ● পাদটীকা

১. Risley H H - The Tribes and Castes of Bengal, V II P-328
২. Ibid, P-328, Mitra A -The Tribes and Caste of West Bengal, P-76
২খ Risley H H - Report on the Census of Bengal, 1872, P-188
৩ Risley H H - Ibid, P-328
৪ Ibid, P-330
৫ Mitra A - Op Cit , P-114
৬ Op Cit , P-76

ক্ষেত্রানুসন্ধানে ও তথ্যদানে ঃ ছোটন মণ্ডল, অবনী মণ্ডল, কালীপদ দাস, সবিতা সাহা, গোপালচন্দ্র পাঠক

## ভুঁইমালী, ভূসুন্দর

পূর্ব বাংলায় কৃষিজীবী, পাল্কীবাহক -শ্রমজীবী এই আদিবাসী সম্প্রদায় পরবর্তী কালে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে।[১] দিনাজপুর জেলায় হাড়ি ও ভুঁইমালী সমার্থক হিসাবে ব্যবহৃত। ডাঃ ওয়াইজ ঢাকা অঞ্চলের ভুঁইমালীদের মধ্যে প্রচারিত তাদের এক পৌরাণিক কিম্বদন্তী উপস্থিত করেছেন। তাতে আছে যে আদিতে তারা শূদ্র ছিল এবং অন্যান্য সকল জাতির সঙ্গে দেবী পার্বতীর এক ভোজসভায় আমন্ত্রিত হলে এক সরলমনা ভুঁইমালী বলেছিল যে আমার ঘরে এমন সুন্দরী থাকলে আমি তার জন্য হীনকাজ করতেও রাজী। এই উক্তিতে শিব তাকে এক সুন্দরী স্ত্রী দেন এবং চিরকালের জন্য তাকে ঝাড়ুদার করেন।[২] মালদা জেলার ভুঁইমালীরা তাদের পেশার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। তারা আগে বাঁশ দিয়ে চাঙারী ইত্যাদি তৈরী করতো। কিন্তু ইদানীংকালে কৃষিকাজেই বেশী লিপ্ত।

ভুঁইমালীদের মধ্যে প্রধান দুই বিভাগ—১. বড় ভাগিয়া, ২. ছোট ভাগিয়া। এই দুই ভাগের মধ্যে বিবাহ হয় না বা সামাজিক কাজকর্মও অচল। বড় ভাগিয়ারা প্রধানতঃ কৃষিজীবী, বাজনদার এবং পাল্কী বাহক এবং ছোট ভাগিয়ারা ঝাড়ুদারের কাজ করে কিন্তু ডোম, মেথর এবং হালাল খোরের ন্যায় অস্নাত অবস্থায় ঘরে প্রবেশে ঘৃণ্য।[৩] তাছাড়া আছে আর একটি ভাগ মিত্রসেনী বেহার। এরা বল্লালসেনের পুত্র থেকে এসেছে বলে দাবী করে।[৪]

ভুঁইমালী সমাজে একজন মাতব্বর নির্বাচিত হয়। কোন সমস্যার সমাধানের জন্য সম্প্রদায়ের সকল পরিবারের লোকেদের ডেকে সকলের মতামত নিয়ে সে তার সিদ্ধান্ত দেয়। তবে মাতব্বর ব্যভিচারী হলে তাকে পদচ্যুত করে অন্য কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ঐ পদে বসানো হয়।

এদের বিবাহে পাঁচটি কলাগাছ পুঁতে (চারটি চারদিকে এবং মাঝখানে একটি) মারোয়া অর্থাৎ বিবাহ-বাসর তৈরী হয়। প্রত্যেকটি কলাগাছের গোড়ায় রঙ করা ছোট পাত্রে ধান ও সলতে থাকে। মারোয়ায় প্রবেশ করতে হয় পশ্চিম দিক থেকে। গায়ে হলুদ ইত্যাদি অনুষ্ঠানের সঙ্গে বিবাহের গীতও আছে। যেমন—একটি গান, যেখানে মায়ের যন্ত্রণা অভিব্যক্ত ঃ

লাল বেনারসী শাড়ী জড়িয়ে তুমি যে আমার সীমানা ছাড়িয়ে গেলে
লাল বেনারসী শাড়ী জড়িয়ে তুমি যে আমার সীমানা ছাড়িয়ে গেলে

কি অপরাধ ছিল, দুচোখে আঁধার দিলে উপহার,
সব স্বপ্ন তুমি ভেঙ্গে দিলে, তুমি গুঁড়িয়ে দিলে—
কি অভিমান নিয়ে গেছ চলে, সে কথা বলে গেলে না আমায়
লাল বেনারসী শাড়ী জড়িয়ে তুমি আমার সীমানা ছাড়িয়ে গেলে।

এই ভুঁইমালীরা পূর্বে শূদ্র বলে দাবী করত। কিন্তু ১৯৩১ সালে তারা বৈশ্য বলেই দাবী করে।[৫] আগে তারা শূকরের মাংস খেলেও পরবর্তী পর্বে তা পরিত্যাগ করেছে।

ঢাকার ভুঁইমালীদের গোত্র পরাশর ও আলিমান। একই গোত্রে বিবাহ তাদের নিষিদ্ধ নয়। অধঃপতিত ব্রাহ্মণ তাদের পূজারী এবং রজক ও নরসুন্দর তাদের সম্প্রদায়েরই লোক হতো। কৃষ্ণ তাদের সাধারণ আরাধ্য দেবতা। তবে দুর্গা, কালী প্রভৃতিরও তারা পূজা করে। অম্বুবাচী উপলক্ষে তারা তিন দিন জমিচাষ করে না।

মালদা জেলায় ওল্ড মালদার কাটাবাড়ী, চাঁচলের মায়াপুর, কুশমাই, গোয়ালজই, গাজোলের সাহজাদপুর, ভোরদীঘি, বামনগোলার জগদলা, বামনগোলা এবং হবিবপুবের কেন্দুয়া, শালগম ভিটায় তাদের বেশী বাস।[৬]

আদমসুমারী অনুযায়ী মালদা জেলায় তাদের জনসংখ্যা—

| ১৮৭২ | ১৮৮১ | ১৮৯১ | ১৯০১ | ১৯১১ | ১৯২১ | ১৯৩১ | ১৯৪১ | ১৯৫১ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২১০৯ | . | ... | ২৫৬৭ | ২২৩১ | ২২২০ | ১৬০৯ | ৩০৬৮ | ১১৬৬ |

● পাদটীকা

১. Risley H H -The Tribes and Castes of Bengal, V.I, P-105
২. Wise James - Notes on the Races, Castes abd Tribes of Eastern Bengal in Risley Vol.-I, p-106
৩. Risley H. H. - Ibid, P-106
৪. Ibid, P-106
৫. Mitra A - The Tribes and Casts of West Bengal, P-70
৬. অজয়কুমার ঘোষ - মালদা জেলার তপশীলী জাতি, স্মরণিকা, সিধু-কানু-বীরসা-জিতু মেলা ২০০১।
৭. Mitra A - Op. Cit, P - 97

ক্ষেত্রানুসন্ধানে ও তথ্যদানে ঃ পঞ্চানন ভুঁইমালী, রতন ভুঁইমালী, শিবনাথ মার্ডি।

# মুসাহর, মুসাহার, মূষাহর

মুসাহর বাংলার আদিম জাতি বিশেষ। পূর্বে জঙ্গলময় স্থানে এদের বাস ছিল এবং তারা বিহারের ছোটনাগপুরের ভুঁইয়া উপজাতিভুক্ত ছিল। এদের ভুঁইয়া, সাদা বনরাজ, বনমানুষ নামেও কোথাও কোথাও অভিহিত হয়। ভাষাগতভাবে তাদের কোল দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তবে নেসফিল্ড উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে মুসাহরদের সঙ্গে দ্রাবিড়, শবর ও চেরুর সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন।[১] আবার দক্ষিণ ছোটনাগপুরের দ্রাবিড়ীয় ভুঁইয়াদের সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছেন রিজলি।[২] বুকানন Eastern India তে মুষা অর্থাৎ ইঁদুর ভক্ষণ করে বলে মুষা (মূষিক) + আহার = মুষাহার অথবা মুষা + হর = মুষিক হরণ করে বলে তাদের এই নাম বলেছেন। কিন্তু তাদের নামের উচ্চারণ উত্তর ভারতে 'মাসহীরা' বা 'মাসহেরা'। অথাৎ মাস বা মাংস সন্ধানী বা বন্য পশু শিকারী।[৩] 'মাসহেরা' ব্যতীত অযোধ্যার জেলাগুলিতে তারা বনমানুষ বা বনবাসী বলে পরিচিত। আবার মুসাহরদের আদিপুরুষ দেওসির অনুসরণে তারা 'দেওসিয়া' নামেও কোথাও কোথাও অভিহিত। তাছাড়া বনের রাজা হিসাবে 'বনরাজ' নামটিও প্রচলিত। অবশ্য নেসফিল্ড কখনো কখনো তাদের জাতি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদে তাদের 'আহীর' বংশোদ্ভূত বলেও জেনেছেন। কিন্তু বংশগত ভাবেই তারা গোপালকদের শত্রু বলে এ দাবী টেঁকে না। রিজলি তাদের মূষিক আহারকারী বা মূষিক শিকারী বলেই মনে করেন। বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত অন-আর্যদের খাদ্যাখাদ্যের বাছবিচারহীন অভ্যাসই আর্য উপনিবেশ স্থাপনকারীদের অবমাননাসূচক নামকরণে অভিহিত করার প্রবণতাই এ ব্যাপারে ক্রিয়াশীল।[৪]

মীর্জাপুরবাসীদের কিম্বদন্তীতে প্রকাশ যে ঈশ্বর সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রতিটি জাতি থেকে এক এক জন এবং তাদের জাত ব্যবসার জন্য একটি অস্ত্র ও ব্যবহারের জন্য একটি অশ্ব দেন। এই বংশের আদিপুরুষের দুর্বুদ্ধি হেতু ঘোড়ার পিঠে গর্ত খনন করে সেখানে পা রেখে তার পিঠে ওঠার ইচ্ছা করায় ঈশ্বর তাকে অভিশাপ দেন এই বলে যে সে এমনভাবে মৃত্তিকা খুঁড়ে ইঁদুর ধরে খাবে। তখন থেকেই মুষা বা মুষিক ধরে খায় বলে তাদের নাম মুষাহর এবং প্রথমে তারা ঘোড়াকে নির্যাতন করেছে বলে অশ্ব এই জাতির বর্জনীয় হয়েছে।[৫]

মুসাহরদের মধ্যে বহতবার, চাঁড়বার, চিকসৌরিয়া, ধার, কনৌজিয়া, মগহিয়া (মাগধী) বা দেশবার, নাথুয়া, পছমা, সুরজিয়া ও তিরহুতিয়া নামে কতিপয় উপ-সম্প্রদায় আছে। এর মধ্যে

চাঁড়বারের গোত্র ঘরমুৎনা, চিকসৌরিয়ার গোত্র গিয়ারী, কাংঘাট্টা, কোসিলবাড়, মহৎবার, পুতারি, ফুলওয়ার, সোনওয়াহি; মগহিয়ার গোত্র বালকমুনি, দৈতিনিয়া, গহলোত, পৈল, রিখমুন বা ঋষিমুনি ও তিসবাড়িয়া; তিরহুতিয়ার গোত্র বাঁশঘাট, পাহাড়ি নগর, ধনহারিয়া, সরপুখা -চখবাড়িয়া, কসমেটা, মার্তারিয়া, বইবার, বলগাছিয়া, বটওয়ার বা বটউয়ারী, ভাছুয়ার, ভাক্ইয়াসিন, ভুইয়ার, চুরিহার, ধঙ্গপাতিয়া, দিয়ার, দোধুয়ার বা দদ্ওয়ার, গৌড়ীয়া, গেণ্ডুয়া, গিভারী, কাশ্যপ, খটধার, মেহারিয়া, মনদ্যার, সন্ধোয়া, সন্ধুয়ার, টিকাইত ভোক্তা, উলারিয়া, উপওয়ারিয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[৮]

মুসাহর সম্প্রদায়ের মধ্যে সগোত্রে বিবাহ প্রচলিত নেই। গঙ্গার উত্তর-তীরবর্তী অঞ্চলে বাল্যবিবাহের প্রচলন থাকলেও কোন কোন অঞ্চলে যুবতী কন্যার বিবাহও হয়। বিবাহকালে আগে কোন ঠাকুর বা ব্রাহ্মণ ছিল না। মন্ত্র নেই, তবে কোন কোন স্থলে কোন বয়স্ক লোক নিম্নোক্ত ছড়া বলে ঃ

গঙ্গা কা পানি সমুন্দর কা শাঁক।
বরকন্যা জাগ জাগ আনন্দ।।

বরের হলুদ, যব, মেথি ও কাঁসা - এগুলি একসঙ্গে ভেজে নিয়ে চূর্ণ করে বিয়ের তিনদিন আগে গায়ে মাখানো হয়। বিয়ের আগের দিনে নারায়ণ পূজা এবং মারোয়া পূজা হয়। তাতে নাপিত, ঠাকুর থাকে। বাজে ঢাক-ঢোল। বিবাহের দিন নাপিত বরকে কামায়। পরে স্নান করার পর পুনরায় তাকে হলুদ মাখায়। পাত্রকে মুকুট বা টোপর পরানোর সময় সকলে হুলুধ্বনি দেয়। পাত্রপক্ষ পাত্রীর বাড়ীতে উপস্থিত হলে পাত্রীর মা-মাসী প্রভৃতি মহিলারা পাত্রকে চুম্বন করে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে ছায়ামণ্ডপ বা 'মারোয়া'র চারদিকে পাঁচপাক ঘুরে ছায়ামণ্ডপের সামনে বসায়। পাত্রের পাশে পাত্রী বসে এবং উভয় পক্ষের বাবা, নাপিত ও ঠাকুর থাকে। ঠাকুর ছায়ামণ্ডপের পাশে বসে জপ করতে থাকে। এর সঙ্গে সঙ্গে দানকার্য চলে অর্থাৎ কলসী, থালা, বাটি ইত্যাদি। পাত্র পুরোহিতকে সিঁদুর দিলে পুরোহিত মন্ত্র পড়ে তা পুনরায় পাত্রকে দিলে সে পাত্রীকে পাঁচবার সিঁদুর দান করলে বিবাহ সমাপ্ত হয়। বরের মাথায় চাল ও জল ছড়িয়ে দেওয়া হয়। আধুনিক কালে ব্রাহ্মণের সংযোগ হয়েছে। মুসাহরদের বিবাহে গায়ে হলুদের গান ঃ

মেথিয়াল লাগালি ব্যায়টি (= বেটি) আম্মা সোহাগিনী
উপরা হি চাঁদরে সোহানে বান।

[ অর্থাৎ কাঁসা, মেথি, হলুদ লাগানর জন্য মা-বোন সবাই বসেছে তার চাঁদের মত পাত্রের গায়ে মাখাবার জন্য ]

মুসাহরদের বিবাহে বিশেষ কোন অনুষ্ঠান নেই। অল্প সংখ্যক নিমন্ত্রিত ব্যক্তিই থাকে। তবে ইদানীংকালে ব্রাহ্মণ দ্বারা বিবাহের রীতি লক্ষণীয়। মালদা জেলার চাঁদমণি ২ নং অঞ্চল, কুমারগঞ্জ, মালতীপুর, আড়াইডাঙ্গা; মাণিকচক অঞ্চল, হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লকে খেজুরবাড়ী, নবগ্রাম, গাঙ্গোর, দৌলা, মালিওর, সামুখা, নারায়ণপুর, চাঁচলের নদিশীক, মতিহারপুর, ডোমনভিটি, বত্রিশকোলা, রতুয়ার সামসী, দেবীপুর, খেড়িয়া, বল্লভপুর, লস্করপুর, ওল্ড মালদার পাঁচপাড়া, কুয়াপাড়া এবং ইংরেজবাজারের ঘোড়াপীরে মুসাহর সম্প্রদায়ের বেশী বাস।[৯] মুসাহরেরা তুলসীবীর,

রামবীর বা রামশিলা পূজা, চড়খাবীর বা চড়কপূজা, ঠাকুরানী মাই বা মতিয়া পূজা, কালী মাই বা ভগবতী পূজা এবং মনসা পূজা করে। এদের সমাধিস্থ করার রীতিই বেশী, তবে শবদাহও করে কোথাও কোথাও।[৮]

প্রসঙ্গক্রমে আদমসুমারী অনুসারে মালদা জেলায় মুসাহরদের জনসংখ্যা ঃ

| ১৮৭২ | ১৮৮১ | ১৮৯১ | ১৯০১ | ১৯১১ | ১৯২১ | ১৯৩১ | ১৯৪১ | ১৯৫১ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | ১৩৯ | . | ১৯১০ | ১৯১৯ | ... | ৩১৭৫ | ১৯২০ | ৫৪৪২ |

## ● পাদটীকা

১. Nesfied J C – The Musheras of Central and Upper India, 1888

২ Risley H. H – The Tribes and Castes of Bengal, Vol - II p-114

৩. ibid - p-114

৪. ibid - p-115

৫. নগেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদিত) বাংলা বিশ্বকোষ, পঞ্চদশ ভাগ, পৃ-২৭৯

৬. Risley H H – Appendix-I, p-110-111

৭. অজয়কুমার ঘোষ - মালদা জেলার তপশীলী জাতি স্মরণিকা, সিধু-কানু-বিরসা-জিতু মেলা, ২০০১

৮. Op. Cit , P-116-117

৯. Mitra A. Op. Cit, P- 109

ক্ষেত্রানুসন্ধানে ও তথ্যদানে - আনোয়ারুল ইসলাম, হলদিবাড়ী, রতুয়া, মালদহ। নীবদ বেওয়া, আমেলা বেওয়া, মানদা বেওয়া, কাইলি বেওয়া, গোপালপুব, সামসী।

# চামার, মুচি, চর্মকার, রবিদাস

চামড়া ছাড়ানো (খালানো), পাকানো (পাকা করা) ও তদ্দ্বারা পাদুকা ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত সংকীর্ণ এই উপসম্প্রদায় — 'চর্ম তন্নির্ম্মিত পাদুকাদিং করোতি'। পরাশরের মতে চণ্ডালীর গর্ভে তীবরের ঔরসে চর্ম্মকারের জন্ম। মনুর মতে বৈদেহীর গর্ভে নিষাদের ঔরসে চর্ম্মকারের উৎপত্তি। এদের অন্য নাম কারাবর।

কারাবরো নিষাদাত্তু চর্ম্মকারঃ প্রসূয়তে। (মনু ১০/৩৬)

আবার উশনার মতে বেণুকের ঔরসে ক্ষত্রিয়া-গর্ভে তারা জাত —

সূতাদ্বিপ্রপ্রসূতায়াং সূতো বেণুক উচ্যতে।
নৃপায়ামব তস্যৈব জাতো যশ্চর্ম্মকারকঃ।। (উশনা)[১]

ব্যবসা ও আচার-ব্যবহারে হিন্দু সমাজের নীচু পর্যায়ে এদের অবস্থান। গরু, ছাগলের চামড়া পরিষ্কার, ঘোড়ার সাজ-তৈরী এবং ঘোড়া প্রতিপালন করাও এদের জাতিগত ব্যবসা, আবার ঢাক, ঢোল ছাওয়া এবং বাজানোও পেশা। এদের কোন কোন শ্রেণী পাল্কী বহন, কোন শ্রেণী কৃষিকাজ, আবার কোন শ্রেণী বস্ত্র বয়নও করে।[২]

জুতো প্রস্তুত করার জন্য চামড়া গরু, ছাগল প্রভৃতি প্রাণীদের গা থেকে ছাড়িয়ে হরিতকি, বাবলার ছাল, ক্ষার, নুন-চূন দিয়ে লোম উঠিয়ে এই সব মশলা যোগে জলে ডুবানো হয় (১০-১৫ দিন)। এরপর রঙ ধরলে রৌদ্রে আনা হয়। প্রথম দিকে কড়া এই চামড়া 'ওখলি' (= উদুখল) তে পিটিয়ে নরম করা হত এবং তা জুতা ইত্যাদি প্রস্তুতিতে লাগে।

ভারতের সর্বত্রই চামারদের দেখা যায়। নাগপুর অঞ্চলে চামার জাতির চেহারা সুন্দর, কিন্তু উত্তর পশ্চিম প্রদেশ বা বাংলার চামার বা মুচিরা কৃষ্ণবর্ণের।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে রামানন্দ স্বামীর খ্যাতনামা শিষ্য রবিদাস (রুইদাস) আবির্ভূত হন। বাংলা ও বিহারের চর্মকারেরা এই রুইদাসকেই নিজেদের আদি পুরুষ বলে গণ্য করে। এদের উদ্ভব সম্পর্কে এরা একটি পৌরাণিক আখ্যানও প্রচার করে — যাতে ব্রাহ্মণ চতুষ্টয়ের কনিষ্ঠই অভিসম্পাতে চর্মকার বলে পরিগণিত হয়েছে।[৩]

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিহারে জনৈক সমাজ-সংস্কারক 'সতীয়ামা' বলে যুক্তিবাদী একেশ্বরবাদ প্রচার করলে হাজার হাজার চামার সে সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছে বলে ডালটন জানিয়েছেন।[৪]

চামারদের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশে নানা শ্রেণী আছে। যুক্ত বাংলায় এরা ত্রয়োদশ শ্রেণীতে বিভক্ত। সেগুলি — চামার, তান্তি, ধাড়, ধুসিয়া, দোহর, গুড়ি (গৌড়ীয়), জৈসবর, জনকপুরী, জৌনপুরী, খাটি-মাহারা, কোরার, লারকোর, মগহিয়া, পচ্ছিয়ান। এদের মধ্যে ধুসিয়া উপ-সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার পাঁচটি থাক আছে। সেগুলি — হোগুসিয়া, জোরিয়াহা, মোঘোলিয়া, সোনপুর্স ও ঠেঙ্গাই।[৫]

মালদা জেলায় সাধারণতঃ এদের চারটি শ্রেণী দেখা যায় — ১. দাস (এরা একটু বড়) ২. ঋষি (অন্য স্থান থেকে আগত) ৩. খারদাহা ৪. বিটাল।

জুতো তৈরী করতে মুচিদের প্রয়োজন হয় হাপ্‌সুল (তিন ঠেঙ্গা), লইয়া (কাঠামটা), খুরপি (ছিলা), কাটারণী, খুরপা ইত্যাদি।

আগেকার দিনে চামারদের বিবাহে ব্রাহ্মণ বিশেষ মিলতো না। স্বজাতীয় কোন বৃদ্ধ লোকই পুরোহিত সেজে অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা করতো। কিন্তু সাঁওতাল পরগণায় সমাজচ্যুত কনৌজী ব্রাহ্মণেরা তাদের পৌরোহিত্য করে।

বিধবা বিবাহ স্বীকৃত এ সমাজে। মালদা অঞ্চলে বিবাহানুষ্ঠানে বরকে প্রথমে পানচুমানোর পর 'অষ্টমঙ্গলা' বলে এরা একটা অনুষ্ঠান করে। সেটি উচ্চবর্ণের 'অষ্টমঙ্গলা' নয়। এখানে বরপক্ষের বয়স্কা ৭জন বা ৯জন ঢেঁকিতে ধান কুটে ৭টি করে চাল বা ভাঙ্গা চাল নিয়ে অর্থাৎ ৭ x ৭ = ৪৯টি বা ৭ x ৯ = ৬৩টি নিয়ে একটি আমের পাতায় রেখে দেয়। পুরোহিত তা মন্ত্র পাঠে শুদ্ধ করে পাত্র-পাত্রীর হাতে দেয়। সপ্তপদী এদের মধ্যেও দেখা দিয়েছে। চামারদের বিবাহে গায়ে হলুদের একটি গান —

সোনে কি কাটৌরি মে
হ্যালোদি খুরহিবেই
রূপে কি কাটৌরি মে তেল
কাঁহা গেলি বেটিকা বাপ হে
দোহো সুহাগিনী তেল।

বাংলার চামাররা বর্ণ হিন্দুদের অনেক ক্রিয়াকলাপ গ্রহণ করেছে। তাদের মধ্যে অনেকে 'শ্রীনারায়ণী' মতাবলম্বী। পূর্ব বাংলায় কবীরপন্থী দলভুক্ত চামারও দেখা যায়।[৬]

চামারদের মধ্যে নানা পেশাধারী আছে। পূর্ববঙ্গে 'চামড়া-ফরস' চামড়া সংরক্ষণে নিযুক্ত। কিন্তু মুচি বা ঋষিদের মধ্যে তীব্র বিবাদ আছে।[৭] ধুসিয়ারা চামড়া খালানো, পাকানো, জুতো তৈরীতে যুক্ত এবং বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে বাজনদার হিসেবে বিশেষ পরিচিত। ঢোল, ঝাঁঝ তাসা, খঞ্জনী, বাঁশী, ব্যাগু ইত্যাদি তাদের যন্ত্রসঙ্গীত। ধাড়-শ্রেণী এগুলি ছাড়া পাল্কীবাহকের কাজও করতো। গুড়ি বা গৌড়ীয়রা চাষবাসে ব্যাপৃত। ধাড়রা জুতো তৈরী ও মেরামত করে, গুড়ি বা গৌড়ীয়রা চাষ-আবাদ করে। জমিতে কাজ করে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রাম্যমান অবস্থায়

ধান কাটে ও ঝাড়াই-মাড়াইয়ের কাজ করে, জৈসবরেরা সহিযের কাজ করে এবং দোহররা চামড়ার সুতো দিয়ে rent সেলাই করে। শিখরিয়া সম্প্রদায় জুতো তৈরী ও মেরামত করে ও চাষ করে এবং নেপাল থেকে আগত অনেক সারকি-চামার কসাই এবং চামড়া খালানোর কাজ করে।[৭] আসলে অন্যান্য প্রদেশের চামার, মুচিদের যেমন নানান পেশা দেখা যায়, যুক্ত বাংলা তথা মালদা জেলাতেও তেমনই। এখন চামড়ার কাজ অপেক্ষা এখানে চাষবাসেই বেশী চামার-মুচিরা যুক্ত। ইংরেজবাজারের মিল্কি, খাসকোল, মাণিকচক ব্লকের এনায়েতপুর, মথুরাপুর, খয়েরতলা, নাজিরপুর, লস্করপুর, কালিয়াচকের ঋষিপাড়া, বাবলা, গোবিন্দগঞ্জ, সাদীপুর, সুবেদারটোলা, রাজনগর, বৈষ্ণবনগর, বীরনগর, ওল্ড মালদার খানপাড়া, রতুয়ার বালুপুর, দেবীপুর, রতুয়া, ভালুকা, জিতুটোলা, কাহালা, মীরজাতপুর, পরাণপুর, চাঁদপুর, নিজগাঁ, আড়াইডাঙ্গা; হরিশ্চন্দ্রপুরের কস্তুরিয়া, ভিঙ্গোল, গাংনদিয়া, মালিওর, মশালদহ, অর্জুনা, চাঁচলের গ্রামসাগর, রামচন্দ্রপুর, খেলনপুর; বামনগোলার পাকুয়া, তিতপুর, নালাগোলা এবং হবিবপুরের বারোমাইল, হালদারপাড়া ও লালপুর ইত্যাদি গ্রামে এদের উল্লেখযোগ্য বাস।[৮]

বাংলার চর্মকারদের প্রধান উৎসব এক সময়ে ছিল শ্রীপঞ্চমী, শারদীয়া শুক্লানবমী, রামনবমী। পূর্বে কালীপূজোয় মূর্তি না এনে বড় গাছ বিশেষতঃ বট বা নিমগাছের নীচে কলা-পান-সুপারী দিয়ে তারা পাঁঠা বলি দিত। কোন ব্রাহ্মণ না এনে তাদের মধ্যেই কোন বর্ষীয়ান ব্যক্তিই পূজারী হতো। এখন তারা বর্ণ-হিন্দুদের অনেক পূজাই গ্রহণ করেছে। এরা নারায়ণ পূজা, সরস্বতী পূজা করে এবং হোলি, গম্ভীরা ইত্যাদি উৎসবে এদের যোগদান করতে দেখা যায়। এরা হোলিতে গানও করে। যেমন একটি গান —

ক্যাইসে খেলো রাঙা হোলি
ক্যাইসে খেলো রাঙা হোলি
হাম আজু আয়া নায়া গাওনা সে,
ক্যাইসে খেলো রাঙা হোলি ....

*(অর্থ ঃ আমি আজ নতুন এই গ্রামে এসেছি। আমি কেমন করে খেলবো এই রাঙা হোলি)*

চামার রমণীরা চামাইন নামে অভিহিত। তারা কপালে টিকলি এবং সমস্ত দেহ উল্‌কীতে সজ্জিত করে এবং খুব ভারী পায়ের মল (পাইরি) ও হাতের বাজবন্ধ (বংরী) পরে। ভারতের সর্বত্র এরা ধাত্রীর কাজ করে। লোকায়ত হিন্দু সমাজে এমন প্রবাদ আছে যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়ে চামার-রমণী ধাত্রীর কাজ না করলে জাতক্রিয়া শুদ্ধ হয় না।[৯]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে এ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে এদের ভাষা-ব্যবহারেও পার্থক্য আছে। এ পর্যন্ত আদম্‌সুমারীতে প্রাপ্ত চামারদের মালদা জেলায় (অবিভক্ত ও বিভক্ত) জনসংখ্যা নীচে দেওয়া হলো। তবে ১৮৭২ ও ১৮৯১ সালে চামার ও মুচি বলে অভিহিত হয়েছে।

| ১৮৭২ | ১৮৮১ | ১৮৯১ | ১৯০১ | ১৯১১ | ১৯২১ | ১৯৩১ | ১৯৪১ | ১৯৫১ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৪,৯২৯ | ৭,৭১৮ | ৫,৯৮২ | ৪,৫২৭ | ৪,৪২৭ | ৪,৪৪৩ | ৩,৭২১ | ৩,১৫৮ | ৫,৪৪৯ |

আবার ওই একই সূত্রে মুচিদের পরিসংখ্যান এমন ঃ

| ১৮৭২ | ১৮৮১ | ১৮৯১ (চামার ও মুচি) | ১৯০১ | ১৯১১ | ১৯২১ | ১৯৩১ | ১৯৪১ | ১৯৫১ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ৫৯৮২ | ২১২৬ | ২৬৭৭ | ৩০১২ | ৪০৪০ | ২৭৮১ | ৬২৯২ |

অর্থাৎ ১৯০১-এর আদমসুমারী থেকে চামার ও মুচি পৃথক দেখানো হয়েছে।[১১]

## ● পাদটীকা

১. নগেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদিত) - বাংলা বিশ্বকোষ, ষষ্ঠ ভাগ, পৃ-১৮৬

২. তদেব, পৃ-১৮৯

৩. তদেব, পৃ-১৮৭

৪. Dalton Edward Tuite – Descriptive Ethnology of Bengal, p-324

৫. Risley H. H. – The Tribes and Castes of Bengal, Vol II, Appendix I, p-3

৬. বাংলা বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ-১৮৮

৭. Risley H H. – ibid, p-180

৭.খ Op Cit. P-181

৮. অজয়কুমার ঘোষ - পূর্বোক্ত স্মরণিকা, ২০০১

৯. Risley H. H. – ibid, p-181

১০. Mitra A – ibid, p-98

১১. ibid, p-109

ক্ষেত্রানুসন্ধানে ও তথ্যদানে ঃ নেসাদ আহ্‌মেদ, মণ্টু রবিদাস, কানাই রবিদাস, অঞ্জলি রবিদাস, সিদ্ধার্থ পোদ্দার, পুলিন রবিদাস, আনোয়ারুল ইসলাম, সুরেশ রবিদাস।

# চাঁই, চাই, বড়চাঁই, চাইৎ

বিহার ও মধ্যবাংলায় কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী এই সম্প্রদায় সম্ভবতঃ কোন অন্-আর্য জাতির শাখা। কার্নেগী অযোধ্যা অঞ্চলের চাঁইদের সঙ্গে মোঙ্গলীয় জাতির দৈহিক আকৃতির সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছিলেন। শেরিং তাদের মাল্লাদের উপজাতি বলেও মনে করেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে চাঁইদের নুনিয়ার একটি উপজাতি (sub-caste) বলে মনে করলেও নুনিয়ারা তা স্বীকার করে না।[১] ম্যাগ্রা চাঁইদের মুখ্যত মাঝি ও মৎস্যজীবী বলে মনে করেন।[২] ডালটন বিন্দ এবং চাঁইদের মাঝির কাজ করায় ও মৎস্যজীবী হওয়ায় তাদের নীচ জাতিতে পরিণত হওয়ার কোন কারণ খুঁজে পান নি।[৩] তবে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে তারা খয়ের তৈরীর কাজে নিযুক্ত।[৪]

চাঁইরা বিহার অঞ্চলে চুরি ডাকাতি, রাহাজানি ইত্যাদিতে এমনই একসময়ে বদনামের ভাগীদার হয়েছিল যে, শেষ পর্যন্ত মঘৈয়া ডোম, নট ও রাজওয়াররা ঐ সব দুষ্কর্মে যুক্ত বলে প্রমাণিত হলেও চাঁইরাই সাধারণত ও সর্বক্ষেত্রে অপরাধী বলে সাধারণের নিকট প্রচারিত ছিল। এমনকি হিন্দী ভাষা-ভাষীদের মধ্যে চাই-পনা বলতে চুরি বোঝায়।[৫]

চাঁই সম্প্রদায়ের মধ্যে বাল্যবিবাহ, বয়স্থার বিবাহ প্রচলিত আছে। দশনামী গোঁসাই এদের গুরু এবং জনৈক অধঃপতিত মৈথিলী ব্রাহ্মণ পুরোহিত হিসেবে ক্রিয়াকর্মাদি করেন। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এদের দেব-দেবী ভিন্ন ভিন্ন। অযোধ্যা অঞ্চলে তারা মহাবীর, সত্য নারায়ণ ও দেবী পাটন-এর পূজা করে। তারা দেশী মদ (তাড়ি) ও শূয়োরের মাংস ভক্ষণ করে। বিহারের চাঁইরা অন্য মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের ন্যায় 'পাঁচ পিরাইয়া' ধর্মমতে বিশ্বাসী। অন্যদিকে বাংলার অনেক স্থানে 'কৈলা বাবা' পূজা করে।[৬]

পূর্বে 'কন্যাপণ' এ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ইদানীংকালে 'বরপণ' চালু হয়েছে। বিধবার বিবাহ গ্রাম্য মোড়লের উপস্থিতিতে নিকাহ্ বা সাঙ্গা (সাগাই) পদ্ধতিতে হয়, তবে মন্ত্রপাঠ হয় না।

বাংলায় তথা মালদা জেলায় এদের উপজীবিকা কৃষিকাজ। অনেকের কিছু জমিজমাও আছে। দিন-মজুরও আছে অনেক। নারী-পুরুষ — উভয়েই ক্ষেত খামারে কাজ করে এবং প্রতি জেলাতেই নদীর ধারেই এদের অধিক বাস মাছ ধরা ও কৃষিকাজের সুবিধার্থে।

চাঁইদের 'বিবাহ-বাসর' বা ছাঁদনাতলাকে 'মারোয়া' বলে। বিবাহ-উৎসব আগে পাঁচ দিনের ছিল। এখন তিন দিনের আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে দৈমাছ, লগন ও বিবাহ, গালসেঁকা, সাতপাকে বাঁধার অনুষ্ঠানের পর সিঁদুর দান। পৃথক বাসর ঘর এদের থাকে না। বিবাহের পর বাস্তু দেবতার ঘরে বর-কনে থাকে। বৈশাখ মাস চাঁইদের নিকট বিশেষ পবিত্র মাস বলে এরা দলবদ্ধভাবে হরিনাম সংকীর্তন ও বাস্তুভূমিতে সত্যনারায়ণের পূজা করে। তাছাড়া শিব, কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, মনসা প্রভৃতি দেবদেবীর পূজার্চনাও এখন করে। তবে কালীর প্রতি এদের ভক্তি অধিক বলে তাদের প্রায় প্রতি পল্লীতেই কালীর থান / বেদী দেখা যায়।

নানা ব্রতাদিও তাদের মেয়েরা করে থাকে। চাঁইদের এই সব ব্রতের মধ্যে 'ছট বা সূর্যপূজা', জন্মাষ্টমী ব্রত ছাড়া বোনেরা ভাই-দের কল্যাণার্থে ভাদ্রমাসে 'করম-ধরম' বা 'কর্মা-ধর্মা' ব্রত পালন করে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ওঁরাওদের মধ্যেও এই কর্ম উৎসব পালিত হয়।[১] সাম্প্রতিক কালে ভাইফোঁটা, রাখীবন্ধন ইত্যাদি অনুষ্ঠানেরও প্রচলন হয়েছে তাদের মধ্যে। পুরুষেরা হোলির গান, আলকাপ গান, কীর্তন, মনসার গান ও হরিনাম সংকীর্তন করে। চাঁই মেয়েরা অসংখ্য গীতও কণ্ঠস্থ করে রাখে বলে বিবাহে বহু গীত তারা গায়। আবার সারা ফাল্গুন মাসেই তাদের হোলির মহড়া চলে। গ্রামের মোড়লের বৈঠকখানায় প্রতিদিন তারা কাজের শেষে সন্ধ্যার সময় হোলির গানের আসর বসায়। দেব দোলের পরের দিন অর্থাৎ স্থানীয় ভাষায় 'পচ্ছাদোল' (পশ্চিমা দোল) -এ সকাল থেকে সারারাত্রি হোলির গান চলে।

চাঁইদের বিবাহের 'লগন'-এ কনের গৃহের একটি গীত ঃ

হ্যারি হ্যারি গোব্যারা হে
আঙিনা নিপাওলা হে
গ্যাজামতিচৌকা পুরারে হে
এহি কুলে ব্যাই স্যালা হে
ল্যাইহারাকে লোগা হে
ওহি কূলে ব্যাই স্যালা শ্যাশুরাকে লোগা হে
মাঝে ঠাঁয়ে ব্যাইস্যালা ল্যাওয়া বাভ্যানা হে
ধ্যারি দেহ ল্যাগানাকে ক্ষেণা হে।

(বঙ্গানুবাদ ঃ গোবর দিয়ে আঙিনা নিকানো হয়েছে এবং আলপনা দেওয়া হয়েছে। আলপনার নকশায় বিশেষ অলংকরণের ব্যবস্থা হয়েছে। এই নকশাযুক্ত আঙিনার একদিকে পিতৃপক্ষের লোক এবং অন্যদিকে শ্বশুরপক্ষের লোক বসেছেন। মাঝখানে নাপিত-ব্রাহ্মণ বসেছে। নাপিত ও ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে যে তাঁরা যেন 'লগণের' ক্ষণ (সময়) ধার্য করে দেন।)

মালদায় ১৮৭২ ও ১৮৮১ সালে চাঁইদের জনসংখ্যা যথাক্রমে ৩০০৮২ ও ৩৩৬৩৯[৮]

- **পাদটীকা**

১. Risley H H - The Tribes and Castes of Bengal, Vol. I, p-166

২. Magrath C. F. - Memorandum on the Tribes and Castes of the Province of Behar in Census, 1872, p-162

৩. Dalton E.T. - Descriptive Ethnology of Bengal, p- 324

৪. Magrath C. F. - ibid, p-162

৫. Risley H. H. ıbid, p-167

৬. Op. Cit., p-167

৭. Dalton E.T. Descriptıve Ethnology of Bengal, p-260

৮. Risley, Op. Cıt Vol.-I, p-168

ক্ষেত্রানুসন্ধানে ও তথ্যদানে ঃ হরিমোহন মণ্ডল, সুধীরচন্দ্র দাস ও ড. সুনীলচন্দ্র মণ্ডল।

# নুনিয়া, নোনিয়াঁ

নুনিয়া বিহার ও উত্তর ভারতের কৃষিকাজ, নুন তৈরী ও মাটি কাটার কাজে যুক্ত একটি জাতি। তাদের মধ্যে একটি গল্প প্রচলিত আছে যে বিদুর ঠাকুর নামে জনৈক তপস্বীর বংশধর অওধীঅ নুনের পৃথিবীতে তার অনশন ভঙ্গ করলে রামচন্দ্রের অভিশাপে সে গভীর ধ্যানকর্ম থেকে বঞ্চিত হয়ে নুন তৈরীর কর্মে লিপ্ত হয়। তবে বিন্দ ও বেলদারদের সঙ্গে তার সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়। কেউ কেউ মনে করেন যে আদিম অধিবাসীর আধুনিক প্রতিনিধি রূপ যে বিন্দদের দেখা যায়, তাদেরই শাখা এই নুনিয়া এবং মাটিকাটার কাজে লিপ্ত বেলদার। বিন্দদের শিকার ও মাছ শিকারের প্রবণতা থেকে তাদের এই তিন শ্রেণী সম্প্রদায়ের প্রাচীনতম বলে মনে করা সঙ্গত। তিনটি শ্রেণীরই এখন অন্তঃগোষ্ঠী বিবাহ (Endogamous)রীতি প্রচলিত। অন্যদিকে তাদের গোত্র দেবতার (Totemistic) ভাগ দ্রাবিড়ীয় চিহ্নই বহন করে।[১]

বেলদার সম্ভবতঃ 'নব শাখা' বলে মনে হয়। কারণ বেলদার (= কোদাল-বেলচা বাহক) যে কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায়েরই মানুষ হতে পারে।[২] বিহারের নুনিয়ারা সাতটি উপজাতিতে বিভক্ত — ১. অওধীয়া বা অযোধ্যাবাসী ২. ভোজপুরিয়া ৩. খরাওন্ট ৪. মগহিয়া ৫. পচইন্যা বা চৌহান ৬. ওর ৭. সেমরওয়ার। কুলদেবতাকেন্দ্রিক ভাগে তাদের বিভাগ — অদ্ধিগট, যমগট, নাগ, পেচগট, ফুলগট।

মালদা জেলার নুনিয়ারা চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ ১. কর্মকার ২. দাস লোহার ৩. নুনিয়া (লবণ তৈরী বৃত্তিতে রত) ৪. কায়স্থ। সম্ভবতঃ এ ভাগ বৃত্তিভেদেই সৃষ্ট।

মালদা জেলার ইংরেজবাজার থানার গয়েশপুর, বালুচর, নিত্যানন্দপুর, চণ্ডীপুর, মহদীপুর, কৃষ্ণপুর; ওল্ড মালদা থানার সাহাপুর, মঙ্গলবাড়ী, হবিবপুর থানার আইহো, বুলবুলচণ্ডী; কালিয়াচক থানার মোহনপুর; রতুয়া থানার গোবর্জনা, এবং বামনগোলা থানার চাঁদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে নুনিয়াদের অধিক বাস। এ সম্প্রদায়ের পুরুষরা নিজেদের শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ না করে অন্য সম্প্রদায়ের পাত্রীও বিবাহ করতে পারে। বালবিবাহ এদের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত নয়। বিবাহে আগে সমাজের প্রধান পরামাণিকের অনুমতি নেওয়া অবশ্যিক ছিল। বহু-বিবাহ প্রচলিত থাকলেও নুনিয়াদের মধ্যে কিন্তু স্বল্প লোককেই একাধিক বিবাহ করতে দেখা যায়।

তিরহুতিয়া ব্রাহ্মণই তাদের বিবাহে আগে পুরোহিত ছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে আগে ঘটকের মাধ্যমে যে সব পাত্র-পাত্রীর খোঁজ হত, তাতে মেয়ে মায়ের বংশের ও ছেলেটি পিতার বংশের হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল। নুনিয়াদের মধ্যে দেবর-বিবাহ বিধবাদের ক্ষেত্রে প্রশস্ত। বিবাহ বিচ্ছেদের পর'সাগাই' পদ্ধতিতে পুনরায় বিবাহও সিদ্ধ। বিহারের কোন কোন অঞ্চলে তারা কূর্মি ও কৈরীদের সমগোত্রীয়, কিন্তু অন্যত্র তারা অন্ত্যজ এবং উচ্চবর্ণের নিকট তাদের জল অচল।[৩]

বিহার অঞ্চলে তারা অধিকাংশ শাক্ত ও স্বল্প বৈষ্ণব। ভাগবতীজী তাদের প্রিয় দেবতা। তা ছাড়া বন্ডী, গোরাইয়া এবং শীতলা যথাক্রমে মঙ্গল, বুধ ও শনিবারে পূজিত হন। সন্ন্যাসী ফকির তাদের সম্প্রদায়ের গুরু হিসেবে বিবেচিত।

বাংলার বিভিন্ন জেলায় তাদের পেশাও নানা ধরণের। যেমন কৃষিকাজ, লোহার কাজ, কাঠের কাজ এবং দালান বাড়ী নির্মাণের রাজমিস্ত্রীর কাজ। মহিলারা প্রধানত বিড়ি তৈরী করে।

মালদা অঞ্চলে তাদের উৎসবের মধ্যে অন্যান্য বর্ণ হিন্দুদের মত বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা ব্যতীত গম্ভীরা ও 'নবান্ন' তাদের জনপ্রিয় উৎসব।

এরা মৃত শিশুকে কবর দেয় বটে, কিন্তু বয়স্কদের শবদেহ দাহ করে। নুনিয়াদের বিবাহের গানও উল্লেখ্য। একটি তাদের গীত —

গোবর এসে কালোরে মাটি আলিপনে ধল।
তারই মাঝে সভারে করে শরিমালার গাছে।
তারই মাঝে সভারে করে ঘট আর সাতাসি।
তারই মাঝে ঠাকুর আর নাপিত,
তারই মাঝে সভা করে জামাই আর বেটি।

আদমসুমারী অনুসারে নুনিয়াদের অবিভক্ত ও বিভক্ত মালদা জেলায় জনসংখ্যা ঃ—

| ১৮১৮ | ১৮৯১ | ১৯০১ | ১৯১১ | ১৯২১ | ১৯৩১ | ১৯৪১ | ১৯৫১ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ২০৫৫ | ৪০৪৮ | ৩২১০ | ৫৬৫৬ | ৫০৬০ | ৩৯৯৯ |

● **পাদটীকা**

১. Risley H H - The Tribes and Castes of Bengal, Vol-II P-135
২. Op Cit P-135
৩. Mitra A - The Tribes and Castes of West Bengal, P-75
৪. Op. Cit P-110

ক্ষেত্রানুসন্ধানে ও তথ্যদানে ঃ দুখু মণ্ডল, শিবনাথ মার্ডি

# ধানুক

বিহারের এক কৃষিজীবী সম্প্রদায় এই ধানুকেরা উচ্চবর্ণের বিত্তবান গৃহস্থের বাড়ীতে পরিচারক হিসেবে আগে কামকর্ম করতো। শব্দটি সংস্কৃত 'ধানুষ্ক' থেকে জাত অর্থাৎ ধনুরূপজীবী। মহাভারতে এদের কথা লিপিবদ্ধ আছে —

অশ্বে হস্বে দশ ধানুষ্কা ধানুষ্কে দশ চর্ম্মিণঃ।

এবং বূঢানানীকানি ভীষ্মেণ তব ভারতঃ।। (ভারত ৬/২০/১৭)

বুকানন ধানুক জাতিকে কূর্মিদের পংক্তিভুক্ত করেছেন। এবং মনে করেন যে দারিদ্র্য হেতু যশওয়ার কূর্মি নিজে বা নিজের সন্তানদের বিক্রয় করলে 'ধানুক'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। সমস্ত ধানুক জাতিই এক সময় সম্ভবত দাসবৃত্তিতে নিযুক্ত ছিল এবং অনেকেই ক্রীত হয়ে সেনাভুক্ত হয়।[১] এ ধরণের দাসদের সেনা হিসেবে নিয়োগ সুদীর্ঘকাল এশিয়া, পার্থিয়ান এবং তূর্কীদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল।

পদ্মপুরাণের উদ্ধৃতি অনুসারে ধানুকেরা চামার পিতা ও চণ্ডাল মাতার সন্তান। অপর পৌরাণিক কাহিনীতে তারা চামার মাতা ও ত্যজ্য আহির পিতার সন্তান বলে কথিত।[২] ধানুকেরা অন-আর্য এক উপজাতিরই শাখা হিসেবে উদ্ভূত বলে মনে হয়।

ধানুকরা কতিপয় উপ-সম্প্রদায়ে বিভক্ত। যেমন — ছিলটিয়া বা শিলটিয়া, মঘাইয়া, তিরহুতিয়া বা চিরউত, জৈসওয়ার, কনৌজিয়া, খাপরিয়া, দুধওয়ার বা দোজওয়ার, শুঁড়ি-ধানুক ও কথৌটিয়া। মনে হয় পেশা ও স্থাননামে এগুলি জাত।

বুকানন আবার এদের চারটি শ্রেণীর কথা বলেছেন — ১. যৈশওয়ার ২. মঘৈয়া ৩. দোজওয়ার ৪. ছিলটিয়া।[৩] মালদা জেলাতেও দেখতে পাওয়া যায় চারটি শ্রেণী। তাদের নাম ১. মঘৈয়া ২. ছিলটিয়া ৩. চুনটিয়া ৪. দোজওয়ার।

বর্তমান মালদা জেলায় ইংরেজবাজার ব্লকের মবারকপুর, নরহরিপুর, আরাপুর, বাগবাড়ী, ভোলানাথপুর, কালিয়াচক দু নম্বর ব্লকের শ্রীপুর, মদনপুর, ছিলামপুর, কাগমারী; হবিবপুর ব্লকের তেঘরিয়া, শিরসী, শ্রীরামপুর, বালপুর, দরঘাপাড়া, (কৃষ্ণনগর), বাস্তুপাড়া; হরিশ্চন্দ্রপুরের অর্জুনা, মালিওর, ভালুকা, ডোবা, জানকীনগর; মাণিকচক ব্লকের নেস্তা, ভীষণপুর, নারিদিয়া, নুরলাগঞ্জ, দামোদরপুর, খয়েরতলা, এবং রতুয়ার লসকরপুর, বেতাহা, পীরগঞ্জ, বাবলাবনা ইত্যাদি গ্রামে

অধিক সংখ্যক ধানুক সম্প্রদায়ের মানুষের বাস। এর মধ্যে আবার কালিয়াচকের শ্রীপুর, মদনপুর ও কাগমারিতে মঘৈয়া (স্থানীয় নাম 'মেঘিয়া') ধানুক এবং মাণিকচকের নেস্তা, ভীষণপুরে ছিলটিয়া ধানুকের অধিক বাস।

সাধারণতঃ বাল্য বিবাহ ও বেশী বয়সে বিবাহ — উভয়ই এদের সমাজে থাকলেও প্রথমোক্ত বিবাহই অধিকতর শ্রেয়। বিবাহের রীতি বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে কিছুটা ভিন্ন। মালদা জেলায় ধানুক সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়ের বিবাহ উভয়পক্ষের দ্বারা সমর্থিত হলে পাত্রপক্ষ কন্যাকে একটি থালাতে সিঁদুর দেয়। থালার সিঁদুরের উপর পয়সা বসিয়ে কোন এক সধবা স্ত্রী এই থালাটি মেয়ের কপালে স্পর্শ করায়। এটিকে 'থালাতে সিঁদুর' দেওয়ার অনুষ্ঠান বলে। এসময়ে গীত মঙ্গল হয়, তারপর শুভদিন দেখে বিবাহের দিন ধার্য হয়। বর-কন্যার আশীর্বাদ অনুষ্ঠানেরও বৈশিষ্ট্য আছে। বরপক্ষ কন্যার নূতন জামা-কাপড় ইত্যাদি যেমন নিয়ে যায়, তেমনই কন্যা পক্ষও বরের জন্য তার বস্ত্রাদি নিয়ে গেলে উঠানে আলপনার উপরে কাঠের পিঁড়িতে তাকে নব-নীত বস্ত্রে সজ্জিত করে পাত্র/পাত্রীকে বসিয়ে তার হাতে এক ছড়া কলার উপরে পান-সুপারী দেওয়া হয় এবং তার সম্মুখের থালাতে ধান-দূর্বা-হলুদবাটা রাখা হয়। যে পক্ষ আশীর্বাদ করবে,তারা ৫/১০/৫০/১০০ টাকা (সঙ্গতি সাপেক্ষে) কলার ছড়ার উপর রেখে হলুদ আঙ্গুলে নিয়ে তার কপালে লাগিয়ে ধান দূর্বাদি দিয়ে আশীর্বাদ করে। এটিকে'চুমানো' বলে। আশীবর্দী অনুষ্ঠানে কোন অবিবাহিত পুরুষ গেলে সে পাত্র/পাত্রীর হাতে টাকা দেয়, কিন্তু পাত্র/পাত্রীর কপালে হলুদের ফোঁটা বা চুমানোর অধিকার তার থাকে না।

ধানুকদের বিবাহের পূর্বদিন 'মারোয়া পূজা' (অর্থাৎ ছায়ামণ্ডপ বা বিবাহ বাসর পূজা) হয়। পুরোহিতই এ কার্য সমাধা করেন। পূর্বে মৈথিলী ব্রাহ্মণেরা এই কাজে পৌরোহিত্য করতেন। 'মারোয়া পূজা' সাঙ্গ হলে ঘরে বাঁশের মই ও বাঁশের লাঠি ঘর্ষণের মাধ্যমে উত্থিত 'গোত্র' নামে আগুন প্রজ্জ্বলিত করে রাখা হয়। এই আগুন দ্বারায় 'লোকনিয়া'-রা বিবাহের দিনে খই ভাজে। 'গোত্র' বিবাহানুষ্ঠানের পর আর রাখা হয় না।

বিবাহের দিনে উপরি উক্ত 'লোকনিয়ার' (যারা খই ভাজে) একজন স্ত্রী ও অপর.একজন পুরুষ মিলে 'মারোয়া' তৈরী করে। তারা পাত্র বা পাত্রীকে নিয়ে অন্যের বাড়ীতে 'উটকন' পিষ্ট করে বা বাটে। 'উটকন' হল হলুদ,যব ও নানা ফলের সমন্বয়। এই বাটা / পিষ্ট উটকন বর /কন্যার গায়ে মাখানো হয়। আবার শ্বশুরালয়ে আসার পর শ্বশুর-শাশুড়ী ও বধূ নৃত্য করার সময় বধূটি তাদের মুখেও এই 'উটকন'সরষে তেলে মিশিয়ে মাখায়। ধানুকদের মধ্যে বিবাহে খই-ভাজা প্রক্রিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

এই উনুন জিওল গাছের খুঁটির উপর রাখা হয় এবং খই ভাজায় বিধবা দিদি, মাতামহী, পিতামহীদের অধিকার নেই। এ সময় রঙ ও অন্যান্য জিনিস গায়ে ছুঁড়ে তামাসাও চলে।

এদের অনুষ্ঠানহীন বিবাহ 'সাগাই' নামে অভিহিত। এই 'সাগাই বিবাহের' বর-বৌ সামাজিক বিবাহানুষ্ঠানে প্রবেশে অনুমতি পায় না। সাগাই-বিবাহিত দম্পতির পুত্র-কন্যাদের সঙ্গে সমাজের অন্যান্য লোক তাদের পুত্র-কন্যাদের বিবাহও দেয় না। এমনকি সাগাই-বিবাহিত 'লোকনিয়া' - ও বিবাহানুষ্ঠানে খই ভাজার অধিকারী নয়।

ধানুক সম্প্রদায়ের মধ্যে নিমন্ত্রণ-পদ্ধতিরও কয়েকটি ভাগ আছে। যেমন —

**১. ঘোর-যাগন্ন ঃ**

প্রতি পরিবার থেকে একজনের নিমন্ত্রণ। সাধারণতঃ এটি 'নারায়ণজী' (নারায়ণ পূজা) বা ছোটপূজা উপলক্ষে প্রযুক্ত।

**২. শামরা ঃ**

বাড়ীর নারীরা ব্যতীত পুরুষ ও ছোটছেলেরা নিমন্ত্রিত হয়। শ্রাদ্ধের ভোজনানুষ্ঠানে এটি প্রচলিত।

**৩. হাঁড়ি-বান্না ঃ**

আসলে সেদিন পরিবারে হাঁড়ি চড়বে না অর্থাৎ পরিবারের সকলেরই নিমন্ত্রণ।

ধানুকেরা অধিকাংশই ক্ষেত-মজুর, শ্রমজীবী। এদের অন্যান্য দেবদেবী বর্ণ হিন্দুদেরই মত। তবে গম্ভীরা পূজা ও সোনা রায়ের পূজাও তারা করে। সোনা রায় দক্ষিণ বঙ্গের ব্যাঘ্র দেবতারই সমতুল। রাখালদের মধ্যেই এর প্রচলন আছে। তারা দলবদ্ধ হয়ে বাড়ী বাড়ী পয়সা ও চাল ইত্যাদি সংগ্রহ করে এবং তার সঙ্গে সোনা রায়ের যেমন গান করে, তেমনই ছড়াও বলে। তাদের একটি ছড়া —

এলাম ভাই মহাজনের বাড়ী
হাঁসফাঁস মোচন দাঁড়ি।
সে হাঁস খরতানে তুলে
চোর পালায় ধুর ধুর করে।
সে চর যায় কত দূর।
নিমগাছের সিম খাই
সে সিম জোগায় রে
সে সিম বর্তমান।
আমায় দিবি কত দান।
জোয় দান জোয় বেড়াতে
সোনা রাই (= রায়) ফুল জোগাতে
সোনারাই থামেত।
আরাই (= আড়াই) পাকে এসেছি
গাছের নেবু ভেঙেছি
গাছের নেবু খাবো কি।
সে সোনা রাই করবে কি?

আলত্ ফালত্.....

**১৮৭২ ও ১৮৮১ সালের আদমসুমারীতে মালদা জেলার (অবিভক্ত) ধানুক সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা যথাক্রমে ৭,৮০৫ ও ৫,০৪৪**

● পাদটীকা

১. Risley H. H. - The Tribes and Castes of Bengal, Vol I p-220

২. Op. Cit., p-220

৩. Op. Cit , p-220

৪. Op. Cit.,, p-222

ক্ষেত্রানুসন্ধানে ও তথ্যদানে — সুশান্ত মণ্ডল, যুধিষ্ঠির মণ্ডল।

## পোদ, পৌণ্ড্র, পুঁড়া, পদ্মরাজ, পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীকাক্ষ, বলাই, চাষী

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে — "অন্ধ্রাপুণ্ড্রাঃশবরাঃপুলিন্দা মুতিবা
ইত্যুদন্তা বহবো ভবন্তি। বিশ্বামিত্র দস্যুনাং ভূয়িষ্ঠাঃ।[১]

বিশ্বামিত্রের অভিশাপে এই পুণ্ড্রদের বংশধরেরা অন্ত্যজ হয়। মহাভারতে পুণ্ড্র বলিরাজের ক্ষেত্রজ পুত্র বিশেষ। তাঁর দেশই পুণ্ড্র নামে খ্যাত —

অঙ্গো বঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মশ্চ তে সুতাঃ।। (ভারত ১/১০৪/৪৮)

আবার এই মহাভারতেও পুণ্ড্র জাতি দস্যু মধ্যে পরিগণিত হয়েছে —

যবনা কিরাতা গান্ধারাশ্চীনাঃ শবর বর্বরাঃ।
শকাস্তুয়ারা কুঙ্কাশ্চ পহ্নবাশ্চান্ধ্রমদ্রকাঃ।।
পৌণ্ড্রাঃ পুলিন্দা রমঠাঃ কাম্বোজাশ্চৈব সর্বশঃ।
ব্রহ্মক্ষত্র প্রসূতাশ্চ বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ মানবাঃ।
কথং ধর্মাংশ্চরিষ্যন্তি সর্ব্বে বিষয়বাসিনঃ।
মদ্বিধৈশ্চ কথং স্থাপ্যাঃ সর্ব্বে বৈ দস্যু জীবিনঃ।।[২]

অন্যদিকে মনুসংহিতার মতে, পৌণ্ড্রাদি সকলে পূর্বে ক্ষত্রিয় ছিল, সংস্কার ও ব্রাহ্মণ অভাবে বৃষলত্ব প্রাপ্ত হয়েছে।[৩] তবে তারা শূদ্রত্ব লাভ করলেও এমন পরাক্রান্ত ছিল যে আর্যমণ্ডল থেকে তাদের বিতাড়িত করা যায় নি। তাদের আচার ও ক্রিয়া-পদ্ধতি বৈদিক ব্রাহ্মণদের থেকে পরিপূর্ণ পৃথক থাকায় তাদের অধঃপতনের প্রসঙ্গ শোনা যায়। এই পুণ্ড্রদের মধ্যে পূর্ব দেশ থেকে আগত দ্বিজও ছিল।[৪] অবশ্য মহাভারতের যুগে এই জাতি পুণ্ড্র নামে কথিত হলেও এদের আবার তিনটি প্রকারভেদ দেখা যায় — পুণ্ড্রক, পৌণ্ড্র ও পৌণ্ড্রক। তবে প্রথম দুটি নাম বৃহৎসংহিতা ও দশকুমার চরিতে প্রথম দেখা যায়।[৫]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র শব্দের অপভ্রংশে পুঁড়া, পেঁড়ো ইত্যাদি হওয়া সম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্র পুঁড়ো, পুণ্ডরী এবং পোদ — তিনটিকেই এক জাতি এবং তারা যে প্রাচীন পুণ্ড্র জাতির সন্তান তাও মনে করেন।[৬] জেনারেল ক্যানিংহাম এই পুণ্ড্র জাতির বাসস্থান পৌণ্ড্রবর্ধন হিসেবে পাবনাকে চিহ্নিত করলেও মালদার পাণ্ডুয়া বলে চিহ্নিত করা যায়।[৭] প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, ২৪

পরগণা ও মালদা জেলার ইক্ষুজীবী ও কৃষিজীবী পুঁড়া নামে এক জাতি আছে। এদের অনেকে পৌণ্ড্র জাতির সন্তান বলে পরিচয় দেয়। আবার পোদ জাতির মধ্যেও এক 'থাক' নিজেদের পৌণ্ড্র জাতীয় বলে দাবী করে। তবে অনেকে এই নিম্নশ্রেণীভুক্ত জাতিকে মহাভারতের সুপুণ্ড্রক জাতি বলেও মনে করেন।[৮] কিন্তু রিজলি পোদ, পদ্মরাজকে, চাষী হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং এদের কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী, ভূস্বামী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

বাংলার নিম্ন অঞ্চলে, বিশেষতঃ ২৪ পরগণায় এই নিম্নবর্ণের জাতির সংখ্যা বেশী। এরা চার শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ ১. বাগন্দে, ২. বঙলা ৩. খোট্টা বা মউলা ৪. উড়িয়া। প্রথম দুটি প্রধানত যুক্ত বাংলার যশোর ও চব্বিশ পরগণায়; তৃতীয়টি মুর্শিদাবাদ ও মালদায়; চতুর্থটি মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার বালেশ্বরে দেখা যায়।[৯] পোদদের চারটি ভাগ দেখা যায় — ১. বড় পুঁড়া, ২. ছোট পুঁড়া, ৩. ভাগ্যা পুঁড়া ৪. কুজরা

পোদরা বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী। আগে তারা সাধারণতঃ ৫ থেকে ৯ বছরের মধ্যে কন্যার বিবাহ দিত। তাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা নেই। তাদের চার শ্রেণীর প্রত্যেক শ্রেণী নিজের শ্রেণীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক তৈরী করতো। সমাজে এদের স্থান নীচু, বাগদীদের সঙ্গে সামাজিক শ্রেণী এক না হলেও সামাজিক মর্যাদা প্রায় একই। ব্রাহ্মণ ও 'নবশাখ'-রা এদের জল খায় না। বৈষ্ণব পোদরা মাংস খায় না।[১০] বর্তমান মালদা জেলায় ইংলিশবাজার ব্লকের মহদীপুর, ধানতলা, জোত, কালিয়াচকের সুজাপুর, বাখরপুর, দেবীপুর,ছোট মহদীপুর, ওল্ড মালদা ব্লকের মুচিয়া, মহাদেবপুর ও হবিবপুর ব্লকের আইহো, যাদবনগর ইত্যাদি গ্রামে পোদদের অধিক বাস।

পুঁড়াদের বিয়ের দিন প্রথমে পাঁচ অথবা সাতজন সধবা যজ্ঞের খই ভাজে। এরপর ঢেঁকিতে হলুদ ও ধান কোটা হয়। এই ধান-হলুদ দিয়েই পাত্র ও কন্যার অধিবাস হয়। এরপর নান্দীমুখ। পিতৃপুরুষকে বিবাহের কথা জানানো হয়। ছাদনা তলা বা ছায়ামণ্ডপ তৈরী করে জামাইরা। ঝাসরা নেওয়া, সরাবদল বিধি, কামানো, দুধ ছড়ানো, মেয়ের ঘর ভাঙ্গানো, বর বরার বিধি, গৌরী পূজা ইত্যাদি অনুষ্ঠান হয়। বিবাহ বাসরে মেয়েদের লালপেড়ে শাড়ি থাকে। অবশ্য হলুদ দিয়ে তা হলুদ রঙা করা হয় এবং 'সপ্তপদী' অর্থাৎ সাতপাক ঘোরা অনুষ্ঠানও হয়। পরের দিন বৌ নিয়ে ছেলের গৃহে যাত্রা। বরের মা এক পায়ে ছেলে ও বউকে নিয়ে ছেলেকে বলে —

গিয়েছিলি বাণিজ্য করতে এনে দিলি কি?

ছেলে উত্তর দেয় — নিয়ে আসলাম মা তোমার কামের কামিনী।

পরদিন প্রাতে ঘাট স্নান, পাশাখেলা, ভাত রান্না করা বিধি এবং সন্ধ্যায় বৌভাত। তার পর দিন বৌ যায় পিতৃগৃহে এবং সেখানেও হয় ঘাট-স্নান। তার পর দিন বৌ আবার শ্বশুর বাড়ী আসে এবং চারদিন পর পুনরায় বাপের বাড়ী গিয়ে একেবারে অগ্রহায়ণ মাসে আসে শ্বশুরবাড়ীতে। এই রীতিটি অবশ্য এখন সর্বত্র পালিত হয় না, কারণ বাল্যবিবাহ এখন হ্রাস পেতে চলেছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে পোদরা দুর্গা, কালী, সরস্বতী ইত্যাদি পূজার সঙ্গে গম্ভীরা পূজাতেও অংশগ্রহণ করে। ব্রতের মধ্যে কুমারী মেয়েরা সান্ঝা ব্রত সুরু করে কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন তুলসীতলায় মাটির সান্ঝা (সন্ধ্যা) পেতে। এতে পূজারী নেই। সান্ঝার দু পাশে ডুমনা-ডুমনী থাকে। অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তিতে এর বিসর্জন হয়। এর গানও হয়। যেমন —

১. এক পাত্তা, দু পাত্তা, তিন পাত্তা, লাল সান্ঝার ফুল পাত্তা

২. ওপার দিয়ে যেতে সান্ঝা হাতো দেখাইলো —
সে দেখে রাজার ছেলে চুড়ি পরাইলো।

(এমন ভাবে কান, পা, গলা) ....

সঙ্গীতপ্রিয় পোদদের মেয়েরা। তাই গায়ে হলুদ, অধিবাস, দোরবাঁধা, শাশুড়ীর পাত্রের মিষ্টি খাওয়ানো, সাতপাকে বাঁধা, বৌ নিয়ে ঘরে আসা, বাসরঘরের দরজা ধরা ইত্যাদি সর্ব আচার-অনুষ্ঠানেই অসংখ্য তাদের গান আছে। যেমন গায়ে হলুদের গান —

কাঁচা না হলুদরে টগমগ করে রে
মুখ বহে পড়ে বাছার ঘাম
কোথায় না গেল রে লালাপুরি মাসিরে
আঁচল দিয়ে মুছায় বাছার ঘাম।

পূর্বে নাপিত কন্যা/পাত্রের নখ কেটে দিত ও কান ফুটো করতো। সে উপলক্ষে একটি গান —

লাওয়া নাপিতরে বাছা ধনকে কামাও ভাল করে
ক্ষুর যেন না লাগে রে।
দুধ খাবার যা-ই দিব, দুধ খেতে বাটি দিব
আমার বাছার ধনকে কামাও ভাল করে
কন্যা/পাত্রের মায়ের কোলে শুতে দিব
লাওয়া নাপিতরে বাছা ধনকে কামাও ভাল করে। ....

এদের সাতপাকে বাঁধার একটি গান —

এক পাক হ'ল কন্যা, দুই পাক হল
তিন পাকোর ব্যালা কন্যা সম্মুখে দাঁড়াইল।
আবাল গৌরীর বিয়ে হবে
পুষ্পের ছাওনে শঙ্খের ধ্বনি ....

প্রসঙ্গতঃ আদমসুমারী অনুসারে পুঁড়া বা পোদদের (অবিভক্ত ও বিভক্ত) মালদা জেলায় লোকসংখ্যার পরিসংখ্যান —

| ১৮৭২ | ১৮১৮ | ১৮৯১ | ১৯০১ | ১৯১১ | ১৯২১ | ১৯৩১ | ১৯৪১ | ১৯৫১ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৬৬ | ৮২১৬ (৩৬৬) | ৯৫৭৪ | ৩ | ... | ১ | ৪৭৬ | ৪৪৫ | ২৭৫১ |

১১

[কতিপয় পরিসংখ্যান বিভ্রান্তিজনক, ভুল ১৮৮১ সালের মূল Risley-র বইতেই ধরা পড়ে।]

## ● পাদটীকা

১. ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৭/১৮

২. মহাভারতম্, শান্তিপর্ব, ৬৫ অঃ

৩. মনুসংহিতা, ১০/৪০-৪৪

৪. অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ - পুণ্ড্রজাতি (অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ রচনাবলী) তৃতীয় খণ্ড, পৃ- ৩২৫
৫. প্রাগুক্ত, পৃ-৩২৬
৬. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড) বাঙ্গালীর উৎপত্তিঃ বিবিধ প্রবন্ধ, পৃ-৩৫৯
৭ Beverly H. - Report on the Census of Bengal, 1872, p-188
৮. নগেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদিত) - বাংলা বিশ্বকোষ, একাদশ ভাগ, পৃ-৫০৯
৯. Risley H. H. - The Tribes and Castes of Bengal, vol.II, p-176
১০. ibid, p-177
১১ Mitra A - The Tribes and Castes of West Bengal, p-112

ক্ষেত্রানুসন্ধানে ও তথ্যদানেঃ রঞ্জিতা মণ্ডল, রাধারাণী মণ্ডল, প্রতিমা বায. স্বপ্না মজুমদাব।

## জালিয়া, জেলে, ঝালো, জালওয়া, জেলিয়া, জালিয়া কৈবর্ত

বাংলা দেশে সমস্ত শ্রেণীর মৎস্যজীবী ও মাঝিদের এক সাধারণ নাম 'জেলে'। শব্দটির উৎপত্তি জল বা জাল (net) থেকে। প্রকৃতপক্ষে এটি সম্প্রদায়ের নাম নয়। তাই মালো, তিয়র, কৈবর্ত, বাউরী, বাগদী, রাজবংশী এবং মুসলমানদের ঐ বৃত্তি থাকায় সাধারণভাবে জেলে বলে চিহ্নিত করা হয়। বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নোয়াখালি অঞ্চলে তাদের অন্তঃগোষ্ঠী হিসেবে চার শ্রেণী দেখা যায় — ১. চাটগাঁও জালিয়া ২. ভুলুয়া জালিয়া ৩. ঝালো জালিয়া ও ৪. কৈবর্ত জালিয়া।[১] ধাতুগত অর্থে 'কে' অর্থাৎ জলে বর্ততে ইতি কেবর্ত ও কেবট ( কেওট) জলকে অবলম্বন করে অথবা জলমধ্যে জীবিকা নির্বাহের উপায় ছিল বলেই কেবট নাম।[২] প্রথম দুটি অঞ্চলভিত্তিক নাম, তৃতীয়টি সমার্থক শব্দযুক্ত এবং চতুর্থটি কৃষিজীবী কৈবর্ত থেকে পৃথকীকরণে উপ-সম্প্রদায়। ঢাকা অঞ্চলের জেলেদের শক্তসমর্থ চেহারা এক সময়ে চোখে পড়ার মত ছিল। মালদা জেলায় জেলেদের অন্তঃগোষ্ঠী — গুড়হি / কুলীন গুড়হি, কেউট,সরাইয়া, বিন্দ, মালো। সুতরাং অনেক স্থানে জেলে ও মালো একই সম্প্রদায়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে মালো ও ঝালোমালোর সম্পর্কে অনুসন্ধানে জানা যায় যে যারা উপবীত ধারণ করার অধিকারী তারা ঝালোমালো, অন্যদিকে মালোরা পৈতা পরিধান করে না।

অন্যান্য অঞ্চলের মত মালদা জেলার নদীর তীরবর্তী অঞ্চলেও এদের বাস। কালিন্দ্রী, মহানন্দা, টাঙ্গন, গঙ্গা, ইত্যাদি নদীর তীরে এদের বাস। মালদা জেলায় ইংরেজবাজার ব্লকের শোভানগর, মিল্কি, খাসকোল; মাণিকচক ব্লকের পাঁচিশা, নওয়াদা, এনায়েতপুর, খয়েরতলা, নূরপুর; ওল্ড মালদা ব্লকের নাগেশ্বরপুর, মুচিয়া, আইহো; রতুয়া এক নং ব্লকের শুয়োরমারা (কমলপুর), বাজিতপুর, কাহালা, পশ্চিম রতনপুর; রতুয়া ২ নং ব্লকের পরাণপুর,সিমলা, মীরজাতপুর, পীরগঞ্জ, পুখুরিয়া,হাতিছাপা, ভালুকা, গোবরা; হবিবপুর ব্লকের বুলবুলচণ্ডী; চাঁচল ১ নং ব্লকের চাঁচল, পাহাড়পুর, কলিগ্রাম; হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লকের কুইলপাড়া, তুলসীহাটা, দক্ষিণ হরিশ্চন্দ্রপুর; হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নং ব্লকের হরদমনগর, শিমূলতলা, দুবোল ইত্যাদি গ্রামে জেলে বা জালিয়া কৈবর্তের বেশী বাস।

জেলেদের আগে সম্পত্তির উত্তরাধিকারসূত্রে সমাজে ছেলেরা দশ আনা পেত এবং মেয়েরা পেত ছ আনা।

আগে তাদের সমাজে দুষ্কর্মে গ্রাম্য-বিচারে প্রধান বিচারক ছিল 'মোড়ল' বা মুখিয়া'।

পাঁচজন সদস্যের এই বিচার ব্যবস্থায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো, তবে মতান্তর থাকলে ক্রমান্বয়ে 'বাইশী' ও 'ছত্রিশী' বিচার হতো। এই 'ছত্রিশী'ই সর্বপ্রধান বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী ছিল।

সমাজে ডাইনী সম্পর্কে ধারণাও তাদের ছিল। এবং তাদের না মেরে তাদের কাছ থেকে ছেলে-মেয়েদের দূরে রাখার ব্যবস্থা তারা করতো।

আগে জেলেদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রথা ছিল এবং কন্যাপণ প্রচলিত ছিল। জেলেদের বিবাহে মেয়েদের নানা গীত আছে। তন্মধ্যে একটি গায়ে-হলুদের গান —

কাঁচা হলুদ মাখিয়া হে বোরো (= বর)
ফিরিছো বাজারে, ওহে বোরো ফিরিছো বাজারে
কামিনী লাগি আনি ওহো বোরো
কামিনী লাগি আনি ওহো বোরো
পরিবার শাড়ী।
মাথা তুলিয়া দেখি ওহো বোরো
শাড়ী হল আঁটো (=ছোট) ....

মালদার জেলেদের উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্যে মহাদেব পূজা, গঙ্গাপূজা ও গম্ভীরা গান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মেয়েরা মঙ্গলচণ্ডীর এবং কুমারী মেয়েরা কর্মা-ধর্মার ব্রত পালন করে।

এদের মাছ ধরার বিভিন্ন প্রকার জালের নাম —ভুরি জাল, খড়া বা ভ্যাসালে জাল, মছ জাল, ছাঁদি জাল, চট জাল, সূতি জাল, টানা জাল, বুটি জাল,বাদাই জাল, চান্দি জাল,স্যাংলা জাল, ছুবলি জাল, চেলি জাল, ফ্যারাকাছি জাল, খ্যাপলা বা ঝাঁকি জাল, উঠার বা গলতি জাল, খাটাল জাল, বেড় জাল, হাঁটা জাল, বাচন জাল, ফেচিজাল ইত্যাদি। আবার মাছ ধরার জন্য বাঁশের তৈরী আনতা, জাঙ্গা, বানা ইত্যাদি। জেলেদের মধ্যে কতিপয় নিষিদ্ধ কাজ (taboo) আছে। যেমন তারা পাঙ্গাস, গারুয়া ও গাগর মাছ কেটে বিক্রী করে না। অনেক জেলে আঁষহীন মাছ ঘৃণা করে। এমনকি সিঙ্গি মাছ স্পর্শও করে না। মুসলমান জেলেদের মধ্যে হানাফী সম্প্রদায় কাঁকড়া প্রভৃতি খায় না। অশৌচকালে জেলেরা মাছ ধরে না বা বিক্রয়ও করে না।[৩]

মালদার নদী-নালায় যে সব মাছ জেলেরা ধরে তার মধ্যে আছে — রুই, কাতলা, কালবাউস, পুঁটি, পাতাসি, চিংড়ি (ছোট ও বড়), ভেদা, আড়, মাগুর, সিঙ্গি, মৌরলা বা ময়া, চেলা, মৃগেল, চ্যাঙ, বাম, শোল, কই, গুচি, বাগহার, শাকুক (বর্তমানে লুপ্ত), রায়খড় বা রায়েখ, পাবদা, বাটা, ট্যাংরা (স্থানীয় ভাষায় গুজি ট্যাংরা, রাম ট্যাংরা, গেটিয়া ট্যাংরা, তেলি টেংরা, গুপ্তি ট্যাংরা), সরপুঁটি, রিঠা, পিয়ালি, পাতাসি বা তিনকাঁটা, বাচা, ফ্যাঁসা, করতি, সোনা খড়কি, বেলে, ডারকা, বাঘাড়, চাঁদা, কাঁকলেস (কাঁক্ল্যা), ইলিশ, বাঁশপাতা বা সুতলি, নয়না ইত্যাদি।

বাংলার জালিয়াদের অনেকে কৈবর্ত ও অন্যান্য প্রদেশের কেওটের সমপর্যায়ভুক্ত করেন।[৪] পূর্বে অধিকাংশ অঞ্চলে জালিয়ারা মৃতদেহকে স্নান করিয়ে শ্মশানঘাটে নিয়ে যেতো এবং নদীর ধারে গর্ত করে সমাধিস্থ করতো।

আদমসুমারী অনুসারে মালদা জেলার জালিয়া কৈবর্তদের জনসংখ্যা ঃ—

| ১৮৭২ | ১৮৮১ | ১৮৯১ | ১৯০১ | ১৯১১ | ১৯২১ | ১৯৩১ | ১৯৪১ | ১৯৫১ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২১৮৬ | ১৩২৮ | ৩৭,৭৪৪ | ৭৯৩ | ১০৯৭ | ১৫৯৩ | ১০৬৪ | ৬৫৯ | ৪২৭১ |

## ● পাদটীকা

১. Risley H. H -The Tribes and Castes of Bengal, Vol I, p-340

২. অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ - কৈবর্ত জাতির ইতিহাস, (রচনাবলী) তৃতীয় খণ্ড, পৃ-১৮৯-৯০

৩. ibid, p-342

৪. Beverly H - Report on the Census of Bengal, 1872, p-186

৫. Mitra A., The Tribes and Castes of West Bengal, p-101

ক্ষেত্রানুসন্ধানে ও তথ্যদানে : সুবল সবকার, খাইজামান আলি, বাসুদেব সরকার।

## ঝালো-মালো, মালো, মালো পাটনী

বাংলার এক দ্রাবিড়ীয় নৌকাবাহক ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায়। কৈবর্ত ও তিয়র (তিবর) থেকে এরা স্বতন্ত্র।[১] সম্ভবতঃ মার্গব (নৌকাবাহক মাঝি) শব্দ থেকে মালো জাতির নামকরণ হয়েছে বলে অনেকের অনুমান।[২] ডাঃ ওয়াইজ মৎস্যজীবী তিনটি সম্প্রদায় অর্থাৎ কৈবর্ত, মালো ও তিয়রদের গঙ্গার ব-দ্বীপ অঞ্চলের প্রাক্-ঐতিহাসিক অধিবাস বলে দৃঢ় মত পোষণ করেছেন। এদের মধ্যে শ্রেণী-বিভাগ না থাকায় তাদের বাংলাদেশের আদিম অধিবাসী হিসেব গণ্য করা যায়।[৩] বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মৈমনসিংহ জেলায় দু শ্রেণীর মৎস্য ব্যবসায়ী দেখা যায় — ১. কৈবর্ত ও ২. ঝালো।[৪] মনে হয় শব্দদ্বৈত এটি — মালো-ঝালো বা ঝালো-মালো।

বর্ণ হিন্দুদের আচার-ব্যবহার ও ধর্মকর্মাদির প্রভাবে ও অনুকরণে এদের অনেক গোত্র প্রচলিত আছে। যেমন — আলিমান (আলম্বায়ন), বাণঋষি, বঙ্গশ ঋষি, কার্ত্তিক ঋষি, ভরণ ঋষি ইত্যাদি।[৫]

কাটার বা ব্যাপারী মালো নামে আর এক শ্রেণী আছে। তারা মাছ ধরে না, কিন্তু মাছ কেটে ওজন করে বিক্রী করে। এরা মালো থেকে স্বতন্ত্র এবং ইসলাম ধর্মাবলম্বী।[৬]

এদের সমাজে সমস্যা ও সাধারণ বিবাদ ইত্যাদি গ্রামের মোড়ল বা মাতব্বর (অন্য সম্প্রদায়েরও হতে পারে) সাধারণতঃ মীমাংসা করে থাকে। এতে দৈহিক শাস্তি বা অর্থদণ্ড হতে পারে। কূটবুড়ির কুমন্ত্র ও ভূতপ্রেতে এদের যেমন বিশ্বাস, তেমনই ওঝা বা কবিরাজের ঝাড়ফুঁকেও তাদের বিশ্বাস।

মালোদের সগোত্রে বা মাতৃগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। এ ছাড়া সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত পিণ্ড-প্রতিবন্ধকতা বাদ দিয়ে বিবাহের নিয়ম প্রচলিত আছে। সাধারণতঃ কন্যাপণ এদের মধ্যে প্রচলিত। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের বিবাহ প্রণালীর অনুকরণে এদের বিবাহ হয়। তবে ছায়ামণ্ডপ বা ছাদনাতলায় বিবাহে বিভিন্ন সময়ের আলপনা পৃথক পৃথক ভাবে দেওয়া হয়। যেমন বর-যাত্রার সময়ে যে আলপনা থাকে, বৌ নিয়ে আসার সময় তার রূপ বদলায়। এই ধরনের পরিবর্তনশীল আলপনার নাম 'বউছত্র'। বর বৌকে নিয়ে গৃহে এলে 'ছাদনাতলায়' স্থানীয় বৌদের নৃত্য হয়। এ সময়ে

নববধূকে কোলে নিয়ে নৃত্য হয়। কুলা, চালুনি, দূর্বা ও ফুল নিয়ে অন্য সধবা নারীরা বর-বধূকে বরণ করে।

মালোদের গায়ে-হলুদের একটি গান —

ক. এতদিনে ছিল্যারে হলুদ আলানে পালানে।
আজ হইতে আইল্যারে হলুদ রামের বিহার শুভখণে (= ক্ষণে)।।

খ. এতদিনে ছিল্যারে কুল্যা-চালুন বাঁশফোড়ের দোকানে।
আজ হইতে আল্যারে কুল্যা-চালুন রামের বিহার শুভখণে।।

ঝালো-মালোরা বাঙালীর সমস্ত পূজা উৎসবে যোগ দিলেও চড়ক, গাজন, গঙ্গাপূজা ও মনসা পূজাই আড়ম্বরে করে। চড়কের সময় গেরুয়া কাপড় ও হর-পার্ব্বতীর মুখোশ পরে ঢাকের সঙ্গে নৃত্য করে এরা অর্থ-উপার্জন করে। রাধা-কৃষ্ণের সঙ সাজিয়ে (অষ্টদল) তারা লৌকিক গানও পরিবেশন করে। এরা প্রতি বছর নদীর ঘাটে গঙ্গাদেবীর মূর্তিপূজা করে এবং তার কয়েক দিন আগে থেকে তারা মাছধরা পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়। লবণ ও চিনি গঙ্গা পূজার প্রধান উপকরণ হিসেবে গণ্য।

ঝালো সম্প্রদায় প্রধানতঃ বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী বলে কীর্তন গান করে এবং তার বাদ্যযন্ত্র অনুষঙ্গ — খোল বা মৃদঙ্গ, জুড়ি, করতাল, ঢোলক, একতারা, সানাই বাঁশী। গোঁসাইরা তাদের দীক্ষাগুরু। পতিত ব্রাহ্মণেরা এদের পূজানুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করে। যে সকল নদীতে এরা নৌকায় মাছ ধরে, সেই সব নদীকে বিশেষ ভক্তি সহকারে পূজা করে। শ্রাবণ মাসের মহোৎসবে এরা 'খল কুমারী'র পূজা করে। এ সময়ে বুড়াবড়ীকে ভক্তি সহকারে পূজা করে এবং খাজা খিজিরের উদ্দেশে নদীতে প্রদীপ ভাসায়।[৭]

মালোদের মধ্যে মাংসাহার বিশেষ পছন্দের নয়। তবে মাংসের মধ্যে কচ্ছপের মাংস এরা পছন্দ করে। এদের গৃহে স্টীল বা এলুমিনিয়ামের বাসন অপেক্ষা কাঁসা-পিতলের থালা বাসনই বেশী দেখা যায়।

বর্তমান মালদা জেলায় ওল্ড মালদা ব্লকের সাহাপুর, বাচামারি, আইহো, চর লক্ষ্মীপুর, মুচিয়া, বুলবুলচণ্ডী, ছাতিয়ানগাছী, সিঙ্গাবাদ, রঙবাহার; বামনগোলা ব্লকে বামনগোলা, ডেমাডাঙ্গা, নালাগোলা; হবিবপুর ব্লকের তিলাসন, নিমডাঙ্গা, পার হবিনগর, বৈরডাঙ্গী, হাঁসপুকুর, জালসা; চাঁচল ১ নং ব্লকের জগন্নাথপুর, বলদিয়াহাট, পাহাড়পুর; চাঁচল ২ নং ব্লকের সুতী, সদরপুর, ভাকুরী, বোয়ালিয়া; রতুয়া ২ নং ব্লকের পরাণপুর; হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লকের ভেলাবাড়ী, গাজোল ব্লকের রানীগঞ্জ, জালসা, আলালঘাট ইত্যাদি গ্রামে মালোদের অধিক বাস।

ঝালো-মালোদের মাছ ধরার সাজ-সরঞ্জাম, জেলে বা জালিয়া কৈবর্তদেরই অনুরূপ (দ্রষ্টব্য জালিয়া অংশে)। তা ছাড়া এ জেলার উৎপন্ন বা প্রাপ্ত মৎস্যের নামও 'জালিয়া' অংশে দ্রষ্টব্য।

মালোরা মাছ ধরার পাশাপাশি চাষ-আবাদও করে। নিজের জমি ও অপরের জমিতে এরা কাজ করে।

ঝালো-মালোরা মৃতদেহ সৎকার সেদিনই করে। বাদ্যযন্ত্র বিশেষ করে খোল ও জুড়ি,

মাটির কলসী এবং কলাগাছ নিয়ে নদীর কূলে শবদেহ জলের সঙ্গে সামান্য স্পর্শ করে রেখে সাতবার জল দিয়ে স্নান করিয়ে সলতে যুক্ত মাটির প্রদীপের অগ্নি মুখে দেয়। তারপর পাটকাঠি দিয়ে চিতায় অগ্নি সংযোগ করে সাধারণতঃ মৃতের জ্যেষ্ঠ পুত্র। শবের ভস্মরাশি ও নাভিকুণ্ডলী নদীগর্ভে বিসর্জিত হয়। শবদাহ হলে ঐ স্থানে জলপূর্ণ কলসী রাখা হয় এবং কলাগাছটি পুঁতে শ্মশানযাত্রীরা স্নান করে গৃহে ফেরে। শ্রাদ্ধান্তে জ্ঞাতি ভোজনাদি হয়। তারপর এক বৎসরকাল প্রতি মাসে মাসিক এবং প্রতি বছর অন্তে শ্রাদ্ধ হয়ে থাকে। কখনো কখনো মাসিক শ্রাদ্ধগুলি একসঙ্গে বার্ষিক শ্রাদ্ধকালেও হয়ে থাকে।[৭]

আগে ঝালো-মালোরা হিন্দু সমাজে বিশেষ হেয় বলে প্রতিপন্ন হতো। ব্রাহ্মণেরা এদের স্পৃষ্ট জল গ্রহণ করতো না। এমনকি কৈবর্ত ও তিওরেরা মালো অপেক্ষা উচ্চশ্রেণী বলে দাবী করতো।

আদমসুমারী অনুসারে মালদা জেলায় ঝালো-মালোদের জনসংখ্যা এরূপ ঃ

| ১৮৭২ | ১৮৮১ | ১৮৯১ | ১৯০১ | ১৯১১ | ১৯২১ | ১৯৩১ | ১৯৪১ | ১৯৫১ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩৪৯৫ | .. | ৫৬৬২ | ৪৭২৯ | ৫৪০০ | ৫৮১০ | ৪৬২০ | ২২৮১ | ২৯৮১ |

(... - পৃথকভাবে জেলার ঝালো-মালোর সংখ্যা মেলে নি।)

## ● পাদটীকা

১. Risley H. H - The Tribes and Castes of Bengal, Vol II, p-64
২. নগেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদিত), বাংলা বিশ্বকোষ, চতুর্দশ ভাগ, পৃ-৬৮৪
৩. Risley H H , ibid, p-64
৪. অমূল্যচবণ বিদ্যাভূষণ, কেবট জাতি (অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ রচনাবলী- তৃতীয় খণ্ড, পৃ- ২০৫)
৫. নগেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ-৬৮৪
৬. তদেব, পৃ-৬৮৪
৭. Risley H. H , ibid, p-65
৮. Mitra A., The Tribes and Castes of West Bengal, 1953, p-101

ক্ষেত্রানুসন্ধানে ও তথ্যদানে ঃ জগদীশচন্দ্র হালদার, বাসুদেব সরকার

# মালদার পুরাকীর্তি পরিচয়

## অংরেজাবাদ বা ইংলেজাবাদ বা ইংলিশবাজার বা ইংরেজবাজার ঃ

মহানন্দা নদীর তীরে অবস্থিত ইংলিশবাজার (ইংরেজবাজার) মালদা জেলার পুরাতন সদর। মহানন্দার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে ২৫°৫´ ১৪´´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°১১´ ২০´´পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। দুই/তিন দশকের মধ্যে জনসংখ্যার বাহুল্যে এর চৌহদ্দী অনেকগুণ বর্ধিত হয়েছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ১৬৮৫ থেকে ১৬৯৩ সালের Maulda and Englesavade শীর্ষক Diaries and Consultations-এ আছে যে সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে ইংলিশবাজারে একটা কুঠি (Factory) ছিল।[১] বর্তমান ওল্ড মালদায় ইংরেজদের ১৬৮০ সালে যে কুঠি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা বাংলার নবাব শায়েস্তা খানের নির্দেশে বাজেয়াপ্ত হয়।[২] অবশ্য ইংরেজদের কুঠির আগেই ওলন্দাজরা এখানে কুঠি স্থাপন করেছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রিচার্ডস এডওয়ার্ডসের আগমনে তাদের কুঠি স্থাপনার কাজ ত্বরান্বিত হয় এবং ১৬৮০ সালে বঙ্গোপসাগরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান ম্যাথিয়াস ভিনসেস্ট ১৬৮০ সালে কাশিমবাজার কুঠির প্রধান এডওয়ার্ড লিটলটন এবং প্রস্তাবিত কুঠির ফিচ নিঢামকে নিয়ে এসে স্থানীয় কর্মচারীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য মালদায় (ওল্ড) আসেন। লিট্‌লটন নিঢামকে স্থানীয় ফৌজদার ও ক্রোরির (রাজস্ব কর্মচারী) সঙ্গে পরিচয় করান। এই ঘটনাই এখানকার কুঠি স্থাপনা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রপাত ঘটায়।[৩]

এখানে বিভিন্ন রকমের সূতিবস্ত্রের ব্যবসা ছিল। সে সব সূতীবস্ত্রের নাম — চাঁদনী (সাদা গালচের থান), ওরঙশাহী (রেশমের থান), এলাচী (রেশম বস্ত্রে লম্বালম্বি ঢেউ খেলানো নকশা) চারকোণী (চৌখুপী মসলিনের থান ), শিরশুক্কার (পাগড়ী), নেহালিওয়ার (বিছানার চাদর), মন্দিল (তোয়ালে, কৌপীন বস্ত্র), মলমল ( বিভিন্ন শ্রেণীর মসলিন), তাঞ্জীব (সূক্ষ্ম মসলিনের থান)।[৪]

১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে মহানন্দার অপর পারে জমিদার রাজারায় চৌধুরীর নিকট থেকে মকদুমপুরে ১৫ বিঘা জমি তিনশ টাকায় কিনে তারা নূতন কুঠি তৈরী করে এবং ওল্ড মালদায় ভাড়াবাড়ীতে থেকে কাজ চালাতে থাকে। নিঢাম কুঠির অধ্যক্ষ হন।[৫]

পলাশীর যুদ্ধের পর ১৭৭১ সালে টমাস হেঞ্চম্যান বাণিজ্যিক কুঠিয়াল (Commercial Resident) হয়ে এখনকার পুরাতন কালেক্টরেট ভবনটি প্রতিষ্ঠা করেন। নিরাপত্তার খাতিরে এর চতুর্দিকে তোপমঞ্চ এবং কামান স্থাপন করার জন্য প্রাচীরের গায়ে ছিদ্র (Embrasure) ছিল। এটি সাধারণের নিকট বড়ি কোঠি (বড় কুঠি) বলে পরিচিত ছিল। এখানে কাপড় বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত করা হতো। কিছু সোনা-রূপার সূচিশিল্পের কাজও (কশিদা) হতো।[৬]

মালদার মকদুমপুরের এ অঞ্চলে সূতা এবং কাপড়ে রং করার (Dye) ঘাঁটি গড়ে ওঠে এবং এই রং করার কর্মীদের রঙরেজ বলা হতো। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলেও এদের পরিচয় আছে—

রঙরেজ নাম ধরে রঙ্গন করিয়া।
ধরিলা হাসান নাম কুন্দুর করিয়া।।[৭]

পাশেই বাজার ছিল বলে অঞ্চলটি রঙরেজ বাজার নামে পরিচিত হল। ইংলিশরা (Englishman) এর নামকরণ করে তখনকার ফারসী ভাষার আবাদ যুক্ত করে — ইংলেজাবাদ (Englesavad)। আজও ইংরেজী ভাষায় (ইংলিশরা তখন দেশের রাজা ছিল) এ অঞ্চলটি ইংলিশবাজার, কিন্তু বাংলায় বলে ইংরেজবাজার। আসলে এটি ধ্বনিতত্ত্বের (Phonology) বিচারে লোক নিরুক্তি বা লোকব্যুৎপত্তির (Folk-Etymology) ফলেই ঘটেছে — যা ধ্বনিসাম্যের সুযোগে শব্দ-বিকৃতিরই ফল।

ইংরেজবাজার শহরে বেশ কয়েকটি মসজিদ ও প্রাচীন শিলালিপি থাকায় এটিকে 'মসজিদময় শহর' বলা যেতে পারে।[৮] অবশ্য এ শহরে কয়েকটি মন্দিরও আছে যা উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেই নির্মিত।

## ইংরেজবাজারের পুরাকীর্তি পরিচিতি ঃ

### কুট্রিটোলা মসজিদ/ভবন

ইংরেজবাজার শহরের প্রায় কেন্দ্রভূমিতে কুট্রিটোলা লেনে অবস্থিত। আবিদ আলি খান এটিকে মসজিদ বললেও আগে এখানে কোন মেহরাব ছিল না। বছর কুড়ি আগে এখানে মেহরাব হয়েছে ও মিম্‌বার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সম্ভবত এটি জনৈক বুজুর্গের ইবাদৎখানা ছিল। ভবনটি বর্গাকার — ১৪´৭১/২´´ x ১৪´ x ৭১/২´´। ছাদ থেকে গম্বুজের উচ্চতা ১০´২´´ এবং গম্বুজের ব্যাস ৪৪´৭´´।[৯] এখানে যে লিপিটি আছে তা জনৈকা বিধবা সওরা বেওয়া মসজিদ হিসেবে গ্রাহ্য হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তৈরী করেছিলেন বলে জানা যায় —

بنای مسجد هذا شعـورا نیک نام * سروش غیب گفته که سنه بالا راحت

در سنه یکهزار و دو صد و پنجاه و هفت اتمام * آنچه تحریر کرده قلم خوشخرام.

অনুবাদ ঃ 'পুণ্য নাম যুক্ত সওরা এই মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন ১২৫৭ অদৃশ্য ফেরেশতাগণ বলেছিলেন 'ছানাহ বালা রাহাত' মহা আরামের বছর এবং দ্রুতগতি লেখনী এটি উৎকীর্ণ করে।

### ফুন্দন মসজিদ

ইংরেজবাজার শহরের মীরচক এলাকার শেষ প্রান্তে মুঘল রীতির এই মসজিদ। মসজিদের মূল কক্ষ ত্রিধা বিভক্ত, মধ্যভাগে আছে গম্বুজ এবং দুদিকে দুটি ভল্ট (vault)। বাইরের আয়তন ৩১´৫´´ x ১৭´ ৫´´। মধ্যভাগের কক্ষ খিলান দ্বারা পার্শ্ববর্তী ভল্টের দিকে সম্প্রসারিত। সামনের বারান্দা ষাট/পঁয়ষট্টি বছর আগে নির্মিত হয়েছে। ভিতরে মেহ্‌রাব-মধ্যের বর্গাকার (৯´ ৫´´x ৯´ ৫´´) ক্ষেত্র থেকে গম্বুজটি উঠেছে। পাশের 'ভল্ট' দুটি ৯´৫´´ x ৪৪´ ৮´´। তবে ভিতরে বর্তমানে চুনকাম করাতে তার সৌন্দর্য অন্তর্হিত।[১০] জনৈকা মোসাম্মৎ ফুন্দন কর্তৃক ১২০৮ হিজরী সালে (১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দ) নির্মিত হয়। এর লিপিটি 'রিয়াজ-উস-সলাতীন্-এর লেখক গোলাম হুসাইন কর্তৃক লিখিত বলে কথিত। ফারসী ভাষায় লিখিত এই লিপিটিতে আছে —

(অনুবাদ — ফুন্দন এই মসজিদ নির্মাণ করেন -- অন্তর্দশায় তিনি সুখী হোন। শাহ আলমের রাজত্বে এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়। অদৃশ্য দেবদূতগণ এর তারিখ বলেছেন — 'বুর্দ কুফর খূদ্ ইঁ দার ইসলাম', বিধর্মী বিদূরিত হল এবং এই শহর 'দার ইসলাম' হল। এটির মাধ্যমে জানা যায় যে, ১২০৮ হিজরী সাল।)

### খাইর্-উল্-লাহ্-র মসজিদ

ফুন্দনের উত্তর -পূর্বে অতি সন্নিকটে খাইর্-উল্-লাহ্ মসজিদ। এটি 'খাইর-উল্-লাহ্ আতি কুল্-লাহ্ ওয়াকফ এস্টেট মসজিদ' নামেও পরিচিত। মসজিদ-সম্মুখে ফারসী ভাষায় একটি লিপি বর্তমান। পূর্ব দিকে উন্মুক্ত বারান্দা এবং বামদিকে 'হুজরা'। তিনটি মেহ্‌রাব, মধ্যস্থটি বৃহত্তর, মধ্যাংশে গম্বুজ এবং উভয় দিকে দুটি ভল্ট ৫´ ১/২´´ x ১০´। প্রবেশের তিনটি দরজা। ভল্ট দুটির উপর অর্ধ প্রস্ফুটিত মোটিফ অর্ধবৃত্তাকার খিলানের উপরে অবস্থিত। 'পেণ্ডেনটিভের' উপরে গম্বুজ এবং গম্বুজের আলম্বস্থানে মনোরম অলংকরণ। পরবর্তী কালে অনভিজ্ঞ রাজমিস্ত্রীদের সংস্কার ও পঙ্খের কাজ নান্দনিক অজ্ঞতার পরিচায়ক।[১১]

### মুন্সী গোলাম হুসাইনের সমাধি ও সৈয়দ আলির সমাধি

ইংরেজবাজার শহরের মীরচক এলাকায় ফুন্দন মসজিদের সম্মুখে পূর্ব-দক্ষিণে 'রিয়াজ-উস-সলাতীন-এর লেখক মুন্সী গোলাম হুসাইনের সমাধি বর্তমান। ইংরেজবাজারের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠির ম্যানেজার জর্জ উডনীর ডাক মুন্সী ছিলেন ফারসী-আরবীতে পণ্ডিত গোলাম হুসাইন। উডনীর অনুরোধে তিনি বাংলার বহু নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার করে বাংলার ইতিহাস রচনা করেন। ফারসী ভাষায় বহু শিলালিপির পাঠোদ্ধারও তিনি করেছেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে মালদার ভূমিপুত্র বিখ্যাত অধ্যাপক বিনয় সরকার জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পক্ষে তাঁর সমাধিটি সুন্দর করে বাঁধিয়ে একটি প্রস্তর-ফলক উৎকীর্ণ করেছিলেন।

এই সমাধির কাছেই পশ্চিম দিকে এবং ফুন্দন মসজিদের সম্মুখে জনৈক ইমাম আলির সমাধি। এর চেরাগদানি ও ক্ষুদ্র প্রস্তরলিপিটি দৃষ্টিনন্দন। ১২০৯ হিজরী সালে (১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে) তাঁর দেহাবসান ঘটেছে বলে লিপি পাঠে জানা যায়। সম্ভবত তিনি গোলাম হুসাইনের জনৈক আত্মীয়।[১২]

এগুলি ছাড়া ফিরোজপুরের সমাধি লিপি, চক কুরবান আলি অঞ্চলের সমাধি সমূহ, তুরকান-ই-শহীদ বা ঘোড়াপীরের সমাধি ও জাহানপীরের সমাধিও দেখা যায়।

**মনস্কামনা মন্দির**

ইংরেজবাজার বা বর্তমান মালদা শহরের উত্তর-পশ্চিমে মালদা টাউন স্টেশনের কাছাকাছি অধুনা মনস্কামনা রোডের উপরে এই জনপ্রসিদ্ধ মন্দিরটি শতবর্ষ অতিক্রম না করলেও জনপ্রিয়তায় তা উল্লেখ্য। কথিত আছে যে জনৈক স্বর্ণাম গিরি ১২৪৫ বঙ্গাব্দে এই মন্দির স্থাপন করেন। অবশ্য জনৈক বিশ্বম্ভর গিরির সাধনার কথা জানা গেলেও স্বর্ণাম গিরির সঙ্গে বিশ্বম্ভর গিরির সম্পর্ক জানা যায় নি। হয়তো বা গুরুভাই বা গুরুশিষ্য। অবশ্য উভয়েই শঙ্করাচার্য-প্রবর্তিত 'দশনামী'-র গিরি-সম্প্রদায়ভুক্ত। বর্তমান মন্দিরটির বহু রূপ-রূপান্তর ঘটেছে। পঞ্চরত্ন এই বর্তমান মন্দিরটির বহিরঙ্গের মাপ ৯´ ৬´´ x ৯´ ৬´´ অর্থাৎ বর্গাকার। পাশে বারান্দা। ভিতরের অষ্টধাতুর ভগবতী মনস্কামনা পূর্ণ করেন বলে তিনি 'মনস্কামনা'। এটি মনসা-চণ্ডী নামে কথিত। দ্বিভুজা দেবীমূর্তি সিংহবাহিনী। মন্দিরের কার্নিস পর্যন্ত মাপ ৮´ ৬´´, তারপর ধনুকাকৃতি।

মন্দিরের বামপার্শ্বে বিশ্বম্ভর গিরির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সাধনস্থলটিতে ত্রিভুজাকৃতি সমকোণী-সমভুজাকৃতি একটি গর্ভগৃহ আছে। উপানের (plinth) উপর প্রতিভুজ ১৭´ ১০´´। অধিস্থান (base) থেকে ৬´ ৬´´ — উপর থেকে ধনুকাকৃতি কার্নিশের (cornice) মধ্যভাগ ৯´ ২´´ একটি ডিম্বাকৃতি ৩´ x ৩´ x ২´ স্থানের সাহায্যে প্রথম তলের ত্রিকোণাকৃতি ঘর (১০´ ৬´´ x ১০´ ৬´´ x ১০´ ৬´´ এবং উচ্চতা ৬´ ৬´´)। আবার এখান থেকে ২´ ৬´´ উঠে সামান্য ভল্টের আকার। ত্রিকোণাকৃতি একটি বেদী। বামদিকে ৭টি সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামলে গর্ভগৃহ। দক্ষিণদিকে একটি ফোকর ( ৯´´ ব্যাস বিশিষ্ট) থাকলেও অন্ধকারাচ্ছন্ন। সম্পূর্ণ গৌড়ীয় ইটে তৈরী এই ক্ষুদ্র ভবনটি।[১৩] কথিত আছে যে এখান থেকে একটি সুড়ঙ্গ পাশের বর্তমান পুকুর পর্যন্ত গেছে — হয়তো পাশের মহানন্দার খাদে।

**কালীতলার শিবমন্দির**

ইংরেজবাজার শহরের মধ্যস্থলে বর্তমান নেতাজী মোড়ের বাম দিকে কালীতলায় গোঁসাইদের প্রতিষ্ঠিত অন্যতম পঞ্চরত্ন মন্দির। বারান্দায় একটি ভল্ট ছিল, যা 'জগমোহন' বলে পরিচিত এবং মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল গণেশমূর্তি। শতাধিক বৎসরের এই মন্দির বর্গাকার (১২´x ১২´)। বারান্দা ১২´ x ৬৭´, বারান্দায় তিন খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ, পার্শ্বদেশে কার্নিশ এবং এর মধ্যভাগ ধনুকাকৃতি সহ প্রতি কোণে ইটের বন্ধ।[১৪]

**বাঁধ রোডের শিব মন্দির**

ইংরেজবাজার শহরের উত্তরে সুপ্রাচীন 'বি. দে. হল' নাট্যগৃহের পাশে এই পঞ্চরত্ন মন্দিরটির রূপ-রীতি কালীতলা শিব মন্দিরেরই অনুরূপ।[১৫]

**সাহাপুরের বাণিজ্যা বাড়ীর শিব মন্দির**

উত্তরে মহানন্দার অপর তীরে সাহাপুরের মালোপাড়ায় বাণিজ্যা বাড়ীর এই শিব মন্দির প্রতিষ্ঠালিপি সূত্রে ১৭৬২ শকাব্দে (১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ) হরিপ্রসাদের পুত্র রামচন্দ্র দেব কর্তৃক নির্মিত।

চৌচালা বিশিষ্ট মূল মন্দিরের সম্মুখে জগমোহন ভন্টের আকার দেখা যায়। চুন সুরকীর দ্বারা প্রবেশদ্বারের মকরবাহিনীগঙ্গা, বামপার্শ্বে শঙ্খ ঘণ্টা হস্তে নৃত্যরত মূর্তি ও দক্ষিণে ঋষিমূর্তি। উপান ৭১/২, দ্বারীমূর্তিতে ঔপনিবেশিক ছাপ আছে। উপরে চুনসুরকীর দ্বারা লতাপাতা ও ফলের নকশা। আরও কয়েকটি মূর্তি আছে বটে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে সৌন্দর্যের ভারসাম্য বিচলিত। বর্গাকার গর্ভগৃহ ৮১″ x ৮১″।[১৬]

## জহুরা কালীর থান

ইংরেজবাজার শহর থেকে প্রায় চার কি. মি. দক্ষিণ-পূর্বে এই থান। বর্তমান মন্দিরটিতে আধুনিকতার ছাপ আছে। 'জহুরা' দেবী চণ্ডী হিসেবে পূজিতা। মধ্যযুগে 'জহুরা' শব্দটি পাওয়া যায় — যার অর্থ 'অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন'। শব্দটি আরবী জহুর থেকে জাত। ভক্তমাল গ্রন্থে আছে —

রাজা কহে তোমার জহুরা লোকে কহে।
কেরামত কিছু আজ দেখাইবে মোহে।।[১৭]

মাটির ঢিবির উপর একটি মুখোশ (পাশেও কতিপয় দেখা যায়)। নানান জনশ্রুতি যেমন অধিকাংশ ধর্মস্থানকে কেন্দ্র করে প্রচারিত, 'জহুরা' কালীও তা থেকে বাদ পড়েন নি। এই 'জহুরা' শব্দের মধ্যেই দেবীর লোকায়ত চরিত্র (Folk God) ধরা পড়ে। শনি-মঙ্গলবার পূজা হয় এবং বৈশাখ মাসে প্রতিদিন অসংখ্য ভক্ত সমাবেশ ঘটে— যার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সকলেই থাকে।[১৮]

- পাদটীকা

১ Abid Ali Khan, (Edited and Reviewed by Stapleton H E), Memoirs of Gaur and Pandua,p-156

২ Stewart - History of Bengal, p-199

৩ Jatindrachandra Sengupta - West Bengal District Gazetteers, Malda 1969,p-51

৪. ibid, p-52

৫ ibid, p-52

৬. Abid Ali Khan, ibid, p-156

৭. প্রদ্যোত ঘোষ (সম্পাদিত) - কবিকঙ্কণ চণ্ডী, পৃ-১৭০

৮. প্রদ্যোত ঘোষ - মালদহ জেলার পুরাকীর্তি, পৃ-২২

৯. প্রাগুক্ত, পৃ-২৩

১০. তদেব, পৃ-২৬ ২৭

১১. তদেব, পৃ-২৩-২৪

১২. তদেব, পৃ-২৪, Abid Ali Khan, ibid, p-161

১৩ প্রদ্যোত ঘোষ - প্রাগুক্ত, পৃ-২৯-৩০

১৪. তদেব, পৃ-৩০

১৫. তদেব, পৃ-৩০

১৬ প্রাগুক্ত, পৃ-৩০-৩১

১৭. বলাইচাঁদ গোস্বামী (সম্পাদিত) - ভক্তমাল গ্রন্থ পৃ-১৮২

১৮. প্রদ্যোত ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ-২৯

# গৌড়

প্রাচীন গৌড় নগরীর ধ্বংসাবশেষ, প্রাচীন গঙ্গার মজে যাওয়া খাদের পাশে ২৪° ৫২´ উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৮° ১০´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। ইংরেজবাজার শহর থেকে এর দূরত্ব ১৬.১ কি. মি।[১]

*এখানকার দর্শনীয় পুরাস্থল ও পুরাকীর্তির মধ্যে উল্লেখ্য ঃ*

## পিয়াসবাড়ী দীঘি

পিয়াসবাড়ীতে রাস্তার বাম দিকে এই দীঘি। আইন-ই-আকবরীতে আবুল ফজল আল্লামি এর প্রথম উল্লেখ করেছেন। তা হল এই যে পূর্বে এই দীঘির জল বিষাক্ত লবণাক্ত ছিল। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত আসামীদের এর পাশে আবদ্ধ করে রাখা হত এবং পিপাসার্তদের এই জলপান করতে দিয়ে মারা হত। মহানুভব আকবরের নির্দেশে এই নিষ্ঠুর-বিধান রদ হয়।[২] সংবাদটি কতদূর সত্য তা প্রমাণিত হয় নি। দীঘির জল যে সুপেয় নয় বা বিষাক্ত সে সম্পর্কেও কোন তথ্য মেলে না।

## রামকেলী

পিয়াসবাড়ী থেকে ডান দিকে রামকেলী-গৌড় প্রবেশের পর প্রায় আধ কিলোমিটার দূরে পথের ডান দিকে তমালতলা ও তার পশ্চাতে মদনমোহন জীউর মন্দির। কথিত আছে যে রামকেলীতে গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহের মন্ত্রী রূপ ও সনাতন শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে পরবর্তী পর্বে রাজকার্জ ত্যাগ করে বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীদের অন্যতম হন। রূপ ছিলেন 'সগীর মালিক' অর্থাৎ প্রতিরাজ এবং সনাতন ছিলেন 'দবীর খাস' অর্থাৎ প্রধান মুন্সী। তমালবৃক্ষ ও চৈতন্য-পদচিহ্ন পরবর্তীকালে যুক্ত হয়েছে। প্রায় পাঁচ শতাব্দী পূর্বের শ্রীচৈতন্যের সেই শুভ পদার্পণের স্মৃতিতে রেখে এখানে জ্যৈষ্ঠমাসের সংক্রান্তিতে রামকেলী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে মদন মোহন জীউর মন্দিরের পঞ্চরত্ন মন্দিরটি ১৯৩৮ সালে নূতনভাবে সংস্কার করে নির্মিত। শ্রীসনাতন গোস্বামী কর্তৃক শ্রীমদনমোহন ও রাধারানীর বিগ্রহপ্রতিষ্ঠার কাল ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দ বলে কথিত।[৩] প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, শব্দতত্ত্বের দিক থেকে 'রামকেলী' স্থানটিতে উৎকৃষ্ট কলাগাছ ছিল বলেই এই নাম (< রম্ভা কদলী) হওয়া সম্ভব। ষোড়শ শতকে শব্দটির সন্ধান মেলে।[৩ক]

### বারদুয়ারী বা বড় সোনা মসজিদ

গৌড়-রামকেলী অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ দ্রষ্টব্য বারদুয়ারী বা বড় সোনা মসজিদ। হিজরী ৯৩২ বর্ষে অর্থাৎ ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে এটি সুলতান হোসেন শাহর পুত্র সুলতান নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ নির্মাণ করেন। উইলিয়াম ফ্র্যাঙ্কলিন মসজিদের দেওয়ালে যে লিপি দেখেছিলেন[৩] তা পরবর্তীকালে অন্তর্হিত। ফ্র্যাঙ্কলিন 'পুড়ুয়া' বা পাণ্ডুয়ার আর একটি সোনা মসজিদের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু 'বড় সোনা'-'ছোট সোনা' বলে চিহ্নিত করেন নি। তা ছাড়া কোতয়ালী দরওয়াজার দেড় মাইল দূরে (বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রে) ফিরোজপুরে আর একটি সোনা মসজিদও ছোট সোনা মসজিদ নামে পরিচিতি। আসলে আয়তনের নিরিখে এগুলি 'বড়' -'ছোট' নামে পরবর্তীকালে চিহ্নিত।[৪]

মসজিদটি ক্যানিংহামের মাপ অনুযায়ী ১৬৮´ x ৭৬´। সম্মুখভাগে ২০০ ফিট পরিমিত বর্গাকার প্রাঙ্গণ। পূর্ব-দক্ষিণ-উত্তরে তিনটি খিলানযুক্ত সুদৃশ্য প্রবেশপথ। পূর্বটি অভগ্ন, উত্তরটি আংশিক ভগ্ন এবং দক্ষিণটি ভগ্ন। উত্তরের প্রবেশ দ্বারটি ৩৮ ১/২´ x ১৩ ১/২´। খিলানের মাথা পর্যন্ত ২২ ফুট প্রস্তর-ফলকের আস্তরণ। এগুলি এক সময়ে সাদা, নীল, সবুজ, হলুদ এবং কমলা রঙে মীনা করা টালিতে অবস্থিত ছিল।[৫]

মন্দিরের ভিতর তিনটি লম্বা আইল (isle) দিয়ে তিনটি পৃথক পরিসর এবং সম্মুখে এগারটি খিলান দ্বারা উন্মুক্ত পথ। এখানে একটি প্রার্থনা কক্ষ,সম্মুখে বারান্দা ও কোণগুলিতে অষ্টভুজ বুরুজ বর্তমান। সম্মুখভাগ (facade) সমান, ছাদ ও দেওয়ালের সঙ্গমস্থলে কারুকার্য ও বক্রাকৃতি কার্নিস — উপরে অর্ধবৃত্তাকার গম্বুজ। নামাজের কক্ষ প্রস্তরস্তম্ভ দ্বারা বিভক্ত। এটি তিনটি লম্বা 'আইল' এবং উত্তরের তিনটি বে (bay) দ্বারা নির্মিত। ডান দিকে মহিলাদের যে বসার স্থানে (Ladies gallery) ছিল তা এখনও বোঝা যায়। মূল কক্ষের উপরের ৩৩টি গম্বুজই ভূপতিত। ইমামের বেদীও দেখা যায় না এখন। মসজিদের দক্ষিণ-পূর্বে উচ্চ পাটাতনটি স্থানীয় অধিবাসীদের ভাষায় 'ছাবুত্রা'।এর উপর থেকে'মুয়াজ্জিন' আজান দিতেন বলে লোকের বিশ্বাস।[৬]

ক্যানিংহামের বক্তব্যে জানা যায় যে, ফ্র্যাঙ্কলিন 'সোনার মত দামী' অর্থাৎ প্রচর অর্থব্যয়ে এটি নির্মিত বলে এটির নাম সোনা মসজিদ। আবিদ আলিও এ যুক্তি সমর্থন করেছেন।[৭] আবার কেউ কেউ 'সোনার পাতে মোড়া' — এমন হাস্যকর যুক্তিও দেখিয়েছেন।[৮] মসজিদে সোনার কাজের ব্যবহার থাকার কথা নয়। সোনালী রঙের ব্যবহারও প্রাথমিক পর্বে ছিল না। সবুজ, বেগুনী, বাদামি রঙ সোনালী বা রেশমীর পরিবর্তে ব্যবহৃত হতো।[৯] ঔজ্জ্বল্যে স্বর্ণময় ছিল বলে এটি 'সোনা মসজিদ'নামে অভিহিত এমন মনে করা অসম্ভব নয়। তা ছাড়া 'বারদুয়ারী' নামটিও বিতর্কিত। বারটি দরজার জন্য 'বারদুয়ারী', এমন অর্থও যথার্থ নয় — কারণ এখানে এগারটি প্রবেশ দ্বার আছে। আবিদ আলি এটিকে জনকক্ষ (Audience Hall) বলেছেন। এটি অযথার্থ। প্রকৃতপক্ষে রাজ প্রাসাদের বহির্দেশে এর অবস্থান (বার+দুয়ার) বলে এটি 'বারদুয়ারী'।[১০]

- **পাদটীকা**

১. Jatindrachandra Sengupta - West Bengal District Gazetteers, Malda, 1969, p-229

২. Abul Fazl Allami - The A-IN-I Akbari (Tr. Jarrett H. S and Corrected and further

annotated by Sir Jadunath Sarkar) Vol.II,p-135

৩. প্রদ্যোত ঘোষ - মালদহ জেলার পুরাকীর্তি, পৃ-৩৪

৩ক. সুকুমার সেন — বাংলা স্থান নাম, পৃঃ- ১৩৬

৪. William Francklin's Journal (1810-11)

৫. Abid Ali Khan, ibid, p-79, রজনীকান্ত চক্রবর্তী - গৌড়ের ইতিহাস (দে'জ), পৃ ৩২৩

৬. Alexander Cunningham's Account of Malda - Archaeological Survey of India, Vol.XV,p- 39-127

৬খ. Abid Ali khan - Op. Cit P-49

৭. Abid Ali Khan - op. cit. p-47

৮. কালীপদ লাহিড়ী - গৌড় ও পাণ্ডুয়া। পৃ-২২০

৯. Encyclopaedia Britannica, Vol.12, page 710-11 (Islamic Art.)

১০. প্রদ্যোত ঘোষ - গৌড়বঙ্গের স্থাপত্য, প্রথম পর্ব, পৃ-২৪

## দাখিল দরওয়াজা

'বারদুয়ারী থেকে কিছুদুরে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে এটি গৌড়ের সিংহদ্বার বা 'মূল দরওয়াজা'। এই ফটকের পার্শ্ববর্তী গড় থেকে সুলতানকে বন্দুক দেগে সম্মান জানানো হতে বলে এটি 'সালামী দরওয়াজা' নামেও পরিচিত ছিল।[১] এটি বাংলা রীতিতে নির্মিত প্রথম সিংহদ্বার।[২]

দাখিল দরওয়াজার সঠিক নির্মাণকাল জানা যায় নি। ক্রিটন এক শিলালিপি পাঠে সুলতান বারবক শাহের রাজত্বকালে (৮৭১ হিজরী / ১৪৬৬ খ্রীষ্টাব্দ) এটি নির্মিত বলে মনে করেছেন এবং তাঁর অনুমান র‍্যাভেনশ, বার্গেস, ফার্গুসন এবং পার্সি ব্রাউন সমর্থন জানান বটে, কিন্তু স্থাপত্যরীতি অনুসারে এটি অন্ত্য-ইলিয়াস শাহী পর্বের গৌড়ের সুলতান নাসির-উদ-দীন মামুদ শাহের যুগের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করে।[৩] পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে (১৪৩৭-৫৯) এটির নির্মাণ কার্য হয় বলে ধারণা এবং পরবর্তী সুলতানগণের মধ্যে রুকনুদ্দীন বারবক শাহ, হোসেন শাহ, এমনকি নশরৎ শাহের দ্বারাও এটির পরিবর্তন হয়েছিল বলে অনেকের অনুমান।[৪]

ছোট ইটে তৈরী এই দরওয়াজা।
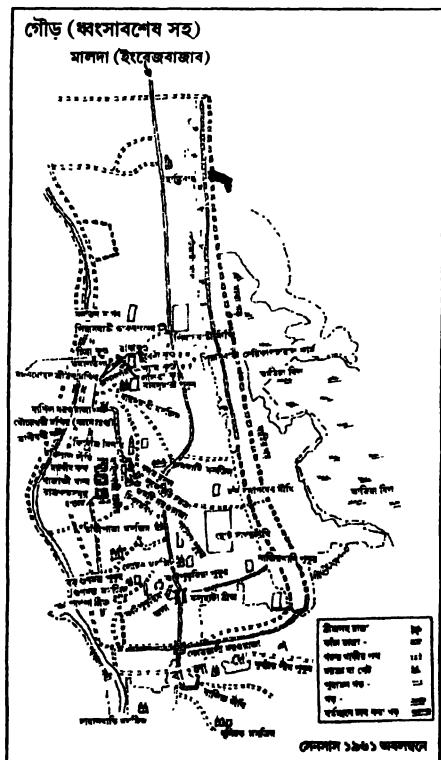
ইটগুলির কিছু কিছু বুটি দিয়ে খোদাই করা, কিছু ছাঁচে ঢালাই এবং পরে পোড়ানো। অধিকাংশ ইটের দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x বেধ – ৫১/৪″ – ৪১/২′ x ১/২″ – ১″, এগুলিও প্রাক্-মুসলিম যুগের পোড়ামাটির কাজের (terrocotta) প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই ফটকের বিস্তৃতি ১৪´৬″, লম্বায় ১১৩´১/৪″ এবং দ্বারকক্ষ ৭৪১/২″ লম্বা ও ৯১/২″ চওড়া। ৯´১/৪ ফুটের চওড়া দেওয়ালের উভয় দিকের অলিন্দের মধ্য দিয়ে তিনটি প্রবেশপথের সঙ্গে গড়ের অন্তবর্তী অংশে একটি বাইরের প্রবেশ পথ।[৫]

ভিতরের পার্শ্ববর্তী প্রত্যেকটি প্রবেশপথের শীর্ষে পৃথক পৃথক পাথরের অলংকরণ।

দাখিল দরওয়াজার সম্পূর্ণ প্রবেশপথ তিনটি খিলানের দ্বারা একটি ভল্ট তৈরী করেছে। অবশ্য ইদানীংকালে দক্ষিণদিকের ভল্টটি কিঞ্চিৎ অবনত।

অতীতে এই ফটকের চারদিকে দ্বাদশকোণী বুরুজ ছিল, কিন্তু এখন দুটি তার অতীতের সাক্ষী। গম্বুজের মাথা থেকে দেখা যায় শৃঙ্খল-ঘন্টার 'রিলিফের' কারুকার্য। বাইরের খিলানের উচ্চতা ৩৪´। তার উপরে সরলরেখায় উর্ধ্বে উত্থিত 'ব্যাটলমেন্ট'-এর প্রাচীর ১৫´। সুতরাং ভূমি থেকে মোট উচ্চতা ৪৮´।[৬] এর চতুষ্পার্শ্বেই অলংকরণ ছিল বলে মনে হয়। পার্শ্ববর্তী উচ্চ প্রাচীরে ঢাকা পড়ায় তার পূর্ণরূপ আজ বোঝা দায়।

● **পাদটীকা**

১. Cunningham Alexander – Archaeological Survey of India, Vol. XV. P-40
২. Dani Ahmad Hasan – Muslim Architecture in Bengal, P-100
৩. Hasan Syed Mahmudul – Gaud and Hazrat Pandua, P-65
৪. প্রদ্যোত ঘোষ — মালদহ জেলার পুরাকীর্তি, পৃ- ৩৭
৫. Abid Ali Khan – Op. Cit. P-51
৬. Cunningham Alexander Op. Cit P-41

## ফিরোজ মিনার বা ফিরোজা মিনার

দাখিল দরওয়াজা দিয়ে পূর্ব দিকে ঘুরে বাঁক নিয়ে গেলেই প্রায় ১/২ কিমি দক্ষিণে ফিরোজ মিনার বা ফিরোজা মিনার। ক্যানিংহাম নীলরঙের (অথবা ফিরোজা বর্ণের) বা নীলকান্ত মণির ন্যায় বর্ণ যুক্ত মীনা করা টালির দ্বারা আবৃত ছিল বলে তাকে 'ফিরোজা মিনার' নামে অভিহিত করা করেছেন।[১] কিন্তু এই ধারণা যথার্থ নয়। কারণ মীনাকরা ইট এতে থাকলে তার সামান্যতম নিদর্শন মিলতো। স্থানীয় অধিবাসীরা একে পীর-আশা মন্দির এবং 'চেরাগদানি' বলে।[২] অনেকে একে প্রহরাদানার্থ উচ্চ কক্ষ (Watch Tower) কিম্বা মানমন্দির (observatory) বলে অনুমান করেছেন।[৩] জেমস ফার্গুসন একে জয়স্তম্ভ বলে মনে করেছেন।[৪] অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এটিকে স্থানীয় কিম্বদন্তী অনুসারে ত্রিশূল মন্দির-এর ভিত্তিভূমিতে স্থাপিত বলে মনে করেন।[৫] ভগ্ন গড়ের পূর্বদিকে অবস্থিত এই মিনারটির শীর্ষদেশের র‍্যাভেনশর ফটোগ্রাফ ফার্গুসন মুদ্রিত করেছেন।[৬] এর শিরোভাগ বিপজ্জনক হওয়ায় তা পরবর্তী পর্বে সমতলিক ক্ষেত্র হিসেবে সংস্কার করা হয়েছে। এর উচ্চতা ৮৪´ এবং ব্যাস ৬২´। ৭৩টি চক্রাকার সিঁড়ি উর্ধ্বে উত্থিত।

র‍্যাভেনশার ফটো থেকে
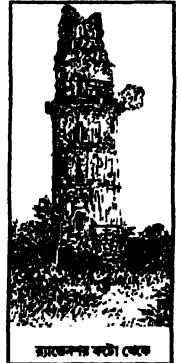
বর্তমানে এর প্রবেশ দ্বারের সিঁড়ি পরবর্তীকালের যোজনা। স্বাভাবিকভাবেই এখানে বৃত্তাকার বা অষ্টকোণী (?) উপান ছিল। প্রবেশ পথ থেকে তিনটি তলাযুক্ত এই মিনারে প্রতি তল অলংকরণ-বন্ধনী যুক্ত। চতুর্থ ও পঞ্চম তলা বৃত্তাকারে ক্রমক্ষীণ হয়ে শিরোভাগে একটি গম্বুজধারী খিলানযুক্ত কক্ষে গিয়ে পৌঁছেছে। বন্ধনীর উপর-নীচে জালির কাজ এবং বহু পার্শ্ব প্যানেল বিশিষ্ট পল (Facets) গুলিতে ঝুলন্ত 'মোটিফ' দৃশ্যমান। দরজার বাজু হিন্দু মন্দির থেকে গৃহীত। নানা বিচার বিবেচনায় মিনারটি হাবসী সুলতান সৈফুদ্দীন দ্বিতীয় ফিরোজ শাহ কর্তৃক নির্মিত বলে মনে হয়। (১৪৮৭-৯০)[৭]

আপাতদৃষ্টিতে মিনারটি গঠন-বৈশিষ্ট্যে দিল্লীর কুতুব মিনারেরই বঙ্গীয় সংস্করণ — যদিও স্থাপত্যের নিরিখে নান্দনিক রূপের ঘাটতি আছে। মিনারটিকে কেন্দ্র করে মসজিদ-স্থপতি ও সুলতানের উক্তি-প্রত্যুক্তিতে স্থপতির প্রতি ক্রোধ ও সুলতানের নির্দেশে মিনার থেকে তাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করার পর সুলতানের নির্দেশে প্রিয়ভাজন অনুচর হিঙ্গার মেরাগাঁও-এ গমন এবং সুলতানের স্পষ্ট নির্দেশ না পেয়েও বুদ্ধি কৌশলে জনৈক ব্রাহ্মণ যুবকের নির্দেশে মোরগাঁও-এর বিখ্যাত স্থপতিদের নিয়ে যায় হিঙ্গা। সুলতান তার বুদ্ধিমত্তার স্বীকৃতিতে সেই যুবক সনাতনকে গৌড়ের রাজ দরবারে উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করেন। এই স্থানীয় জনশ্রুতি আবিদ আলি লিপিবদ্ধ করেছেন।[৮] ঠিক এমনই আর একটি দেউল নির্মাণের ঘটনা রেনেলের জার্নাল উল্লেখ করে গুরুসদয় দত্ত জানিয়েছেন ফরিদপুরের (বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্র) মথুরাপুর দেউল সম্পর্কে জনৈক সংগ্রাম শাহের তার স্থপতির দম্ভোক্তিতে ক্রোধ হেতু ভূমিতলে নিক্ষেপের ঘটনা।[৯] সন-তারিখের দিক থেকে বিচার করলে এই জনশ্রুতি অসত্য বলে মনে হয় না, কারণ দ্বিতীয় সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহের (১৪৮৭-১৪৯০ খ্রী) রাজত্বের তিন বছর পর থেকে অর্থাৎ ১৪৯৩ খ্রী হোসেন শাহী বংশের প্রথম সুলতান হোসেন শাহের রাজসভারই মন্ত্রী হয়েছিলেন এই সনাতন।[১০]

● **পাদটীকা**

১. Cunningham, Op.cit, p-57-58
২. Abid Ali Khan, Op.cit, p-52
৩. Syed Mahmudul Hasan, Op.cit, p-121
৪. Fergusson James - History of Indian and Eastern Architecture Vol. I & II, in two Volumes, page 260 (Vol.,II)
৫. Akshaykumar Maitra - The Ancient Monuments of Varendra, Appendix-IV, p-35
৬. Fergusson, Op. cit. II vol. p-259
৭. Syed Mahmudul Hasan, Op.cit. p- 131-32
৮. Abid Ali Khan, Op.cit.-p-54
৯. Gurusaday Dutt - Folk Arts and Crafts of Bengal, p-124
১০. প্রদ্যোত ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৯

**কদম-ই-রসুল ভবন বা কদম শরীফ**

ফিরোজ মিনার থেকে প্রায় ১/২ কিমি দক্ষিণে বিশাল গড়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে বামপার্শ্বে কদম-ই-রসুল ভবন বা কদম শরীফ। সাদা পাথরের উপর নবী হজরত মহম্মদের পবিত্র পদচিহ্ন এই ভবনের মধ্যে সংরক্ষিত। এটি অবশ্য হিন্দু সংস্কৃতিরই পরিচায়ক। ভবনটির সম্মুখভাগ (Facade) বাংলার বাঁকুড়া-বীরভূম, হুগলীর অনেক মন্দির তথা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অন্তর্গত দিনাজপুরের কান্তনগর ইত্যাদি মন্দিরের কথাই মনে পড়ায়।[১] সুতরাং এটি মন্দির থেকে এই ভবনে পরিবর্তনের সম্ভাবনাই প্রবল। ভবনটি ৯৩৭ হিজরীতে অর্থাৎ ১৫৩১ সালে সুলতান নসরৎ শাহ কর্তৃক নির্মিত।

দরজার উপরিভাগে তুঘ্রালিপিতে লিখিত আছে —

قال الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر امثالها - بنى هذا الصفة

المطهرة و حجرها التى فيه اثر قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم السلطان

المعظم المكرم السلطان بن السلطان ناصر الدنيا و الدين ابو المظفر نصرت

شاه السلطان بن حسين شاه السلطان بن سيد اشرف الحسينى خلد الله

ملكه و سلطنته و اعلى امره و شانه فى سنة سبع و ثلثين و تسعمائة *

বঙ্গানুবাদ ঃ সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন — যে একটি ভাল কাজ কর, তাকে দশগুণ পুরস্কৃত করা হবে। এই পূত মঞ্চ এবং এর পাথর যার উপর নবীর — আল্লাহ তাঁর উপর শান্তি বর্ষণ করুন — পদচিহ্ন আছে, তা মহান উদার সুলতান, সুলতান ও সুলতানের পুত্র সুলতান নাসির-উদ-দীন ওয়াদ্দিন আবুল মুজাফফর নসরৎ শাহ সুলতান, যিনি সুলতান হোসেন শাহের পুত্র, যিনি সৈয়দ আসরফ আলি হুসাইনির পুত্র — আল্লাহ তাঁর রাজ্য ও শাসন চিরস্থায়ী করুন এবং তাঁর ক্ষমতা ও সম্মান বৃদ্ধি করুন। — কর্তৃক ৯৩৭ হিজরীতে নির্মিত হয়। (১৫৩১ খ্রী)

কদম রসুলের ভূমি নকশা

ভবনটির উচ্চতা ১৬ ফুট। বহিরঙ্গের মাপ ৬৩´ x ৪৯´ ৬´´। এক গম্বুজ বিশিষ্ট মূল কক্ষের মাপ ২৫´ x ১৫´ এবং দেওয়াল ৫ ফুট চওড়া। তিনদিকে বারান্দার পরিসর ৯ ফুট। চার কোণে অষ্টকোণী বুরুজ, পূর্বদিকে অলংকৃত সম্মুখ ভাগ খর্বাকৃতি স্তম্ভের উপর স্থাপিত। এখানে আছে তিন খিলানের প্রবেশ পথ। ভবন-সদরের সম্মুখভাগের শীর্ণ ফালি অংশে আনুভূমিক অলংকরণ; ইটের কারুকাজ করা খুপি এবং সম্মুখের উদ্গত কারুকার্য দৈর্ঘে সম্পূর্ণ অংশেই প্রসারিত।[২]

এই খিলানের প্রতি দুই আলম্ব স্তম্ভের মধ্যবর্তী স্থানে আছে (spandrel) পদ্মের মোটিফ,

তার উপরিভাগে মোল্ডিং-এর (moulding) বন্ধনী। ব্যাটলমেণ্ট এবং কার্ণিশত্রয় স্বল্প খোদিত। এর ধনুকাকৃতি রূপ দু ভাগে সম্মুখদেশকে বিভক্ত করেছে। প্রত্যেকটি অংশ আবার চারটি প্যানেলের সারিতে বিভক্ত হয়েছে। মধ্যবর্তী দুই মূল স্তম্ভের অতিরিক্ত দুটি প্যানেল এবং কৌণিক বুরুজগুলিতে বহুল অলংকরণের সঙ্গে সু-অলংকৃত সরু প্রস্তর চূড়া। এর আছে ভল্টযুক্ত বারান্দা। পশ্চিম দিক রুদ্ধ। মেহরাবহীন কক্ষটির মধ্যভাগে একটি কৃষ্ণবর্ণের বেদীর উপরে 'রসুলের পদচিহ্ন' খাদেম দর্শকদের প্রদর্শনের জন্য রাখেন।[৩]

● **পাদটীকা**

১. McCutchion David J - Late Mediaeval Temples of Bengal, pl. 89, 107, 111 Etc.
২. Fetgusson James – History of Indian and Eastern Architecture (Revised) II, P256
৩. প্রদ্যোত ঘোষ - মালদহ জেলার পুরাকীর্তি, পৃ-৪০-৪১

### ফতে খানের সমাধিভবন

কদম রসুল ও ফতে খানের সমাধিভবন একই প্রাচীরবেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত। অবশ্য যদিও কদম রসুল সম্পূর্ণ আবেষ্টনীর মধ্যে নয়। পীর শা্হ নিয়ামতুল্লার উপদেশে শাহ্ সুজা ঔরংজীবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত আছেন সন্দেহে ঔরংজীব দিলীর খানকে গৌড়ে প্রেরণ করেন। দুই পুত্রসহ দিলীর খান গৌড়ে পৌঁছুলে তাঁর অন্যতম পুত্র ফতে খান রক্তবমনে মারা যান। ভবনটির কোনও প্রতিষ্ঠালিপি নেই, কিন্তু ফতে খানের মৃত্যুর তারিখ ১৬৫৭ থেকে ১৬৬০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে হবে নিশ্চিত। পলেস্তারাযুক্ত এই সমাধিভবনটি বাংলার দোচালা ভবনের এক বিশিষ্ট নিদর্শন। ইটের তৈরি আয়তাকার ক্ষেত্রের উপর এই সমাধিভবনের বহিরঙ্গের মাপ ৩০´ ৪´´ x ২১´ ৫´´। দক্ষিণ ও পশ্চিমে পাথরের সর্দল ও সরল খিলানযুদ্ধ দরজার বাজু। ভবনের সম্মুখভাগ আয়তাকার, পলেস্তারার উল্লম্ব ও আনুভূমিক প্যানেল,অথচ উত্তরাংশে তা অনলঙ্কৃত। বাঁশের দোচালার দুটি তলের মিলিত প্রান্তরেখার শীর্ষে পঞ্চবন্ধনী। কক্ষের ভিতরে উত্তর-দক্ষিণে আয়তাকার ক্ষেত্রের উপরে ইটের অর্ধবৃত্তাকৃতি একটি অংশে সমাধি। উর্ধ্বদেশে একটি ক্ষুদ্র লৌহ-আঙটা লক্ষ্য করা যায়।

অনেকে এটিকে হিন্দুমন্দির বলে স্থির করেছেন বটে, তা সঠিক নয়। পলেস্তারাযুক্ত মন্দির প্রাক্-মুঘল যুগে নেই, তাছাড়া উত্তর-দক্ষিণে এই সমাধি। এই দোচালা-জাতীয় স্থাপত্যের নিদর্শন কবরেও ঠিক কদম রসুলের উত্তর অংশে দেখা গেছে। তা ছাড়া মৈমনসিংহ জেলার এগারো সিন্দুরের মুহম্মদের মসজিদের প্রবেশ পথটি (আনু. ১৬৮০ খ্রীঃ) এই দোচালা পদ্ধতিরই অনুকারী।

### চিকা বা চামকান ভবন

কদম রসুলের সামান্য দক্ষিণে চিকাভবন মামুদশাহী বংশের নাসিরুদ্দীন মামুদ শাহ্ (১৮৩৫-৫৯ খ্রীস্টাব্দ) কর্তৃক নির্মিত বলে অনুমান অনেকের। বৃহৎ একগম্বুজবিশিষ্ট এই ভবনটি আপাতদৃষ্টিতে মসজিদ মনে হয় বলে অনেকে এটিকে মসজিদ হিসাবেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু মেহ্‌রাব বর্জিত এই ভবনটি যে মসজিদ নয় তা ভিতরে প্রবেশেই বোঝা যায়। বর্গাকার এই ভবনের বহিরঙ্গের আয়তন ৭১´ ৭´´। আগে চারকোণে ১০ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট চারটি বুরুজ ছিল।

কিং সাহেব এই ভবনটিকে 'চোরখানা' অর্থাৎ কারাগার বলে অভিহিত করেছেন।[১] এই ভবনটির সঙ্গে চৈতন্য পরিকর সনাতনের বন্দীজীবন-কাহিনী লোকমুখে প্রচলিত থাকায় সম্ভবত তিনি এই নামকরণ করেছেন। পার্শ্ববর্তী পশ্চিমদিকে অন্য একটি ভবনের সারিবদ্ধ স্থূল প্রস্তরস্তম্ভের মূলদেশ আজও দেখা যায়। এই ধ্বংসাবশেষ দেখে এটিকে কারাগার না বলে অন্য কোনও রাজকার্যের কক্ষ হিসেবে গ্রহণ করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। উপরন্তু কারাগার হলে এর চারদিকে অর্থাৎ উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিমে প্রবেশদ্বারের প্রয়োজন থাকত না।

পাণ্ডুয়ার একলাখি ভবনের ভূমি-নকশা এখানে ব্যবহৃত হয়েছে, মাপও প্রায় একই, কেবল এর বহিরঙ্গে মীনা করা ইটের ঔজ্জ্বল্যই একে সাধারণ মানুষের মধ্যে 'চিকা' বলে বলে পরিচয় দিয়েছে। অন্তঃপ্রকোষ্ঠে পশ্চিমদিকে উড়িষ্যার রেখ দেউলের রিলিফ ও গণেশ মূর্তি, চৌকাঠের বাজুতে যেমন দেখা যায়, তেমনই দক্ষিণ দুয়ারে বেলে পাথরের প্যানেলে দুটি নারীমূর্তি, দক্ষিণ-পূর্বে ভগ্ন সরস্বতী ও হংসের রিলিফ ইত্যাদি লক্ষণীয়। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ফলকটি 'চামচিকা মসজিদ' এক অন-ঐতিহাসিকতার চিহ্নবাহী।[২] এটি ক্যানিংহামের অভিধাকে সমর্থন করে।[৩]

### বাইশগজী প্রাচীর ও রাজপ্রাসাদ ইত্যাদি

চিকাভবনের সম্মুখের রাস্তায় আবার ফিরে বামহাতের মাটির পথ দিয়ে অগ্রসর হয়ে দেখা যায় বাইশগজী প্রাচীর। এর উচ্চতা ২২ গজ অর্থাৎ ৬৬ ফুট বলে সাধারণের মধ্যে এটি 'বাইশগজী প্রাচীর' বলে পরিচিত। অবশ্য এটি এখন প্রায় পূর্ণ-ধূলিসাৎ। এর ভিত্তিমূল প্রায় ১৮´ চওড়া। সমগ্র বেষ্টনীটি আগে ছিল উত্তর-দক্ষিণে ৯০০´x২০০´। সম্পূর্ণ ইটের এই প্রাচীরটি কার্নিশের নীচে পর্যন্ত ৮´ ১০´´। সম্ভবত এটি সুলতান নাসিরুদ্দীন মামুদ শাহের পুত্র রুকনদ্দীন বারবক শাহের দ্বারা নির্মিত। দুর্গের অভ্যন্তরে পূর্বে রাজপ্রাসাদ ছিল। এটি 'হাভেলি খাস' নামে পরিচিত। রাজপ্রাসাদটি তিনটি মহলে ছিল বিভক্ত। প্রথমটি — প্রকাশ্য দরবার মহল, দ্বিতীয়টি — বাদশাহের খাস মহল এবং তৃতীয়টি — বেগম মহল বা জেনানা মহল। এটির উচ্চতা ছিল ৪০´। এর ছাদের কিনারায় ইটের ফলের কাজ ছিল।[৪] মহল তিনটি উত্তর-দক্ষিণে অবস্থিত।

গৌড়ের ইটের নকশা

প্রথমে দরবার মহল, এটি সর্বাপেক্ষা সংকীর্ণ। দরবার মহলের দক্ষিণ দিকে সুলতানের খাস মহল এবং তারই দক্ষিণে বেগম মহল। পরবর্তী দুটি মহল প্রায় সমান। তিন মহলের মোট আয়তন ৭০০ গজ x ২৫০ গজ। সুতরাং বাইশগজীর পরিধি ১৯০০ গজ বলে মনে করা যেতে পারে। আবার ৩টি মহলের মধ্যে আরও দুটি পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত বাইশগজী প্রাচীর ছিল বলে কেউ কেউ অনুমান করেছেন। সুতরাং মোট বাইশগজীর দৈর্ঘ্য-পরিমাণ ২৪০০ গজের কম নয়। এখানে একটি নাতি-বৃহৎ পুষ্করিণীও আছে। সম্প্রতি কালে কেন্দ্রীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ খনন করে মীনা করা টালি ও ভবনের স্তম্ভমূলস্থ পীঠিকা ইত্যাদি পেয়েছে। এখনও উৎখননের কাজ অব্যাহত।

### হোসেন শাহের সমাধি, খাজাঞ্চীখানা, চাঁদ দরওয়াজা ও নিম দরওয়াজা

ফিরোজ মিনারের পিছন দিকে অর্থাৎ কদম রসুলের উত্তর-পশ্চিম কোণে অতীতে ছিল 'খাজাঞ্চীখানা' অর্থাৎ টাঁকশাল (mint)। কেউ কেউ মনে করেন যে এই টাঁকশালের নাম

'ফিরোজবাদ'। এই ভবনের পাশে ছিল হারেম বা 'মহাল সরাই'। সাধারণত লোকে এর একখন্ড ভূমিকে 'ভাবাক' (খাজাঞ্চীখানা) বলে। এর পাশে টাঁকশাল দীঘি আজও পূর্বস্মৃতি বহন করে চলেছে। এরই উত্তর-পূর্ব কোণে এবং বাইশগজী প্রাচীরের বাইরে 'বাংলাকোট' নামক স্থানে বাংলার অন্যতম স্বাধীন সুলতান হোসেন শাহের সমাধি ছিল।[৫] ক্রিটনের স্কেচে এর প্রস্তরনির্মিত খিলানের অপরূপ ফটক দেখা যায়। প্রবেশপথের সম্মুখে ও পার্শ্ববর্তী অংশ নীল ও সাদা মীনা করা টালিতে বিচিত্র রচনাকৌশলে আচ্ছাদিত ছিল। চতুষ্কোণে পাথরের উপরে নকশা ছাড়া সমাধিভবনের বুরুজগুলি বৃক্ষ ও পুষ্পের অভিনব খোদিত অলঙ্করণে পূর্ণ ছিল। প্রবেশপথের মধ্য দিয়ে এক বৃহৎ আবেষ্টনীর মধ্যে সুলতান হোসেন শাহ ও রাজপরিবারের অন্যান্যদের সমাধি ছিল। এই আবেষ্টনীর পার্শ্ববর্তী অংশও নীল ও সাদা মীনা করা টালি দ্বারা সজ্জিত ছিল। হোসেন শাহের মৃত্যু হয় ৯২৪ হিজরী অর্থাৎ ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে।

নকশা করা ইট ঃ গৌড়
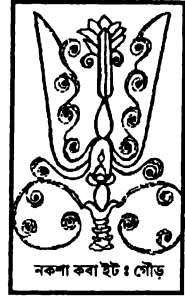
এর সন্নিকটে চাঁদ দরওয়াজা ও নিম্ দরওয়াজার অতীত গৌরবও ইতিহাসে পাতাতেই লিপিবদ্ধ। পাথর ও ইট দ্বারা নির্মিত এই দুটি ফটক অনবদ্য স্থাপত্যকৌশল এবং অপরূপতার অনবদ্য ছিল। ক্রিটন সাহেবের গ্রন্থে এই চাঁদ দরওয়াজার সুন্দর ছবি বর্তমান। প্রাচীনকালে এই দুটি ফটক ছাড়া গৌড়ের উত্তরদিকের ফটক দাখিল দরওয়াজা এবং পূর্বেরটি শাহী দরওয়াজা নামে পরিচিত। দুর্গের দক্ষিণে ছিল রাজভবন। মধ্যবর্তী স্থানে চাঁদ দরওয়াজা। চাঁদ দরওয়াজা দিয়ে নগরের প্রাচীন ও নূতন উভয় অংশেই প্রবেশ করা যেত। দাখিল দরওয়াজার অনুরূপ চাঁদ দরওয়াজা। নিম (= অর্ধ) দরওয়াজা রাজবাড়ি থেকে অর্ধেক পথে অবস্থিত। এখন রাজপুরী এলাকা পরিপূর্ণ বিধ্বস্ত। অতীতে নগরের সর্বত্র জলপথে গমনের জন্য স্বাভাবিক ও কৃত্রিম অনেক জলপ্রণালীও ছিল।[৬]

ইটের অলংকরণ ঃ গৌড়

### গুমটি দরওয়াজা বা গুমটি গেট

চিকাভবনের সামান্য দূরে পূর্ব দিকে গুমটি দরওয়াজা বা গুমটি গেট। শব্দটি ফারসী শব্দ 'গুমবদ্' থেকে হিন্দীর মাধ্যমে জাত। এর অর্থ একদুয়ারী ক্ষুদ্র ঘর বা 'প্রহরীর কুটির'। সুতরাং অনেকে দুর্গ নগরীর মধ্যে প্রবেশ করার গোপন পথ বলেছেন — তা সঠিক নয় বলে মনে হয়।

উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত গড়ের দেওয়ালের মধ্যবর্তী এই ভবনটি অষ্টকোণী বুরুজ-নির্মিত একগম্বুজ বিশিষ্ট। ৫´ বিস্তৃত খিলানের মধ্যবর্তী মূল পূর্ব-পশ্চিমের প্রবেশপথ এখানে আছে। কক্ষটি বর্গাকার — ২৫´ x ২৫´। বহিরঙ্গে এর মাপ ৪২´ ৮´´ x ৪২´ ৮´´। প্রবেশপথটি একটি আয়তাকার কাঠামোর মধ্যে অবস্থিত। উর্ধ্বাংশের শীর্ষে ক্ষুদ্র অলংকৃত কুলুঙ্গিসহ বেড়-বন্ধ (tiers of mouldings) আছে। কৌণিক বুরুজগুলির স্তম্ভের'বন্ধ' ছাড়া সবই ভগ্ন। 'ব্যাটলমেণ্ট'-এর কার্ণিশত্রয় স্বাভাবিকভাবে ধনুকাকৃতি। কোথাও কোথাও কার্ণিশের অলংকরণ আজও দেখা যায়। সম্পূর্ণ অংশটি একসময়ে মীনা করা ইটে সজ্জিত ছিল। দরজার পার্শ্ববর্তী মিনার (turret) আদিনা মসজিদকে যেমন মনে করায়, তেমনই অলংকরণে ও স্থাপত্যকৌশলের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যে 'লোটন

মসজিদ' ও স্মরণ পথে আসে। এই ফটকের উপরিস্থিত লিপিটি শাহ্ নিয়ামাতুল্লাহের দরগায় দেখা যায়।[৭]

## শাহী দরওয়াজা বা শাহ্ সুজার দরওয়াজা / লক্ষ ছিপ্পি দরওয়াজা / লুকোচুরি গেট

কদম রসুলের বাঁদিকে প্রায় ১৫০ গজের মধ্যে শাহী দরওয়াজা। এটি দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত থাকায় স্থানীয় ছোট ছোট শিশুদের লুকোচুরি খেলার মনোরম স্থান হওয়ায় 'লুকোচুরি গেট' নামে পরিচিত হয়ে সার্বজনিক জনপ্রিয়তা লাভ করে। সেজন্য 'শাহী দরওয়াজা' নামটি প্রায় সকলেই বিস্মৃত। 'লক্ষ ছিপ্পি দরজা' বলেও এটিকে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন।[৮] কারণ লক্ষ (অসংখ্য) ছিপ্পি বা ছাপের অর্থাৎ নানারঙের মীনা করা টালির দ্বারা একসময়ে এটি আবৃত ছিল। সম্ভবত শাহ্ সুজার সময়ে মুঘল স্থাপত্যের নিরিখে কিছু অদলবদল হয় এবং পলেস্তারা যুক্ত হয়।

রাজপ্রাসাদে প্রবেশের এটি পূর্বদিকের ফটক। তবে দাখিল দরওয়াজার ন্যায় এত আভিজাত্য-বাহী নয়। দেওয়াল ৮´ ৮´´ চওড়া, ভিতর ২৫´। পার্শ্ববর্তী কোণের পলকাটা অংশগুলি পূর্ববর্তী বলে মনে করা যায় সহজেই। সন্নিকটের দুটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ এবং তার উপরে ডঙ্কা-নিনাদের স্থান। এই দরওয়াজার উপর থেকে নহবত বাজানো হত বলেও অনেকের ধারণা। শাহ্ সুজা হাওদা সমেত হাতি নিয়ে এ দরওয়াজার মধ্য দিয়ে যাতায়াত করতেন বলেও অনেকে মনে করেন। কেউ কেউ ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এটি নির্মিত বলে মনে করেছেন। প্রবেশদ্বারটি ৬৫´। মধ্যবর্তী পর্যায়ে চতুষ্কেন্দ্রিক খিলান দ্বারা অর্ধগম্বুজাকৃতির রূপ নিয়েছে। পার্শ্ববর্তী বহুশিখর খিলান (multi-cusped arch)-এর প্যানেল। দরজার উভয়দিকে প্রথম ও দ্বিতীয় তলায় প্রবেশের দরজা — যা প্রস্তরাগ্রের বহির্বর্তনের দ্বারা সীমায়িত। তৃতীয় তলায় জানালাপথের উভয়পাশে সারিবদ্ধ খিলানযুক্ত প্যানেল এবং শীর্ষপ্রদেশে 'কংগুর' (Kangura)[৯]।

## চামকাটি মসজিদ

শাহী দরওয়াজা দিয়ে পূর্বদিকে মহদীপুর-গৌড় রোডের ধারে এই মসজিদ। সম্ভবত ১৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এটি নির্মিত হয়। এই মসজিদের নির্মাণ কৌশলে অভিনবত্ব থাকলেও দর্শকদের দৃষ্টিতে তেমনভাবে আসে না। প্রবেশপথ যুক্তভল্ট (joint-vault) — বারান্দার পাশে দুটি ও সম্মুখে একটি দেখা যায়। অবশ্য তা এখন ভগ্নাবস্থায়। ভিতরের আটটি স্তরের উপরে বৃত্তাকার নকশা। এখানে নীল, হলুদ ও সাদা — এই তিন রঙের মীনা করা ইট ব্যবহৃত হয়েছে। নকশাগুলি পূর্ব ও পশ্চিমে তিনটি করে এবং উত্তর-দক্ষিণে দুটি করে আছে। সামনের প্রবেশদ্বারের বারান্দা একেবারে ধ্বংসোন্মুখ। মূল কক্ষটি বর্গাকার, আয়তন ২৩´৮´´ x ২৩´৮´´। গম্বুজের বহিরঙ্গে পাঁচটি ধাপ। পূর্বদিকের বারান্দার প্রসার ৯´x ১১´´। প্রতিটি কোণে অষ্টকোণী উদ্গত অংশ দেখা যায়। সামনের সরল কক্ষটি ধারাবাহিক ফুলের মোটিফ দ্বারা অলংকৃত। প্রান্তবর্তী অংশসমূহ বিচিত্র শ্রেণীর টালির দ্বারা আচ্ছাদিত। ভগ্নপ্রায় এই মসজিদটির কোথাও কোথাও মীনা করা কাজের ঔজ্জ্বল্য আজও আমাদের অবাক করায়। মসজিদের 'ব্যাটলমেন্ট' বাংলারীতিতে ঈষৎ বক্র এবং তার উপরে একটি মাত্র গম্বুজ। 'স্কুইন্‌চে'র উপরে গম্বুজের ভারবহনের জন্য দেওয়ালের গাত্র থেকে প্রলম্বিত পাথরের চতুষ্কোণী স্তম্ভ দেখা যায়। একলাখি ভবনের স্থাপত্যের সঙ্গে এর সাদৃশ্য থাকলেও

'ভল্ট' এখানেই দেখা যায়। দেওয়ালগুলি অবশ্য ইটের।

চামকাটি মসজিদের নামকরণে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। কেউ বলেছেন যে গায়ের চামড়া কেটে উপহার দেওয়া একটি সম্প্রদায়ের রীতি ছিল। তাদের নাম থেকেই এই নামকরণ।[৯] আবার কেউ বলেছেন যে মুসলমানদের মধ্যে 'চামকাটি' বলে একটি সম্প্রদায় এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। কিন্তু মনে হয় সম্ভবত 'চাম' অর্থে শীর্ণ ও কাটি বা কাঠি অর্থে 'পথ' ধরলে শীর্ণ পথের পাশে এমন মসজিদ চামকাটি মসজিদ নাম হয়ে থাকতে পারে। আবার শব্দতত্ত্বের দিক থেকে এলাকাটি চাম < চর্মটি (= গাছের নাম), কাঠি (< কন্টক) থেকে হতে পারে। যুক্ত বাংলায় ঝালকাঠি, বিদ্যানন্দকাঠি, সরসকাঠি ইত্যাদি বহু স্থান আছে। বিশেষত রাজধানীর চৌহদ্দীর মধ্যে সুন্নী সম্প্রদায়ের দ্বারা এমন একটি ঐশ্বর্যমণ্ডিত মসজিদ নির্মাণ করা সম্ভব বলে মনে হয় না। স্থাপত্যকৌশল ও যত্ন দেখে মসজিদটি রাজানুকুল্যে হয়েছিল বলেই ধরা যেতে পারে। চামকাটি মসজিদটি সামসুদ্দীন ইউসুফ শাহের দ্বারা ১৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তৈরি হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন।

### তাঁতীপাড়া মসজিদ

শাহী দরওয়াজা দিয়ে সামান্য কিছুদূর পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে মহদীপুরের পথে দক্ষিণদিকে তাঁতীপাড়া মসজিদ। টেরাকোটার উল্লেখযোগ্য নিদর্শনে গৌড়-পাণ্ডুয়ার মসজিদগুলির মধ্যে তাঁতীপাড়া মসজিদই সর্বশ্রেষ্ঠ।[১০] যদিও অতীতের গৌরবের চিহ্ন আজ অল্পমাত্রই আছে। কেউ কেউ এই মসজিদটিকে 'ওমর কাজীর' মসজিদ বলেও অভিহিত করেছেন।[১১] আয়তাকার এই মসজিদটি গৌড়ের বারদুয়ারী বা বড়সোনা মসজিদের ন্যায় বহুগুম্বুজ রীতিরই চিহ্ন বহন করে। বাংলার ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যরীতির পূর্ণতা-পর্বের স্মারক যে এই মসজিদ তা নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যায়।
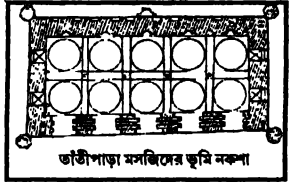
তাঁতীপাড়া মসজিদের ভূমি নকশা

তাঁতীপাড়া মসজিদের অলংকরণ

বহিরঙ্গে এই মসজিদের আয়তন ৯১´ x ৪৪´। কিন্তু ভিতরের মাপ ৭৮´ x ৩১´ এবং এর দেওয়াল ৬১/২´ চওড়া। এখানে পাঁচটি খিলানের দরজা এবং শেষের দিকে দুপাশে জানালা দেখা যায়। সম্মুখভাগের পূর্বদিকের উপরের ঢালু অংশ এবং দেওয়ালের গায়ের কুলুঙ্গি একটি পর আরেকটি লম্বা প্যানেলের দ্বারা অলংকৃত। প্যানেলের ধার সর্পিল অলংকরণে উচ্চাবচ প্রণালীতে খোদিত। খিলানের শীর্ষদেশ থেকে লতাপাতার অলংকরণ দোদুল্যমান ভঙ্গিতে শোভিত। কোণের অষ্টকোণী স্তম্ভগুলিও অনুরূপভাবে কারুকার্য সমন্বিত। ছাদ ও দেওয়ালের সংযোগস্থলের 'ব্যাটলমেন্ট' ও 'কার্নিশ' বাংলা ঢঙে ঈষৎ বক্র। মাঝে চারটি পাথরের স্তম্ভের দ্বারা আইল (aisle) ছিল। মসজিদে অর্ধগোলাকৃতি দশটি গম্বুজ ছিল, কিন্তু ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ভূকম্পনে সেগুলি ভূমিসাৎ হয়েছে। মসজিদের পূর্বদিকে এর নির্মাতা ও তাঁর কন্যা জুলকরয়নের

তাঁতীপাড়া মসজিদের টেরাকোটার ফুলকারি

সমাধি আছে।[১২] কেউ কেউ মনে করেন যে এটি ওমর কাজী ও তাঁর ভ্রাতার সমাধি। অবশ্য কেউ কেউ মনে করেছেন যে জনৈক মীরসাদ খান এর নির্মাতা।[১৩] তবে এটি যে ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সুলতান ইউসুফ শাহের রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছিল তা ঠিক।

তাঁতীপাড়া মসজিদের টেরাকোটা
টেরাকোটা ইটের নকশা
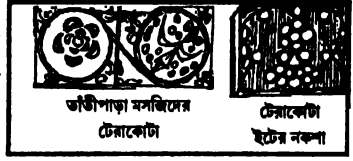
সামগ্রিকভাবে অলঙ্করণে, ভারসাম্যে ও অলংকৃত মোটিফগুলিতে 'তাঁতীপাড়া মসজিদ' বাঙালীর শিল্পমানসের এক অনন্য নিদর্শন সন্দেহ নেই। কেউ কেউ একে গৌড়ের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি বলেও মনে করেছেন। তবে এখানকার moresque কাজ প্রশংসিত হলেও তা চটকদারী ও অতিললিত টেরাকোটা কারুকার্যের নিদর্শন।[১৪]

তাঁতীপাড়ার ইটসজ্জা

### লোটন মসজিদ

ক্রিটনকে স্বীকৃতি-সাপেক্ষে ক্যানিংহামের মতানুসারে এটি ইউসুফ খানের নির্মিত মসজিদ (১৪৭৫)।[১৬] কিংবদন্তি অনুসারে এক নর্তকীর নাম থেকে এটি নট্টন মসজিদ নামে অভিহিত।[১৭] কিন্তু ক্যানিংহাম যে ভাবে শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করেছেন তা সঠিক নয়। আবিদ আলী সংস্কৃত শব্দ "নটীন" বা "নটী" থেকে আগত বলে অনুমান করেছেন।[১৮] অবশ্য ডঃ ব্লখ তার আগেই তা অনুমান করেছিলেন।[১৯]

লোটন মসজিদের ভূমি-নকশা
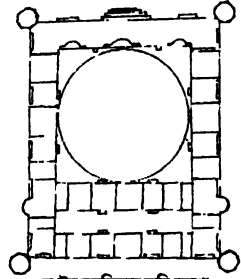
ডঃ ব্লখের মতে বিচিত্র বর্ণের মীনা করা ইট ও কারুকার্যে একে নর্তনকারী নারীর মতন দেখায়, তাই এটি নোটন মসজিদ বলে অভিহিত।[২০] কিন্তু তাও গ্রাহ্য নয়। কারণ গুমটি দরওয়াজাও অনুরূপ ঔজ্জ্বল্য ও রঙের অধিকারী। হোসেন শাহের রাজত্বের স্থাপত্যের ঔজ্জ্বল্য এর মধ্যে বিধৃত।

ভাষাতত্ত্বের নিরিখে এ মসজিদটির নাম লক্ষ্য করলে সহজেই নানা কিম্বদন্তী, লোককথা ও স্বকপোলকল্পিত কাহিনীর আশ্রয় নিতে হয় না। এটি নতুন মসজিদ হওয়াতে এটি নৌত(তু)ন - সং.নূতন, হি.নৌতন (নব-তন)। মধ্য বাংলায় 'নৌতন', নৌতুন' শব্দের অজস্র সাক্ষাৎ মেলে। সুতরাং এই নৌতন স্থানীয় বরেন্দ্রী উপভাষায় 'ন' স্থলে 'ল'-এর ব্যবহারে লৌতন > লোতন > লোটন খুব সহজেই সাধারণ জনগণের মুখে স্থায়ী হয়েছে।

লোটন মসজিদের মীনে করা ইট

চামকাটি মসজিদের ঢঙে এই লোটন মসজিদ বর্তমান গৌড়-মহদীপুরের রাস্তার পাশেই অবস্থিত। পূর্বে যে এটা মীনা করা ইটে ভূষিত ছিল তা বিগতশ্রী মসজিদের প্রায় অপসৃয়মান ভগ্ন ইটগুলির দিকে তাকালেই বোঝা যায়। এ প্রসঙ্গে মুসলিম শিল্পে, সেরামিক-শিল্প সম্পর্কে সামান্য আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। পূর্ব এশিয়ার প্রভাব এই শিল্পে

পড়েছে এ কথা স্বীকার করতেই হয়। মীনা করা ইট বা উজ্জ্বল টালির কাজ মুসলিমরা ব্যাবিলন থেকে পেয়েছিল।[২১] সাসানীয় যুগেও এর সন্ধান মেলে। কোবাল্ট নীল, টার্কুইজ সবুজ এবং ম্যাঙ্গানীজ বাদামী রঙ সাধারণতঃ সাদা জমির উপরে প্রথম প্রথম ব্যবহার করা হত। এখানে অন্য রঙের জমির উপরে সাদার ব্যবহারও লক্ষণীয়।

লোটন মসজিদের বর্গাকৃত কক্ষটি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ৩৪ ফুট x ৩৪ ফুট। বাইরের মাপ ৩২ ফুট x ৫১ ফুট। পূর্বদিকে তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ আছে। লম্বা কক্ষগুলিতে সুন্দর নিচ্ এবং বহু শিখর বিশিষ্ট খিলান কারুকার্য সমন্বিত স্তম্ভ থেকে আনতমুখী। ছাদ ও প্রাচীরের সঙ্গমস্থল এবং কার্ণিসের মধ্যবর্তী অংশ কিঞ্চিৎ বক্র। বারান্দার উপরে তিনটি গম্বুজ উত্থিত। মূল কক্ষের উপরে সর্ববৃহৎ গম্বুজ। মধ্যবর্তী বারান্দার গম্বুজটি চৌচালা। মূল গম্বুজ কিঞ্চিদধিক খর্বাকৃতি স্তম্ভের উপরে বর্তমান। তিনভাগে বিভক্ত কোণের বুরুজগুলি অনবদ্যভাবে কারুকার্য করা (Moulding) প্রতিটি অংশ বাঁশীর ছিদ্রের ন্যায় খাঁজকাটা। পশ্চিমদিকের দেওয়ালেও অনুরূপ মেহ্‌রাবের অভিক্ষিপ্ত অংশে খাঁজকাটা। মেহ্‌রাবের সংখ্যা তিন। গম্বুজটি ৮টি পাথরের স্তম্ভ-ধৃত এবং ব্যাপক অলঙ্কৃত কর্বেল পেণ্ডেনটিভ দৃশ্যমান।

এখানকার উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্যাদি সূত্রাকারে দেওয়া হ'ল —

১. আটটি সুবৃহৎ প্রস্তরস্তম্ভের অষ্টকোণী মূল কক্ষের ভারবহনের জন্য ব্যবহার

২. কোণের বুরুজগুলির মোল্ডিং

৩. সুঅলঙ্কৃত কর্বেল পেণ্ডেন্টিভের ব্যবহার

৪. মেহ্‌রাবে অভিক্ষিপ্ত অংশ

৫. কোণের বুরুজাদির ফ্লুট

৬. শ্রেণীবদ্ধ ব্যাটল্‌মেন্ট .

৭. বারান্দায় চৌচালারূপ গম্বুজ

মসজিদটি এখন অতীত সৌন্দর্যহারা। কিন্তু, ক্যানিংহাম তাকে যে ভাবে দেখেছিলেন (যদিও তখনও অনেকরূপ সে হারিয়ে ফেলেছিল) তার উদ্ধৃতি আমাদের দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মত। তার মধ্যে ফ্র্যাঙ্কলিনের উক্তিও উল্লেখযোগ্য।[২২]

তবে এখানে মীনা করা ইটের যে নমুনা আছে তা থেকে বোঝা যায় যে তার উজ্জ্বলতা থাকলেও সুষ্ঠু শিল্পভাবনার স্বাক্ষর নেই। শুধু তাই নয়, কর্বেল পেণ্ডেন্টিভ লোটন অপেক্ষা গুণমন্তের সুন্দরতর। দানী একে ঐশ্বর্যের যুগে প্রতিষ্ঠিত বলে এটিতে গরিমার চিহ্ন আছে বলে জানিয়েছেন।[২৩] কিন্তু একথাও সম্পূর্ণ মানা যায় না। কারণ ব্যয়ের দিক থেকে দাখিল দরওয়াজা ন্যূন বলে মনে হয় না। আসলে প্রতিষ্ঠাতার রুচি ও সমসাময়িক ঢঙের উপরে স্থাপত্যের নিদর্শন নির্ভর করে। তবে সমগ্র গৌড়ে এমন জমকালো মসজিদ (বাইরের প্রায় সমগ্র অংশ নীল, সবুজ, হলুদ ও সাদা রঙে মীনা করা অলঙ্কৃত ইট এবং কৌণিক স্তম্ভগুলি) একটিও ছিল না তখন।[২৪]

- **পাদটীকা**

১. Cunningham Alexander – Archaeolgical Survey of India, Vol. XV, P-67

২. প্রদ্যোত ঘোষ — গৌড়বঙ্গের স্থাপত্য, প্রথম পর্ব, পৃ-২৮
৩. Cunnigham, Op. Cit. P-67
৪. Francklin William – Journal, (1810-11)
৫. Abid Ali Khan – Memoirs of Gaur and Pandua, P-59
৬. প্রদ্যোত ঘোষ — মালদা জেলার পুরাকীর্ত্তি, পৃ-৪৪-৪৫
৭. Abid Ali Khan – Op. Cit., P-67
৮. Cunningham – Op. Cit , P-62
৯. প্রদ্যোত ঘোষ — প্রাগুক্ত, পৃ-৪৬
৯খ. Cunningham, Op Cit, P- 60-61
১০. Cunningham - Op Cit, P-6
১১. Abid Ali Khan, Op. Cit. P-72
১২. রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী — গৌড়ের ইতিহাস, (দে'জ), পৃ-৩২০
১৩. Abid Ali Khan, Op Cit., P-72
১৪. Cunningham, Op Cit., P-62
১৫. Cambridge History of India, Vol III, P-605
১৬. Cunningham – Op cit pp 62
১৭. Ibid — pp 62
১৮. Abid Ali Khan – Op cit pp 74
১৯. Conservation Notes, Eastern Bengal & Assam, 1909
২০. Dr Bloch – Op cit (1909)
২১. Encyclopaedia Britannica Vol 12 page 710
২২. Cunningham - Op cit pp 63 - 65
২৩. Ahmad Hasan Dani – Op cit pp 124
২৪. প্রদ্যোত ঘোষ, গৌড়বঙ্গের স্থাপত্য, প্রথম পর্ব, পৃ-৩৩-৩৪


## পাঁচ খিলানের সেতু

'লোটন' থেকে দক্ষিণমুখী রাস্তা দিয়ে মহদীপুর যাওয়ার পথে এই সেতু। রাস্তাটির এত বেশী সংস্কার হয়েছে যে সেতুটি আর উপর থেকে তেমনভাবে বোঝা যায় না। অন্যটি আছে মহদীপুর থেকে মাটির পথে গুণমন্ত মসজিদে যাওয়ার পথে।

প্রথমটি সূচ্যগ্র খিলানের দ্বারা গঠিত। মধ্যেরটি ১১´´ ৬ চওড়া, তার দুপাশের দুটি ১০´৩১/২´´এবং সর্বকোণের দুটির পরিসর ৯´ ১´´। মধ্যের স্তম্ভদুটি ১০´ ৬´´ এবং অন্য দুটি ৭´ ৩´ চওড়া। সেতু ২৭১/২´´ চওড়া এবং ১৭৫´ লম্বা। ব্লক একটি শিলালিপির মাধ্যমে এটি আবুল মোযাফফর মাহ্মুদ শাহের (১৪৫৭ খ্রীঃ) সময় নির্মিত হয়েছিল বলে ধারণা করেছেন।

## কোতোয়ালি দরওয়াজা

প্রথম সেতুটির পথেই মহদীপুরের প্রায় ১ কিমি আগে বামপার্শ্বে বিরাট এক গড়ের মধ্যবর্তী একটি প্রবেশপথ। এখন এটি সম্পূর্ণ ধ্বংস। প্রাচীন গৌড়নগরীর এটিই হয়েছে দক্ষিণ দ্বার। এটি কোতোয়ালি দরওয়াজা নামে খ্যাত। 'লোটন' মসজিদ থেকে প্রায় পৌনে দেড় কিলোমিটার দক্ষিণে এবং গৌড়ের পরিখা থেকে (Citadel) তিন কিমি দক্ষিণে। এটি সাধারণত কতল্ দরওয়াজা

বলে খ্যাত বা কোতোয়ালি দরওয়াজারই বিকৃত রূপ অর্থাৎ পুলিশ থানা। প্রবেশপথটি ১৬´/৪´´ X ১৭´ ৪´´ চওড়া এবং এর দেওয়ালের বিস্তৃতি ১৭´ ৪´´। আরক্ষাধ্যক্ষ বা কোতয়ালের সম্ভবত এটি মূল ঘাঁটি।[১] মুন্সী শ্যামপ্রসাদ এখানে একটি নহবতের কথা বলেছেন।[২] ৩০ ফুট উচ্চ ইটের খিলানের দ্বারা এটি আবদ্ধ ছিল। ক্যানিংহামের বিবরণীতে তার একটি মনোরম চিত্র আমরা দেখতে পাই।[৩] দু দিকে ভিতরে এবং বাইরে ক্রমাবনত অর্ধবৃত্তাকার ৬ ফুটের পরিধিযুক্ত দুটি বুরুজ এবং গভীর কুলুঙ্গি ছাড়া অলংকৃত স্তম্ভের উপরে সূচ্যগ্র খিলান ছিল। এই ক্রমাবনত বুরুজ, গভীর কুলুঙ্গি (niche), বহুল অলংকৃত স্তম্ভ — দিল্লীর প্রাথমিক পর্বের মুসলিম স্থাপত্যেরই পরিচয় বহন করে। এই দরওয়াজার সম্ভাব্যকাল ১২৩৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৩১৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বলে কেউ কেউ মনে করেছেন। পার্সি ব্রাউন তুঘলক স্থাপত্য রীতি লক্ষ্য করে এটিকে চর্তুদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে স্থাপিত বলে মনে করেন।[৪]

### গুণমন্ত মসজিদ

পূর্বোক্ত লোটন মসজিদের ঠিক বিপরীত দিকে প্রায় এক কিলোমিটার পশ্চিমদিকে বাগানের মধ্যে অবহেলিত জীর্ণদশায় এই গুণমন্ত মসজিদ। আবার কোতোয়ালি দরওয়াজা হয়ে মহদীপুর গিয়ে মেঠো পথ দিয়ে সামান্য উত্তরে গিয়েও এই মসজিদে পৌঁছানো যায়। কিং একে 'গুন্নৎ মসজিদ' বলে অভিহিত করেছেন। শব্দটি গুণ + মন্ত (অধিকারী) হওয়া সম্ভব নয়। সম্ভবত ফারসী শব্দ গুনাহ + মত্ - পাপের মৃত্যু অর্থাৎ এ মসজিদে নামাজপাঠে পাপমুক্তি ঘটে — এমন অর্থ হওয়া স্বাভাবিক। পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে একটি শিলালিপির মাধ্যমে ক্যানিংহাম এটি ১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত বলে রায় দিয়েছেন।[৫]

গুণমন্ত মসজিদের স্তম্ভের অলংকরণ
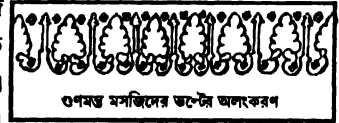
সামন্তরিক এই মসজিদটির বহির্ভাগের আয়তন ১৫৭´ X ৫৯´´। এখানে অষ্টকোণী বরুজ আছে। মূল কক্ষের আয়তন ৫১´ X ১৬´ ১৩´´। পূর্বদিকের কক্ষের প্রবেশদ্বার থেকে পশ্চাদ্দেশের দেওয়াল পর্যন্ত 'নেভ' বিস্তৃত। পূর্ব-পশ্চিমের দেওয়ালের উপরিভাগে দুটি জানালাও অবস্থিত। পূর্বদিকে মূল দ্বারদেশের উপরে অতীতের বর্গাকার মিনারের অবস্থানও লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এখন প্রায় কিছুই নেই। এর বিভিন্ন উপাদান — ইট, পাথর স্থানীয় জনগণ এমনকি দূর-দূরান্তের অধিবাসীরাও নিয়ে গেছে। যদিও কার্নিশ ভাগ অনুপস্থিত, কিন্তু 'ব্যাটলমেন্টের' মধ্যবর্তী অংশের বক্রাকৃতি রেখা এখনও দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে গৌড়ের এই মসজিদের সঙ্গে আদিনা মসজিদের পশ্চিমের ভূমি নকশার একটা মিল আছে।[৬] মসজিদটির অন্তর্দেশ তিনভাগে বিভক্ত, মধ্যভাগে সুবৃহৎ অষ্টকোণী
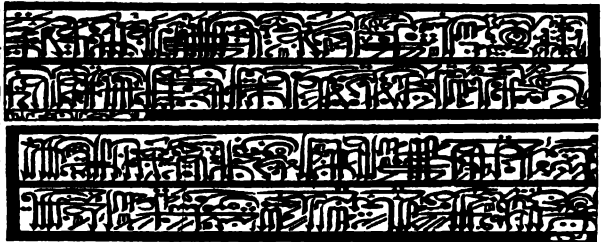
গুণমন্ত মসজিদ (গৌড়) জালাল-উদ্-দীন ফতে শাহের লিপি

পিল্‌পা রিব্‌ড ভল্টদ্বারা আচ্ছাদিত। অলংকৃত 'ব্যাটলমেন্টে'র উপরে পূর্বদিকে খিলানবদ্ধ জানালা আছে। টেরাকোটা ও পাথরের উপর অলংকরণও এখানে দেখা যায়। উভয়পার্শ্বের দৈর্ঘ্য বরাবর প্রস্তরস্তম্ভের দ্বারা সৃষ্ট 'আইল' এবং নটি অর্ধবৃত্তাকৃতি গম্বুজের দ্বারা তা আচ্ছাদিত। একসময়ে খিলানের উপরিভাগ রঙিন মীনা করা টালিতে সজ্জিত ছিল।[৭] উত্তরদিকের সব গম্বুজ ও স্তম্ভই ভূপতিত।

খিলানে ব্যবহৃত হয়েছে লোহার শিকও। গৌড় ও পাণ্ডুয়ার আর কোন সৌধ বা মসজিদে তা চোখে পড়ে না। ভল্ট যুক্ত ছাদটি অষ্টকোণী স্তম্ভের উপর ন্যস্ত। হোসেনশাহী যুগের স্থাপত্য রীতিই ফসল বলে এ মসজিদটি গ্রাহ্য হতে পারে।[৮]

# পাণ্ডুয়া

ইংরেজবাজার থেকে ১১ মাইল এবং গৌড় থেকে ২০ মাইল উত্তর-পূর্বে পাণ্ডুয়া বা পাড়ুয়া বা পারুয়া বা পেড়ো বা পেঁড়ো। এই পাণ্ডুয়ায় হজরত শাহ জালালের আস্তানা থাকায় অনেকে পশ্চিমবঙ্গের হুগলির পাণ্ডুয়া নামক স্থান থেকে (এখানেও মুসলিম যুগের পুরাকীর্তি আছে) পৃথক করার জন্য মালদহের পাণ্ডুয়াকে 'হজরত পাণ্ডুয়া' বলে অভিহিত করেন।[৯]

এই পাণ্ডুয়াকে কেউ কেউ পুণ্ড্র আখ্যা দিয়েছেন। পার্জিটার-মতে অঙ্গ ও বঙ্গের মধ্যবর্তী স্থলে পুণ্ড্রের স্থান। অক্ষয়কুমারের মতে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অংশবিশেষ পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র।[১০] পুণ্ড্র-সহ অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, কলিঙ্গ দ্বারা পূর্বভাগ গঠিত — যা আর্যাবর্তের প্রাচী নামে পরিচিত। এর প্রধান নগরী পুণ্ড্রনগর (বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বগুড়া জেলার মহাস্থান) অথবা পুণ্ড্রদের নগর। বহু লেখক পুণ্ড্রনগরকে পুণ্ড্রর সঙ্গে এক বলে মনে করেছেন — যা পৌণ্ড্র বলেও উচ্চার্য। আবার 'পান ডুবিয়া' থেকে এসেছে বলেও মনে করা হয়।[১১] উইলসন সাহেব পুণ্ড্র বলতে বাংলা ও বিহারের নিম্ন জেলাগুলিকে নির্দেশ করেছেন, যার মধ্যে বাংলার রাজশাহী, দিনাজপুর, বগুড়া, রংপুর ও নদীয়াও আছে। অবশ্য এই ভৌগোলিক চৌহদ্দীতে বর্তমান মালদহ জেলাও পড়ছে।

চীনা-পরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙ পুণ্ড্রবর্ধন পরিদর্শন করেছিলেন (৬২৯ -৪৫ খ্রীস্টাব্দ)। তিনি পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্যের পরিধি ৭০০ মাইল এবং রাজধানীর আয়তন ৫ মাইল বলে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি বরেন্দ্রের এক বিরাট ভূখন্ড নিয়ে গঠিত — যার মধ্যে মহাস্থানও আছে — যাকে পুণ্ড্রবর্ধন এবং পাণ্ডুয়া ও মাঝে মধ্যে পাণ্ডুনগর বলে অভিহিত করা হয়েছে। দনুজমর্দনদেব (গণেশ) এবং তাঁর ধর্মান্তরিত পুত্র যদু মহেন্দ্রদেব (?) জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের মুদ্রায় উৎকীর্ণ দেখা যায় পাণ্ডুনগর নামটি। মহাভারতের পাণ্ডব ভ্রাতৃগণের নামে এ অঞ্চল বলে পরিচিত বা 'সাতাশঘরা দীঘি' তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন কর্তৃক খনিত হয়েছে ইত্যাদি কিংবদন্তী ইতিহাস-সিদ্ধ নয়। বর্তমানে সৌধ, দীঘি ও মসজিদ প্রভৃতিতে আকীর্ণ পাণ্ডুয়ায় মুসলিম যুগেরই স্বাক্ষর আছে। হিন্দুযুগের কেবলমাত্র কিছু দীঘি আজও দেখা যায়।

প্রকৃতপক্ষে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের গৌড় থেকে পাণ্ডুয়ায় রাজধানী স্থানান্তরিত করার মাধ্যমে পাণ্ডুয়ার ইতিহাসের পথে যাত্রা (১৩৪২ খ্রী)। রাজধানী হিসেবে পাণ্ডুয়ার সঙ্গে ইলিয়াস

শাহী বংশ এবং রাজা গণেশের বংশের নাম যুক্ত। ইবন্ বতুতার 'রেহলা' (ভ্রমণ বিবরণী)-তে প্রসঙ্গক্রমে 'লখনৌতির' নাম যুক্ত (১৩৪৬ খ্রী) আছে। তবে চীনা পরিব্রাজক মা হুয়ান ও কুও ছুং লির লেখায় বাংলা রাজ্যে ১৪০৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৪১১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে পাং-কো-লা-র বা পাণ্ডুয়ার উজ্জ্বল বর্ণনা আছে। জালালুদ্দীন মহম্মদ শাহের রাজত্বে চীন সম্রাটের দূতদলের মধ্যে ফেই শিন্ (১৪১৬ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ) পাণ্ডুয়ায় এসেছিলেন।

সুলতান ইলিয়াস শাহের মুদ্রায় (১৩৩৯খ্রী) আবার 'ফিরোজপুরাবাদ' নামটি উৎকীর্ণ। কেউ কেউ মনে করেন যে শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের (১৩০১ -২২ খ্রী) দ্বারা কমপক্ষে দু-দশক আগেই পাণ্ডুয়া বাংলার রাজধানী হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে গৌড় বাংলার রাজধানী থাকাকালীন পাণ্ডুয়ার প্রসিদ্ধি তিন দরবেশের জন্যই সম্ভব হয়েছিল। তাঁরা ছিলেন হজরত শাহ জালাল, হজরত নূর কুতবুল আলম এবং শেখ রাজা বিয়াবানী।

তবে পাণ্ডুয়া গৌড়ের ন্যায় নগরী না হলেও ১২০৬ থেকে ১৫৬৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তার গুরুত্ব ও ঐশ্বর্য অব্যাহত ছিল সন্দেহ নেই। তার পর সুলাইমান কররানী রাজধানী টাঁড়ায় স্থানান্তরিত করেন। মধ্যবর্তী পর্যায়ে ইলিয়াস শাহী ও রাজা গণেশের বংশের রাজত্ব কালে এখানে রাজধানী ছিল। তবে দরবেশদের প্রতি ভক্তিবশত রাজধানী গৌড় হলেও এখানে সৌধ, মসজিদ ইত্যাদির নির্মাণও চলেছিল।

পাণ্ডুয়ার আয়তন সম্পর্কেও নানা মত আছে। ক্যানিংহাম উনিশ শতকের শেষে এসে (১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দ) বিভিন্ন ভগ্ন অট্টালিকা ও রাস্তার চিহ্ন দেখে ইংরেজবাজার থেকে ৭ মাইল দূরে এই শহর শুরু হয়েছিল বলে অনুমান করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন যে পাণ্ডুয়া নগরীর দৈর্ঘ্য ছিল ২৫ কিমি ও প্রস্থ ছিল প্রায় ৩ কিমি।

ইংরেজবাজার শহর থেকে বর্তমান ৩৪নং জাতীয় সড়কের (প্রাচীন দেবকোট সড়ক)
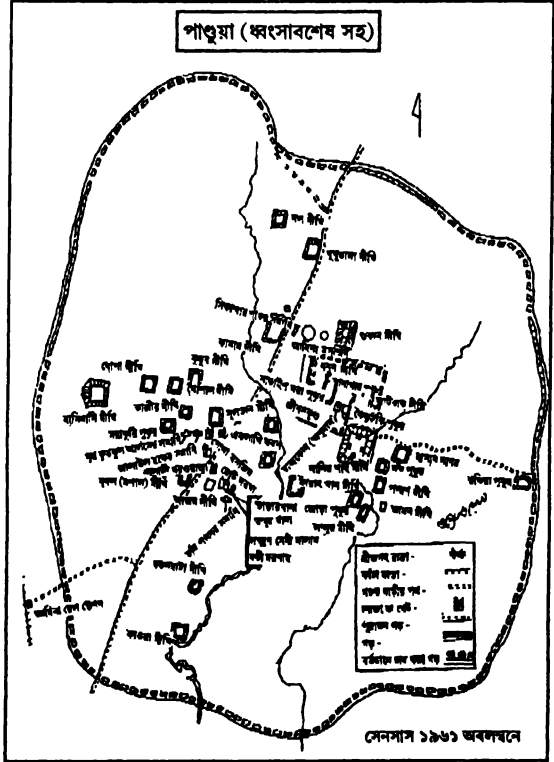
বামপার্শ্বে প্রায় ১৭কিমি দূরে এই পাণ্ডুয়া। এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করে আদিনা মসজিদ, প্রাসাদ চত্বর। আবার আদিনা মসজিদের পশ্চিমদিক থেকে উত্তর-দক্ষিণের পথ দিয়ে দক্ষিণাংশে গেলে একলাখি ভবন, কুতুবশাহী মসজিদ, ছোটি দরগাহ্, সেলামী দরওয়াজা ও বড়ী দরগাহ্ বা শাহ্ জালালের আস্তানা। তবে ইংরেজবাজার শহর (বর্তমান মালদহ শহর) থেকে উত্তরে অগ্রসর হলে প্রথমেই পড়ে বড়ী দরগাহ্ বা হজরত শাহ্ জালাল আস্তানা। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে পাণ্ডুয়ার দুই বিখ্যাত পীর হজরত শাহ্ জালালুদ্দীন তাব্রিজি ও হজরত নূর কুতবুল আলমের আবাসস্থল বলে মুসলিম সাধুসন্ত ও ভক্তদের নিকট এই স্থান চিরকাল পুণ্যতীর্থ হয়ে আছে। ভক্তেরা দূর-দূরান্ত থেকে এখানে বৎসরে দুবার ফতেয়া ও সিন্নি দেওয়ার জন্য রজব মাসে বড়ী দরগাহে এবং শাবান মাসে ছোটী দরগাহে সমবেত হন। ৩-৪ দিন এই উপলক্ষে মেলাও অনুষ্ঠিত হয়। ছ হাজারী ওয়াকফ এস্টেট ও বাইশ হাজারী ওয়াকফ এস্টেট বা লাখেরাজ ভূস্বামী মোতয়ালীগণ এ উপলক্ষে সন্ত ও ফকিরদের সেবা করেন। তবে বর্তমানকালে সেই সেবার চরিত্র পরিবর্তিত হলেও তা আজও প্রথা হিসাবে বর্তমান।

### বড়ী দরগাহ্ বা শাহ্ জালালের দরগাহ্

৩৪নং জাতীয় সড়কের পার্শ্বে জামি মসজিদ ও হজরত শাহ্ জালালুদ্দীন তাব্রিজির স্মৃতির প্রতি উৎসর্গকৃত আরও কতিপয় ভবন সমেত সামগ্রিকভাবে বড়ী দরগাহ্ হিসেবে পরিচিত। মূল দরগাহ্‌টি ১৩৪২ খ্রীস্টাব্দে দরবেশের নির্দেশে সুলতান আলাউদ্দীন আলি শাহ্ নির্মাণ করেছিলেন বলে অনেকের অনুমান। সমাধিটি ৯১/২ ফিট লম্বা ও ৬ ফিট ২ ইঞ্চি চওড়া। আয়তকার স্তম্ভগুলি পার্শ্ববর্তী আদিনা মসজিদের মতো অলংকৃত নয়। প্রবেশপথ সংকীর্ণ। প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলে এক গম্বুজবিশিষ্ট গৃহের দক্ষিণ-পূর্বদিকে ভাণ্ডারখানার নির্মাতা কোতয়াল চাঁদ খান, তাঁর স্ত্রী ও পুত্রের সমাধি সমন্বিত একটি ভবন দেখা যায়। এর বিপরীত দিকের পথ দিয়ে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করা যায়। উত্তরদিকের একটি পাথরের উপর সুন্দর জালির কাজও দেখা যায়। সম্মুখে জামি মসজিদ। এর বামদিকে একটি পুষ্করিণীর উত্তর দিকে লক্ষ্মণসেনী দালান এবং দক্ষিণ দিকে হাজি ইব্রাহিমের বড় কবর ও ভাণ্ডারখানা, পশ্চিম সীমায় দরবেশের দ্বিতীয় চিল্লাখানা। ভাণ্ডারখানার ঠিক পূর্বদিকে তন্দুরখানা।

(১) জামি মসজিদ — যে স্থানে হজরত শাহ্ জালাল 'মোকাবারায়' উপবেশন করতেন — তারই উপরে মূল মসজিদটি বলে অনেকের ধারণা। বাংলার স্বাধীন সুলতান আলি মবারক বা আলাউদ্দীন আলি শাহ্ কর্তৃক এই সুবৃহৎ মসজিদ নির্মিত হয়। ১৬৬৫ খ্রীস্টাব্দে গৌড়ের ফিরোজপুরের শাহ নিয়ামতউল্লাহ্ কর্তৃক মসজিদটির সংস্কার হয়। দরবেশের এই আসনটিতে পূর্বে রূপার 'কাটরা' (রেলিং) ছিল।[১২] কেউ কেউ বলেন যে এটি নবাব সিরাজদ্দৌলা উপহার দেন, আবার কেউ বা মনে করেন যে রৌপ্যনির্মিত জলপাত্রটি তাঁরই উপহার। মকদুম জহানিঁয়া জাহানঘস্ত-এর (বিশ্বভ্রমণকারী) 'ঝাণ্ডা' (দণ্ড) এবং 'নহবৎ' (পতাকা) এখানে রক্ষিত আছে। এই দরগায় আগে গৌড়ের কদম রসুল মসজিদস্থিত হজরত মহম্মদের পদচিহ্ন ছিল। মসজিদের পূর্বদিকের লিপিতে এই অট্টালিকা নির্মাণের কাল এবং অন্য একটি লিপিতে তার সংস্কারের কথা লেখা আছে।

ভবনটি ৫৭' লম্বা, ৬৪' চওড়া এবং ২৪' উচ্চ। খিলান ও গম্বুজের ভারবহনের জন্য

অভ্যন্তরে সুদৃঢ় বৃহৎ স্তম্ভাবলী আছে। কার্নিসের বহিভাগে নির্গত প্রস্তরখণ্ডগুলি আদিনা মসজিদের জেনানাগৃহ (Ladies' Gallery) বা বর্তমানে পরিচিত 'বাদশা-কা-তখ্‌ত' থেকে সংগৃহীত বলে অনেকের ধারণা। এর মধ্যে একটিতে দীর্ঘ শিলালেখ আছে — যার পাঠ আজও উদ্ধার করা যায়নি।

এছাড়া এই চৌহদ্দীর মধ্যে আছে সিজদা গাহ্‌, ভাণ্ডারখানা, লক্ষ্মণসেনী দালান, তন্দুরখানা, আসানশাহী ও সালামী দরওয়াজা।

## ছোটী দরগাহ্‌

বড়ী দরগাহের প্রায় এক কিলোমিটার দুরে রাস্তার বামদিকে ছোটী দরগাহ্‌। এখানে পাণ্ডুয়ার অন্য এক খ্যাতনামা দরবেশ হজরত নূর কুতবুল আলমের (কুত্‌ব-ই-আলম) দরগাহ আছে। কুতবুল আলম ও তাঁর পিতা আলাউল হকের সমাধি ছাড়া আরও অনেকগুলি সমাধি এখানে দেখা যায়। একে ছোটী দরগাহ্‌ ছাড়া ষষ হাজারী বা ছ'হাজারী দরগাহ্‌ও বলে। কারণ পীরোত্তর সম্পত্তির পরিমাণ ছ-হাজার বিঘা জমি। হজরত নূর কুতবুল আলমের মৃত্যুর (৮১৮ হিজরী, ১৪১৫খ্রীস্টাব্দ) বারো বছর পর এটি নির্মিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে,কুতবুল রাজা গণেশের পুত্র যদু (অন্যমতে জিৎমল)কে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করেন। দরগাহের প্রবেশের পথে যে সুন্দর প্রস্তরের দরজা আছে, সেখানে একটি হস্তচিহ্ন আছে। একে কেন্দ্র করে একটি কিংবদন্তী বিজড়িত। কথিত আছে যে, মুকদুম দুকারপোশ নামে জনৈক ফকির ক্ষুৎপিপাসাতর হয়ে এখানে প্রবেশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাকে বাধা দেওয়া হলে তার দুর্বল হস্তচিহ্ন ওখানে মুদ্রিত হয়।

নূর কুতবুল আলমের সমাধিটি একটি শুভ্র চন্দ্রাতপের দ্বারা আবরিত; এটি রক্তাভ পাথরের চারটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। সমাধির শীর্ষে পঞ্চম স্তম্ভের উপর ফার্সিতে যে লিপিটি আছে তাতে জানা যায় যে, হাতিমুল-মুলকের পুত্র (?) পীরজাত খান স্পেন থেকে স্তম্ভগুলি এনে ১০২০ হিজরী অর্থাৎ ১৬১১ খ্রীস্টাব্দে এই দরগাহ্‌কে উপহার দেন।

**(১) শেখ আলাউল হকের সমাধি** — নূর কুতবুল আলমের সমাধির পূর্বদিকে শেখ আলাউল হকের সমাধি বর্তমান। সমাধির প্রাঙ্গণের আবেষ্টনীর দরজার উপরের লিপি অনুযায়ী জানা যায় যে, কুতবুল আলমের পিতা উমর বিন আসাদ খালিদীর পুত্র আলাউল হকের প্রকৃত নাম সম্ভবত আহম্মদ। এই দুই দরবেশ আরবের কোরায়শ গোত্রভুক্ত বলে দাবি করেছেন বলে স্বাভাবিকভাবে এঁরা নবীর আত্মীয়ের বংশধর ছিলেন। কথিত আছে যে, বিখ্যাত দরবেশ নিজামুদ্দীন আউলিয়ার নিকট থেকে খিলাফত (উত্তরাধিকার) প্রাপ্ত হয়ে পীর অখী সিরাজুদ্দীন ওসমান বাংলায় এলে সমসাময়িক কালে প্রাজ্ঞ আলাউল হক বাংলায় অবস্থান করায় সিরাজুদ্দীন ইতঃস্তত করেন। এতে নিজামুদ্দীন নাকি ভবিষ্যৎবাণী করেন যে, তাঁর চিন্তার কোনও কারণ নেই, কারণ পরবর্তীকালে আলাউল হকই তাঁর ভৃত্য (খাদিম) হবেন। নিজামুদ্দীন আউলিয়ার এই ভবিষ্যদ্বাণী যথার্থ হয়েছিল। এখানকার কিংবদন্তীটিও শাহ জালালেরই অনুরূপ। আলাউল হক গুরুর দেশভ্রমণকালে উষ্ণপাত্র মস্তকে বহন করে ফিরতেন। ফলে তাঁর মস্তকের সমস্ত কেশ দগ্ধ হয়েছিল।[১৩] সুলতান সিকান্দার শাহ ১৩৫৪ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করে কোনও কারণবশত রুষ্ট হয়ে আলাউলকে পূর্ববঙ্গের সোনার গাঁওয়ে নির্বাসিত করেন।[১৪] পরবর্তী পর্বে আজম শাহ বিদ্রোহ করলে আলাউল

হক পুনরায় পাণ্ডুয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর মৃত্যুর তারিখ নিয়ে অবশ্য গবেষকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। কথিত আছে যে আলাউল হকের মৃত্যুর পর মখদুম জাহানিয়াঁ জাহানঘস্ত পাণ্ডুয়ায় তাঁর 'জানাযা' অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।[১৫]

## কুতুবশাহী মসজিদ বা সোনা মসজিদ

ছোটী দরগাহের উত্তর-পূর্ব দিকে পীর কুতবুল আলমের সমাধি এবং একলাখি ভবনের মধ্যবর্তী স্থানে এই কুতুবশাহী মসজিদ বা সোনা মসজিদ। কুতবুল আলমের বংশধর মুহম্মদ আল-খালিদীর পুত্র মখদুম শেখ প্রয়াত পীর নূর কুতবুল আলমের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার উদ্দেশ্যে ৯৯০ হিজরী অর্থাৎ ১৫৮২ খ্রীস্টাব্দে এই মসজিদ নির্মাণ করেন। তুঘ্রা হরফে দরজাগুলির উপরে নির্মাতার কথা লিপিবদ্ধ।

আয়তাকৃতি এই মসজিদটির আয়তন বাইরে থেকে ৮২ ১/২´ X ৩৭´ ৮´´, সাধারণের মধ্যে এটি সোনা মসজিদ' নামে পরিচিত। পূর্বে এর প্রাঙ্গণে একটি বৃহৎ ফটক ছিল ও তার উপরে একটি লিপিও পাওয়া যায়; এটির তারিখ ৯৯৩ হিজরী (১৫৮৫ খ্রীস্টাব্দ)।

রেখাচিত্র / কুতুবশাহী মসজিদ / পাণ্ডুয়া

ইট-পাথরের স্থাপত্যরীতি 'কুতুবশাহী মসজিদ'-এ দেখা যায়। এর প্রস্তরফলক মসৃণ নয়। পূর্বে গম্বুজের সংখ্যা ছিল — দশ, পূর্বদিকে প্রাচীরের আবেষ্টনীতে যে প্রবেশপথ আছে, তার উভয়দিকে দুটি কুলুঙ্গী আছে। তাদের প্রস্থ ও উচ্চতা যথাক্রমে ১´৯´´X২´ ৬´´, প্রবেশ পথের প্রস্থ ও বেধ ৬´ ৪´´X ৭´ ২´´। মসজিদের পূর্বদিকের সম্মুখে পাঁচটি খিলানযুক্ত ৫´২´´X৭´´ দরজা আছে। এর সামনের 'ব্যাটলমেন্ট' সরল রেখাকৃতিতে তৈরী হলেও কতিপয় বন্ধনী ও বক্রাকৃতি কার্নিশ আছে। ভিতরে প্রস্তরস্তম্ভের দ্বারা বিভক্ত দুটি 'আইল' এবং পাঁচটি 'বে' দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে এগুলিই গম্বুজের ভার-বাহক। উত্তর ও দক্ষিণে আরও দ্বারপথ আছে। পশ্চিমদিকের দেওয়ালে পাঁচটি মেহ্‌রাব লক্ষণীয়। মধ্যস্থলের মেহ্‌রাবের উত্তরে চাঁদোয়াযুক্ত একটি বেদী (Pulpit) আছে। মেহ্‌রাবের আয়তন ৬´ ১১ ১/২´´ X ২´ ৬ ১/২´´। বেদীর প্রবেশপথের উচ্চতা ও প্রস্থ যথাক্রমে ৪´ ৬´´ X ২´ ১´´। ভিতরের অংশ ৪´ ১১´´ X ৪´। সাতটি সিঁড়ি বেয়ে বেদীতে পৌঁছানো যায়। কার্নিস ও 'ব্যাটলমেন্ট'-এর মধ্যবর্তী অংশের কেন্দ্রভাগ কিঞ্চিৎ বক্র। ব্যাপক অলংকরণের অভাব এখানে দেখা যায় স্বাভাবিকভাবেই। 'স্প্যানড্রেল'-এ খোদিত পদ্ম ও দরজার খিলানে 'কাস্‌প'-ও দেখা যায়। তবে মেহ্‌রাবে 'কাস্‌প' ছাড়া স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন এখানে একেবারেই নেই। পূর্বদিকের বাইরের আবেষ্টনীর উপর গৌড়ের বড় সোনা মসজিদের প্রভাব স্পষ্ট। ভিতরের স্তম্ভগুলি ভূপতিত, কেবলমাত্র চারটি স্তম্ভ আছে। বর্গাকার এই স্তম্ভগুলির পাদমূলের আয়তন ২´ ৫´´। কোণের বুরজগুলি বর্তুলাকার, কিন্তু 'ব্যাটলমেন্ট'-এর উপরে অষ্টকোণী বুরুজগুলি মস্তকভূমির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এর শীর্ষের চূড়াগুলি হরিৎবর্ণের মীনা করা টালিতে আচ্ছাদিত ছিল বলে হয়ত এর নাম সেই সুবাদে 'সোনা মসজিদ' হয়েছে। তবে তার

চিহ্ন মাত্রও আজ আর নেই। বর্তমানে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের রাজশাহী জেলার বাঘা মসজিদের সম্মুখভাগ, দ্বারের সংখ্যা ও বুরুজের অলংকরণ বাদে তার স্থাপত্য প্রায় একই ধাঁচের।[১৫]

## একলাখি সমাধি ভবন

অষ্টকোণী বুরুজবিশিষ্ট এক গম্বুজের এই সমাধি ভবনটি (আনুমানিক নির্মাণের সময় ১৪১২-১৫ খ্রীস্টাব্দ) নির্মাণে এক লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হয়েছিল বলে এর নাম একলাখি। কেউ কেউ একে মসজিদ বলে অভিহিত করেছেন বটে, কিন্তু মেহ্‌রাব না থাকায় এটি যে মসজিদ নয় — তা স্পষ্ট। ইটের এই ভবনটির টেরাকোটার (Terracotta) অনবদ্য কারুকার্য আজও আমাদের মুগ্ধ করে।

একলাখির ভূমি-নকশা
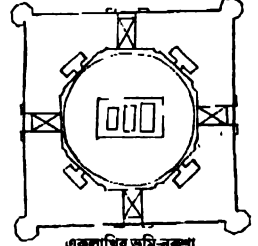
ভবনের অভ্যন্তরে যে তিনটি কবর আছে তার সম্পর্কে বিভিন্ন লেখক ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কেউ বলেছেন তা সুলতান গিয়াসুদ্দিন, তাঁর স্ত্রী ও পুত্রবধূর,[১৬] কেউ রাজা গণেশের পুত্র যদু (জিৎমল) অর্থাৎ জালালুদ্দিন, তাঁর কন্যা ও পৌত্রের কবর, আবার কেউ বা বলেছেন যে এই তিনটি কবর জালালুদ্দীন, তাঁর স্ত্রী ও পুত্রের।[১৭] আবার কেউ গিয়াসুদ্দিন ও তাঁর দুই পুত্রের কবর বলেছেন।[১৮]
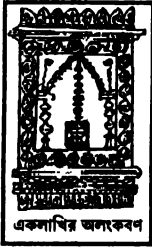
একলাখির অলংকরণ

প্রাক্-মুঘল যুগের বাংলার ইট ও টেরাকোটার উল্লেখযোগ্য মুসলিম স্থাপত্যের নিদর্শন হিসেবে একলাখি নিঃসন্দেহে মূল্যবান। বর্গাকার এই ভবনটির আয়তন ৭৮´ ৬´´ x ৭৮´ ৬´, অর্ধ গোলাকৃতি গম্বুজের ব্যাস ৪৮´ ১/২। দেওয়ালগুলির বাইরের দিকে কোথাও কোথাও নানাবর্ণের মীনা করা ইটের কথা কোনও কোনও লেখক উল্লেখ করলেও[১৯] আজ তার কোনও চিহ্ন নেই। ৫´ পুরু এই গম্বুজ। চতুষ্পার্শ্বে অষ্টকোণী বুরুজের বহির্আলম্ব দেখা যায়। কোণের বুরুজগুলি সুদৃশ্য অলংকরণে এক সময়ে মন্ডিত ছিল। তাদের শীর্ষে ছাদের সমান্তরালের উপরিভাগে একটি 'ক্যাপস্টোন' আছে, এর কোণগুলি উভয়দিকে নিম্নাভিমুখে খোদাই করা। ভবনটির চারদিকে অর্থাৎ উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব ও পশ্চিমে চারটি খিলানযুক্ত দরজা আছে — যার মাপ ৬´ ৭´´ x১৩´ ৬´´, দেওয়াল ১৩´ চওড়া। হিন্দু মন্দিরের প্রস্তরের চৌকাঠ বসানোর জন্যই এটি করা হয়েছিল। তাই প্রবেশপথ দৃষ্টিকটু। খিলানের চৌকাঠের উপরিভাগের প্রবেশপথে ত্রিকোণ বক্রাকৃতি রূপ দেখা যায়। পূর্বদিকের দেওয়াল বাদে অন্য তিনদিকে ৭´ ২´´ উদগত অংশের অভিমুখে এবং দেওয়াল গাত্রে ২´ ৮´´-র কুলুঙ্গী আছে। প্রবেশদ্বারের উপরের বাজুবন্ধে ভগ্ন গণেশ মূর্তি — যা অনেক হিন্দু মন্দিরেই দেখা যায়। ভবনটির চারদিকের দেওয়ালে চারটি কুলুঙ্গীর মতো ছোট প্রকোষ্ঠ আছে। এগুলি কোরান পাঠকারীদের জন্যই নির্দিষ্ট। পূর্বদিকের প্রধান দরজার চৌকাঠের তলদেশ ভিতর দিকে ঢালু। অন্য তিনটি দরজার চৌকাঠ পাথরের।[২০] 'লিনটেল' অংশ খাঁজকাটা —লৌহদণ্ড দিয়ে
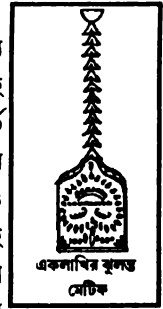
একলাখির ঝুলন্ত মেটিফ

একলাখির স্তম্ভের ভিত্তিমূলের টেরাকোটা ও ইটের সজ্জা

তা বন্ধ করার রীতি ছিল। অধুনা তা তারের জাল দিয়ে বন্ধ আছে। কেবল দক্ষিণের দরজাটিই খোলা। সম্ভবত কাঠের দরজা দিয়ে প্রবেশপথ বন্ধ থাকত।

বর্গাকার ক্ষেত্রের এই সমাধি ভবনটির অন্তঃপ্রকোষ্ঠের চতুষ্কোণে চারটি বুরুজ আছে, তা মধ্যবর্তী পর্যায়ে একটি অষ্টকোণী প্রকোষ্ঠ রচনা করেছে। মধ্যবর্তী প্রকোষ্ঠের বিস্তার ৪৮ বর্গফুট। অষ্টকোণ থেকে গম্বুজের বৃত্তাকার পাদদেশ পর্যন্ত পেণ্ডেনটিভের মাধ্যমে ফুল ও অন্যান্য অলংকরণ। ক্যানিংহাম তাতে রং করা দেখেছিলেন।
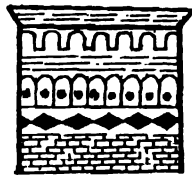
টেরাকোটার অলংকৃত ইট

বহির্ভাগে অষ্টকোণী বুরুজগুলি এমনভাবে আছে যে তার মোট আটটির মধ্যে পাঁচটি দেখা যায়, অন্য তিনটি দেওয়ালের মধ্যে প্রবিষ্ট। বুরুজগুলি হ্রস্ব ও স্থূল এবং 'প্যারাপেটের' দেওয়ালের উপরে ওঠেনি। কেউ কেউ তাতে গম্বুজ ছিল বলে অনুমান করলেও তার সুস্পষ্ট ছাপ নেই।

'প্যারাপেট' ও 'কার্নিশের' আংশিক বক্ররূপ মধ্যভাগে গিয়ে মিশেছে। কার্নিশের অলংকরণের তিনটি সারির মধ্যে একটি 'বদ্ধ-খিলান-প্যানেল' (Freeze Arched Panel) দেখা যায়। 'মোল্ডিং'-এর ঠিক নীচে শ্রেণীবদ্ধ জালির কাজ। ভবনটির সম্মুখের অলংকরণ, মোল্ডিং-এর বেড় এবং নিম্নভাগের 'অফসেট' (offset)-এর ধারা এবং উপরিভাগের বদ্ধ অলংকৃত অংশের মধ্য দিয়ে প্রসারিত। চারটি ভিন্ন ভিন্ন সর্পিল অলংকরণ 'মোল্ডিং' এর মধ্যে আছে — যার উপরে শ্রেণীবদ্ধ 'প্যানেল'। এর মধ্যে খর্জুর বৃক্ষের রূপ-নির্মিতি। সারিবদ্ধ খাদে আরও বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে বাম ও দক্ষিণ দিকে তিনটি করে ফুল ও জ্যামিতিক নকশার রূপ। প্রত্যেক দিকে স্বল্প রিলিফের মোট ছ'টি প্যানেল এবং ভিতরে প্রবিষ্ট অংশে ঝুলন্ত অলংকরণ। প্যানেলগুলি ৬´ X২´ ১১´´। উপরের 'ব্যাটলমেন্ট'— এর নীচে থেকে মধ্যবর্তী-পর্বে দ্বিধাবিভক্ত অংশের মাপ ১৮´ ৬´´। তার উপরে শ্রেণীবদ্ধ টেরাকোটার 'কঙ্কাসদৃশ' কারুকাজ। এখানে বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু সাম্য (balance) না থাকায় নয়নাভিরাম হয় নি। আবার প্রত্যেকটি প্রবেশদ্বার একটি বিশিষ্ট প্যানেলের আকার নিয়েছে। এর উচ্চতা ১৯´ ৩ $^{১}/_{২}$´´ X ১৩´ ১০´´। উভয়পার্শ্বের অবতল অংশ দ্বারা প্রাচীরকে পৃথক করা হয়েছে। চারটি বিভিন্ন ঝুলন্ত সর্পিল অলংকরণের উপরে প্যানেলের সারিতে বৃক্ষের 'স্টাইলাইজড' রূপটি পরিস্ফুট করেছে।

তবে সামগ্রিকভাবে একলাখি ভবনের টেরাকোটা সমৃদ্ধ রূপ গৌড়-পাণ্ডুয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন সন্দেহ নেই।[২১]

### সেতু

একলাখি সমাধি ভবন থেকে আদিনা মসজিদে আসার পথের কাছে একটি হিন্দু যুগের সেতু দেখা যায়, এর মধ্যে কয়েকটিতে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি খোদিত।

### আদিনা মসজিদ

আদিনার সুবিশাল এই মসজিদ দর্শকদের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করে। সুলতান ইলিয়াস শাহের পুত্র শিকান্দার শাহ্ (১৩৫৮-৯০খ্রীস্টাব্দ) এর নির্মাতা। পশ্চিমদিকে বাইরের দেওয়ালে এই

মর্মে একটি লিপি আছে। মসজিদের পশ্চিম দেওয়ালের বহির্ভাগ সংলগ্ন একটি অংশে তাঁর সমাধির ধ্বংসাবশেষ বর্তমান।

আদিনা মসজিদের ভূমি-নকশা

আদিনা মসজিদকে আয়তনের দিক থেকে সম্ভবত পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মসজিদ বলে মনে করা হয়। কারণ, আয়তনের দিক থেকে দিল্লির জামি মসজিদ প্রথম, দামাস্কাসের আল্-ওয়ালিদ মসজিদ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় আদিনার স্থান। এর আয়তন ৫০৭½´ X ২৮৫½´। নৈষ্ঠিক মতে নির্মিত এই আয়ত চতুষ্কোণী মসজিদটি আবেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত। এর মধ্যভাগে একটি সুবিশাল প্রাঙ্গণ আছে। অবশ্য পূর্বদিকের প্রবেশপথ অতিশয় সংকীর্ণ। এর কারণ এখনও অজ্ঞাত। বৌদ্ধবিহারের বা হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপরে এটি নির্মিত— এই মত পরিপূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করাও যায় না; বিশেষ করে পশ্চিম দিকের বাইরের পাথরের দেওয়ালের মোলডিং (mouldings) গুলি লক্ষণীয়। যাই হোক পূর্ব দিকের আচ্ছাদিত পথের (cloister) পরিসর ৩৮´ এবং তাতে তিনটি 'আইল' আছে। সম্পূর্ণ স্থানটি ইটের দেওয়াল এবং প্রস্তরস্তম্ভের দ্বারা ১০৮ টি বর্গক্ষেত্রে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটির উপরিভাগে এক সময়ে এক-একটি ছোট গম্বুজও ছিল। সেগুলি আজ ভূপতিত, উত্তর ও দক্ষিণ দিক একইভাবে নির্মিত, কিন্তু পরিসর স্বল্প হওয়ায় যথাক্রমে ৩৯টি ও ৫১টি ছোট গম্বুজ দ্বারা আবরিত ছিল। পশ্চিমদিকের সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত পথের (cloister)-এর পরিসর ৬৪ ফুট। এখানে পাঁচটি 'আইল' এবং মধ্যভাগের 'নেভ' বা মূলকক্ষের পরিসর ৬৪ X ৩৩´ ৮´´। এর ক্লয়স্ট্যারগুলির উপরিভাগেও সমসংখ্যক অর্থাৎ ১০৮টি গম্বুজ ছিল। অতএব মোট গম্বুজের সংখ্যা ৩০৬টি। বিস্তৃত অলংকৃত কার্নিসের মাপ ধরে বাইরের আবষ্টনীর উচ্চতা প্রায় ২০ ফুট। অনেকগুলি খিলানই এখন ধূলিসাৎ হয়েছে। উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণের বহির্দেশে অনেক জানলার উপরে কারুকার্য আছে। পশ্চিম দিকে চারটি ছোট দরজা ও একই দিকে মূল কক্ষের প্রাচীরের সর্বোচ্চ স্থানে একটি জানালা এবং নীচের দিকে প্রথাসিদ্ধ প্রতিটি 'নিচ্' বা কুলুঙ্গী সুঅলংকৃত। পশ্চিম দিকের দক্ষিণ ভাগে সাধারণ উপাসনাকারীদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে ১৮টি সারির খিলানের (যার দ্বারা ক্লয়স্ট্যার নির্মিত) সম্মুখে মানান-সই 'নিচ্' দেখা যায়। উত্তর ভাগেও সেই একই ধরনের রীতি অনুসৃত। কিন্তু ডানদিকে প্রস্তর নির্মিত উচ্চ পাটাতন এক সময়ে ছিল, কিন্তু এখন অনেকটা অংশ কাঠের দ্বারা আচ্ছাদিত। সাধারণের মধ্যে তা 'বাদশা-তা-তখত্' নামে পরিচিত। সুপ্রশস্ত পীঠিকার উপরের স্তম্ভগুলি ত্রিবেণীর জাফর খান গাজীর মসজিদের স্তম্ভগুলির মতো। পরবর্তী অংশে 'নিচ্' ও দুটি দরজার উপরে কোরান শরীফের উদ্ধৃত অংশ আলংকারিক কুফী ও তুঘ্রা রীতির অক্ষরে লিখিত। এর বঙ্গানুবাদ করলে দাঁড়ায় ঃ—
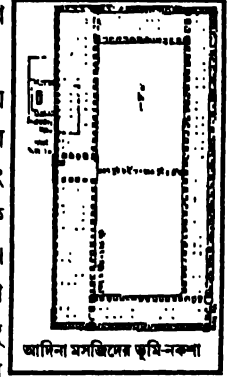
ঝুলন্ত মোটিফ

(ক) 'পরম করুণাময় আল্লাহর নামে';

(খ) 'আল্লাহ ব্যতীত ঈশ্বর নেই এবং মহম্মদ আল্লাহর রসুল';

(গ) সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন— 'জনগণ, যারা বিশ্বাস করে, তারা প্রার্থনার সময় নত হও, মাটিতে মাথা ছোঁয়াও এবং প্রার্থনা করো';

(ঘ) সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বলেছেন— 'যারা আল্লাহর গৃহনির্মাণ করে আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর বিশ্বাস করে, নামায করে, যাকাত্ (জমানোর অংশের নির্দিষ্ট পরিমাণ) দেয়, আর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করে না, তারাই সুপথগামী। তোমার কি সেই ব্যক্তি, যে তীর্থযাত্রীদের জলদান করে এবং পবিত্র মসজিদ তত্ত্বাবধান করে, তার সঙ্গে সমান কর কি ঐ ব্যক্তিকে যে আল্লাহকে এবং শেষদিনে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে? তারা আল্লাহর চোখে সমান নয় এবং ঈশ্বর অত্যাচারী সম্প্রদায়কে কখনও সুপথে চালিত করেন না।'

তথাকথিত 'বাদশা-কা-তখত্' বা মহিলাদের বসার স্থানের পশ্চিম প্রাচীরের উপর দুটি শিলালিপিও উৎকীর্ণ আছে। প্রথমটি কোরানের আয়ত-উল-কুরশি থেকে গৃহীত (সুরাহ্ ৪৮.২৭-২৯ এবং সুরাহ্ ৯.২০) আদিনা প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, এখানে গণেশ, অষ্টভুজা, চতুর্ভুজা, উড়ন্ত বিদ্যাধর-বিদ্যাধরী, কীর্তিমুখ, বিষ্ণুমূর্তি প্রভৃতি হিন্দু মন্দিরের মূর্তি বা বৌদ্ধ মোটিফ ইত্যাদি প্রায়ভগ্ন বা অর্ধভগ্ন অবস্থায় লাগানো দেখা যায়। দরজার চৌকাঠের বাজুতেও যে মূর্তিগুলি ছিল, তাও বিনষ্ট। খোদাই করা প্যানেলের মাপেই দরজা তৈরি হয়েছে। 'মেহ্রাব' ও টেরাকোটার 'টিম্পানাম' ব্যতীত কোথাও সুশৃঙ্খল খোদাইয়ের চিহ্ন নেই। পশ্চিম দিকে সিকান্দর শাহের সমাধিস্থলের মধ্যবর্তী অংশে যে দরজার প্যানেল আছে, তার মধ্যে রেখ দেউলের খোদিত রূপের কেন্দ্র বা অন্য শ্রেণীবদ্ধ গুলির মধ্যবর্তী হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি নির্মমভাবে ভঙ্গ করা হয়েছে। এমনকি একটি শিবলিঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে মূলকক্ষের (nave) উপরিভাগে।

*মসজিদের পরিকল্পনা* — 'নেভ' বা মূলকক্ষ এবং তার উত্তরদিকে অর্থাৎ ডানপাশে তথাকথিত 'বাদশা-কা-তখত'। মধ্যবর্তী প্রাঙ্গণটির আয়তন ৪০০´ X ১৫০´। স্তম্ভাদির মধ্যে 'আইল' আছে। পশ্চিম দিকে পাঁচটি এবং অন্যদিকে তিনটি 'বে'। পূর্বে মোট ২৬০টি স্তম্ভ ছিল। প্রস্তর-ফলক-গ্রথিত ইটের কাজ এবং সম্মুখে খিলানের প্রকোষ্ঠ। এগুলি মোট ৮৮টি। সমান্তরাল ছাদের কিনারাও লক্ষ্য করা যায়। এটি ভূমি থেকে সরলরেখায় উর্ধ্বে উত্থিত। তার উপরিভাগে ছাদের গম্বুজগুলি প্রতিটি 'বে'-র উপরে একটি করে অবস্থিত।

মসজিদের মূল প্রার্থনা কক্ষটি আকর্ষণীয়। প্রত্যেকটি 'বে'-তে একটি করে মেহ্রাব এবং মূল 'নেভ' -এর উপর গৌড়ের গুণমন্ত মসজিদের ন্যায় 'পিপা-সদৃশ ভল্ট' (ব্যারেল ভল্ট) যে একসময়ে এখানে ছিল— তা তার স্থাপত্যরীতি ও ভগ্ন অংশগুলি দেখলেই বোঝা যায়। এটি দৈর্ঘ্য-বরাবর 'আইল' গুলিকে সমান দুভাগে বিভক্ত করেছে। 'নেভ' -এর মধ্যভাগে একটি বৃহৎ মেহ্রাব এবং অন্যটি দক্ষিণ পার্শ্বে (বাম পার্শ্বে অর্থাৎ দর্শনার্থী বা প্রার্থনাকারীদের দক্ষিণ দিকে) আচ্ছাদিত বেদী (Pulpit), যেখান থেকে ইমাম নামায পরিচালনা করতেন এবং তার ডানদিকে অর্থাৎ উত্তরে তথাকথিত 'বাদশা-কা-তখত।'

***মূলকক্ষ বা 'নেভ' (Nave)*** — মূল সুবৃহৎ কক্ষটির আয়তন ৬৪ X ৩৩ (৬৪৪˝ X ৩৩ ৮˝)। সামনের খিলান ও ভল্ট যুক্ত খিলান এবং অলংকৃত 'প্যারাপেট' আজ আর নেই। সুতরাং এখন উন্মুক্ত আকাশের নীচেই এই কক্ষটি দেখা যায়। মূল কক্ষটির উভয়দিকে পাঁচটি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ আছে এবং পাশের দিকে উত্তর-দক্ষিণে পাঁচটি সূচীমুখী খিলানের দ্বারা সুদীর্ঘ 'আইল' (isle) সৃষ্টি করেছে। পাশের দিকে সংযোজনে আঠারোটি 'বে' এবং পিছনের দিকে দেওয়ালে

আঠারোটি 'নিচ্', ডানদিকে ৬৮টি স্তম্ভ ছিল। 'নেভ'-এর সম্মুখের অংশ নিঃসন্দেহে বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। মূল মেহ্‌রাব অত্যন্ত দক্ষতা ও যত্নে নির্মিত। উপরের দিকে খোদিত পদ্মের 'মোটিফ' এবং একটি গর্তকার 'নিচ্'; একটি ঝুলন্ত লম্বা কারুকার্যের মোটিফ এবং সর্বোচ্চ অংশে 'ট্রিফোরিয়াম' আছে। 'নিচ্'-এর মধ্যের অংশ চারটি প্যানেলের দ্বারা পাশাপাশি ও পাঁচটি উপর-নীচে বিভক্ত। তা সংখ্যায় কুড়ি। 'স্প্যানড্রেল'-এ আছে পদ্মের মোটিফ এবং শীর্ষবিন্দু থেকে একটিমাত্র ঝুলন্ত 'শৃঙ্খল-প্রদীপ'। এটি হিন্দু স্থাপত্য থেকে গৃহীত, তবে আংশিক পরিবর্তিত। প্যানেলের সারির উপরের শীর্ষদেশে এবং কার্নিসের মধ্যবর্তী 'ফ্রিজ'-এর (freize) মধ্যবর্তী অংশে হারের গুটিকার মধ্যে জীবনবৃক্ষ এবং ছাদ ও কিনারার মধ্যে দুটি খাঁজ অর্থাৎ 'মেরলন'-এ অলংকরণ দেখা যায়। সম্পূর্ণ অলংকৃত নকশা আবার রজ্জু-নক্‌শা দ্বারা বিভক্ত। এখানে ঝুলন্ত 'ইন্টারলেসের' (Interlace) কাজও আছে, যা Moresque নামে অভিহিত। স্তম্ভের পাদদেশ বিস্তারিত পত্রগুচ্ছের দানিতে শোভিত, স্তম্ভশীর্ষে আড়াআড়ি নাগদন্ড এবং খিলানে হংস-তোরণের প্রতিকৃতি দেখা যায়। এটি বৌদ্ধ-স্থাপত্যের চিহ্নবাহী। মস্তকে হিন্দু স্থাপত্যের 'কীর্তিমুখ'-এর প্রতিরূপ। 'স্প্যানড্রেল'-এ একটি ঘটের 'মোটিফ' ও দেখা যায়। সম্পূর্ণ নকশা একটি আয়তাকার ক্ষেত্রে অবস্থিত। শীর্ষটি আবার তিনভাগে বিভক্ত— পাশের দুটি অর্ধত্রিভুজাকার, মধ্যেরটি পূর্ণ ত্রিভুজাকার সম্পূর্ণ পুষ্পের মোটিফ এবং কেন্দ্রভাগে অলংকরণ একত্র সংবদ্ধ। মূল মেহ্‌রাবের বামদিকে অপেক্ষাকৃত কম অলংকরণ থাকলেও সুন্দর একটি মেহ্‌রাব আছে। 'হংসতোরণ'-সম 'ট্রিফয়েল' খিলান মেহ্‌রাব থেকে এখন অনুপস্থিত হলেও পাশের অনবদ্য অলংকরণ নয়নমুগ্ধকর। কুলুঙ্গীর ভিতর 'শৃঙ্খল-প্রদীপ' দেখা যায়। তবে হিন্দু দরজার চৌকাঠের বাজুতে গভীর খোদাইয়ের কাজ যেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করে বহু দূর থেকেও, তেমন খোদাই এইসব স্থানে নেই। বিশেষত 'কুফী' ও তুঘ্রা লিপিতে কুরআনের বিশিষ্ট উদ্ধৃতি স্বল্প খোদাইতে হওয়ায়—তা কাছ থেকে সুন্দর হলেও দূর থেকে তার রূপ ও স্বরূপ এত স্পষ্ট নয়।

***বেদী (Pulpit)*** — উপাসনাকারীদের ডানদিকে একটি মিম্‌বার অর্থাৎ বেদী আছে। ইমাম এখান থেকেই 'নামায' পরিচালনা করতেন। কালো ব্যাসল্টের প্রস্তরখন্ড দ্বারা এর কাঠামো আচ্ছাদিত। হিন্দু ও মুসলিম উভয় যুগের রাজসিংহাসনের ছাপ এতে আছে। বেদীর শীর্ষদেশে চাঁদোয়ার মত স্থাপত্যকৌশল। ভিতরের নিজের অংশের উচ্চতা (কক্ষভূমি থেকে) ৫´১০´। প্রবেশপথ ৩´ x ৪১/২´। ভিতরের প্রায় বর্গাকার ক্ষেত্রটি ৪৬১/২´´। ভূমিতল থেকে বেদীতল পর্যন্ত সাতটি সিঁড়ি, তন্মধ্যে একটি সিঁড়িতে জ্যামিতিক নক্‌শা, একটিতে সুবৃহৎ কীর্তিমুখ এবং উভয়পার্শ্বে উড়ন্ত বিদ্যাধরী মূর্তিও দেখা যায়। সমস্ত নামাযকারীরা যাতে ইমামকে দেখতে পায় সেজন্য কক্ষটির তিনদিকই উন্মুক্ত। কক্ষটির মধ্যে একটি ক্ষুদ্র মেহ্‌রাব এবং ঝুলন্ত প্রদীপের মোটিফ ছাড়া সমগ্র অংশে আটটি ও পাশে চারটি প্রস্ফুটিত পদ্মের কারুকাজ দেখা যায়। একটু উপরেই আবার খোদাই করা পদ্ম।

***মহিলাদের দরদালান (Ladies' Gallery)*** **বা তথাকথিত** ***'বাদশা-কা-তখত'*** — ডানদিকে মহিলাদের নামাযের জন্য পৃথক দরদালান (Ladies Gallery)। ভারতে ও বহির্ভারতের বহু মসজিদে এই ধরণের পৃথক স্থান নির্দিষ্ট আছে নারীদের জন্য। এটিকে কেউ কেউ 'বাদশা-কা-তখত' বলে অভিহিত করেছেন। মুন্সী শ্যামপ্রসাদ একে "তখত্‌গাহ-ই-নিমাযগাহ্‌-ই-বাদশাহান ওয়া শাহ্‌জাদ্‌গান" বলে চিহ্নিত করেছেন।[২২] কিন্তু বাদশাহের জন্য মসজিদে পৃথক কোন স্থান নির্দিষ্ট

করা ইসলাম ধর্ম-বিরুদ্ধ। আসলে পর্দানশিন মহিলাদের জন্যই এমন পৃথকস্থান। এ ধরণের নারীদের জন্য নির্দিষ্ট দরদালান গৌড়ের বড় সোনা মসজিদ ও গুণমন্ত মসজিদেও বিদ্যমান।

মহিলাদের এই স্বতন্ত্র-আসন ভূমি থেকে ৬´৬˝ উচ্চ। পাটাতনের স্তম্ভ ১৮টি এবং উচ্চতায় সেগুলি ভূমি থেকে ৫´৯˝। ভূমিস্থ বর্গাকার স্তম্ভের ব্যাস ৪১১/২˝। পাটাতনের উপরে আটটি স্তম্ভ আছে। এগুলির মধ্যভাগ গোলাকার, কিন্তু খাঁজকাটা। ভূমিস্থ আয়তন ২১/২´ x ২১/২´ এবং উচ্চতা ৬১১/২˝। পাশের জানলায় টেরাকোটার জাফরি, পশ্চিমপ্রান্ত থেকে প্রবেশ পথ দুটি। একটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা যথাক্রমে ৫´, ৩´,৬´৮˝, অন্যটির ৫´৯˝, ৫´৭˝, ৭´৮˝। মসজিদ পরিকল্পনার সময়ে যে এই পৃথক আসনের কথা চিন্তা করা হয় নি এবং তা যে পরবর্তীকালের যোজনা, তা খন্ডিত টিম্পানাম থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়।

***অলংকরণ*** — ইট-পাথরের ব্যাপক ব্যবহার আদিনা মসজিদে থাকলেও সমগ্র পশ্চিম দিকের দেওয়ালে মেহ্‌রাবের উপরিদেশের 'টিম্পানাম'-এর ত্রিকোণাকৃত অংশে টোরাকোটার অলংকরণের সমতুল্য সমগ্র গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় নেই। প্রাক্-মুসলিম যুগের হিন্দু-বৌদ্ধদের পোড়ামাটির যে এক ঐতিহ্য বাংলায় দেখা যায় তারই এক সুন্দর সমন্বয় বা সার্থক প্রকাশ ঘটেছে বিভিন্ন নক্‌শা সমন্বিত টেরাকোটায় সমৃদ্ধ 'টিম্পানাম' অংশে। ২৮টি টিম্পানামে এই অলংকরণ দেখা যায়। বৈচিত্র্যে ও নক্‌শার স্বরূপে তারা মনোরম। প্রায় সব মেহ্‌রাবে পাথরের উপর ঝুলন্ত শৃঙ্খল-ঘন্টার 'মোটিফ' এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়তাকার ক্ষেত্রে কোথাও বৃহৎ, কোথাও বা ক্ষুদ্রাকাররূপে খোদিত। মেহ্‌রাবের উভয় পার্শ্বে দুটি উদ্গত খোদিত পদ্মফুল। তবে কোনও কোনও বড় মেহ্‌রাবের উপরের 'টিম্পানাম'-এও ক্ষুদ্রাকার অলংকৃত মেহ্‌রাব দেখা যায়। সমস্ত 'টিম্পানাম'-এ অলংকৃত খিলানসম কারুকৎ আছে। যেমন একটিতে কল্পবৃক্ষ বা জীবনবৃক্ষ, একটিতে বৌদ্ধস্তূপের ছত্রাবলীসম রূপ খোদিত। পৃথক পৃথক মাপ ও ঢঙের ছাঁচে প্রস্তুত নক্‌শাযুক্ত ইটের (টেরাকোটা) দ্বারা এগুলি তৈরী। 'দাখিল দরওয়াজাতে'তেও এমন কিছু অলংকৃত ও ইটের সন্ধান মেলে। 'টিম্পানাম'গুলি অসাধারণ দক্ষতা, নিষ্ঠা ও পরিশ্রমে যে রূপ পরিগ্রহ করেছে তা সামান্য লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। টিম্পানামের আয়তন প্রায় একই। তিনদিকের অলংকৃত অংশের পরিধি যখন বৃদ্ধি পেয়েছে, তখন ভিতরের স্থানও স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পার্শ্ববর্তী বাহুদ্বয় এক/দুই/তিন/চার ভাগে পৃথক পৃথক অলংকরণে মন্ডিত। প্রত্যেকটি 'টিম্পানাম' -এর ভূমিতে তিনটি করে ঘন্টা বা কলসের 'মোটিফ', কোনটির বা দুই সারিও আছে। পাঁচটি 'টিম্পানামে'-এ ঝুলন্ত প্রদীপের 'মোটিফ' দেখা যায়। তবে চতুর্দিকে অন্য অলংকরণ আছে। এগুলি অবশ্য বাংলার আলপনার জগতে দেখা যায়। কোনটিতে দুটি কর্তিত খিলানের সূক্ষ্মতম রূপের বিপরীতমুখী মিলন, কোথাও জাফরি, কোথাও বা প্রত্যেক সারিতেই পৃথক অলংকরণ। এর উপরের দু-বাহু কোথাও পদ্মফুল, কোথাও ফল, কোথাও বা পদ্মের 'মোটিফে' আকীর্ণ। মসজিদের দুটি কার্নিসের নীচে জালির কাজ। আয়তাকার মসজিদের চার কোণে স্তম্ভের (দুটি এখন পরিপূর্ণ ভগ্ন, কেবলমাত্র দক্ষিণ-পশ্চিম কোণেরটির অনবদ্য রূপ নিয়ে টিকে আছে) কারুকার্য অপরূপ। চতুষ্কোণী পীঠিকার উপরে স্তম্ভের মূলদেশ ও শীর্ষের মধ্যবর্তী
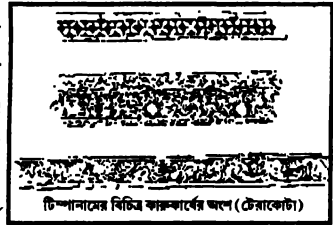
টিম্পানামের বিচিত্র কারুকার্যের অংশ (টেরাকোটা)

অংশের স্তম্ভ উত্তল অর্ধবংশী ছিদ্রবৎ খাঁজকাটা (flute)।

এখন সামগ্রিকভাবে আদিনা মসজিদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি এমনভাবেই সাজানো যেতে পারে ঃ—

১. পাথরের উপর অগভীর খোদাইয়ের কাজ (অলংকরণ ও লিপি)। পাল ও সেনযুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের মতো এগুলি গভীরভাবে খোদিত নয়।

২. হিন্দু ও বৌদ্ধ মোটিফগুলির বৈচিত্র্য সাধন বা রূপ-রূপান্তর। এগুলি ঠিক 'মুসলিম' অভিধায় পরিচিত নয়। স্থাপতি ও ভাস্করদের অধিকাংশ হিন্দু হওয়ায় মুসলিম সুলতানের নির্দেশে গঠিত এগুলি হিন্দু-মুসলিম দুই রীতিরই যুগ্ম-ফসল।

৩. মসজিদের মূল 'নেভ'-এ অনবদ্য কারুসমন্বিত সুঁচালো কাজ—যা হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরাদির 'নিচ্' (কুলুঙ্গী) থেকে গৃহীত। মুঘলযুগে বিশেষত শাহজাহানের সময়ে এর কিছুটা সন্ধান মিললেও বাংলায় 'কাস্‌প'-এর সৌন্দর্য অনেকগুণ বেশী সন্দেহ নেই।

৪. মূল 'নেভ' যেভাবে উভয় পার্শ্বকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে, তা পরবর্তী যুগে বহু মসজিদের আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৫. মহিলাদের নামাযের স্থান (তথাকথিত বাদশা-কা-তখত) -এর স্তম্ভগুলির পাদমূল যদিও হুগলির ত্রিবেণীর জাফর খান গাজীর মসজিদকে স্মৃতিপথে আনে, তবুও এই অষ্টকোণী স্তম্ভগুলি বহির্বাংলায় কোথাও দেখা যায় না।

৬. প্রাচীর ও কার্নিসের মধ্যবর্তী রেখাভূমির সঙ্গে সমান্তরাল এবং তারই সঙ্গে একাধিক গম্বুজ আবেষ্টনীর দ্বারা আচ্ছাদিত।

৭. কোণের বুরুজগুলি প্রাচীরের সঙ্গে সংবদ্ধ।

৮. অলংকরণে অসংখ্য নূতন চিন্তাধারার সংযোজনা।

### সিকান্দার শাহ্‌র সমাধি

মহিলাদের নামাযের স্থানের অর্থাৎ তথাকথিত 'বাদশা-কা-তখতে'র পশ্চিমদিকে সিকান্দার শাহের সমাধি অবস্থিত। পুত্র গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের হাতে সিকান্দার শাহের শোচনীয় মৃত্যুর পর গিয়াসুদ্দীন এখানে পিতাকে সমাধিস্থ করেন।

এই সমাধিকক্ষের ছাদ এখন ভগ্ন। মধ্যেকার স্তম্ভগুলিও এখন ভূপতিত। ভিতরের বর্গাকার ক্ষেত্রটির বর্তমান আয়তন ৪২´ X ৪২´। তার দেওয়াল ৬´৮˝ চওড়া। চারটি স্তম্ভ দিয়ে নটি বর্গাকার ক্ষেত্রে এটি বিভক্ত। সমাধির চিহ্ন অবশ্য এখন আর কিছু নেই। বাইরে থেকে এটিকে ঘনক্ষেত্র বলে মনে হয়। ভিতরে খিলানোপরি টেরাকোটার কাজ আছে। এক সময়ে প্রতিটি বর্গক্ষেত্র আবার স্তম্ভোপরি খিলান ও ন'টি গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। স্থাপত্যের পরিকল্পনার দিক দিয়ে বলা যায় যে বর্গাকারক্ষেত্রের এই সমাধিটির নক্‌শা পূর্ববর্তী যুগেও দেখা যায়।

### প্রাচীন রাজপ্রাসাদের চৌহদ্দী, প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ এবং দীঘিসমূহ

পরিত্যক্ত পরিপূর্ণ ভগ্ন এই রাজপ্রাসাদের চৌহদ্দীর উত্তর-পূর্ব অংশের পুঙ্খানুপুঙ্খ জরিপ করেছিলেন স্টেপলটন সাহেব ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে।

আদিনা মসজিদ থেকে পূর্ব দিকে ৩৪ নং জাতীয় সড়ক পেরিয়ে প্রায় এক কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বদিকে সিকান্দার শাহ্-র রাজপ্রাসাদ ছিল বলে জনশ্রুতি আছে। তবে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের রাজত্বকাল থেকেই এই অঞ্চলের অস্তিত্ব আছে বলে অনুমান করা যেতে পারে। এমনকি হিন্দুযুগেও যে এই জনপদটি বর্ধিষ্ণু ছিল তাও অনেকে অনুমান করেছেন। বুকানন হ্যামিলটন সাহেব ১৮০৮ সালে এটি প্রথম লিপিবদ্ধ করেন তাঁর 'ভ্রমণ-বিবরণী '-তে। তাঁর কিছু বর্ণনায় দীঘি ও ধ্বংসস্তুপের বর্ণনাও আছে। 'সাতাশঘর' বা 'ষাটগম্বুজ' বলে এই অংশটিতে রাজপ্রাসাদ ছিল বলে জনপ্রবাদ আছে। ১২০গজ x ৬০গজ অংশের ধ্বংসাবশেষকে কেন্দ্র করেই এই প্রাসাদ-চত্বরের স্থান। মাটির পাড়ে ইটের দেওয়াল-ঘেরা যা প্রথম দেখা গিয়েছিল, তার উচ্চতাও ১৬'। দেওয়ালবেষ্টিত অংশে অনেক ভবনাদি ছিল বলে অনুমিত হয়। উত্তর-পশ্চিমে একটা অট্টালিকা ছিল এবং এর কেন্দ্র স্থলে খিলান যুক্ত একটি প্রকোষ্ঠও ছিল। দেওয়ালে জলবাহী নলেরও নিদর্শন দেখেছিলেন হ্যামিলটন সাহেব। ২৪ ফুট ব্যাসের অষ্টকোণী কক্ষের আটটি কোণে আটটি ক্ষুদ্র কক্ষ ছিল। এর মধ্যে ২৫' x ৭' ফুটের আয়তাকারের একটি কক্ষ এবং উত্তর-পশ্চিমে একটি পৃথক ১১ ফুটের বর্গাকার কক্ষ ছিল।প্রকৃতপক্ষে এটি একটি 'হামাম' বা স্নানাগার। এই সব ভগ্নস্তূপে ইট ও চুন-সুরকি ছাড়া দু'চারটি মীনা করা ইটও পাওয়া গেছে এখানে। আদিনা ও 'সাতাশঘরা'র মধ্যবর্তী অঞ্চলে একটি মাটির গড় আছে। এর পশ্চিমের খাদটি সম্ভবত প্রাসাদ-বেষ্টনীর কাজ করত। জনশ্রুতিতে মহাভারতের পান্ডুরাজার নাম থেকে এই অঞ্চল সৃষ্ট এবং কিংবদন্তী আছে যে এটি মহাভারতের বিরাটরাজের শ্যালক কীচকের রাজ্যভুক্ত ছিল।

এ অঞ্চলে ধনুষ দীঘি ও মিনার ছিল। আছে আটবাঁক দীঘি বা রাহাৎ বাঁক দীঘি, সাতাশ ঘরা দীঘি, নাসির শাহের দীঘি ও শুকান দীঘি ইত্যাদি। তা ছাড়া জনশ্রুতিতে পাণ্ডবরাজার দালান নামে একটি ভগ্ন স্নানাগার ও একটি গভীর ইঁদারার চিহ্ন (স্থানীয় লোকদের কথায় জীয়ৎ কুণ্ডু বা জীবন কুণ্ডু) আছে।

### রাই খাঁ দীঘি

পুরাতন পান্ডুয়ার একলাখি রেল স্টেশনের দক্ষিণ পাশে মজে যাওয়া শুকান দীঘির প্রায় ৪ মাইল পূর্বে রাই খাঁ দীঘি বা পাল খান দীঘি।

বেশ কয়েকটি টিবি এখানে দেখা যায় এবং এখান থেকে খরা মরসুমে পোড়ামাটির নানাপ্রকার খেলনা, নারীমূর্তির উর্ধ্বাংশ, পাথরের থালা ও বাটির ভগ্নাংশ ইত্যাদি পাওয়া গেছে; স্বাভাবিকভাবে সুপ্রাচীন জনপদের অস্তিত্ব এখানে যে ছিল তা বোঝা যায়।

● **পাদটীকা**

১. Abid Ali Khan, Op. Cit., P-75

২. Dani Ahmad Hasan, Op. Cit P-95

৩. Cunningham, Op. Cit. 69-70
৪. Percy Brown - Indian Architecture (Islamic Period), P 36
৫. Cunningham, Op. Cit., P-65
৬. Saraswati S K. - Indo-muslim Architecture in Bengal, Journal of the Indian Society of Oriental Art , Vol-IX, P-18
৭. Cunningham, Op. Cit , P-66
৮. Dani, Op. Cit., P-136
৯. Cunningham, Op. Cit, P-76
১০. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, গৌড়ের কথা, পৃ-২৭
১১. Cunningham, Op Cit , P-76
১২. Abid Ali Khan, Op Cit , P-100
১৩. Cunningham, Op Cit , P-84
১৪. Blochmann, Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1895 P-262
১৪. প্রদ্যোত ঘোষ, মালদহ্ জেলার পুরাকীর্তি, পৃ- ৫৯-৬৯
১৫. তদেব, পৃ ৭১-৭৩
১৬. Ravenshaw as in Cunningham, Op Cit , P-88, রজনীকান্ত চক্রবর্তী, পৃঃ-৩২১
১৭. Rijaz-us-Salatin, P-118
১৮. Martin, Eastern India Vol II, P-649
১৯. Cunnigham, Op Cit 89, Cambridge History of India, Vol III, P-603
২০. Abid Ali Khan, Op Cit , P-126
২১. প্রদ্যোত ঘোষ, মালদহ্ জেলাব পুবাকীর্তি, পৃ- ৭৩-৭৬
২২ মুন্সী শ্যামপ্রসাদ, আহ্ওয়াল গৌড় ওযা পাণ্ডুযা (Tr. Dani), p- 24-27

# পুরাতন মালদহ্ বা ওল্ড মালদা

মহানন্দা ও কালিন্দ্রী নদীর সঙ্গমস্থলে মহানন্দার পূর্ব তীরে এই মালদহ শহর—যা আজ পুরাতন মালদহ্ বা ওল্ড মালদহ হিসাবে পরিচিত। মালদহ শহরের শ্রীহীনতা ও ইংরেজবাজারের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 'ইংরেজবাজার শহর' 'মালদহ্ শহরে' এবং মূল মালদহ শহর 'পুরাতন মালদহ' বা'ওল্ড মালদহ' শহর বলে পরিচিত হয়েছে। সাধারণের কাছে ইংরেজী শব্দটিই বেশী গ্রাহ্য অর্থৎ 'ওল্ড মালদহ' (Old Maldah)। ইংরেজবাজার শহরে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্যিক কুঠি স্থাপন করলে মূল মালদহ শহরের ঐশ্বর্য হ্রাস পায়।

ইংরেজবাজার বা বর্তমান মালদহ্ শহর থেকে ৪ কিমি দূরে উত্তর-পূর্বে মহানন্দা নদী পেরিয়ে এই পুরাতন মালদহ। ২৫°২´৩´´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°১০´৫১´´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে এর অবস্থান। কোন সময়ে এর উদ্ভব ঘটেছিল তার সঠিক তথ্য আজও পাওয়া যায় নি। তবে মুসলমান রাজত্বের আমলে পান্ডুয়ার একটি সমৃদ্ধ বন্দর হিসাবে এর গুরুত্ব ছিল বলে জানা যায়। দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুঘলক এখানে একটি শিবির স্থাপন করেছিলেন। ফরাসী ও ওলন্দাজদের বাণিজ্যিক কুঠি এখানে ছিল। কিন্তু ইংরেজদের কুঠি চিরকালই ইংরেজবাজারে ছিল না বলে হান্টার সাহেব স্পষ্ট করে জানিয়েছেন।[১] উনিশ শতকের গোড়ায় হ্যামিলটন এখানে এসে তার সমৃদ্ধির কথা তাঁর বিবরণীতে লিখেছিলেন। স্টেপলটন সাহেব এখানেই কুষাণরাজ বাসুদেবের (প্রায় দ্বিতীয় খ্রীস্টাব্দের) একটি স্বর্ণমুদ্রা পান। তাতে হিন্দু আমলেও এখানে যে ব্যবসা-বাণিজ্য হত তা অনুমান করা যায়। 'আকবর নামা' গ্রন্থে আকবরের শাসনকালে এ অঞ্চলের গুরুত্বের কথা স্বীকৃত। 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে মালদহের (বর্তমান পুরাতন মালদহ্) সন্নিকটস্থ এগারোটি মহাল জন্নতাবাদ বা লখনৌতির মোট ৬৬টি মহালের অংশীভূত ছিল বলে প্রকাশ।[২] সুলতানী আমলে বিশেষতঃ আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সময়ে উচ্চপ্রাচীর বিশিষ্ট সুরক্ষিত সরাই খানা বা 'কাটরা' (caravansarai) যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত তাতে সন্দেহ নেই। এই শহরের প্রাচীন বিভাগগুলির মধ্যে আজ অনেকগুলিই নেই। প্রাচীন মহল্লাগুলি দক্ষিণ থেকে উত্তরে এমনই ছিল—কাজীদাঁড়া, চল্লিশাপাড়া, হাতি শালা, বিরোজপাড়া (বেরোজগার টোলা), মুঘলটুলি, কাটরা, রুকনপুর, তেলমুণ্ডাই, কুট্টিটোলা, তুঁতবাড়ি, কাহারটোলা, কায়েতপাড়া, ঘোড়াহারা, শবরী, খোদ

শর্বরী, উপর শর্বরী, তারাপুর, গোয়ালটুলি, ফিরোজপুর, শাকমোহন, শুঁড়িপাড়া, পাটনীটোলা, ফুলবাড়ি, বাঁশহাট্টা, শেখপাড়া, মোকাতিপুর, ধোপাপাড়া, পোড়াটুলি ও খিদিরপুর।[৩]

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে মালদহ (পুরাতন) কেবলমাত্র বাণিজ্য কেন্দ্রই ছিল না, রেশম ও তুলা উৎপাদনের একটি বৃহত্তম কেন্দ্রও এই শহরকে বেষ্টন করে ছিল। 'তারিখ-ই-শেরশাহী'-র লেখক আব্বাস খান শেরওয়ানীর লেখায় জানা যায় যে, ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে শের খান শেখ খলীলকে মালদহের মহামূল্যবান বস্ত্র প্রচুর পরিমানে দান করেছিলেন। ১৬২০ ও ১৬২১ খ্রীষ্টাব্দে পাটনার এক ইংরেজ এজেন্টের চিঠিগুলিতে মালদহের চাদর (দোপাট্টা)[৪] এবং পারস্যের জন্য নমুনা স্বরূপ মালদহে প্রস্তুত দ্রব্যের উল্লেখ আছে। সুন্দর সূচীকর্মের দ্বারা শোভিত বিশিষ্ট তুলার 'সুজনী' প্রস্তুতের জন্যও মালদহের সুনাম ছিল। তবে পুরাতন মালদহের এই ব্যবসা ও সূচীশিল্পকর্মে মন্দা দেখা গেলেও গত শতাব্দীতেও পুরাতন মালদহের সন্নিকটে (প্রায় ৫ মাইল দক্ষিণে) সাহাপুরে (শাহ্পুর (?)) রেশম বস্ত্রের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন মিলত। এ সবগুলির মধ্যে কাতান, সিরাজ, বুলবুল চশম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বহির্ভারতে বিশেষতঃ মধ্য প্রাচ্যের উপসাগরীয় অঞ্চলে এগুলি ব্যাপকভাবে রপ্তানিও হত।[৫] পুরাতন মালদহের যে সব ধনী বণিক ছিলেন তাদের কিছু কিছু নামও জানা যায়।

### শাহ্ লঙ্কাপতির সমাধি

পুরাতন মালদহের পথে ত্রিমোহিনীতে অর্থাৎ বাচামারি গ্রামের আগে পুরাতন মালদহের পথে উত্তরদিকে একটি উচ্চমঞ্চসহ দুটি সমাধিযুক্ত স্থান আছে। একটি শাহ্ লঙ্কাপতির সমাধি এবং অন্যটি সৈয়দ সুলতান ওমরিয়ার। এখানে যে প্রস্তরফলকটি (২৬″ X ১২″) তা এক মসজিদের প্রতিষ্ঠালিপি। এটি পরবর্তীকালে সংযোজিত। পীর শাহ্ ইব্রাহিম শাহ্ চৈতন গরীব ও দুঃস্থদের জন্য লঙ্গরখানার ব্যবস্থা করেছিলেন। শব্দটি লঙ্গরপতি থেকে লঙ্কাপতি হয়েছে বলে অনুমান।

সমাধির উত্তরদিকে একটি প্রস্তরখন্ডে (২২১/২″ X ৮১/২″) 'জীবনকৃষ্ণ' উৎকীর্ণ। এর পার্শ্ববর্তী উপান (plinth) দেখে মনে হয় যে এখানে সম্ভবত একটি মসজিদ ছিল। প্রতি বছর আরবী শাবান মাসের ২৫ তারিখে এখানে পীরের ফতিহা (উরুষ) উৎসব পালিত হয়।

### জামি মসজিদ

এখান থেকে পুরাতন মালদহের দিকে প্রায় দু কিলোমিটার দূরে রাস্তার বামদিকে এই মসজিদ।

জামি মসজিদের দ্বারটিতে দুটি অষ্টকোণী স্তম্ভ আছে। পাথরের চৌকাঠ ৬′৯″ X ৯′২″ এবং এটি ইসলামীয় রীতিতে খোদিত। প্রাচীর-বেষ্টিত খিলান দ্বারা নির্মিত বাইরের প্রবেশপথ দিয়ে প্রাঙ্গণ-সংলগ্ন এই মসজিদ। প্রাঙ্গণের মধ্যে একটি ইঁদারা ছিল। অবশ্য এখন তা বন্ধ হয়ে কলের জলের ব্যবস্থা হয়েছে 'ওজু'র জন্য। 'জুম্মাবার' অর্থাৎ শুক্রবার কেবলমাত্র ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত এই মসজিদ উন্মুক্ত থাকে।

ইট-পাথরে নির্মিত এই মসজিদটির একটি শিলালিপি অনুসারে আবিদ আলি অনুমান

করেছিলেন যে—এটি আকবর বাদশাহের সময়ে নির্মিত হলেও সংস্কারকার্য সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সময়ে হয়েছিল। স্থাপত্য-কৌশলের দিক দিয়ে বিচার করলে এটিকে আকবর বাদশাহের যুগে ফেলাই সঙ্গত।

این قبله که در عالم معلوم آمد * در هند بنام کعبه موسوم آمد
چون ثانی کعبه بود تاریخ ز غیب * بیت الله الحرام معصوم آمد

বঙ্গানুবাদ ঃ এই প্রার্থনা স্থান পৃথিবীতে পরিচিত হয় এবং ভারতে কাব্য নামে অভিহিত হয়। এটি যেহেতু দ্বিতীয় কাব্য, তাই এর তারিখ প্রকাশ হয় অদৃশ্য জগৎ থেকে 'বায়তুল্লাহ আল্ হারাম মাসুম' বাক্যটি দ্বারা। বাক্যের অক্ষরগুলির সংখ্যাগত মানের (আবজাদ) সমষ্টিসংখ্যা ১০০৪ হিজরী অর্থাৎ ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দ।

আয়তাকার এই মসজিদটির আয়তন ৭২´ x ২৭´। প্রতিটি কোণে একটি করে বুরুজ আছে। কিন্তু পূর্বদিকের মসজিদের সম্মুখভাগ নতুনত্বের পরিচায়ক। ছাদের সম্মুখভাগের স্তম্ভোপরিস্থ ত্রিকোণাকার উদগত গাঁথুনি, সরু রেখা দ্বারা অলংকৃত মিনার এবং দরজার খিলানের উপর বিভিন্ন প্রকার 'কাস্‌প' আয়তাকার ক্ষেত্রের মধ্যবর্তী অংশে স্থাপিত। পূর্বদিকে আরও দুটি দ্বার আছে। তা ছাড়া আরও একটি করে 'ফ্রন্টন'-এ দরজা আছে। সম্মুখভাগের ছাদ ও প্রাচীরের মধ্যবর্তী অংশে 'ব্যাটলমেন্ট'-এর রেখা বক্র এবং তিন ভাগে বিভক্ত। কেন্দ্র ভাগটি বাম ও দক্ষিণ পার্শ্ব থেকে বেশ উচ্চ। কার্নিশ ও অন্যান্য বন্ধনীগুলি পলেস্তারাযুক্ত। একই কারুকার্য উত্তর-দক্ষিণেও সম্প্রসারিত। উভয়দিকে এক একটি খিলানযুক্ত দ্বারদেশও দেখা যায়। পশ্চিমদিকের দেওয়ালে প্রথাসিদ্ধ মেহ্‌রাব। তার ধারগুলিও অলংকৃত বুরুজে শোভিত। মধ্যবর্তী অংশে 'পঞ্জরাকৃতি ভল্ট', দুপাশে খর্বাকার স্থূল গম্বুজ এবং তার উপরে খোদিত পদ্মের কারুকার্য। গম্বুজ দুটি উদগত রেখাপাত দ্বারা পলেস্তারা করা। মিনারগুলির মস্তক ছাদ ও দেওয়ালের কিনারা থেকে কিঞ্চিৎ উর্ধ্বে শীর্ষসীমাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মোট মিনার সংখ্যা আট। কোনও প্রস্তরস্তম্ভ এ মসজিদে দেখা যায় না। মসজিদের সম্মুখভাগ যেমন তিন ভাগে বিভক্ত, ভিতরের অংশও তেমনই তিন ভাগে বিভক্ত আছে। আয়তাকার মধ্যবর্তী অংশের পরিসর ২২´ x ১৮´ এবং দুপাশের বর্গাকার অংশের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ ১৬ ফুট। পশ্চিমদিকের দেওয়ালে তিনটি অলংকৃত মেহ্‌রাব আছে। খিলানের 'স্প্যানড্রেল' এবং স্তম্ভের উপর খিলানের অবস্থান—তাও অলংকৃত। স্তম্ভগুলিতে শিকল-ঘন্টার 'মোটিফ' আছে।

যে মুঘল স্থাপত্যরীতির কৌশল এখানে দেখা যায়, সেগুলি ঃ দেওয়ালে পলেস্তারা; ছাদের সম্মুখে স্তম্ভোপরিস্থ ত্রিকোণাকার গাঁথুনি; খর্বাকার ও স্থূল গম্বুজ এবং গম্বুজে খোদিত পদ্মের কারুকাজ।

পূর্বে এই মসজিদের প্রাঙ্গণের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি কক্ষ মাদ্রাসা হিসাবে ব্যবহৃত হত বলে কথিত আছে। উত্তর-পশ্চিম কোণেও অনুরূপ কক্ষ ছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন। এগুলির পশ্চাদ্দিকে মসজিদের অন্য দুটি চত্বর সমাধিস্থল হিসাবে ব্যবহৃত হত। এখানে প্রায় পঞ্চাশটি সমাধি আছে। জনশ্রুতি আছে উত্তর-পশ্চিমের সমাধিগুলি মসজিদের নির্মাতার বংশের

পুরুষ-সদস্যদের এবং দক্ষিণ-পশ্চিমের সমাধিগুলি মহিলা-সদস্যদের।[৬]

## শাহ্ গদার দরগাহ্

পুরাতন মালদহের মুঘলটুলী এলাকার জামি মসজিদ থেকে প্রায় ৮০০ গজ অগ্রসর হয়ে দ্বিধাবিভক্ত রাস্তাটির ডানদিকে শাহ্ গদার সমাধি। বর্গাকার দরগাহ্‌টির বহিরঙ্গের আয়তন ১২´ ৬´´ X১২´ ৬´´, ভিতরের পরিসর ৭´ ৯´´X৭´ ৯´´। এর উপরিভাগে একটি অর্ধবৃত্তাকার গম্বুজ আছে। গম্বুজটির ব্যাস ৩৫´ ৮´´,এবং ছাদের উপর থেকে শীর্ষবিন্দু পর্যন্ত৭´ ৯´´। ফার্সী 'গদা' শব্দটির অর্থ ভবিষ্যৎ। অর্থাৎ ভবিষ্যৎদ্রষ্টা দরবেশ (গাইন + দ্বাল – আলিফ = গদান্)। প্রাচীর বেষ্টিত আবেষ্টনীর মধ্যে দরগাহটি অবস্থিত।

প্রাঙ্গণে চারটি কবর আছে। বামদিকে এর মাপ যথাক্রমে ঃ—(১) ৬´ ৩´´X ৩´ ৪´´, (২) ৬´ ২´´ X ৩´ ১০´´, (৩) ৫´ X ৩´ ২´´ এবং (৪) ৫´ X ২´ ১০´´। এ দিক থেকে দেখলে প্রথমটি দরবেশের পোষা এক তোতাপাখির। জনশ্রুতি আছে যে সে নাকি কোরাণের কিছু আয়াত মুখস্থ বলতে পারত। পাশেরটি মস্তান মিয়া লঙ্গট বন্দ নামক ফকিরের, তার পাশেরটি 'দরবেশ-ই-বিবি'র সম্ভবত (শাহ্ গদার স্ত্রীর) এবং সর্ব পশ্চিমে দরবেশের ধাইমার। এখানে একটি বড় চেরাগদানি ও একটি ছোট চেরাগদানি আছে। আবেষ্টনীর মধ্যে আরও পাঁচটি কবর আছে; সম্ভবত সেগুলি দরগাহ্‌র খাদেমদের।[৭]

শাহ্ গদার দরগাহে দুটি প্রস্তরলিপি আছে — (১) ভবনটির দরজার উপরে এবং (২) বহিরাবেষ্টনীর ফটকের উপর। প্রথমটির সঙ্গে দরগাহের কোনও সম্পর্ক নেই। এটি জামি মসজিদ সংস্কারের সময় সেখানেই ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে তা এই দরগাহে লাগানো হয়েছে। দ্বিতীয়টিতে 'দরগাহ্' শব্দটি থাকায় হয়ত তার সঙ্গে সম্পর্ক থাকাও অসম্ভব নয়। সম্ভবত আর একটি মসজিদ পার্শ্ববর্তী স্থানে ছিল।

## কাটরা

শাহ্ গদার দরগাহ্ থেকে প্রায় ২০০ গজ দূরে এই ভগ্ন কাটরা। রিয়াজ-উস-সলাতীনের মতে দিল্লির বাদশাহ ফিরোজ শাহ্ তুঘলক ১৩৫৩-৫৪ খ্রীষ্টাব্দে শীতকালে বাংলার স্বাধীন সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এই স্থানে তাঁবু স্থাপন করেছিলেন। পুরাতন মালদহ তখন শুধু এক বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্রই ছিল না, রাজধানী পাণ্ডুয়ায় মূল্যবান পণ্যসমূহ প্রেরণ করার জন্য মধ্যবর্তী পর্যায়ে পুরাতন মালদহের কাটরায় তা রক্ষিত থাকত।[৮]

কাটরার প্রবেশদ্বারে সুদৃঢ় স্তম্ভ বর্তমান। অবশ্য শেষের দুটির চিহ্নমাত্র আজ আর নেই। উত্তর-দক্ষিণে এখন ভগ্ন-কাটরার একটি দীর্ঘ দরদালান জাতীয় অংশ আছে। তার মধ্যে দিয়ে পাকা রাস্তা প্রসারিত। উত্তর-দক্ষিণে এটি ২৮৩ ফুট লম্বা ছিল। বামপাশে তিনটি খিলান ও দক্ষিণ দুটি খিলান আজও দেখা যায়। ভূমিমূল থেকে খিলানের শীর্ষবিন্দু পর্যন্ত উচ্চতা ৬১/২´, ডানদিকে ২৬ প্রশস্ত। উত্তরভাগের শেষ প্রান্তে এখনও ৩২´ ৪´´ পরিমিত অংশে ভগ্নাবশেষ আছে এবং তার প্রতিটির দুটি করে খিলানও আছে। পূর্বে এক একটি চতুষ্কোণী প্রকোষ্ঠ এর পাশে ছিল এবং সেগুলিও খিলানযুক্ত ছিল। এখন অবশ্য তার চিহ্নমাত্র নেই। ফতেপুর সিক্রিতে আকবরের

সরাইখানার এটি অনুরূপ বলেও কেউ কেউ মনে করেন। তদানীন্তন যুগে অর্থাৎ ষোড়শ শতকের শেষ ভাগে এটি নির্মিত বলে মনে করা হয়।

### নিমাসরাই বা নিমসরাই বুরুজ বা স্তম্ভ

কাটরা থেকে পিছিয়ে এসে শাহ্ গদার দরগাহের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটি প্রসারিত পুরাতন মালদহ শহরের দিকে, তা মহানন্দা নদীর ধার দিয়ে গিয়েছে। কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে কালিন্দ্রী ও মহানন্দার প্রায় সঙ্গমস্থলে নদীর অপর তীরে এই নিমসরাই বুরুজ। ইংরেজবাজার শহরের দিকে মালদহ টাউন স্টেশনের পাশ দিয়ে আরাপুর-কোতয়ালির পথে গিয়ে রেলপথের পাশ দিয়েও নিমাসরাই যাওয়া যায়। পাণ্ডুয়া ও গৌড়ের মধ্যবর্তী স্থানে (নিম = অর্ধেক) অবস্থিত বলে এটি নিমসরাই বা নিমাসরাই। 'নিম' অঞ্চলে সরাই (সরাইখানা) থাকায় এটি নিমসরাই হয়েছে বলে অনেকের ধারণা।[৯]

বুরুজটির উপরিভাগ ভগ্ন। ভিত্তিদেশে এর পরিধি ৫৮´ ৯˝ এবং এর ব্যাস ১৮´ ৯˝। নীচের দুটি তলের উচ্চতা প্রায় ৫৫´। অষ্টভুজবিশিষ্ট ভিত্তির উপরে এই বুরুজটি স্থাপিত — যার প্রতিটি বাহু প্রায় ১৮´। বুরুজটির গাত্রে অসংখ্য উদ্গত প্রস্তরফলক আছে। কেউ কেউ এটিকে প্রহরাস্তম্ভ (tower) বলে মনে করেছেন। বিপদ দেখে সংবাদ দেওয়ার জন্য এখানে অগ্নি প্রজ্জ্বলনের ব্যবস্থা ছিল বলেও মনে করা হয়। কেউ কেউ শিকারের নিমিত্ত বুরুজ বলেও মনে করেছেন।[১০] এটির নির্মাতা কে তা জানা যায়নি।[১১] তবে ফতেপুর সিক্রিতে আকবরের 'হিরণ মিনার' এবং লাহোরের সন্নিকটে শিকোহপুরে মিনারের মত বলে এই বুরুজটিকে অনেকে মনে করেন এবং সে জন্যই ওই যুগে নির্মিত হয়েছে বলেও অনেকের ধারণা।[১২]

### শাকমোহন মসজিদ

মহানন্দা নদীর পাড়-বরাবর গিয়ে শাকমোহন পাড়ায় এই শাকমোহন মসজিদ। আয়তাকার এই মসজিদটির সম্মুখে প্রাঙ্গণ এবং মসজিদটি প্রাঙ্গণ-ভূমি থেকে প্রায় ৬ ফুট উঁচু। মসজিদের সম্মুখে কড়ি-বরগা দেওয়া একটি বারান্দা এবং ভিতরের ঘরে মেহ্‌রাব। এই দালান-মসজিদটি কারও মতে জনৈক শেখ ফকির মোহম্মদ নির্মাণ করেন। এই শেখ ফকির মোহম্মদ সমকালীন মালদহের বিখ্যাত বস্ত্র ব্যবসায়ী ও রপ্তানিকার শেখ ভিখাহ্-র ভাই ছিলেন বলে অনেকের ধারণা।[১৩] বাম পাশে একটি প্রবেশদ্বার আছে, যা আজ গৌণ হয়ে পড়েছে। এখানে ৩´ ৫˝ X ৯˝ লিপি আছে। অন্যটি মসজিদের দরজার উপরে এবং তৃতীয়টি ৪´ ১˝ X ৬˝ সম্প্রতি বারান্দার ডানদিকে লাগানো হয়েছে। একটি লিপি থেকে জানা যায় যে, সুলতান বারবক্ শাহের পুত্র সুলতান মুযাফ্ফর ইউসুফ শাহের আদেশে এই মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। তবে সময়ের দিক থেকে লিপিটি ভ্রমাত্মক।[১৪]

### ফুটি মসজিদ

পুরাতন মালদহের ভিতরে এই মসজিদটি কোনও একসময়ে ভূমিকম্পে ফেটে যাওয়ায় ফাটা বা ফুটি মসজিদ বলে কথিত। ষাট বছর আগেও এ মসজিদ দর্শনীয় ছিল। এই মসজিদে একটি বৃহৎ গম্বুজ ও বারান্দায় তিনটি গম্বুজ ছিল। শুধু তাই নয়, ক্যানিংহাম এই মসজিদে অলঙ্কৃত

ইট ও মীনাকরা ইটের বিবরণও দিয়েছিলেন। ওয়েস্টম্যাকট এখানে যে লিপিটি আবিষ্কার করেছিলেন তাতে জানা যায় যে, উলুখ শের খান কর্তৃক ৯০০ হিজরীর ২০ শাওয়ালে (১৪ জুলাই ১৪৯৫ খ্রীস্টাব্দে) এই মসজিদ নির্মিত।[১৫] রজনীকান্ত চক্রবর্তী এটি খান মোয়াজ্জেম কর্তৃক নির্মিত বলে মনে করেছেন, কিন্তু কোন তথ্য নেই।[১৬]

ইদানীংকালে এই মসজিদ পরিপূর্ণ বিধ্বস্ত। সমস্ত ইট-পাথরও স্থানান্তরিত হয়েছে। কেবলমাত্র উপান (Plinth) দেখা যায় — সামান্য অংশে। বর্গাকার যে ক্ষেত্রটিতে ছোট ইট আজও দেখা যায়— তা ২৪১/২´X২৪১/২´, মাটিতে এটি প্রোথিত। একটি ছোট খিলান ৪´২´´X২´৫´´ কোন মতে তার পূর্বরূপের একমাত্র সাক্ষী।[১৭]

## ফকির তাকিয়া

পুরাতন মালদহের শুঁড়িপাড়ায় 'ফকির তাকিয়া' নামে একটি স্থানে পীর পাক ধেয়ান শাহ ও তাঁর ভ্রাতা বুজুর্গ পীর পালের দুটি সমাধি এবং প্রায় ২০০ গজ দূরে অন্য একটি জনৈক মর্দান আলি শাহের সমাধি দেখা যায়। মুসলিম ফকিরেরা এখানে বিশ্রাম করে পাণ্ডুয়ায় নূর কুতবুল আলমের দরগাহে যাত্রা করেন। রজব মাসে তিন দিন ফকিরেরা এখানে বিশ্রাম করেন বলেই স্থানটির নাম 'ফকির তাকিয়া'। এখানে পান্ডুয়া থেকে সে সময় পীরের ঝান্ডা আসে। পার্শ্ববর্তী অংশে একটি উন্মুক্ত পাকা চত্বর আছে—যেটি একসময়ে নূর কুতবুল আলমের চিল্লাখানা বলে জনশ্রুতি আছে। প্রতিবছর ইদুলফিতরের দিনে এই দুই পীরের সমাধি স্থানে 'ফতিহা উৎসব' পালিত হয় আজও।[১৮]

## পারাদীঘি বা পারাঢালা দীঘি

পুরাতন মালদহের উত্তর দিকে বালিয়া-নবাবগঞ্জ অঞ্চল একসময়ে বর্ধিষ্ণু জনপদ ছিল। এর নিকটেই পারাদীঘি। পুরাতন মালদহ স্টেশন থেকে এটি প্রায় দেড় কিমি পূর্বে অবস্থিত। এই দীঘিকে কেন্দ্র করে একটি কৌতুকপ্রদ জনশ্রুতি আছে বহু গ্রন্থে। তা হচ্ছে এই যে—এক পারদ বিক্রেতা (বণিক) একলক্ষ টাকার পারদ বিক্রয়ের জন্য এই শহরে এলে, তা বিক্রয় না হওয়ায় স্থানীয় অধিবাসীর অর্থকৃচ্ছতার কথা প্রকাশ করলে এক ক্ষুব্ধ ধোপানী বণিকের সমুদয় পারদ ক্রয় করে ওই পুকুরেই ঢেলে দিতে বলে।[১৯] প্রকৃতপক্ষে এটি একটি গল্পই বটে। উজ্জ্বলবর্ণের পারদের ন্যায় স্বচ্ছ এই পুকুরের জল বলে তা 'পারাদীঘি' বলে পরিচিত। জলে সর পড়লে বা ঘোলা হলে $Fe^{+++}$ হয়, তাকে শোধন করার জন্য সামান্য পরিমাণ পারদ (Hg) প্রয়োজন হয়। আবার 'পারাঢালা দীঘি' নাম হলে পুকুরের জলের শোধন-প্রক্রিয়ায় পারদ কোনও এক সময়ে ব্যবহৃত হয়েছিল বলেই এর নাম 'পারাঢালা দীঘি' হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

## চালিশ পাড়ার লেখদ্বয়

পুরাতন মালদহের এইসব পুরাকীর্তি ছাড়া চালিশা পাড়ার লিপিটিও উল্লেখযোগ্য। এখানে আবিদ আলি দুটি লিপির সন্ধান দিয়েছিলেন। তার একটি—জনৈক মজলিস রাহাৎ কর্তৃক একটি মসজিদ নির্মাণের লিপি (১৪৯৪ খ্রীস্টাব্দ) এবং অন্যটি জনৈকা বুয়া মাল্‌তী কর্তৃক জনসাধারণের

পানীয় জলের জন্য একটি চালা-নির্মাণের (সকায়হ্) কথা (১৫৩১-৩২ খ্রীস্টাব্দে) লিপিবদ্ধ।

সম্ভবত এই বুয়া মাল্‌তীই গৌড়ের জান্ জাহানিয়ান মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। লিপিটির বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়—"সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ " বলেন—"যে একটি সৎকাজ করে, তার দশগুণ সে পুরস্কৃত হয়। এই সকায়হ্ (পানীয় জলের গৃহ) সুলতান হোসেন শাহের পুত্র সুলতান নাসির উদ্-দুনিয়া ওয়াদ্‌দীন আবুল মোজাফফ্র নসরৎ শাহের, সময়ে নির্মিত হয়। আল্লাহ্ তাঁর রাজ্য ও শাসন চিরস্থায়ী করুন। এর নির্মাতা হলেন বুয়া মাল্‌তী ৯৩৮ হিজরী সালে (১৫৩১-৩২ খ্রীস্টাব্দ)।"

## পীরাণ-এ পীর বা অখী সিরাজুদ্দিন ওসমানের সমাধি সৌধ

মালদা শহর থেকে সাদুল্লাপুরের পথে সাদুল্লাপুরের প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে বড় সাগরদীঘির উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে এই সমাধি সৌধে দিল্লির বিখ্যাত সাধক নিজামুদ্দিন আউলিয়ার প্রিয় শিষ্য অখী সিরাজের সমাধি নিহিত। পীরাণ-ই-পীর (দরবেশগণের দরবেশ) বা পুরানাপীর (প্রাচীন দরবেশ)-এর সমাধি বলে এটি পরিচিত।[২০] নিজামুদ্দিনের মৃত্যুর পর অখী সিরাজ লখনৌতিতে গমন করেন এবং অধিকাংশ সুলতানেরাই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মূল সৌধটি যে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল, তার মধ্যে কামানাদি দাগার রন্ধ্র বা খাঁজ (Embrasures আকাশ-জননী) ছিল। পূর্ব ও দক্ষিণে ৭ ফুট গভীর ও প্রবেশদ্বারের বিপরীত দিকে অর্থাৎ উত্তরে ৬ ফুট গভীর এই এই খাঁজ।

সমাধির প্রতিষ্ঠা লিপি পাওয়া যায় নি। পূর্বের আবেষ্টনীটিও প্রায় নেই। মূল সমাধি ভবনের পাশেই চারটি প্রস্তর লিপি এখন লাগানো আছে। দুটি কোরাণের আয়াত আছে এবং অন্য দুটির লিপির বামটিতে লেখা আছে —

قد بنى هذا الباب المروضة مخدوم شيخ اخى سراج الدين السلطان المعظم
المكرم علاؤ الدنيا و الدين ابو المظفر حسين شاه السلطان بن سيد اشرف
الحسينى خلد الله ملكه و سلطانه سنة ست عشر و تسعمائة *

অর্থাৎ "ভক্তিভাজন শেখ আখী সিরাজুদ্দিনের এই সমাধি সৌধের দ্বারবর্ত্ম (gate-way) সৈয়দ আশরফ-আল-হুসাইনির পুত্র মহিমার্ণব উদার সুলতান আলাউদ্-দুনিয়া ওয়াদ্দীন আবুল মোযাফ্‌ফর হোসেন শাহ সুলতান কর্তৃক নির্মিত—আল্লাহ তাঁর রাজ্য ও রাজত্ব চিরস্থায়ী করুন। — ৯১৬ হিজরী বর্ষে।" (অর্থাৎ ১৫১০ খ্রীস্টাব্দে)

ডান দিকের লিপিতে আছে—

بنى هذا الباب للروضة بامر السلطان المعظم المكرم سلطان بن السلطان
ناصر الدنيا و الدين ابو المظفر نصرتشاه السلطان بن حسين شاه السلطان
خلد الله ملكه فى سنة احدى و ثلاثين و تسعمائة *

অর্থাৎ "সমাধির এই দ্বারবর্ত্ম হোসেন শাহ সুলতানের পুত্র মহিমার্ণব উদার সুলতান, সুলতানের পুত্র সুলতান নাসির উদ্‌দুনিয়া ওয়াদদ্বীন মোযাফ্‌ফর নসরৎ শাহের নির্দেশে ৯৩১ হিজরী বর্ষে নির্মিত।" (অর্থাৎ ১৫২৪-২৫ খ্রীস্টাব্দ)

সুতরাং ফটক নির্মাণের বা তার পুনর্নির্মাণ বা আবেষ্টনীর দ্বিতীয় কোনও ফটকের কথাও হতে পারে।

মূল সমাধিটি অস্বাভাবিক দীর্ঘ। সমাধি সৌধটি বর্গক্ষেত্রাকার, ইষ্টকনির্মিত, পলেস্তারা (stucco) দ্বারা আবৃত। প্যানেল ও ধারে পুষ্পের নকশা ও অলংকরণের চিহ্ন আছে। বর্তমানে সমাধিভবনের সম্মুখভাগ ছ-হাজারী ওয়াকফ এস্টেটের দ্বারা এমনভাবে আধুনিকীকরণ করা হয়েছে যা পূর্বের স্থাপত্যের পরিপন্থী এবং নন্দনতত্ত্বের বিচারেও মূল্য পায় না।

প্রতি বছর ঈদ-উল-ফিতর ও বকর-ঈদ—এই দুই উৎসবে দূরদূরান্ত থেকে মুসলিম ভক্তেরা এখানে সমবেত হন। ঈদ-উল-ফিতরের দিন পীরের মৃত্যুবার্ষিকী পালন অনুষ্ঠানে পাণ্ডুয়া থেকে মখদুম জাহানিয়া জাহানঘস্ত এবং নূর কুত্‌বুল আলমের পাঞ্জা (হাতের প্রতিচ্ছবি) এই পীরের প্রতি সম্মানের চিহ্নস্বরূপ পাণ্ডুয়া থেকে আনা হয়। সে সময় এক বিরাট মেলাও বসে।

### ঝনঝনিয়া বা জান জাহানিয়ান মসজিদ

পীর জাহানিয়ান জাহানঘস্তের নামে এই মসজিদটি স্থানীয় অধিবাসীদের উচ্চারণে "ঝনঝনিয়া মসজিদে" পরিণত হয়েছে। র‍্যাভেনর্শ ঝনঝনিয়াকে জান জান মিঞার মসজিদ বলে অভিহিত করেছেন।[২১] লক্ষ্মণাবতীর খ্যাতনামা পীর অখী সিরাজউদ্দিনের সমাধির অনতিদূরে এর অবস্থিতি। ক্যানিংহাম একে ফনফনিয়া মসজিদ বা ফনজানিয়া (ফনজান মিঞা) বলেও উল্লেখ করেছেন।[২২] হোসেন শাহের পুত্র গিয়াসউদ্দিন মামুদ শাহের রাজত্বকালে এর প্রতিষ্ঠা হয় (১৫৩৫)। আয়তকার এই মসজিদের আয়তন ৫৬ ফুট X ৪২ ফুট। চার কোণে অষ্টকোণী বুরুজ (কদম রসুলের ন্যায়) বর্তমান। মসজিদটির সম্মুখভাগ মাত্রাতিরিক্ত অলংকৃত এবং নিম্নাভিমুখী তরঙ্গায়িত অগ্নিশিখাতুল্য রেখার কারুকার্য। ছাদের রেখা কিঞ্চিৎ বক্র এবং তিনটি কার্নিস ব্যতীত ভবনের উন্নতি (Elevation) লক্ষণীয় এবং বক্রতার পরিমানে চারভাগে বিভক্ত কারুকার্য। এই অংশগুলিতে টেরাকোটার প্যানেল আছে। এই ঢঙের অলংকরণ কদম রসুলেও লক্ষ্য করা যায়। কোণের বুরুজগুলি ইষ্টক নির্মিত এবং অভিনব, কদম রসুলের বুরুজেরই বৃহৎ সংস্করণ। উল্লেখ্য যে কদম রসুলের (১৫৩১ খ্রী) পরবর্তী সময়ে নির্মিত বলে এই মসজিদে পরিণত চিন্তার পরিচয় মেলে। জান জাহানিয়ান মসজিদে ছয়টি গম্বুজ বর্তমান। তাতে খোদিত পদ্মফুলের অবস্থান। মসজিদে প্রবেশের পূর্বে, উত্তর-দক্ষিণ দিকে তিনটি দ্বার অবস্থিত। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা যায়, তা এই যে পশ্চিম দিকে মেহ্‌রাব ও কিবলা থাকার দরুন সব মসজিদেই (পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ ভিন্ন, কারণ তা মহিলাদের ব্যবহারের জন্য) পশ্চিম দিকে কোন প্রবেশ পথ নেই; মধ্যভাগে প্রস্তর স্তম্ভের দ্বারা বিভক্ত দুটি 'আইল' আছে। পশ্চিম দিকের প্রাচীরে কারুকার্য সমন্বিত তিনটি মেহ্‌রাবও দর্শনীয়।

জাহানিয়ান মসজিদের গম্বুজে মুঘল-স্থাপত্যের প্রভাব অনিবার্যভাবে এসে পড়েছে। তবে গম্বুজটি পরবর্তী পর্যায়ে যুক্তও হতে পারে। কিন্তু এই সম্ভাবনাটি অমূলক। কারণ প্রায় ৩০ বছর

পরে (১৫৬৫) হুমায়ুনের স্ত্রী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হুমায়ুনের সমাধি ভবনেই এই ধরনের গম্বুজ ও বুরুজ মুঘল স্থাপত্যের উষালগ্নে প্রথম পরিলক্ষিত হয়। অতএব দুটি ঘটনা হতে পারে ১. বাংলাদেশ থেকে স্থপতিরা সেখানে যে কোন কারণেই হোক গমন করেছিল এবং তাদের হাতেই এই রূপটি মুঘল স্থাপত্যে প্রথম ধরা দেয়। কিম্বা ২. পরবর্তী পর্যায়ে (যদি গম্বুজটি যুক্ত হয়ে থাকে) কোন স্থপতি সেখানকার অনুকরণ করেছে। তবে দ্বিতীয়টি অনুমান ভিত্তিক—কারণ দু'দুটি ভবনে এই সংযোগ হওয়া স্বাভাবিক নয়—সেখানে অন্য সমস্ত গম্বুজগুলিই (গৌড় তথা পাণ্ডুয়ার) পূর্ব রূপ নিয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে। আরও একটা কারণ—এ যুগের অসংস্কৃত রূপ এখানেও দেখা যায়—সুতরাং মুঘল স্থাপত্যের গম্বুজের পরিমার্জিত রূপের আদিরূপ এখানেই প্রথম রূপ নিয়েছিল।

মসজিদের লিপিতে জানা যায় যে মাল্‌তী নামে এক উচ্চবংশীয়া মহিলা এ মসজিদ নির্মাণ করান। তাঁর পূর্ণ পরিচয় জানা যায় নি।[২৩]

### কাগুারণ

মালদহ জেলার চাঁচল থানার অন্তর্গত সামশী রেল স্টেশনের পাশে এই কাগুারণ।

কাগুারণের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কতিপয় ঢিবি (mound) আজও লক্ষণীয়। অঞ্চলটি কাগুারণ ও বঙ্গপাল মৌজার অন্তর্ভুক্ত। এই দুই মৌজার মধ্যে কাগুারণ, অজগড়া, হুড়হুড়িয়া, ডোমনভিটা, বঙ্গপাল, মধুবনী,কইমারি ও দুধমছি গ্রাম আছে। তা ছাড়া এই অঞ্চলে বীরস্থলী, সঞ্জীব ইত্যাদি গ্রাম-নাম এলাকাটি সুপ্রাচীনত্বেরই চিহ্ন বহন করে। এই বিস্তীর্ণ এলাকার আয়তন প্রায় ১২ কিমি x ১/২ কিমি। এর বহির্ভাগে মহানন্দার গভীর জলখাতের চিহ্ন বর্তমান। কাগুারণের নীচে একসময়ের খালের চিহ্ন আছে—যার নাম গঙ্গাহার। একসময়ে এখানে একটি বর্ধিষ্ণু জনপদ তথা শহর গড়ে উঠে ছিল সন্দেহ নেই। পাল-সেন যুগের বহু পুরাবস্তু এখান থেকে পাওয়া গেছে—যার মধ্যে পোড়ামাটির দাবার ঘুঁটি, মৃৎপাত্র, পাথরের হারের অংশ, অলঙ্কৃত জলপাত্র, একাদশ-দ্বাদশ শতকের বৃহস্পতির মূর্তি, উমা-মহেশ্বর, গণেশ, চীনামাটির পাত্র ও আনুমানিক দশম শতকের উভয়পার্শ্বে গরুড়মূর্তি উল্লেখযোগ্য।[২৪]

### বাগবাড়ি/বল্লালবাড়ি

বাগবাড়ি একটি উল্লেখযোগ্য প্রত্নস্থল। ইংরেজবাজার ও মালদহ শহর থেকে মানিকচকের পথে রাজমহল রোড দিয়ে প্রায় দু-কিলোমিটার দূরে উভয়দিকে প্রায় মাইলখানেক দীর্ঘ আল দিয়ে ঘেরা এই অংশটি। গৌড়ের প্রাচীনতম অঞ্চলগুলির অন্যতম এই বাগবাড়ি অঞ্চল; 'বাগানবাড়ি' থেকে 'বাগবাড়ি'। যে বাঁধটি দিয়ে এটি বেষ্টিত, তার দৈর্ঘ পূর্ব-পশ্চিম থেকে উত্তর-দক্ষিণে বেশি। এই মাটির বাঁধটির উপরভাগের পরিসর প্রায় ১৫০ ফুট ও উচ্চতা প্রায় ২০ ফুট। কথিত আছে যে, পূর্বদিকে রাজা বল্লালসেনের প্রাসাদ ও পশ্চিমের অর্ধাংশে ছিল তাঁর দুর্গ। সে জন্য এটি 'বল্লাল বাড়ি' বলেও কেউ কেউ অভিহিত করেছেন। লাখনোর থেকে দেবকোট পর্যন্ত যে সুউচ্চ রাস্তা বিস্তৃত—তার একটি অংশ দ্বারা এর দক্ষিণ-সীমা গঠিত। মুসলিম ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে—এই রাস্তাটি বখ্‌তিয়ার খিলজী শুরু করেন এবং গিয়াসুদ্দীন ইউয়াজ এর নির্মাণকার্য সমাপ্ত করেন। তবে এটি পূর্ববর্তী পর্বে হিন্দু আমলেও ছিল বলে স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করা যেতে

পারে। জনশ্রুতি আছে যে লক্ষ্মণসেন পূর্ববঙ্গে এর পার্শ্ববর্তী জলপথ দিয়েই পলায়ন করেছিলেন। তবে এ ইতিহাস তথ্য-নির্ভর নয়।[২৫]

বাগবাড়ি অঞ্চলের বিস্তীর্ণ অংশে ইটের টুকরো ও গৃহের ভিত্তিমূল পাওয়া যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই এটি যে একসময়ে বর্ধিষ্ণু জনপদ ছিল—সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই। তা ছাড়া এখান থেকে নানা মূর্তি (হিন্দু ও বৌদ্ধ, তাম্র, ব্রোঞ্জ ও পাথরের) আবিষ্কৃত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। বাগবাড়ির বহির্দেশে কাজলদীঘি নামে একটি দীঘিও আছে। বাগবাড়ি ও বল্লালবাড়ির মধ্যে তমনাদীঘি (তর্পণ দীঘি)[২৬] নামে আরও একটি দীঘি বর্তমান।

## পিছলি

মালদহ শহর থেকে বর্তমান রাজমহল রোড ধরে প্রায় আট মাইল উত্তর-পশ্চিমে ডানদিকে কালিন্দ্রী নদী ও তার পুরাতন খাদের মধ্যবর্তী অংশ পিছলি বলে পরিচিত। পুরাতন কালিন্দ্রীর এই খাদটি বর্তমান অমৃতির নিকট সোনাতলা পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে দু-দিকই আজ শুষ্ক। গঙ্গারামপুর মৌজার পাশে এই পিছলি মৌজা অবস্থিত বলে তাকে সাধারণত 'পিছলি গঙ্গারামপুর'বলে। তবে শুধুমাত্র মৌজাটিই পিছলি অঞ্চল বলে পরিচিত নয়, অনেকে এর সঙ্গে নরহাট্টা অঞ্চল, পীরগঞ্জ অঞ্চল, পুখুরিয়া অঞ্চল এবং আড়াইডাঙ্গা অঞ্চলকেও পিছলির অন্তর্ভুক্ত করেন। জনশ্রুতি আছে যে এ স্থানটি হিন্দু রাজা আদিশূরের রাজধানী ছিল।[২৭] কেউ কেউ কালিন্দ্রীর বিপরীত দিকে উত্তর-পশ্চিমে প্রায় সাড়ে আট কিমি দূরে বিষাণ কোটে (মোর্চা বিষ্ণুপুর) গিয়াসুদ্দীন ইউআজের একটি দুর্গ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করেছেন।[২৮] এ অঞ্চলে বহু ইট, নীল-পীত-সবুজ, সাদা মিনাকরা ইট, ভাঙা মৃৎপাত্র, কালো ব্যাসল্টের স্তম্ভ, হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি ইত্যাদি পাওয়া যায় এখনও। এ অঞ্চলে বালুপুর 'কাঁটাল'-এ একটি টিবি আছে—যেখানে আজও টুকরো টুকরো ইট ও সেরামিকের ভাঙা পাত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এ অঞ্চল থেকে বিষ্ণুমূর্তিও পাওয়া গেছে।[২৯]

## আইহোর মঠের গম্ভীরা ও পুরাতন শিবমন্দির

ইংরেজবাজার শহর থেকে পাকুয়া-নালাগোলার পথে ১৩ কিমি উত্তর-পূর্বে এক সুপ্রাচীন বর্ধিষ্ণু জনপদ আইহো গ্রামে এই দুটি শিবমন্দির আছে। 'মঠের গম্ভীরা' নামে গম্ভীরা পূজো (বর্তমানে) হয় বলে মন্দিরটির নামও মঠের গম্ভীরার শিবমন্দির। প্রায় শতাব্দী-প্রাচীন এই মন্দির ইদানীংকালে হাল-আমলের রূপ নিয়েছে সংস্কার করার ফলে। পূর্বে রেখ দেউলের এই মন্দিরটি সমচতুষ্কোণী (৭´ ৪১/২´´ x ৭´ ৪১/২´´) সম্পূর্ণ গৌড়ী ইটে নির্মিত ছিল। ভিতরে ছিল চারটি শিবলিঙ্গ।

ওই একই মৌজায় আইহো গ্রামে আর একটি শিবমন্দির জীর্ণ দশায় উপনীত। উনিশ শতকের শেষভাগে এটি নির্মিত বলে মনে হয়। বর্গাকার এই মন্দিরটির দৈর্ঘ্য-প্রস্থের পরিমান ১০´ ১০´´ x ১০´ ১০´´। রেখ দেউলের নিদর্শন এই মন্দিরের শীর্ষ পর্যন্ত উচ্চতা ৩৪। মধ্যে চারটি শিবলিঙ্গ আছে—যাদের উচ্চতা ২´ ৫´´। দরজা ৫´ x ২´ ৩´´, বছর চল্লিশ আগে প্রাপ্ত কৃষ্ণবর্ণের ব্যাসল্টের সুন্দর বিষ্ণুমূর্তি রক্ষিত আছে।[৩০]

### দেওতলা/কসবা তাব্রিজাবাদ

ইংরেজবাজার শহর থেকে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বর্তমান সদর শহর বালুরঘাটের পথে অর্থাৎ ইংরেজবাজার শহর থেকে প্রায় ৩৬ কিমি উত্তরে দেওতলা (<দেবতলা)।

পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত পীর শেখ জালালুউদ্দীন তাব্রিজীর চিল্লাখানা বা তাকিয়া বা পীরের ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র (Religious seminary) এই দেওতলায় ছিল। কথিত আছে যে, সারাদেশে শাহ্ জালালের এমন ৩৬০টি স্থায়ী বাসস্থানের অন্যতম এই দেওতলা।

চিল্লাখানাটির ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণের মধ্যে কয়েকটি সমাধি আছে। সম্ভবত এগুলি পীরের খাদেমদের (ভৃত্য) সমাধি। ক্যানিংহাম ১৮৭৯-৮০ সালে এ স্থান পরিভ্রমণের সময় কতিপয় হিন্দুযুগের স্তম্ভ এবং একটি অনন্য সুন্দর বিষ্ণুমূর্তি দেখেছিলেন। কিন্তু আজ আর নেই। প্রবেশদ্বারের উপরে কালো ব্যাসল্টে একটি লিপিতে যে কথা উৎকীর্ণ আছে, তাতে বারবক শাহের রাজত্বে একটি জামি মসজিদের নির্মাণের কথা লিপিবদ্ধ। আরও দুটি লিপি ওয়েস্টম্যাকট আবিষ্কার করেছিলেন—সে দুটিও মসজিদ নির্মাণের কথা।[৩১] একটি হযরত-ই-আলা (সুলাইমান কররানীর) মসজিদ নির্মাণের লিপি এবং অন্যটি হোসেন শাহী বংশের সুলতান নসরৎ শাহ কর্তৃক মসজিদ প্রতিষ্ঠার লিপি। সুতরাং এগুলি যে পরবর্তী পর্যায়ে সংযোজিত তা স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায়।[৩২]

### রানীগঞ্জ/রানীর গড়

গাজোল থেকে বামনগোলা পথে আট কিমি গেলে আদমপুর থেকে দক্ষিণে প্রায় তিন কিমি দূরে রানীগঞ্জ বাজার। রানীগঞ্জ বাজার থেকে কাঁচামাটির পথে এগিয়ে গেলে বামদিকে কাছাকাছি প্রাপ্ত স্থান থেকে মস্তকবিহীন একটি কৃষ্ণপ্রস্তরের শিবের বাহন আছে। এর পাদপীঠ ৬″, পার্শ্বে-১´৪″, উচ্চতা-১´৪″ এবং এর বিস্তৃতি ২´৪″। এই গ্রামটির নাম—বোগলাহাগ্নী। এখান থেকে প্রায় ১/২ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে ধ্বংসপ্রাপ্ত রানীর গড়। গাজোল থেকে পোপড়ার পথ ধরেও আবার রানীগঞ্জে যাওয়া যায়। রানীর গড়ের প্রাইমারী স্কুলের ভিত্তি যে কোনও প্রাচীন ভবনের ভিত্তিমূল তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। এখানে দুটি বেলে পাথরের প্রস্তরস্তম্ভও আছে। আছে প্রাচীরের অংশ।

এ স্থান থেকে টাঙ্গনের (টাঙ্গন নদী) ধারে তিনটি সুবৃহৎ ইটের ভগ্ন স্তম্ভদেশ দেখা যায়, অন্যটি প্রায় বিধ্বস্ত। প্রত্যেকটি স্তম্ভমূলের পরিধি ১৪৫´, প্রথম থেকে চতুর্থ স্তম্ভমূল পর্যন্ত দূরত্ব ২৭৫´। এর পাশেই ২০০ গজের মতো চওড়া নদী, পিছনের বিলটি আজ ‘মাটিকাটা’ বিল নামে পরিচিত। ওপারের গ্রাম ঈশ্বরগঞ্জ। নদীর তীরভূমি থেকে নদীগর্ভে অসংখ্য প্রস্তরখণ্ড ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এটি সম্ভবত কোনও বৃহৎ ভবনেরই স্তম্ভ। সেতু-হাওয়া স্বাভাবিক নয়। পশ্চাদ্ দিকের চিহ্ন না থাকার ফলে অনুমানের উপরই নির্ভর করতে হয়। তবে এই অঞ্চল যে প্রত্নসম্পদে পরিপূর্ণ ও একসময়ে বর্ধিষ্ণু অঞ্চল ছিল তা তার ভগ্নাবশেষ দেখলেই বোঝা যায়।[৩৩]

### জগদলা

ইংরেজবাজার শহর থেকে পাকুয়াহাট ৩২ কিমি পথ। পাকুয়া থেকে উত্তরে ৬ কিমি এগুলে জামতলা, সেখান থেকে প্রায় দু কিমি জগদলা গ্রাম। এই জগদলা গ্রামের সঙ্গে জড়িয়ে

আছে পালবংশের এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। রাজা রামপাল প্রতিষ্ঠিত সুপ্রসিদ্ধ জগদ্দল মহাবিহারের নামটি মনে আসে, যদিওবহু বিশেষজ্ঞ 'জগদ্দলে'র অবস্থান সম্পর্কে নানাবিধ মন্তব্য ও স্থান নিরূপণে আগ্রহী হয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে অবিভক্ত মালদহ ও দিনাজপুর জেলায় 'জগদল', 'জগদলা', 'জগদ্দলা', 'জগদলই' ইত্যাদি নামে বহু স্থান আছে। যেমন অবিভক্ত মালদহ জেলার নাচোল থানার জগদলই, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের রাজসাহী জেলার ধামেরহাট থানায় এবং রানী শঙ্কহল থানায় জগদল নামে একাধিক গ্রাম আছে। তেমনই আছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী থানায় জগদলা, ইটাহার থানার জগদল এবং কালিয়াগঞ্জ থানার জগদল। মালদার এই জগদলা সম্পর্কে অবশ্য দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বী আলোচনাকালে এই স্থানেই জগদ্দলা মহাবিহার অবস্থিত ছিল বলে রায় দিয়েছেন। অর্থাৎ এই মহাবিহার ৮৮° ২৪´ ১২´´ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা ও ২৫°৯´ ৩১´´ উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত বলে তাঁর প্রত্যয়। বর্তমান জগদলা ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানে বাঁধানো রাস্তার চিহ্ন, প্রচুর ইটের টুকরো, বহু পুকুর প্রভৃতির মাধ্যমে এককালে যে এটি বর্ধিষ্ণু জনপদ ছিল তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

বর্তমান জগদলায় একটি প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। বর্তমানে একটি 'রেখ বাংলা' মন্দির আছে—তার বয়সও আনুমানিক দেড়শ বছর। মন্দিরের কোনও প্রতিষ্ঠালিপি নেই। দক্ষিণমুখী এই মন্দিরের কেবলমাত্র — (৫´ ১০´´) দরজার আকারে ইষ্টকবদ্ধ অংশে দেখা যায়। মন্দিরের ভিতরের অংশ বর্গাকার (১২´ X ১২´)। পূর্বে সম্মুখে বারান্দা ছিল এবং তার উপরে গম্বুজাকৃতি ছাদ ছিল, নক্‌শা করা ইটের সামান্য ব্যবহারও দেখা যায়। মন্দিরটির উচ্চতা প্রায় ২৪´। শীর্ষবিন্দুতে গিয়ে মিশেছে। বহিরঙ্গে একে একচালা মন্দির বলে মনে হয়। অন্তঃপ্রদেশের শীর্ষকোণে একটু শঙ্কু বা মোচার খোলের ন্যায় আকৃতি তৈরী করেছে। সামান্য চুন-সুরকির কাজ থাকলেও তা তত উল্লেখ্য নয়। ২৪´ ফুটের পর মন্দিরের চূড়া পর্যন্ত প্রায় ২৪ ফুট উচ্চ, তারপর পাঁচটি পদ্মফুলের খাঁজ সৃষ্টি করেছে। ভিতরে গৌরীপট্টসহ শিবলিঙ্গ আছে। একটি পাথরের বৃষ পূর্বে ছিল; এখন নেই।[৩৫]

## মদনাবতী

ইংরেজবাজার শহর থেকে নালাগোলা ৪৫ কিমি। ব্রাহ্মণী নদী পার হয়ে প্রায় তিন কিমি উত্তরে মদনাবতী (মদন বাটি)। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে আজও যেসব বিদেশীদের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়, তাদের মধ্যে গদ্য সাহিত্যের প্রথম যুগের অন্যতম স্থপতি উইলিয়াম কেরী এই মদনাবতীতে মিষ্টার উডনির নীলকুঠির তত্ত্বাবধায়করূপে যোগ দেন ১৫জুন, ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। এখানে কেরী ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত ছিলেন। কিন্তু কুঠি উঠে যাওয়ায় তিনি শ্রীরামপুরে যান এবং ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যোগ দেন।

মদনাবতীতে কেরীর এই নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ আজও দেখা যায়। মেঘডম্বুর দীঘির পাশেই এই কুঠির ধ্বংসাবশেষ আছে। মদনাবতীতে থাকাকালীন তিনি বরিন্দের কথ্যভাষা সংকলন করেছিলেন, রচনা করেছিলেন বাংলা ব্যাকরণ ছাড়া মহাভারতের কিছু অংশ অনুবাদ ও বাংলা অভিধান। এখানে উডনীর উপহার একটি মুদ্রাযন্ত্রও এনেছিলেন, কিন্তু ছাপা শুরু করতে পারেন নি। মদনাবতীতে থাকার সময় তিনি যোশুয়া হতে যব পর্যন্ত ঐতিহাসিক গ্রন্থ ছাড়া বাইবেলের এব

বৃহৎ অংশ অনুবাদও করেছিলেন। এই ভগ্ন নীলকুঠির পুরাতাত্ত্বিক অপেক্ষা ঐতিহাসিক গুরুত্ব অধিক সন্দেহ নেই।[৩৬]

## শিবডাঙ্গির শিবমন্দির

বামে মদনাবতী এবং রাস্তার ডানদিকে প্রায় দু-কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে শিবডাঙ্গি। কমপক্ষে দু-শত বছরের প্রাচীন এ মন্দির।

জরাজীর্ণ এই মন্দিরটি ভূমিপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৬ ফুট উচ্চে অবস্থিত। পূর্বে পাথরের সিঁড়ি ও প্রাচীরের বেষ্টনী ছিল। বৃহৎ বটবৃক্ষ মন্দিরটিকে বেষ্টন করে আছে। অন্তঃপ্রকোষ্ঠ বর্গাকার—১১´ ৭´´ X ১১´ ৭´´। মস্তকশীর্ষে প্রস্ফুটিত পদ্ম, দেওয়াল ৩´ ৯´´ চওড়া। মন্দিরের ভিতরের চার কোণে প্রদীপ জ্বালানোর জন্য যে আলম্ব ছিল—তার চিহ্ন স্পষ্ট। চতুষ্কোণে পঙ্খের (চুন সুরকির) ভুট্টার 'মোটিফ' আছে। মন্দিরে দুটি খিলানের দরজা। একটি পূর্ব দিকে আছে— অন্যটি দক্ষিণে। পূর্বদিকের প্রবেশপথ ৩´ ৯´´ এবং খিলানের শীর্ষ পর্যন্ত ৭´ ১১´´। দক্ষিণের প্রবেশ পথ অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ ৩´ ২´´ এবং খিলান শীর্ষ পর্যন্ত ৭´ ২´´। ইটের রূপ ও পঙ্খের কাজে অষ্টাদশ শতকের প্রভাব আছে। মন্দিরের শীর্ষ মেঝে থেকে ১৮´ ২´´। শিবলিঙ্গটির ব্যাস ৪´ ৯´´, গৌরীপট্টের পরিধি ৫´ ১´´ (Spout বাদে); গৌরীপট্টের প্রস্থ ৯´´ ১/২। দুদিকে প্রবেশদ্বারের দুদিকে দুটি ছোট কুলুঙ্গী ও উত্তর এবং পশ্চিম দুটি কুলুঙ্গী আছে। spout-এর মুখ থেকে উত্তরের মন্দির গাত্রের ছিদ্র (যার মাধ্যমে জল নির্গত হয়) তা আসলে একটি বেলে পাথরের দরজার বাজু —যা পরবর্তীকালে যোজনা বলেই মনে হয়। এটি শিবমন্দিরের বাইরের বারান্দা (মন্দির সমেত) বর্গাকার (৪৪´ X ৪৪´)। এই রত্নমন্দিরটি বর্গাকার ২০´ X ২০´। শিবরাত্রি উপলক্ষে এখানে পূজো হয় এবং একটি মেলাও বসে।[৩৭] ইদানীং কালে সংস্কারের ফলে তার নান্দনিক রূপের ঊণতা দেখা যায়।

## কলিগ্রামের জিন্দাপীরের সমাধি

ইংরেজবাজার শহর থেকে চাঁচল হয়ে কলিগ্রাম (কালীগ্রাম) ৬৮ ১/২ কিমি উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। কলিগ্রামে প্রবেশের পথে বর্তমান হাইস্কুলের বিপরীত দিকে এই জিন্দাপীরের সমাধি। জীবন্ত সমাধিস্থ হয়েছিলেন যে সূর্য খাঁ বা সূরয খাঁ, তাঁরই সমাধির উপরে প্রায় শতাব্দী প্রাচীন এই সমাধিভবন।

এখানে কোনও প্রতিষ্ঠা লিপি নেই, তবে এই পীরের অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে। দোচালা রীতিতে এই সমাধি ভবনটির বহিরঙ্গের আয়তন ২০´ ৫´´ X ১৪´ ১´´। ভিতরের আয়তকার ক্ষেত্রের পরিমাপ ১৮´ ৩´´ X ১১´ ১১´´। দেওয়াল ২´ ২´ চওড়া। চতুষ্পার্শে বারান্দা আছে। দরজার উপরিভাগে চালার বক্রাংশের মধ্যভাগ বারান্দা থেকে ৮´ ৪´´ এবং উত্তর-দক্ষিণে দুটি চালার মিলন স্থল ভূমিতল থেকে ১০´ ৬´´। পূর্বমুখী দরজাটি ৪´ ১০´´ X ৩´ ৪´´। ভবনটির মস্তকে চুন-সুরকির একটি প্রস্ফুটিত পদ্মকোরক। কক্ষের মধ্যভাগে সমাধি। এই সমাধি ভবনের পার্শ্ববর্তী কতিপয় সমাধি আছে। সেগুলি পীরের খাদেমদের বলেই কথিত। মহরমের সময় এখানে বহু ভক্তজনের সমাবেশ ঘটে এবং একটি মেলাও বসে—যা জিন্দাপীরের মেলা বলে পরিচিত।

### কলিগ্রামের শিবমন্দির

জিন্দাপীরের সমাধির উত্তরদিকে কলিগ্রাম হাইস্কুলের পিছনে, আবার পাঠাগারের পিছন দিয়ে কিছু দূরে উত্তরে গেলেই রানীদীঘির পাশে এই শিবমন্দির। বিহারের পূর্ণিয়া জেলায় সাউরিয়ার রানী ইন্দ্রাবতী ব্রত উদ্‌যাপন করে যে দ্বাদশটি দীর্ঘিকা নির্মাণ করেন, এই দীঘি তার অন্যতম। শিবমন্দিরটিরও নির্মাতা তিনি। তবে কোন প্রতিষ্ঠা লিপি নেই। অষ্টভুজের এই দেউলটির প্রতি বাহুর মাপ ৯´ ১১´´, কিন্তু ভিতরের মাপ ৭´ ১´´, মন্দিরের ভিতরের গম্বুজটি গোলাকার, বাইরের প্রতি বাহুতে দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে দুটি কুলুঙ্গী। দেউলটির শিখরদেশে পলেস্তারা, কৌণিক অংশে খাঁজকাটা। কার্নিস পর্যন্ত অর্থাৎ গম্বুজের ভূমির অবস্থান পর্যন্ত প্রায় ২০´। প্রায় ১ ফুট প্রলম্বিত কার্নিস। এই কার্নিসের উপর থেকে অষ্টকোণী শিখরটি প্রায় ২০ ফুট উর্ধ্বে ধাবমান। এর শীর্ষে মঙ্গল-কলসের সঙ্গে শৃঙ্খলযুক্ত ত্রিশূল প্রোথিত। প্রবেশদ্বারের উপরে চুন-সুরকির গণেশমূর্তি আছে।[৩৮]

### মোরগ্রাম-মাধাইপুর

ইংরেজবাজার শহর থেকে প্রায় ৬ কিমি উত্তর-পূর্বে মহানন্দা নদীর পূর্বপারে মোরগ্রাম-মাধাইপুর গ্রাম। কথিত আছে যে মাধাইপুর গ্রামে একটি সুপ্রাচীন কালীমন্দির ছিল। জনশ্রুতি আছে যে; সেনবংশের রাজা বল্লালসেন তাঁর রাজধানীর চারিদিকে যে চারটি দ্বার-অধিষ্ঠাত্রী দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—তার অন্যতম ছিলেন এই মাধাইচণ্ডী। কথিত আছে যে, শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামীর মাতুলালয় এই মাধাইপুর।

প্রাচীন মন্দির বা সৌধ এখানে নেই, কেবল একটি আধুনিককালের মন্দির সেই প্রাচীন স্মৃতি বহন করে। বেশ কিছু মূর্তি এখানে পাওয়া গিয়েছে। প্রাচীনকালে সংস্কৃতচর্চার এটি একটি পীঠস্থান ছিল।

মন্দিরের ভিতরে বেদীর উপরে উঁচু ঢিবি আছে—যার উপরে কতিপয় মুখোশ দেখা যায়। প্রাঙ্গণে মূর্তির বহু টুকরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মন্দিরের বিপরীত দিকে লৌকিক দেবতারও স্থান — সেগুলির নাম ঝাপড়ী মা, বুড়ি মা, জহুরা মা ইত্যাদি। বেশ কিছু মূর্তি বিশেষ করে মহীপালদেবের রাজত্বের একটি বুদ্ধমূর্তির (পাদদেশে উৎকীর্ণ লেখসহ) এখান থেকে সংগৃহীত হয়ে মালদহ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে।[৩৯]

### টাঁড়া/টাণ্ডা/তাংরা/তান্‌না/তাণ্ডা

গৌড় ঐশ্বর্যহীন হওয়ায় টাঁড়া বা টাণ্ডা (তাণ্ডা) বাংলার রাজধানী হয়। আফগান নৃপতি সুলাইমান শাহ্ কররানী হিজরী ৯৭২ অর্থাৎ ১৫৬৪ খ্রীস্টাব্দে প্রথম টাঁড়ায় রাজধানী স্থাপন করেন। শের শাহের সেনাপতি খাওয়াস খাঁর নামানুসারে কেউ কেউ খাওয়াসপুর তাণ্ডাও নাম দেন।[৪০] গৌড়ের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত সমৃদ্ধশালী নগরী না হলেও মুঘল শাসকদের দ্বারা সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত টাঁড়া মুঘল সুবাদারদের প্রিয় বাসভূমি ছিল। ঔরঙ্গজেবের সেনাপতি মীরজুমলার দ্বারা বিতাড়িত বিদ্রোহী শাহ্ সুজা রাজমহল থেকে টাঁড়ায় এসে একে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু ঐ বছরের ১৫ই এপ্রিল মীরজুমলার দ্বারা পরিপূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে সুজা সপরিবারে প্রথমে ঢাকা যান এবং পরে যান আরাকানে। পরবর্তী পর্যায়ের ইতিহাসে টাঁড়ার বিশেষ কোনও উল্লেখ নেই।

টাঁড়ার অবস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন মত পোষণ করেন লেখকেরা। হ্যামিলটনের মতে গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ দক্ষিণ-পশ্চিমে কালিয়াচক থানায় এটি।[৪১] মেজর রেনেল জানিয়েছেন যে, এটি রাজমহলের রাস্তার পাশেই অবস্থিত—যা গৌড়ের গঙ্গার পাশে না হয়ে বেশ কিছুটা উপরেই হবে। আবার র‍্যালফ্ ফিচ্ (১৫৮৬ খ্রী) বলেছেন, গঙ্গা থেকে এক লিগ্ অর্থাৎ প্রায় ৩১/২ মাইল দূরে অবস্থিত।[৪২] সুতরাং টাঁড়া যে গঙ্গাগর্ভে বিলীন তা বোধ হয় অস্বীকার করে লাভ নেই। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের বন্যায় তা নষ্ট হয় এবং ভাগীরথীর খাদ বদলে তার অস্তিত্বও পরিপূর্ণ লুপ্ত হয়।[৪৩]

## ওয়ারী-হোসেনপুর

হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত 'রত্নগড়' এ যে ইটের গাঁথুনিযুক্ত ভগ্নাবশেষ মেলে তাতে বিশেষজ্ঞদের মতে এটি দশম-একাদশ শতকের একটি বৌদ্ধবিহারের ৯টি কক্ষের ধ্বংসাবশেষ বিশেষ। এখান থেকে একটি অষ্টভুজা সরস্বতী মূর্তিও আবিস্কৃত হয়েছে। এখানকার একটি শিলালেখে 'শ্রীমহেন্দ্র' নামে জনৈক ব্যক্তির মন্দির নির্মাণের কথাও আছে। কেউ কেউ এটি প্রথমে বৌদ্ধবিহার এবং পরবর্তী পর্বে এটি হিন্দুমন্দির হিসাবে ব্যবহৃত হয় বলে অনুমান করেছেন।[৪৪]

ওয়ারী-হোসেনপুরের রত্নগড় এর ভূমি-নকশা

## ● পাদটীকা

১. Hunter W.W. - A Statistical Account of Bengal, Vol- VII, P-49
২. Abul Fazl Allami - The A-in-i-Akbari (Tr. Jareett, Corrected and annotated - Sir Jadunath Sarkar, Vol.-II, P-147
৩. Abid Ali Khan, Op. Cit., P-147, রজনীকান্ত চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত পৃ-৩৩৩
৪. Tarikh-i-Sher Shahi – Abbas Khan Sarwani (Eliott), Chapter IV, P-372
৫. Abid Ali Khan, Op. Cit., P-146-47
৬. Op. Cit., P-152
৭. Op. Cit., P-140
৮. Ravenshaw, Gour, its Ruins and Inscription, P-42
৯. Abid Ali Khan, Op. Cit., P-154
১০. Dani Ahmad Hasan, Op. Cit., P-173
১১. Ravenshaw, Op. Cit., P-41
১২. Dani, Op. Cit., P-173
১৩. Abid Ali Khan, Op. Cit., P-147
১৪. Op. Cit., P-148
১৫. Syed Mahmudul Hasan, Gaud and Hazrat Pandua, P-291
১৬. রজনীকান্ত চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৩৩
১৭. প্রদ্যোত ঘোষ, তদেব, পৃ-৯৫
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ- ৯৫-৯৬
১৯. রজনীকান্ত চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৩১, Abid Ali Khan, Op Cit P-154
২০. Ravenshaw, Gour, P-6

২১. Abid Ali Khan, Op. Cit., P-92
২২. Cunnigham, Op. Cit., P-89
২৩. প্রদ্যোত ঘোষ, গৌড়বঙ্গের স্থাপত্য, পৃ- ৩৭-৩৮
২৪. প্রদ্যোত ঘোষ, মালদহ জেলার পুরাকীর্তি, পৃ-১০৯
২৫. Abid Ali Khan, Op. Cit., P-162
২৬. Stapleton H.E. in Op. Cit., P-162
২৭. Abid Ali Khan, Op. Cit., P-163
২৮. Op. Cit., P-163
২৯. প্রদ্যোত ঘোষ, মালদহ জেলার পুরাকীর্তি, পৃ- ৯৭-৯৮
৩০. প্রাগুক্ত, পৃ-৯৮
৩১. Abid Ali Khan, Op. Cit , P-169
৩২. Op. Cit., P-170
৩৩. প্রদ্যোত ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ-১০০
৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ-১০০-১০১
৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ-১০১-১০২
৩৬. তদেব, পৃ-১০২
৩৭. তদেব, পৃ-১০২-১০৩
৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ- ১০৩ - ১০৪
৩৯. Abid Ali Khan, Op. Cit., P-166
৪০. Abid Ali Khan, Op. Cit., P-166
৪১. Buchanan Francis (Hamilton) – Account of the District of Purnea in 1809-10, P-9-10
৪২. Ralph Fitch, Purchas, Vol. - V
৪৩. প্রদ্যোত ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ-১০৫
৪৪. প্রাগুক্ত, সংযোজন অংশ, পৃ- ১৩৮-১৪০

## মালদহ জেলার আরো কতিপয় প্রত্নস্থল ও দর্শনীয় স্থান

### কালাপাহাড়ের গড় / ঝাঁঝরা কুঠি / নীলকুঠি, পাতালচণ্ডী

ইংরেজবাজার শহর থেকে গৌড় স্টেশনের অদূরে গুয়ামালতী এলাকায় পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত একটি স্থান 'কালাপাহাড়ের গড়' নামে পরিচিত। কিম্বদন্তী আছে যে, এ অঞ্চলটি সুলাইমান কররানীর বিখ্যাত সেনাপতি কালাপাহাড়ের বাস ছিল।

এই অঞ্চলেই এক পুষ্করিণীর ধারে জরাজীর্ণ এক কুঠি 'ঝাঁঝরা কুঠি' নামে পরিচিত। এরই পশ্চাতে এল্লার্টন সাহেবের নীলকুঠি ছিল। এখন তার ভিত্তি মূলটি কেবলমাত্র দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে এল্লার্টন কতিপয় ধর্মীয় পুস্তকের অনুবাদক ছিলেন এবং ইউরোপীয় ধাঁচে স্থানীয় চাষী ও কৃষক সন্তানদের শিক্ষার জন্য এ জেলার প্রথম বিদ্যালয়ের স্থাপয়িতা।

এ অঞ্চলের প্রায় দু কিমি দক্ষিণ পূর্বে 'পাতাল চণ্ডী' বলে সুপরিচিত স্থান। জনশ্রুতি আছে যে অতীতে এখানে 'পাট্‌লা চণ্ডী' বা 'পাতাল চণ্ডী'র মন্দির ছিল। একটি ভগ্ন প্রস্তর খণ্ড আজ 'পাতাল চণ্ডী' হিসাবে পূজিত। বিগ্রহ যাই হোক না কেন, এটি যে মন্দিরের উপান নয়, তা নিশ্চিত। প্রাচীন ভাগীরথীর মরা খাদের বাঁকে এর উপান বৃত্তাকার। তার পরিধি ১৭০। নদীপৃষ্ঠ থেকে 'র‍্যানডম র‍্যাবল'-এর উপান প্রায় ৩১ ফুট উচ্চ। এর উপরে মিনার বা স্তম্ভজাতীয় স্থাপত্য ছিল সন্দেহ নেই। সম্ভবতঃ এটি প্রহরাস্তম্ভ ছিল। নদীপথে জলযান নোঙর করার জন্য বৃহৎ লৌহ বলয়ের ২/১টি আজও চোখে পড়ে। ইদানীং কালে প্রতি বছর চৈত্র মাসের রামনবমী উপলক্ষে একটি মেলা হয় এবং কালীপূজার সময়ে সাড়ম্বরে পূজা হয়ে চলেছে।[১]

### সাদুল্লাপুরের মহাশ্মশান, শিবমন্দির, জঙ্গলীটোটা, বড় সাগর দীঘি বা বড় দীঘি, গৌড়েশ্বরী / দ্বারবাসিনীর স্থান

ইংরেজবাজার শহর থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে ৮ কিমি দূরে ভাগীরথীর প্রাচীন খাদের তীরে এই বহু শতাব্দী প্রাচীন মহাশ্মশান মুসলিম যুগেও মান্যতা পেয়েছে। পৌষ পূর্ণিমায় আজও একটি গঙ্গাস্নানের মেলা বসে। এই এলাকায় উত্তর দিকে একটি রেখ-দিউলের নিদর্শন সমন্বিত শিবমন্দির "বাচামারী নিবাসী দাসানুদাস শ্রীরঘুনাথ দাস কর্তৃক ১২৫৫ বঙ্গাব্দে (১৮৪৮ খ্রীঃ) প্রতিষ্ঠিত।"[২]

সাদুল্লাপুর থেকে প্রায় আড়াই কিমি পশ্চিমে রথবাড়ী গ্রামে 'জঙ্গলীটোটা' চৈতন্যোত্তর পর্বে এক কাহিনী এবং জঙ্গলীর বিভিন্ন কীর্তিকলাপ এই 'জঙ্গলীটোটা'কে কেন্দ্র করে প্রচারিত। শূদ্র নন্দরাম ও ব্রাহ্মণ যজ্ঞেশ্বর অদ্বৈত আচার্যের পত্নী সীতাদেবীর দ্বারা দীক্ষিত হন। ব্রজগোপীর ভাবানুযায়ী তাঁরা পুরুষভাব ত্যাগ করে শাড়ি-অলংকারাদি পরিধান করেন।[৩] এমন কি তাঁদের অঙ্গ মধ্যে নারীচিহ্ন দেখা গেলে তাঁরা 'নন্দিনী' ও 'জঙ্গলী' নামে পরিচিত হন। পরবর্তীকালে সীতা দেবীর নির্দেশে জঙ্গলী এখানে বাস করেন বলে এটি জঙ্গলীটোটা ('টোটা'র অর্থ উদ্যান) বলে অভিহিত। কথিত আছে যে তাঁর দৈবী ক্ষমতা দেখে গৌড়-বাদশাহ তাঁর জন্য এই 'টোটা' নির্মাণ করে দেন। বাদশাহ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে জঙ্গল দানও করেন।[৪] আবার 'প্রেমবিলাস' মতে গৌড়েশ্বর তাঁর মধ্যে নারী ও পুরুষ — উভয়ের পরিচয় পেয়ে মাতৃ সম্ভাষণ করে তাঁর জন্য একটি পুরী নির্মাণ করে দেন এবং তখন থেকেই এ স্থান — "জঙ্গলীটোটা বলে খ্যাত।[৫]

এখানে আজও যাঁরা আছেন তাঁদের নারী-নাম ও নারী-বেশ। যেমন সত্যপ্রিয়া ঠাকুরাণী, নিকুঞ্জপ্রিয়া ঠাকুরাণী, নলিনীপ্রিয়া ঠাকুরাণী ইত্যাদি। পূর্বে 'তুলসীর বিয়ে' অর্থাৎ তুলসীর সঙ্গে তাঁদের বিবাহ হতো। আজও প্রতিবছর বৈশাখ সংক্রান্তিতে এখানে 'তুলসী বিয়ের মেলা' ও ঘোড় দৌড়ের মেলা অনুষ্ঠিত হয়।[৬]

সাদুল্লাপুরের আগেই বড় সাগর দীঘি নামক এক বিশাল দীঘি খনন রাজা লক্ষ্মণ সেনের আমলে শুরু হয় বলে জনশ্রুতি আছে। মেজর ফ্যাঙ্কলিন এই 'সাগর' বা 'বড় দীঘি' উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এসে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছিলেন।[৭]

বর্তমান মালদা শহর থেকে পশ্চিম দিকে বাগবাড়ী হয়ে সাদুল্লাপুরের রাস্তায় প্রায় ৮ কিমি দূরে চণ্ডীপুর গ্রামে একটি মুসলিম যুগের ভগ্ন ফটক বর্তমান। ফটকটি গৌড়ের দাখিল দরওয়াজাকেই মনে করায়। সম্ভবত দুটি ভল্টের দ্বারা পার্শ্ববর্তী দুটি প্রবেশদ্বার আচ্ছাদিত ছিল। এখানে অষ্টকোনী স্তম্ভ ইটের ভিত্তিমূলে থেকে ৮' পর্যন্ত প্রস্তরখণ্ড স্থাপিত তারপর চারটি বন্ধ। বন্ধগুলির মধ্যবর্তী পরিসর ৩' ৬''। প্রতি কোন ১' ১০'' ছিল। বহুযুগ ধরে এটিই দ্বারবাসিনী চণ্ডীর স্থান বলে পূজা হয়। সম্ভবতঃ এর সংলগ্ন কোন স্থানে হয়ত কোন পূর্ব যুগের মন্দির ছিল। হিন্দু যুগে গৌড়ের পশ্চিমদ্বারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী গৌড়েশ্বরীর কথা জানা যায়। হ্যামিলটন গৌড়েশ্বরীর স্থানকেই পুণ্যপ্রদা দ্বারবাসিনী বলে আখ্যা দিয়েছেন। ক্যানিংহ্যাম দ্বারবাসিনী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ১৮৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দে কমলাবাড়ীতে দেখেছিলেন।[৮] হয়ত এ অঞ্চলটি কমলাবাড়ীরই অন্তর্গত ছিল।

## ● পাদটীকা

১. প্রদ্যোত ঘোষ — মালদহ জেলার পুরাকীর্তি, পৃঃ ৫৪-৫৫
২. তদেব, পৃঃ ৫৬
৩. লোকনাথ দাস — অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি — সীতা চরিত্র, পৃঃ ১২-১৫, ১৯-২৭
৪. বিষ্ণুদাস আচার্য — হৃষীকেশ বেদান্তশাস্ত্রী (সম্পা) - সীতা গুণকদম্ব, পৃঃ ৯৬ - ১০৪
৫. নিত্যানন্দ দাস — রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ — প্রেমবিলাস, পৃঃ ২৩৯
৬. প্রদ্যোত ঘোষ — প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭
৭. William Francklin's Journal (1810-11)
৮. প্রদ্যোত ঘোষ — প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৮

# জগজ্জীবনপুর বৌদ্ধ বিহার

মালদা জেলার পূর্বদিকে হবিবপুর থানার অন্তর্গত জগজ্জীবনপুরের তুলাভিটা নামক স্থানে একটি তাম্রশাসন আবিষ্কারের (১৯৮৭ সালের ১৩ই মার্চ) ফলে পাল রাজগণের বংশলতিকাতেও এত দিন অপ্রাপ্ত নূতন যে রাজার নাম পাওয়া যায় তাঁর নাম মহেন্দ্রপাল। গুর্জর প্রতিহার বংশের এক মহেন্দ্রপালের নাম অবশ্য ইতিপূর্বেই ইতিহাসে মেলে। কিন্তু এই অভিলেখে উল্লেখ আছে যে দেবপালের ঔরসে তাঁর ধর্মপত্নী মাহটার গর্ভে মহেন্দ্রপালের জন্ম হয় (১১-১২ শ্লোক)। সুতরাং দেবপাল অপুত্রক ছিলেন এই ধারণা পরিত্যাগ করা যায়। তবে তাম্রশাসনে তাঁর দোর্দণ্ড প্রতাপ ও বিরাট অঞ্চল অধিকার ইত্যাদির দাবী সমকালের অন্যান্য প্রান্তের লেখমালার সাক্ষ্যে সমর্থিত হয় নি।[১] তাম্রপট্টটির ওজন ১১ কেজি ৮০০ গ্রাম এবং দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ৫২ সেমি x ৩৭.৫ সেমি। 'সিদ্ধমাতৃকা' লিপিতে লিখিত এই তাম্রপট্টটিতে পাল বংশের রাজা মহেন্দ্রপালদেব কর্তৃক তাঁর সেনাপতি বজ্রদেবের অনুরোধে বৌদ্ধ দেব দেবীদের পূজা ও ভিক্ষু-উপাসনার জন্য নন্দদীর্ঘিকা উদ্রঙ্গ-মহাবিহার-এর পার্শ্ববর্তী জমি দানের কথা লিখিত। রচনাকার ও ভাস্কর যথাক্রমে ব্রজেন্দ্র ও সামন্ত শ্রীমাহট। পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত কুদ্দালখাতক বিষয় থেকে এই দলিল মহারাজাধিরাজ মহেন্দ্রপাল হস্তান্তর করেন। এই তাম্রপট্টের বিকশিত পদ্মপুষ্পের কেন্দ্রে পালবংশের রাজকীয় প্রতীক বা মোহর সংযুক্ত, সিলমোহরের মধ্যভাগে 'ধর্মচক্র', উভয়পার্শ্বে দুটি হরিণের চিত্র এবং নিম্নভাগে 'শ্রীমহেন্দ্রপালদেবঃ' খোদিত। চতুস্ত্রিংশ স্তবক সমন্বিত এ তাম্রশাসন। 'সিদ্ধম্ ওঁ স্বস্তি' শব্দ দুটি প্রথমে খোদিত। প্রথম স্তবকে ভগবান বুদ্ধের বন্দনা, দ্বিতীয় থেকে ষোড়শ স্তবকে পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালদেব থেকে সুরু করে মহেন্দ্রপালদেবের বংশ পরিচয়। তারপর ভূমিদান বিষয়ক বিস্তারিত বিবরণ এবং সর্বশেষে দলিল হস্তান্তরের কথা লিপিবদ্ধ।
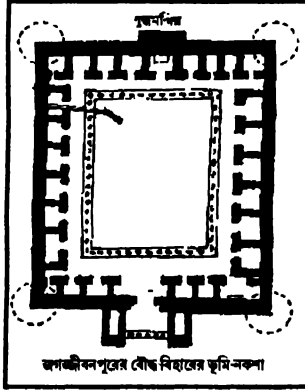
জগজ্জীবনপুরের বৌদ্ধ বিহারের ভূমি-নকশা

১৯৯০ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয়ের প্রচেষ্টায় রাজ্য সরকার এটিকে সংরক্ষিত প্রত্নস্থল হিসেবে ঘোষণা করে এবং ১৯৯২ সাল থেকে মাঝে মাঝে এর খনন কার্য চলেছে।

জগজ্জীবনপুর মৌজায় এ পর্যন্ত যে পাঁচটি প্রত্নস্থলকে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেগুলি হল — ১. তুলাভিটা, ২. আখরীডাঙ্গা, ৩. নিমডাঙ্গা, ৪. মাইভিটা, ৫. নন্দগড়। এগুলির মধ্যে তুলাভিটাই সর্ববৃহৎ।

তুলাভিটার মধ্যভাগে যে উৎখনন হয়েছে তাতে 'বিহারের' বেশ কিছু অংশ দেখা যায়। সেখানে দেওয়ালই নয়, বারান্দা, সিঁড়ি ইত্যাদিও দেখা যায়। পাথরের ব্যবহার দেখা যায় নি। বিভিন্ন মাপের ইটের ব্যবহার (৩২ x ১৮ x ৬ সেমি), (২৮ x ২৬ x ৫ সেমি), (২৮ x ১৫ x ৬ সেমি), (২৩ x ১৭ x ৮ সেমি) এবং (১৭ x ৬ x ৫ সেমি)। বর্গাকার বিহার-নকশা দেখা যায়। উন্মুক্ত আঙ্গিনাটি ভাঙ্গা ইটের টুকরো গুঁড়ো করে পিটিয়ে তৈরী। এই অঙ্গনটির চতুষ্পার্শ্বে বারান্দা সংলগ্ন ১.৭০ মিটার পরিসর যুক্ত পোড়ামাটির টালি বিস্তৃত পথ।

তুলাভিটার দক্ষিণপূর্ব ক্ষেত্রে চারটি খাদে দুটি ইটের প্রকোষ্ঠ। এগুলি ভিক্ষুকদের বাসস্থান হিসেবে নির্দিষ্ট ছিল। প্রথম পর্যায়ে দুটি প্রকোষ্ঠের মধ্যে যাতায়াতের দরজা ছিল বটে, কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে তা বন্ধ দেখা যায়।

উৎখননে মোট চারটি মাটির স্তর (২.৭০) এ পর্যন্ত চিহ্নিত করা যায়। নীচের দুটি স্তর (Layer 3 & 4) পলিমাটির এবং উপরে দুটি (Layer 1 & 2)। খোলা দরজা ইট দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে গঠনশৈলীর পরিবর্তনে অনুমিত হয়েছে যে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বা পুনরাশঙ্কায় এই উচ্চতা বৃদ্ধি।

তুলাভিটার উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি বিরাট ইটের স্তূপও স্পষ্ট হয়েছে। এর পরিধি ১৯.৬৩ মিটার। এটি গোলাকার বুরুজ বা বুরুজ-প্রকোষ্ঠ।

এখানে অনেকগুলি পোড়ামাটির সিলমোহর পাওয়া যায়, তবে একটি ব্যতীত সবই ভগ্ন। দশম শতাব্দীর সংস্কৃত ভাষায় এ সিলমোহরের প্রথম পংক্তিটিতে "শ্রীব্রজদেব কারিত নন্দদীর্ঘী বিহারীয় আর্য্য ভিক্ষু সংঘ (স্য)" খোদিত। দ্বিতীয় পংক্তিটির পাঠোদ্ধার হয় নি, উপরের মধ্যভাগে ধর্মচক্র ও উভয়পাশে একটি করে হরিণ আছে। এই সিলমোহরগুলি বিহারের 'পরিচয় পত্র' (monastic seal) বা identity token, তবে 'নন্দদীর্ঘী' শব্দটি ব্যবহারে অর্থাৎ জলাশয়ের নামে বৌদ্ধবিহার চিহ্নিত হওয়ার নিদর্শন এখনো পর্যন্ত মেলে নি। নন্দদীঘি নামে একটি পুকুর আজও সেখানে বর্তমান। 'বজ্রদেব' নামাঙ্কিত আর একটি সিলমোহর (personal seal) পাওয়া গেছে। এটি সম্ভবতঃ জনৈক বৌদ্ধভিক্ষুর।

উৎখননের ফলে বহু নকশাযুক্ত ইটেরও সন্ধান মিলেছে। সে সব নকশার মধ্যে ২৮ x ২৩ x ৮ / ৩২ x ২৪ x ৬ সেমি করে লতাপাতা, নানাবিধ জ্যামিতিক নকশা, পদ্ম-পাপড়ি, পদ্মচিত্র, মাদুর-বেড়া (mat-design) ইত্যাদি এবং বিভিন্ন মাপের পোড়ামাটির Relief-এ দেবদেবী ও secular, লোকায়ত জীবনকেন্দ্রিক চিত্র তথা পশু-পাখীর খোদিত রূপ আছে। পলিমাটির সঙ্গে বালি ও সামান্য অভ্র দিয়ে ফলকগুলো হাতে তৈরী এবং হাতে-খোদাই করা। তন্মধ্যে উল্লেখ্য শিব, সূর্য,

গরুড়, গন্ধর্ব, কিন্নর-কিন্নরী, যোদ্ধা, পদ্মের উপর স্থাপিত বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ, ছত্রধর উপাসক, ভারবাহী, সিংহ, বরাহ, মহিষ, ময়ুর, ময়ূরী, হাঁস ও বানর ইত্যাদি। বর্তমান বাংলাদেশে পাহাড়পুরের বিহারেও এমনই ফলক মিলেছে বটে, কিন্তু জগজ্জীবনপুরে প্রাপ্ত এই পূর্ণ ফলকগুলির অবয়ব সংস্থান-শিল্প ও সৌকর্যে উন্নততর সন্দেহ নেই। তা ছাড়া মৃৎপাত্রগুলি লাল ও ধূসর বর্ণের পোড়ানো। এই সব মৃৎপাত্র কুমোরের চাকে যে তৈরী তা বোঝা যায়। এর মধ্যে ক্ষুদ্র তালা, হাতলযুক্ত কড়াই, ঘট, কলসী, নাদা (বৃহৎ পাত্র) উল্লেখযোগ্য। দু চারটি বৃহৎপাত্র শুধুমাত্র হাতে তৈরী। বিভিন্ন রকমের আবিষ্কৃত পুরাবস্তুর মধ্যে পাওয়া গেছে নানা ধরনের পোড়ামাটির প্রদীপ, পোড়ামাটির চুড়ি, পোড়ামাটির বল, বাটখারা (ওজন নির্ধারণে), পোড়ামাটির হাতি, মাছধরার জালের কাঠি, পোড়ামাটির পুঁতি (Bead) উপরত্নের পুঁথি, লিপিযুক্ত পাত্রের ভগ্নাংশ এবং লোহার কাঁটা। এ অঞ্চল থেকে ব্রোঞ্জের ক্ষুদ্র এক ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি ও প্রস্তরের বুদ্ধমূর্তিও পাওয়া গেছে।

তুলাভিটার পাশে আখরিডাঙ্গা প্রত্নস্থলের একটি অংশে যে ইষ্টক নির্মিত সৌধের ধ্বংসাবশেষ মিলেছে তাতে এটি বৌদ্ধ মন্দির বলে অনুমান করা হয়েছে।[২]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে তাম্রশাসনে নন্দদীর্ঘীক উদ্রঙ্গ মহাবিহারের পূর্ব দিকে অবস্থিত টাঙ্গন নদীর উল্লেখ আছে। কিন্তু বর্তমানে টাঙ্গন নামক নদটি পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত, তবে একটি নদীর শুকনো খাদের চিহ্ন মেলে। এটি নিশ্চিত নদী-খাদের পরিবর্তন। তবে পূর্ণ উৎখননে আরও অজানা তথ্য মিলবে সন্দেহ নেই।

● **পাদটীকা**

১. অশোক চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রী - পাল অভিলেখ সংগ্রহ, পৃ-১৭

২. প্রদ্যোত ঘোষ - মালদহ জেলার পুরাকীর্তি : সংযোজন জগজ্জীবনপুর - অমল রায়, পৃ-১২৯-১৩৬

অন্য সূত্র —

ক. ড. দেবলা মিত্র - সম্পাদকীয় প্রতিবেদন- মালদহ জেলার পুরাকীর্তি - প্রদ্যোত ঘোষ, পৃ- ৬-৯

খ. Dr. K. V. Ramesh & Dr. S. Subramania Iyar - Epigraphia Indica, Vol. XLII, P- 6-29

গ. Dr. G. Bhattacharya - South Asian Studies, Vol. 4, P-71-73

ঘ. Dr. A. Bhattacharyya - Bulletin of the Asiatic Society, Vol. XVIII, No. 4, p-1-3

## নির্ঘন্ট (সংক্ষিপ্ত)

# গ্রন্থপঞ্জী ঃ বাংলা (সংক্ষিপ্ত)


১. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় - গৌড় লেখমালা, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ।
- গৌড়ের কথা, ১৩৯০ বঙ্গাব্দ।

২. অজয় হোম - চেনা অচেনা পাখী, ১৯৯০।

৩. অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় - মধ্যযুগে বাংলা ও বাঙালী,১৯৮৬।

৪. অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ - ভারত সংস্কৃতির উৎসধারা, ১৩৭২।
- রচনাবলী, তৃতীয়খন্ড, ১৯৯০।

৫. অশোক চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রী - পাল অভিলেখ সংগ্রহ, ১৯৯২।

৬. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খন্ড, ১৯৭০।

৭. আবদুর রহিম - বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রথম খন্ড (মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত), প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৫।

৮. আবদুল করিম - বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৮৭।

৯. গোলাম হোসেন সলীম - রিয়াজ-উস-সালাতিন ( আকবরউদ্দীন অনূদিত), ১৯৭৪।

১০. চারুচন্দ্র মিত্র - গৌড়-পাভুয়া,১৩২৯ বঙ্গাব্দ।

১১. দীনেশচন্দ্র সেন - বৃহৎ বঙ্গ, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ।

১২. নগেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদিত) - বাংলা বিশ্বকোষ, চতুর্থ - একবিংশ ভাগ, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৮৮।

১৩. নীহাররঞ্জন রায় - বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ।

১৪. প্রদ্যোত ঘোষ - গৌড়বঙ্গের স্থাপত্য, প্রথম খন্ড,১৯৭৭।
- মালদহ জেলার পুরাকীর্তি, ১৯৯৫।
- কবিকঙ্কণ চন্ডী (সম্পাদিত), ২০০১

১৫. প্রভাস সেন - বাংলার ইতিহাস, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ।

১৬. বারণী জিয়াউদ্দীন - তারিখ-ই-ফিরুজশাহী (গোলাম সামদানী কোরায়শী অনূদিত ), ১৯৮২।

১৭. মীর্জা নাথান - বাহারীস্তান-ই-গায়েবী (খালেকদাদ চৌধুরী অনূদিত), ১৯৭৮।

১৮. মীনহাজ-ই-সিরাজ - তবকাত-ই-নাসিরী (আবুল কালাম যাকারিয়া অনূদিত ও সম্পাদিত, ১৯৮৩।

১৯. রজনীকান্ত চক্রবর্তী - গৌড়ের ইতিহাস (দেজ) ১৯৯৫।

২০. রমাপ্রসাদ চন্দ - গৌড়রাজমালা, নবভারত সং, ১৯৭৫।

২১. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় - বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ও ২য় খন্ড (দেজ), ১৪০২।

২২. রামপ্রাণ গুপ্ত (অনূ) - রিয়াজ-উস-সালাতিন, ১৩১২ বঙ্গাব্দ।

২৩. রমেশচন্দ্র মজুমদার - বাংলা দেশের ইতিহাস, ১ম খন্ড, প্রাচীনযুগ, সপ্তম সং ১৯৮১
- দ্বিতীয় খন্ড, মধ্যযুগ, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ।
- তৃতীয় খন্ড, ১৯৮১।

২৪. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিজিৎ দাশগুপ্ত (সম্পা) - জাতি,বর্ণ ও বাঙালী সমাজ, ১৯৮৮।

২৫. সুকুমার সেন - বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খন্ড, পূর্বার্ধ, ষষ্ঠ সং ১৯৭৮।
- বাংলা স্থান নাম, ১৩৮৯।

২৬. সুখময় মুখোপাধ্যায় - বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল, তৃতীয় সং, ১৯৮০।

২৭. সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় - বাংলার আর্থিক ইতিহাস ( অষ্টদশ শতাব্দী), ১৯৮৫।

২৮. সৈয়দ গোলাম হুসাইন খান তাবতাবারী - সিয়ারে মুতাখ্‌খিরীন (আবদুল কাদের অনূদিত),১৯৭৮।

## Select Short Bibliography (English)

1. Abid Ali Khan (Ed. H. E. Stapleton) - Memoirs of Gaur and Pandua, 1931

2. Akshay Kumar Maitra - The Ancient Monuments of Varendra, 1949
   -The fall of Pala Empire

3. Aloka Chattopadhyaya - Atisa and Tibet, 1967

4. Ashok Mitra - The Tribes and Castes of Bengal, 1953

5. Ball V - Jungle Life in India, 1880

6. Basu K. K. (tr.) - The Tarikh-i-Mubarak Shahi of Yahya bin Ahmed Sarhindi

7. Benoykumar Sarkar - The Positive Background of Hindu Sociology, 1937

8. Beveridge H (tr.) - Tarikh-i-Mubarak Shahi, reprint, 1990
   - Akbar-Nama, Vol.I, II, III reprint, 1983

9. Beveridge Annette S (tr.) - Humayun Nama, 1902

10. Beverly H - Report on the Census of Bengal, 1872

11. Bimalachurn Law - Historical Geography of Ancient India, 1968

12. Bose S C - The Hindoos as they are, 1881

13. Bourdillon J A - Report on the Census of Bengal, Vol. I, 1883

14. Brojendranath De (tr.) - The Tabaquat-I-Akbari, Vol. I (1911,vol. II (1936), vol. III (1939)

15. Blochmann H (tr.) - A-In-I-Akbari, reprint, 1989

16. Cambridge History of India, vol. III

17. Carter M. O - Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Malda, 1926-35, 1938

18. Creighton H - The Ruins of Gaur, 1817

19. Dalton Edward Tuite - Descriptive Ethnology of Bengal, 1872, Reprint 1973

20. Dani Ahmad Hasan - Muslim Architecture in Bengal, 1961

21. Desai A Ziauddin - Indo-Muslim Architecture, 1968

22. Fergusson James - History of Indian and Eastern Architecture, vol. I & II, 2nd Edn. 1910

23. Hunter W W - Annalsof Rural Bengal, Reprint, 1975
   - A Statistical Account of Bengal, Vol. VIII, Reprint, 1974

24. Jarett (tr.) - Ain-I-Akbari Vol. I & II

25. Karim A - Social History of the Muslim in Bengal, 1959
   - Corpus of Muslim Coins in Bengal, 1966

26. Kosambi Damodar Dharmanand - An Introduction to the Study of Indian History, 2nd Edn., 1975

27. Lambourn G E (Ed.) - Bengal District Gazetteers, Maldah, 1918
28. Momtazur Rahaman - Husain Shahi Bengal, 1965
29. Nirmal Kumar Basu - Tribal Life in India, 1971
30. Percival Spears - A History of Delhi under the later Mughal, 1951
31. Promode Lal Paul - The Early History of Bengal, 1939
31.B. Prodyot Ghosh - Kalighat Pats : Annals and Appnaisal 1967
32. R. C. Majumdar - History of Ancient Bengal, 1974
- (Ed) The History of Bengal, vol. I 2nd Imp. 1963
- (Ed) The History and Culture of the Indian people, The Delhi Sultanet, 4th Edn., 1990
- Corporate Life of Ancient India, 1920
33. R. C Majumdar, Radhagobinda Basak, Nanigopal Banerjee (Ed)- Ramcharitam of Sandhyakarnandin, 1939
34 Ravenshaw - Gaur, its Ruins and Inscriptions, 1878
35. Risley H H - The People of India, 1908
- The Tribes and Castes of Bengal, vol I & II reprint, 1981
36. S . K Chattopadhyaya - Early History of Northern India, 1958
37. S. K. Maity, R R. Mukherjee - Corpus of Bengal Inscriptions, 1967
38. Salim Ali - The Book of Indian Birds, Reprint, 1996
39. Stewart Charles - History of Bengal From Muhammadan Invasion until 1757, (1813)
40. Thornton Edward - A Gazetteers of the Territories under the Government of the East-India Company and of the native states on the continent of India, 1858
41. Watters T - On Yuan Chwang'sTravels in India, Vol I & II, 1903
42 Yule Henry, A C Burnell - Hosbon-Jobson, 1996

## Journals & Booklets

Annual Report of the Archaeological Survey, 1923-24, Malda

District Flood Contingency Plan & Programme, 2003 of Malda District.

District Profile, Malda 1992-93, 1998-99

Epigraphia Indica, Vol. II, IV, XII

Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1875, 1895, 1909, 1910 & Vols X, XIII, XLVII

Journal of the Indian Society of Oriental Art, Vol. IX

District Census Hand Book, Malda, 1951 (A. Mitra, I.C.S)

District Census Hand Book, Malda, 1971 (B. Ghosh, I.A.S)

District Census Hand Book, Malda, 1981 (S, N. Ghosh, I. A. S)

District Census Hand Book, Malda, 1991 (H. Chakraborty I. A. S)